হিন্দু-পত্রিকা।

১৩১৩ সালের সূচীপত্র।

১৩শ বর্ষ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১ম ২য় সংখ্যা।

১৮২৮, ১৩১৩।

গ্রাহকগণ!

বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৮।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ১৷৹ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵৹

পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্ব স্ব গ্রাহক-নম্বর লিখেন।

১৩০১।২।৩।৪ সনের বাঁধান হিন্দু-পত্রিকা। প্রতি সন ১৷৹ এবং ১৩০৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২ সালের বাঁধান পত্রিকা ...

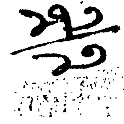
সম্পাদক রায় যতুনাথ মজুমদার বাহাদুর এইক্ষণে হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইলে ২৩ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতা এই ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সুলভমূল্যে উপহার দেওয়া হইয়া থাকে।

হিন্দুপত্রিকা, হিতবাদী ও এডুকেশন-গেজেটের বিখ্যাত উদ্ভট-শ্লোক-প্রকাশক

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ-প্রণীত—

শ্রীহরিঃ



(১৮৬৭ সালের ২৫ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। বৈশাখ। ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

মঙ্গলাচরণ।

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃসন্ত্বোষধীঃ, মধু-নক্তমুতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধু-মান্নো বনস্পতির্মধুমাংস্তু সূর্য্যো, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

মধুর বায়ু প্রবাহিত হউক্, সিন্ধু সকল মধুস্রাবী হউক্, ওষধিসমূহ মধুময়তা লাভ করুক্, রাত্রি মধুময়ী হউক্, প্রাতঃকাল মধুময় হউক্, পার্থিব রজঃকলাপ মধুমৎ হউক্, পিতা দ্যুলোক মধুময় হউন্, বনস্পতিগণ মধুমান্ হউক্, সূর্য্য মধুময় হউন্, গাভী সকল মধুময়ী হউক্, সমস্ত চরাচর মধুর মধুর মধুর হউক্!

অতীত অন্ধকারে আপন অঙ্গ লুকাইল; বর্ত্তমানের তরুণ অরুণকিরণ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। এই শুভ মুহূর্ত্তে পবিত্রপ্রাণে পরমেশ-পদে প্রার্থনা, যেন নবীন উদ্যম, নব বল, নূতন সাহসনিষ্ঠা, উদীয়মান কর্ত্তব্য-জ্ঞান লাভ করিতে পারি। যেন আমাদের ঊর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ সর্ব্বত্র শান্তির মধুময় সুবাতাস বহিতে থাকে। রুগ্ন ভগ্ন, জীর্ণ শীর্ণ, মলিন বিলীন চলিয়া যাউক্, শান্তি কান্তি, প্রীতি তৃপ্তি ভক্তি শক্তি শতধারে প্রবাহিত হউক্। জগৎ মধুময় হউক্ জীবন মধুময় হউক্। বিষাদ রোদন, জ্বালা বেদনা, দাহ পিপাসা, আকুলতা তপ্ত অশ্রু—অতীতের অস্মর্ত্তব্য সাগরে ভাসিয়া যাউক্, অদৃশ্য হউক্; উৎসাহ উদ্যম, পৌরুষ বিক্রম, সাহস সম্পৎ, হাসি শান্তি আসুক্।

অতীতের অপরাধ, পুরাতন পাপ, বিগত ভ্রম আর স্মরণ করিয়া দরকার

৫৫৫

আইস ; বর্ত্তমানে যাহাতে সুখ শান্তি উদ্যম আরোগ্যের মধুময় মূর্ত্তি নয়ন পথে সতত প্রকাশিত থাকে, তাহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

যে গিয়াছে, তাহাকে আহ্বান করা নিরর্থক, যে আছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। শুভ নববর্ষের সুমুহূর্ত্তে আমরা ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি, আমরা যেন হিন্দুশাস্ত্র-সমাজ-সেবাব্রতে পূর্ব্ববৎ অটল ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারি; আর যেন বর্ত্তমান জগৎ আমাদিগের সম্মুখে মধুময় দৃশ্য উপস্থিত করে। ভগবদাশীর্ব্বাদে যেন আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক পৃষ্ঠ-পোষক স্বধর্ম্মানুরাগি মহোদয়গণ মধুময় যোগ্য জীবন যাপন করিয়া ধন্য হ'ন; দেশ পুণ্যময় হয়, ইহাই সর্ব্বোপরি শ্রীভগবৎপদে কামনা। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীদেবীসূক্তম্।

—•:•:•—

**ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরা-
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্য-
হমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥১**

অন্বয়ঃ,

ওঁ অহং রুদ্রেভিঃ চরামি; অহং বসুভিঃ চরামি; মিত্রাবরুণা উভা অহমেব বিভর্ম্মি; ইন্দ্রাগ্নী অপি অহমেব বিভর্ম্মি; উভ অশ্বিনৌ অপি অহমেব বিভর্ম্মি।

অহমিত্যষ্টর্চ্চং ত্রয়োদশং সূক্তং। অম্ভৃণস্য মহর্ষেঃ দুহিতা বাঙ্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মানমস্তৌৎ। অতঃ সার্ষিঃ। সচ্চিৎ সুখাত্মকঃ সর্ব্বগতঃ পরমাত্মা দেবতা। তেন হ্যেষা তাদাত্ম্যমনুভবন্তী সর্ব্বজগদ্রূপেণ সর্ব্বস্যাধিষ্ঠানত্বেন চাহমেব সর্ব্বং ভবামীতি স্বাত্মানং স্তৌতি। দ্বিতীয়া জগতীশিষ্টাঃ সপ্ত ত্রিষ্টুভঃ তথা চানুক্রান্তং। অহমষ্টৌ বাগম্ভৃণী তুষ্টা বাত্মানং দ্বিতীয়া জগতীতি॥ পত্যোবিনিয়োগঃ।

অহং সূক্তস্য দ্রষ্ট্রী বাগম্ভৃণী যদ্ব্রহ্ম জগৎকারণং তদ্রূপা ভবন্তী। রুদ্রেভিঃ রুদ্রৈঃ একাদশভিঃ। ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া। তদাত্মনা চরামীতি যোজ্যং। তথা মিত্রাবরুণা মিত্রঞ্চ বরুণঞ্চ। সুপাংলুগিতি দ্বিতীয়ায়া আকারঃ। উভ উভৌ অহমেব ব্রহ্মভূতা বিভর্ম্মি ধারয়ামি। ইন্দ্রাগ্নী অপ্যহমেব ধারয়ামি। উভ উভৌ অশ্বিনাবপ্যহমেব ধারয়ামি। ময়ি হি সর্ব্বং জগৎ শুক্তৌ রজতমিবাধ্যস্তং সৎ দৃশ্যতে মায়া চ জগদাকারেণ বিবর্ত্ততে তাদৃশ্যা মায়য়া আধারত্বেনাসঙ্গস্যাপি ব্রহ্মণ উক্তস্য সর্ব্বস্যোৎপত্তিঃ॥

অম্ভৃণ মহর্ষির বাগদেবী নামে এক কন্যা ছিলেন। ইনি ব্রহ্মবিদুষী ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মসমুদ্রে নিমগ্না হইয়া আপনাকেই স্তব করিতেছেন। অথবা স্বয়ং চণ্ডিকা দেবী তাঁহার দেহে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহারই মুখে বলিতেছেন।

আমি একাদশ রুদ্র ও অষ্ট বসুরূপে অবস্থিতা; আমিই আদিত্য। আমিই বিশ্বদেব; মিত্রাবরুণকে আমিই ধারণ করিয়া আছি; আমিই ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারশরীরে বিচরণ করিয়া থাকি। ১

অহং সোমমাহনসং বিভ-
র্ম্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুম্বতে ॥

অন্বয়ঃ,

অহং আহনসং সোমম্ বিভর্ম্মি; তথা অহং ত্বষ্টারং উত (অপি) চ পূষণং ভগম্ চ বিভর্ম্মি; সুপ্রাব্যে হবিষ্মতে সুম্বতে যজমানায় দ্রবিণং অহমেব বিভর্ম্মি।

অহং আহনসং আহন্তব্যং অভিষোক্তব্যং সোমং যদ্বা আহন্তারং দেবতাত্মকং সোমং বিভর্ম্মি। তথা অহং ত্বষ্টারং উত অপি চ পূষণং ভগং চ বিভর্ম্মীতি যোজনীয়ম্। তথা হবিষ্মতে হবির্যুক্তায় সুপ্রাব্যে শোভনং হবিঃ দেবানাং প্রাব্যে তর্পয়িত্রে। অবতেস্তর্পণার্থাৎ ই প্রত্যয়স্তস্তচতুর্থী। সুম্বতে সোমাভিষবং কুর্ব্বতে দ্রবিণং ধনং যাগফলরূপং অহমেব ধারয়ামি ॥২

আমি অভিষোক্তব্য (অথবা শত্রুনাশক) দেবাত্মা সোমকে ধারণ করিতেছি; ত্বষ্টা, পূষা ও সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগকে আমিই ধারণ করিয়া রহিয়াছি। সোমযাগে সুন্দর হবিঃপ্রদান দ্বারা যাঁহারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের যাগফলস্বরূপ ধনের রক্ষা করিয়া থাকি। ২

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩

অন্বয়ঃ,

অহং রাষ্ট্রী, অহং বসূনাং সংগমনী, অহং চিকিতুষী, (অতএব) যজ্ঞিয়ানাং প্রথমা, দেবাঃ তাং মাং ভূরিস্থাত্রাং ভূরি আবেশয়ন্তীং পুরুত্রা বিদধাতি।

অহং রাষ্ট্রী ঈশ্বরী তথা বসূনাং ধনানাং সর্ব্বস্ব যাগাদিফললক্ষণানাং সংগমনী সঙ্গময়িত্রী প্রাপয়িত্রী, চিকিতুষী যৎ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যং পরংব্রহ্ম তজ্জ্ঞানবতী স্বাত্মতয়া সাক্ষাৎকৃতবতী। অতএব যজ্ঞিয়ানাং যজ্ঞার্হানাং প্রথমা মুখ্যা, সৈবংগুণবিশিষ্টাহং তাং মাং ভূরিস্থাত্রাং বহু ভাবেন অবতিষ্ঠমানাং ভূরি ভূরীণি বহূনি ভূতজাতানি আবেশয়ন্তীং জীবভাবেনাত্মানং প্রবেশয়ন্তীং পুরুত্রা বহুষু দেশেষু ব্যদধুঃ দেবাঃ বিদধতি। যে যৎ কুর্ব্বন্তি তে তৎ তৎ মামেব কুর্ব্বন্তীতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

আমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী; আমিই যজমানদিগকে যাগাদিফললক্ষণ ধন প্রদান করিয়া থাকি; আমিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানবতী ও সর্ব্বান্তর্যামিরূপে তাহা সাক্ষাৎ করিয়া থাকি; আমি যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে প্রথমা। সর্ব্বরূপে সর্ব্বদেহে যাহা বিরাজ করিতেছে, নিখিল পদার্থের সত্তা বা জীবনরূপে যাহা কিছু অবস্থান করিতেছে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী দেবগণ যেখানে থাকিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা আমারই আরাধনার নিমিত্ত বিহিত হইতেছে। ৩

ময়া সোহন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোত্যুক্তম্।

অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি ॥৪

অন্বয়ঃ,

যঃ অন্নং অত্তি (স ভোক্তা শক্তিরূপয়া) ময়া এব অত্তি, যঃ চ বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি, যঃ শৃণোতি সোঽপি ময়া এব পশ্যতীত্যাদি ইতি উক্তম্। যে (ঈদৃশীং) মাং ন জানন্তি (তে) মাং অমন্তবঃ উপক্ষিয়ন্তি । অথবা মামন্তবঃ জনা উপক্ষিয়ন্তি] হে শ্রুত— শ্রুধি; শ্রদ্ধিবং তে (তুভ্যং) বদামি।

যঃ অন্নং অত্তি স ভোক্তা শক্তিরূপয়া ময়ৈব অত্তি। যশ্চ বিপশ্যতি আলোকয়তি প্রাণিতি শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিব্যাপারং করোতি সোঽপি ময়ৈব পশ্যতীত্যাদি যোজনীয়ম্। যে ঈদৃশীং অন্তর্যামিরূপেণ অবস্থিতাং মাং ন জানন্তি তে মাং অমন্তবঃ অবমন্যমানাঃ অজ্ঞানন্তঃ উপক্ষিয়ন্তি হীনা ভবন্তি। যদ্বা মামন্তবঃ মদ্বিষয়ক জ্ঞান রহিতা ইত্যর্থ। হে শ্রুত বিশ্রুত সখে! শ্রুধি ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু। শ্রদ্ধিবং শ্রদ্ধি শ্রদ্ধা তয়া যুক্তং শ্রদ্ধা-দানেন লভ্যং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু ইতি যাবৎ। তে তুভ্যং বদামি উপদিশামি।

জীব আমারই শক্তি-প্রভাবে ভোজনাদি করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, আমারই শক্তি লাভ করিয়া মনোমুগ্ধকর কত দর্শনীয় বস্তু দেখিয়া থাকে, আমারই শক্তিকণা লাভ করিয়া কত শ্রাব্য শ্রুতিগোচর করে, বস্তুতঃ আমিই জীবের জীবনশক্তিরূপা। হে বিশ্রুত সখে! শ্রদ্ধালব্ধ ব্রহ্মাত্মক বস্তু সম্বন্ধে ইহা তোমাকে উপদেশ দিতেছি। ৪

অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্
॥৫

অন্বয়ঃ,

অহং স্বয়মেব ইদং বদামি; অহং দেবেভিঃ উত মানুষেভিঃ জুষ্টং; (ঈদৃক্) অহং যং যং (রক্ষিতুং) তং তং উগ্রং কৃণোমি, অহং তং ব্রহ্মাণং করোমি, অহং তং ঋষিং করোমি, অহং তং সুমেধাং চ করোমি।

অহং স্বয়মেব ইদং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু বদামি উপদিশামি। দেবেভিঃ দেবৈঃ উত অপি মানুষেভিঃ মানুষৈঃ জুষ্টং সেবিতম্। ঈদৃক্-বস্থাত্মিকা অহং কাময়ে যং পুরুষং রক্ষিতুং বাঞ্ছামি তং তং উগ্রং কৃণোমি সর্ব্বেভ্যঃ অধিকং করোমি। ব্রহ্মাণং স্রষ্টারং ঋষিং অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শিনং সুমেধাং শোভনপ্রজ্ঞং চ করোমি ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্।

আমি স্বয়ংই এই ব্রহ্মাত্মক বস্তু উপদেশ প্রদান করিতেছি। মনুষ্যগণ ও দেবতাগণ আমার উপসনা করিয়া থাকে; আমার ইচ্ছাতেই জীব শোভন প্রজ্ঞা ঋষিত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। ৫

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহংজনায় সমদং কৃণোম্যহম্
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ হ ॥৬

অন্বয়ঃ,

ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবৈ অহং রুদ্রায় ধনুঃ আতনোমি; অহং জনায় সমদঃ কৃণোমি, অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ।

ত্রিপুরবধসময়ে রুদ্রায় রুদ্রস্য মহাদেবস্য

ধনুঃ চাপং অহং আতনোমি মৌর্ব্ব্যা আততং করোমি। কিমর্থং ব্রহ্মদ্বিষে ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টা তস্মৈ। শরবে শরুহিংসক ব্রহ্মহিংসকং ত্রিপুরবাসিনং অসুরং হন্তবৈ হন্তুং হিংসিতুং। উ শব্দঃ পূরকঃ। অহমেব জনায় জনরক্ষণায় সমদং শত্রুভিঃ সহ সংগ্রামং কৃণোমি করোমি তথা দ্যাবাপৃথিবী দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তর্যামিতয়া আবিবেশ প্রবিষ্টবতী।

ব্রহ্মদ্বিট্‌ ব্রহ্মহিংসক ত্রিপুরবাসী অসুরগণকে নিপাত করিবার জন্য রুদ্রদেব কর্ত্তৃক যে হরধনু জ্যাযুক্ত হইয়া ছিল, তাহা আমারই শক্তিপ্রভাবে সম্পন্ন হইয়া ছিল, সাধুগণের রক্ষার নিমিত্তই আমি শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকি। ৬

অহং সুবে পিতরস্য মূর্দ্ধ-
ন্মম যোনিরপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা
তামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥৭

অন্বয়ঃ,

অস্য মূর্দ্ধন্‌ পিতরং সুবে; মম চ যোনিঃ সমুদ্রে; অপ্‌সু অন্তঃ যং (ব্রহ্ম চৈতন্যং) তং মম কারণম্‌; (যং ঈদৃগ্‌ভূতাহমস্মি) ততঃ বিশ্বা ভুবনা অনু (অনুপ্রবিষ্টা ভূত্বা) বিতিষ্ঠে; উত চ অমূং দ্যাং বর্ষ্মণা উপস্পৃশামি।

পিতরং দিবং অহং সুবে জনয়ামি। কস্মিন্‌ অস্য পরমাত্মনঃ মূর্দ্ধন্‌ মূর্দ্ধনি উপরি। কারণভূতে তস্মিন্‌ বিয়দাদি কার্য্যজাতং বিবর্ত্ততে তন্তুষু পট ইব। মম চ যোনিঃ কারণং সমুদ্রে সমুদ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতান্‌ ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা তস্মিন্‌। অপ্‌সু ব্যাপনশীলেষু ধীবৃত্তিষু অন্তর্মধ্যে যং ব্রহ্মচৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ। যং ইদৃগ্‌ভূতাহমস্মি ততো বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনা ভুবনানি অনু অনুপ্রবিষ্টা ভূত্বা বিতিষ্ঠে বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। উত অপি চ অমূং দ্যাং স্বর্গলোকং উপলক্ষণমেতৎ কৃৎস্নং বিকারজাতং বর্ষ্মণা কায়েন মায়াত্মকেন দেহেন মদীয়েন উপস্পৃশামি। যদ্বা অস্য ভূলোকস্য মূর্দ্ধন্‌ মূর্দ্ধনি অহং পিতরমাকাশং সুবে। সমুদ্রে জলধৌ অপ্‌সু উদকেষু অন্তর্মধ্যে মম যোনিঃ কারণভূতঃ অম্ভৃণাখ্যঃ ঋষিঃ বর্ত্ততে। যদ্বা সমুদ্রে অন্তরীক্ষে অপ্‌সু অপ্যয়েষু দেবশরীরেষু মম কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ত্ততে। ততোহহং কারণাত্মিকা সতী সর্ব্বাণি ব্যাপ্নোমি।

আমার পরমাত্মরূপ হইতে সর্ব্বভূতের মূল কারণস্বরূপ এই আকাশাদি প্রকাশ পাইয়াছে; আমি সমুদ্র মধ্যেও কারণরূপে বর্ত্তমান; আমি চৈতন্যরূপে এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি এবং প্রকৃতিরূপেও সমস্ত পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি। ৭

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরোদিবা পর এনা পৃথিব্যৈ
তাবতী মহিমা সম্বভূব ॥ ৮

অন্বয়ঃ,

অহমেব বিশ্বা ভুবনানি আরভমানা বাত ইব প্রবামি, পরো দিবা এনা পৃথিব্যাঃ পরঃ এতাবতী মহিমা সংবভূব।

বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি ভুত-

জাতানি আত্মমায়া কারণরূপেণ উৎপাদয়ন্তী অহমেব পরেণ অনাধিষ্ঠিতা স্বয়মেব প্রবর্ত্তমানা বাত ইব যথা বাতঃ পরেণ অপ্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্রবাতি তদ্বৎ। উক্তং নিগময়তি, পর ইতি সকারান্তঃ পরস্তাদিত্যর্থঃ। যথা অধঃ ইতি অধস্তাদর্থে। পরো দিবা দিবঃ আকাশস্য পরস্তাৎ। এনা পৃথিব্যাঃ পরঃ পরস্তাৎ। উপলক্ষণমেতৎ। উপাদানমুপলক্ষণং। এতদুপলক্ষিত সর্ব্বস্মাৎ বিকারজাতাৎ পরস্তাৎ বর্ত্তমানা অসঙ্গোদাসীনকূটস্থ চৈতন্যরূপাহং মহিমা মহিম্না তত্ত্বাবতী সংবভূব। এতৎ সর্ব্বভূতাস্মীত্যর্থঃ॥

আমি বিশ্বস্থ ভাবৎ পদার্থ স্বয়ং কারণ স্বরূপে উৎপাদন করিয়া স্বাধীন ভাবে বায়ুর ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছি; আমি পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই অসঙ্গ উদাসীন কূটস্থ চৈতন্যরূপে নিজ মহিমাপ্রভাবে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিতা রহিয়াছি। ৮

ভক্তিকামিনঃ কস্যচিৎ—আত্রেয়ী কুটীর।

বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায়ু।

(পরিশিষ্ট)

প্রথম অংশ।

—:•:—

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিয়া, উপস্থিত প্রসঙ্গের উপসংহার করিবার পরে, আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অনেকের অনুরোধে সেই প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পুনরালোচনা করিতে আকাঙ্খা করি। বিগত একশত পঞ্চাশ বৎসর কাল মধ্যে, আমাদের দেশের ও জাতির যে কত প্রকারে অবনতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া যদি বঙ্গদেশের অধিবাসীরা বোধগম্য করিতে পারেন, তাহাহইলে সহজে বুঝিবেন যে, এবম্প্রকার অবনতির স্রোত ক্রমাগত যদি আর সার্দ্ধৈকশত বর্ষকাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ও অপ্রতিহত প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইতে বাঙ্গালী জাতি সম্পূর্ণ ভাবে উৎসন্ন যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, শারীরিক সামর্থ্য, মানসিক বল, মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা, আধ্যাত্মিক তেজ, জাতীয় ধনের পরিমাণ, কৃষি, বাণিজ্য, ব্যবসায়, শিল্প, স্বাধীনবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সকল বিষয়েই বাঙ্গালী যেন অবনত ও অভিশাপগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে॥ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমি কেবল বঙ্গবাসী হিন্দুর পরমায়ু সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, সুতরাং অন্য বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বর্ণনীয় বিষয় হইতে ভ্রষ্ট হইবার ভয়ে, প্রস্তাবের শীর্ষোক্ত বিষয়েরই অনুধাবনায় আবদ্ধ রহিলাম। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালীর পরমায়ুর অবস্থাও শোকাবহ; দীর্ঘজীবী, দীর্ঘকায়, সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবলদেহী ও শান্তমনা বাঙ্গালীর সংখ্যা বৎসর বৎসর কম হইয়া আসিতেছে। যে সকল কার্য্য দ্বারা দেহের সমুদয় ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের সম্পূর্ণ পরিচালনা হইতে পারে, সেই সমুদয় কার্য্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। মনের শান্তি, হৃদয়ের সবলতা ও আনন্দ এবং আত্মার উৎকর্ষবিধানকারী বিদ্যা ও

অভ্যাস সমূহ আর নাই বলিলেই হয়। চাকুরী, গোলামী, অকারণে বিদেশীয় ভাবের পোষকতা, অপরিমিত ব্যয়, বিলাস, সৌখীনতা, অনাবশুক দুশ্চিন্তা, অর্থাভাব, বিলাতী আচার ব্যবহার, অনাবশুক অভাব-বোধ, তামসিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি প্রভৃতির দ্বারা বাঙ্গালী নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। যাহা হউক, ইহা ধ্রুব সত্য যে, সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালী ক্রমে স্বল্পজীবী হইয়া আসিতেছে। নিম্নে কতকগুলি শ্রেণীর লোকের আয়ুর পরিমাণ দেখুন—

শ্রেণী……………………	গড়ে পরমায়ু
বাঙ্গালী জমিদার	৩১ বৎসর
বাঙ্গালী প্রজা (নদীতীরবাসী মাত্র)	৪৫
" শিক্ষক	৩৪
বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রের লোক	৩৬½
চাকরী জীবী	৩২
বেকার (কর্ম্মহীন)	২৯¾
মাঝি (নৌকাবাহক)	৪৭
গোশকটচালক	৩৯
চিত্রকর	৪৮
ব্যাধ (শিকারী)	৫ ½

উপরি উক্ত তালিকায় চাকুরে, বেকার, জমিদার এবং বঙ্গসাহিত্যের সেবক—এই কয়েক শ্রেণীর লোকের পরমায়ু তুলনায় আরও কম, ইহার কারণ যথাসময়ে ব্যাখ্যা করিব। নিম্ন লিখিত তালিকায়, চাকুরে বাবুরা কোন্ কোন্ আফিসে কেরাণীগিরী করিয়া কিরূপে পরমায়ুর পরিমাণ কমাইতেছেন, তাহা অগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করুন।

বিভাগের নাম	পরমায়ু (গড়ে)
পোষ্ট আফিশ	২৮ তিনের চার বর্ষ
পুলিশ	৩৫
আবকারী	৪৯
মুন্সেফ ও সবজজ	৪২
জেল বিভাগ	৪৪ একের তিন
ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের অফিশ	২৯½
জমিদারী গোমস্তাগিরি	৪৯½
মুদ্রাযন্ত্রের কম্পোজিটর	৩০
রেজেষ্ট্রী বিভাগ	ঐ
বাজার সরকার (market gomosta)	৫১
কমিসেরীয়েট বিভাগ	৪৭
সৈনিক বিভাগ (কেরাণী মাত্র)	৪৬½
ফৌজদারী আদালতের কেরাণী	৩৯
দেওয়ানী আদালতের কেরাণী	৩৮
জমিদারের দেওয়ান বা নায়েব	৫২
দোকানের মুহুরী	৫৩½
টেলিগ্রাফ আফিশ	৩২ একের তিন
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট	৪০½
রেলওয়ে বিভাগ	৩৯ তিনের চার
পাটের কল অথবা অন্যবিধ কলের কারখানার লোক	৩৮

নিম্ন লিখিত তালিকায় আরও কয়েকটা বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙ্গালীর পরমায়ুর পরিমাণ বুঝা যাইবে—

শ্রেণী	পরমায়ু (গড়ে)
১। ভ্রমণকারী বাঙ্গালী (যথা বৈরাগী, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ইত্যাদি)	৬১ বর্ষ
২। ভিখারী	৫৯½
৩। জাহাজের চাকুরে (গমনশীল জাহাজ, নৌকা, প্রভৃতির লোক)	৫৮
৪। দালাল	৫৭ তিনের চার

৫। ফেরওয়ালা ৪৩½
৬। জমিদারের পাইক, গ্রামের চৌকিদার এবং বাবুর খানসামা ৫০
৭। গৃহস্থের চাকর ও চাকরাণী ৫২½
৮। ছাত্রাবস্থায় বাঙ্গালীর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ২৯

এবারে নিম্নে যে তালিকা দেওয়া যাইতেছে, তদ্বারা কোন্ প্রকার রোগে প্রত্যেক সহস্রে কত বাঙ্গালী মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহা জানা যাইতে পারে।

রোগের নাম	প্রতিসহস্রে গড়ে মৃত্যু।
জ্বর প্লীহা যকৃৎ	৩২ তিনের চার
মাদক দ্রব্য সেবনে	ঐ
হৃদ্‌রোগ	১৩ একের তিন
বহুমূত্র	৬½
স্নায়বিক দুর্ব্বলতা	১৯
দুর্ভিক্ষ	৪১
বিসুচিকা ও মহামারী	১১
বসন্তরোগ	৪
স্বাস্থ্যকর আহারাভাবে দুর্ব্বলতা	১৯ তিনের চার
অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম	১২
উন্মত্ততা	২
ঘৃণিত রোগ	২¼
উদরী ও অজীর্ণ	১৮½
পক্ষাঘাত	১½
বাতব্যাধি	১
ক্ষয় ও কাস রোগ	৩ তিনের চার

উপরি উল্লিখিত তালিকা সমূহে যে সকল বিষয়ের ও যে সকল সংখ্যার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া না বুঝাইলে, অনেক পাঠকের পক্ষে বোধগম্য হওয়া কঠিন হইবে বলিয়া বিবেচনা করি; এই জন্য এস্থলে ইহার একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলাম।

বাঙ্গালী জমিদার তালুকদার ও পত্তনিদারের পরমায়ু পরিমাণ হ্রাস হইতেছে—শুনিয়া, অনেকে বিষাদিত হইতে পারেন, কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু দেখি না। যে সকল তামসিক কারণে বাঙ্গালার জমিদারেরা নিজের পদে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছেন, তাহা শত সহস্রাধিক বার অনেকের দ্বারা পরিষ্কার রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই অসুখদায়ক প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করা আমি অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। যে সকল ভূমিপগণ সাধারণ প্রাকৃতিক জমিদার হইতে স্বতন্ত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়া নিজের এবং স্বদেশ, স্বজাতি, স্বসমাজ ও প্রজাপুঞ্জের হিতে রত, আমি তাঁহাদিগের নাম এই তালিকাভুক্ত করি নাই। তাঁহারা পরমারাধ্য পরমেশ্বরের করুণায় মহত্বর ব্রতে ব্রতী থাকিয়া, সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন পূর্ব্বক ইহকাল ও পরকালের পথ উজ্জ্বল করুন; ভগবানের সমীপে আমার ইহাই সবিনয় প্রার্থনা।

কেরাণী কুলের পরমায়ুর পরিমাণ হ্রাস হইবার শতাধিক কারণ বর্ত্তমান। স্বল্প বেতন, যথোচিত আহার্য্যের অভাব, অতিরিক্ত খাটুনী, অফিসগৃহে উপযুক্ত বায়ুর অল্পতা, চিন্তা, নিয়ত অভাব, ভয়, অপমান, মনঃকষ্ট প্রভৃতি বহুবিধ হেতু বিদ্যমান দেখা যায়। কেরাণীর রীতিমত আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, দেহরক্ষার যত্ন, মস্তিষ্ক বা

মানসিক উন্নতি, ভগবৎ-আলোচনার অব কাশ, এই সকল প্রায়ই হয় না। পোষ্টা-ফিশ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্-অফিস প্রভৃতি স্থানের বাবুদিগের সর্ব্বদাই এই অসুখজনক অভিযোগ শুনা যায়, এবং অসুন্নত অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাছে অফিস যাইতে বিলম্ব হয়, এজন্য যামিনী বিগত না হইতেই শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্নান ও আহারের প্রয়োজন, এবং যে সময়টা শাস্ত্রমতে ভোজনের সময় নহে, সে সময়ে আহার করিয়া পদব্রজে, অশ্বযানে অথবা ট্রামে কিম্বা ট্রেণে বাবুদিগকে যাতায়াত করিতে হয়। আহারের পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা এতদ্দেশীয় জলবায়ু অনুসারে বিধেয়, ভোজনের পরেই সর্ব্বশরীর রসস্থ হয়, সুতরাং এবম্প্রকার শারিরীক গতি সর্ব্ববিধায় অবৈধ।

বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে যাঁহারা লেখক, গ্রন্থকার, সম্পাদক প্রভৃতি রূপে দর্শন দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় বা রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় উচ্চ-পদস্থ এবং উচ্চবেতনভোগী, তাঁহাদের অবস্থা উন্নত থাকে বটে, কিন্তু যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা অথবা কেবল সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিয়া চলেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৮ জন দরিদ্র অথবা নিয়ত অভাবের সহচর।

এ দেশে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের অবস্থা দিনে দিনে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা বলেন, তরুণ ছাত্র-দিগকে ইংরাজি বিশ্ববিদ্যালয়ের কু-প্রথা-নুসারে অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তজ্জন্য মন ও মস্তিষ্ক এবং দেহ প্রকৃতাবস্থায় থাকে না; তাঁহাদের উক্তি আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। সেকালে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে, হিন্দুছাত্রগণ বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়-শাস্ত্র, বিশেষতঃ কৃষ্ণানন্দের (১) "দীধিতি"র ন্যায় ভয়ানক কঠিন গ্রন্থ পাঠ করিয়াও কখন চোখে চশমা দেয় নাই, চা বা কাফি খায় নাই, পোলাও কালিয়া, কোর্ম্মা প্রভৃতি ভোজন করে নাই; অথচ তেমন উন্নত মন, উর্ব্বর মস্তিষ্ক এবং দেবোচিত স্বভাব, এখনকার ছেলেদের একশতের মধ্যে এক জনেরও আছে কিনা সন্দেহ। ক্রমাগত বিদেশীয় ভাবে দেহ ও মনকে জর্জ্জরিত করিয়া, বিদেশীয় আহার, পরিচ্ছদ, ভোজন-প্রথা, বিদেশীয় তামসিক আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মহীনতা, ভক্তিহীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃ-তিতে বাঙ্গালী ছাত্র নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছে। এই সকল কুপ্রথা ও কুভাব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়া, বাঙ্গালীকে উৎসন্নের সাগরে লইয়া যায়। বাঙ্গালী ছাত্রের পরমায়ু হ্রাস হইয়া যাইতেছে। পাঠ্যাবস্থায় অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। জেল-বিভাগ ও পুলিস-বিভাগের বাঙ্গালীর অবস্থা

(১) দীধীতিরচয়িতার নাম রঘুনাথ শিরোমণি। এই মহাত্মা 'কাণভট্ট' নামে পরিচিত ছিলেন। মৈথিল মহাত্মা গঙ্গে-শোপাধ্যায় চিন্তামণি নামে যে অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার টীকা দীধীতি; এই পুস্তক নব্যন্যায়ের গৌরব। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসার-প্রণেতা। লেখক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। হিঃ পঃ সং।

প্রায় ছাত্রসমতুল্য। হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, বেহারী বা অপর জাতীয় লোকদিগের মধ্যে, যাহারা বঙ্গদেশে জেল-বিভাগ বা পুলীশ-বিভাগে কার্য্য করে, তাহাদের পরমায়ু ও স্বাস্থ্য বাঙ্গালীর অপেক্ষা ভাল। বাঙ্গালী পুলীশ ইনেস্‌পেক্টরাপেক্ষা হিন্দুস্থানী কনষ্টবল অধিকতর সবল ও সুস্থ এবং দীর্ঘজীবী। জেলখানা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। তামসিকতা ও স্বেচ্ছাচার সকল স্থানেই বাঙ্গালীকে উৎসন্নাবস্থায় লইয়া যাইতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের কম্পোজিটরগণের বেতন অল্প, অথচ চক্ষুর ব্যবহার অত্যন্ত অধিক; নানা কারণে বাঙ্গালী কম্পোজিটরের চক্ষু শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া যায়। দরিদ্র কম্পোজিটরের পরমায়ু গড়ে ৩০ বৎসর মাত্র!

বাঙ্গালাদেশ ম্যালেরিয়ার জন্য বিখ্যাত। বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পায়। ভাদ্র হইতে পৌষের অর্দ্ধেক দিবস পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রবলতা দেখা যায়। এই সময়ে অনেক লোক মরে। জ্বর, প্লীহা ও যকৃত্‌ বঙ্গবাসীর ঘরের বিশিষ্ট শত্রু। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতিতে অল্প লোক মরে না! স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের, এবং শারিরীক পরিশ্রমের অভাবের কুফল। উপযুক্ত পুষ্টিকর আহারের অভাবেও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্মে। স্বাস্থ্যকর আহার্য্যাভাবেও অনেক বাঙ্গালী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। অজীর্ণ রোগ প্রায় সকল ঘরেই আছে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম বশতঃ এ দেশের অনেক বড় বড় লোক বহুমূত্র রোগে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কতকগুলি ঘৃণিত রোগ বাঙ্গালীর প্রায়ই সহচর। শতকরা প্রায় ৪৭ জন বঙ্গবাসী ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগকে পোষণ করেন। শতকরা প্রায় ২৭ জন মেহ-রোগভোগী, এবং শতকরা প্রায় দুই জন অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত।*

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ন্যায়-দর্শনে—
মুক্তি ও আত্মা।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোক বড় কষ্টে পতিত হইয়া, আক্ষেপের সহিত বলিয়া থাকে—"পরমেশ! আমায় ত্রাণ কর, আমাকে মুক্তি দাও। এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হইতেছে না। এ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে আমায় আর কত কাল রাখিবে?" কিন্তু, হায়, তাহার এরূপ আক্ষেপ ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে, সে শত চেষ্টা করুক না কেন, তাহার অব্যাহতি নাই, সে যেন কোন কারাগারে নিগড়-সংযত। সে কত চেষ্টা করিতেছে, কত উপায় উদ্‌ভাবন করিতেছে, কত প্রকারে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতেছে—কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইতেছে। কেন, মানব? তুমি-ই না বড় বুদ্ধিমান্? তুমি-ই

* পরিশিষ্ট সুদীর্ঘ হইয়া এই জন্য অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তি-সংখ্যায় প্রকাশ্য।—লেখক।

না বড় কলা-কৌশলসম্পন্ন ? তবে আর তোমার ভাবনা কিসের ? কিন্তু, হে মানব ! তুমি যেমন অন্যের মনঃকষ্ট উৎপাদন করিতে ভ্রূক্ষেপ কর না, তুমি যেমন তোমার অনুযায়িবর্গের প্রতি যথেচ্ছাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হও না, তুমি যেমন মনে করিতেছ যে—তোমার আজ্ঞাকারিগণের তোমার মত ভোগস্পৃহার অধিকার নাই, তুমি যেমন তাহাদিগকে টেণ্টেলাসের মত আশা প্রদান করিতেছ—আবার পরক্ষণেই নিরাশ করিতেছ, তুমি যেমন তাহাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ আদেশ করিতেছ, 'এহি, গচ্ছ, পতোত্তিষ্ঠ; বদ, মৌনং সমাচর।' তেমন তুমি নিজেও লাঞ্ছিত হইতেছ ! তুমি নিজেও বন্ধনদশাগ্রস্ত। দেখ, তুমি যে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া তোমার অনুচরদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দিতেছ, সেই বন্ধন অপেক্ষা তোমার নিজের গাত্রশৃঙ্খল কেমন দৃঢ়তর। তোমার অনুচরগণকে তুমি দু' একদিন মাত্র নিয়ন্ত্রিত রাখিতে পারিবে। কিন্তু, দেখ, তোমার গাত্রশৃঙ্খল দু' এক দিনের নহে, দু' এক বৎসরের নহে, দু' এক যুগের নহে, দু' এক জন্মেরও নহে। উহা অনাদিকাল হইতে গ্রথিত হইয়া আসিতেছে—উহা তোমার জন্ম জন্মান্তরের বাসনা-কাঠিন্য আত্মসাৎ করিয়া কেমন দৃঢ় হইয়াছে ! মানব, তুমি জ্ঞানী, তুমি বিংশশতাব্দীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী। তুমি বিজ্ঞান বলে, "যোগ-বলের" কার্য্য করিতে সমর্থ;—তুমি বিজ্ঞান বলে, সময়ে সময়ে মৃতদেহ পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ ! ঋষিগণ তোমাকে একবাক্যে শতমুখে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু, এক্ষণেও তোমার অনেক অভাব লক্ষিত হইতেছে। বুদ্ধির ব্যবসায় করিতে করিতে, হৃদয়ের কথা তুমি একেবারে বিস্মৃত হইতেছ। তুমি তোমার মুখাপেক্ষী সমস্ত পরিবারের আশা সংহার করিয়া, স্বার্থে পরিনিষ্ঠিত করিয়াছ—সকলের সুখসংভার সংকলন করিয়া, আত্মাতে সমর্পণ করিয়াছ—সকলের বিভাজ্য সুখসম্পদ্ একাকী ভোগ করিতেছ ! তুমি নিজেকে বড়ই ভালবাস ! কিন্তু, একবার ভাবিয়া দেখ, তথাপি তুমি সুখী কি না ? দেখিবে, তুমি আপাততঃ শত সুখে সুখী হইয়াও তোমার হৃদয়ের অন্তস্তলে তীব্র বৃশ্চিকদংশনযন্ত্রণা অনুভব করিতেছ। তোমার অসংখ্য সম্ভোগসামগ্রী-সত্ত্বেও সেই কষ্ট দূর হইতেছেনা;—তোমার কি যেন অভাব থাকিয়াই যাইতেছে !

তুমি ধনের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর কি ? মনে রেখো, 'ধনজন কভু নাহি থাকে চিরদিন।' মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন—'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ'। বিশেষতঃ ধনজন দ্বারা লোক সুখী হইতে পারেনা, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন কি, যে দেহ তোমার আজন্মসঙ্গী, তদুপরিও তোমার কর্তৃত্ব নাই। সুন্দর হইতে তোমার মনে বড়ই সাধ, কিন্তু হইতে পার কি ? সে ত দূরের কথা,—তুমি সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে থাকিতে পার কি ? দেখ, তোমার স্বাস্থ্য ক্ষণভঙ্গুর। শারীরিক স্বাস্থ্য ভোগ করিলেও, জরাযন্ত্রণা কখনই পরিহার করিতে পারিবে না। তোমার নিজের শরীর—যাহাকে

তুমি সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় বলিয়া মনে কর,—তাহার উপরেও তোমার হাত নাই। সুতরাংই বলিয়াছিলাম—তুমি পরাধীন, শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আর, ভাবিয়া দেখ, কত জন্ম-জন্মান্তরেও তোমাকে এরূপ নিয়ন্ত্রিত থাকিতে হইবে!

জগতে প্রত্যেক মনুষ্যই স্বার্থপর, সমস্ত লোকই কেবল নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত। যে ব্যক্তি যাহাই করুক্, সকলই আমাদের স্ব-সুখের নিমিত্ত। প্রাতঃ স্বার্থ কি? কালাবধি রাত্রিশেষ পর্যন্ত আমরা স্বসুখেই নিরত। তুমি বলিবে, "অনেক কার্য্য আমরা পর-হিতের জন্য করিয়া থাকি"। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমুলক। তুমি দরিদ্রে দয়া কর—তাহাও তোমার নিজের সুখের নিমিত্ত। অন্যের দুঃখ দেখিয়া তোমারও দুঃখ হয়। তোমার সেই দুঃখ নিবারণের জন্যই দয়া কর,—তথাপি তুমি স্বার্থপর। দান না করিলে তোমার মনে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট দুর করিবার জন্যই তুমি দান করিয়া থাক।

যখন ভিক্ষুকের শত ক্রন্দন শুনিতেও তোমার অনুকম্পা ও কষ্ট না হয়, তখন তুমি সেই ভিক্ষুকের প্রতি কৃপাকটাক্ষ-পাত কর কি? অন্যের যে কষ্ট তোমাকে স্পর্শ করে, কেবল সেই কষ্টই তুমি দূর করিতে উৎসুক,—নতুবা জগতের অশেষ স্থানে অশেষ লোকে দারুণ কষ্ট পাইতেছে, কই, তৎপ্রতি ত তুমি একবারও দৃক্‌পাত কর না। এইরূপে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তুমি স্বার্থ অন্বেষণ করিতেছ, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও এরূপই করিবে;—স্বার্থলিপ্সা ক্ষান্ত হইবে না! ইহার কারণ কি? বিবেচনা কর, দেখিবে যে, এই সব স্বার্থ তোমার স্বার্থই নহে। ইহারা অদৃষ্টাধীন। লোক ইহজীবনে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ। তাহার সুখ দুঃখও পূর্ব্বকর্ম্মানুসারী। সুতরাং কর্ম্মপাশ ছেদন করাই মানবের স্বার্থ। সেই পাশে জড়িত বলিয়াই মানবের এত কষ্ট। নতুবা মানুষ সচ্চিদানন্দ,—বিশ্বময়, চিন্ময় ও আনন্দময়। কর্ম্মপাশ-চ্ছেদন দ্বারাই লোক সেই স্বভাবে উপনীত হয়। কিন্তু বাহ্য সুখ অনু-সন্ধানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। ইহাতে আমাদের দুঃখ একবারে দূর হইবে না। বিজ্ঞানসম্মত বাহ্য ঔষধ বাহ্য রোগের উপশম করিতে পারে। কিন্তু, যে দুঃখ আমাদের মজ্জাগত, সেই দুঃখ ধ্বংস করিতে হইলে, আত্মতত্ত্বদর্শন-সাহায্যের প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যা দ্বারা কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই এই ক্ষেত্রে উপাদেয় হইবে। যেহেতু, বর্ত্তমান সময়ে পদার্থবিদ্যা চর্চ্চারই অত্যন্ত প্রাবল্য। তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে আমরা মহর্ষি-গৌতম প্রবর্ত্তিত ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বকই তত্ত্বজ্ঞান বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

গৌতম বলিয়াছেন, 'দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ অপবর্গঃ' অর্থাৎ 'দুঃখ' 'জন্ম' 'প্রবৃত্তি' 'দোষ' ও 'মিথ্যাজ্ঞান' এই পঞ্চকের পর-পর পদার্থের অভাবে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পদার্থেরও অভাব হয়, এবং সর্ব্বশেষে দুঃখাভাবই অপবর্গ বা মোক্ষ। কিরূপে মোক্ষ হয়।

লক্ষিত হইবে যে, উক্ত পঞ্চকের মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানই পরম্পরা সম্বন্ধে দুঃখের আকর, কিন্তু জন্মই দুঃখের অব্যবহিত কারণ। রক্তমাংসাদিদ্বারা দুঃখের বাসোপযোগী এক একটি শরীর-মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহাকেই 'জন্ম' বলে। ঐরূপ শরীর ভিন্ন আমাদের দুঃখ অবস্থিতি করিতে পারে না। 'শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া' কখনই হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের দুঃখের অব্যবহিত কারণই ঐরূপ জন্ম-পরিগ্রহ,—এবং জন্ম-পরিহার ব্যতিরেকে দুঃখ সমূলে বিনষ্ট করা যায় না। দুঃখের কারণ জন্ম যতকাল থাকিবে, ততকাল সেই দেহে দুঃখও উৎপন্ন হইতে থাকিবে। সুতরাং জন্মের কারণ (প্রবৃত্তি সম্ভূত) ধর্ম্মাধর্ম্মকেও নির্ম্মূল করা আবশ্যক,—যেন উক্ত প্রবৃত্তি বা চেষ্টাসম্ভূত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সাংসারিক সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার জন্য, আমাদিগকে পুনরায় জন্ম-পরিগ্রহ করিতে না হয়। সেই চেষ্টার মূল আবার রাগদ্বেষ। কারণ, যে যে বিষয়ে আমাদের অনুরাগ আছে, সেই সেই বিষয়েই আমরা প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, এবং যে যে বিষয়ে আমাদের বিদ্বেষ আছে, সেই সেই বিষয়ে আমরা বিদ্বেষানুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকি। সুতরাং রাগদ্বেষই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অনর্থের মূল, রাগদ্বেষেরই অন্যতম নাম 'দোষ'। উহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলে, আমাদের কোনও কার্য্যেই প্রবৃত্তি হইবেনা, ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হইবেনা, জন্ম হইবেনা, এবং দুঃখও হইবেনা। কিন্তু, কোনও বস্তুতে আমাদের অনুরাগ বা বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ কি? কারণ মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলেই তদনন্তর পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সমস্ত অনর্থের নিবারণ হইবে,—এবং আমাদের অপবর্গ বা মোক্ষ হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান।

আমরা অনেক সময়ে 'তত্ত্বজ্ঞান' 'তত্ত্বজ্ঞান' কথাটী শুনিয়া থাকি। দেখা যাউক 'তত্ত্বজ্ঞান' শব্দের অর্থ কি? 'তত্ত্ব' শব্দের অর্থ 'তাহার ভাব' 'তাহার স্বভাব'। 'তাহার ভাব' এ 'কাহার ভাব'? 'তত্ত্বজ্ঞান'ই বা 'কাহার ভাবের জ্ঞান'? এ কি বিশ্বস্থিত যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান? না, তাহা অসম্ভব। বিশ্বস্থিত সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান দূরে থাকুক, পৃথিবীর কয়টী পদার্থের জ্ঞান আমাদের আছে? কাহারও কাহারও বিশ্বাস এই যে, বাহ্য-পদার্থবিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, এবং বৈজ্ঞানিকেরাই তত্ত্বজ্ঞানী। কিন্তু, বিশ্বটী একটী আমলক নহে যে আমরা যদৃচ্ছাক্রমে উহা বিচালিত করিব। বাস্তবিক, সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অল্পমতি মানবের অসাধ্য বলিয়া, ন্যায়সূত্রকার গৌতম ঋষি 'তত্ত্ব' এই তদ্ধিতান্ত শব্দের প্রকৃতি বা 'তৎ'শব্দদ্বারা 'আত্মা' প্রভৃতি দ্বাদশটী পদার্থ লক্ষ্য করিয়াছেন,—উহারাই প্রমেয়, এবং উহাদের তত্ত্বজ্ঞানই নৈয়ায়িকের তত্ত্বজ্ঞান। গৌতম বলিয়াছেন,—'আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ--প্রেত্যভাব--ফল--দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্'। ১। ৯।

মিথ্যাজ্ঞান।

আমরা সংসারী। উক্ত দ্বাদশটী পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের নানা-প্রকার মিথ্যাজ্ঞান আছে। আমরা মনে করি যে, আত্মা

সুখদুঃখাদি ভোগ করেন না। আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সমষ্টিই আত্মা। যে বহিরিন্দ্রিয়-চরিতার্থতা আমাদের বাস্তবিক দুঃখের, তাহাকেই আমরা সুখ মনে করিয়া থাকি। আমরা অনিত্য দেহকে নিত্য জ্ঞান করি। এরূপ, অপরিত্রাণকে পরিত্রাণ, ভয়কে অভয়, নিন্দাকে প্রশংসা, এবং পরিহার্য্যকে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আমরা "কর্ম্মফল" নামে কোনও পদার্থ আছে বলিয়া মনে করি না। আর মনে করি যে, এই সংসার আমাদের রাগদ্বেষ-জনিত নহে। প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্ম বিষয়েও মনে করিয়া থাকি যে, জীবই বল, আর জন্তুই বল, সত্বই বল আর আত্মাই বল, মরিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে পারে, এমন কোন পদার্থ নাই। সাধারণতঃ আমরা মনে করিয়া থাকি যে, আমাদের জন্মমৃত্যুর কোনও আধ্যাত্মিক কারণ নাই। আমাদের মৃত্যু হয় বটে, কিন্তু মৃত্যুর পরে নানা যোনিতে আমাদের জন্ম হইতে পারে, নাও পারে, এমতাবস্থায় পুনর্জ্জন্ম স্বীকার্য্য নয়। আমাদের মৃত্যুর পরে কোথায় বা থাকিবে শরীর, আর কোথায় বা থাকিবে কর্ম্মফল! তখন দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার অবিচ্ছিন্ন-ধারারও উচ্ছেদ হইবে! পুনর্জ্জন্মে পুনরায় তাহাদের দেহসন্নিবেশ! তাহা কখনই হইতে পারে না,—সুতরাং জীবের পুনর্জ্জন্ম নাই। আবার, অপবর্গ, কি ভয়ানক! আমাদের সকল কার্য্যের শেষ হইবে! আমরা সুখসম্পদ্ সকল ভোগ্যে বঞ্চিত হইব। ধর্ম্মও থাকিবে না, পুণ্যও থাকিবে না। পৃথিবীর কত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সম্ভোগ আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। এমতাবস্থায়, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই অচৈতন্য মোক্ষে কোনও বুদ্ধিমানের রুচি হইবে কি?

এইরূপ জ্ঞানের নামই মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান বশতঃই আমাদের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ জন্মে। এরূপ চিত্তবিকার বশতঃই লোক শারীরিক (চৌর্য্য, প্রাণি-হিংসা প্রভৃতি), মানসিক (পরদ্রোহ, পরদ্রব্য-লিপ্সা, নাস্তিক্যবুদ্ধি প্রভৃতি) এবং বাচনিক (মিথ্যা ও কর্কশ বাক্য প্রভৃতি) নানাপ্রকার পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান।

তত্ত্বজ্ঞান অন্যরূপ। তত্ত্বজ্ঞানে সুখ-দুঃখাদি আত্মার বলিয়াই প্রতীত হয়, এবং শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিকে অনাত্মা বলিয়া উপলব্ধি হয়। দুঃখ অনিত্য, অপরিত্রাণ ভয়ঙ্কর, জুগুপ্সকবস্তু হেয়, ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান জন্মে। তখন মনে হয়,—কর্ম্মও আছে, কর্ম্মফলও আছে; সংসার রাগদ্বেষজনিত; জীব বা আত্মা নামে কোনও একটী পদার্থ আছে, যাহা আমাদের দেহনাশেও থাকিবে; আমাদের জন্মমৃত্যুর কারণ আছে, কিছুই অকারণ নহে; আমাদের সংসার অনাদি বটে, কিন্তু অপবর্গ হইলে সংসারের অবসান হইবে; আত্মারই প্রবৃত্তি, এবং তজ্জন্যই পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। আত্মাই ভোক্তা, সুতরাং মৃত্যুদ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনা-ধারার

উচ্ছেদ হয় বটে; কিন্তু, পুনর্জন্মে আত্মার সহিত উক্ত ধারার পুনরায় সন্ধি হয়, আত্মা দেহাদি সমভিব্যাহারে পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হয়। সুখ দুঃখাদির সমস্ত বিষয় হইতে আত্মার বিচ্ছেদকে অপবর্গ বলে। তথাপি অপবর্গ সুখময় শান্তিময়। অপবর্গ হইলে, সংসারিক অশেষ পাপ ও অশেষ ক্লেশ বিলুপ্ত হয়। এইরূপ দুঃখের লেশমাত্রশূন্য অপবর্গে বুদ্ধিমদ্ ব্যক্তির স্বতঃ-ই রুচি জন্মে। সংসার দুঃখময়, বিষময়। মধুলিপ্ত বিষের ন্যায় সংসারে দুঃখানুসক্ত সুখও বর্জ্জনীয়। সংসার শব্দের অর্থ কেবল ইহজন্ম নহে, উত্তরোত্তর জন্ম। দেহাদিতে জীবের আত্মবোধের নাম মিথ্যাজ্ঞান, তজ্জন্যই তাহার দেহাদির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাসনা, তজ্জন্যই তাহার সৎ ও অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, তজ্জন্যই তাহার পুনর্জন্ম, এবং তজ্জন্যই তাহার দুঃখ। এই পাঁচটী ধর্ম্মের অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবৃত্তির নাম সংসার। সুতরাং কেবল এ জন্মই সংসার নহে, ইহা স্মরণ করিয়া আমাদের শরীরদ্বারা—দান আর্ত্তত্রাণাদি, বাক্যদ্বারা সত্য, হিতপ্রিয় বেদপাঠাদি, এবং মনোদ্বারা দয়া অস্পৃহা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি অনুশীলন করা উচিত; উহারাই আমাদের ধর্ম্ম।

আমরা মনে করিয়া থাকি যে, পুনর্জন্ম আমাদের বড়ই সাধের বস্তু। তাই কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে, আমরা প্রায়ই পরজন্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি। এ জীবনে আশীর্বাদ্যের যে

দুঃখ। সুখ দুষ্প্রাপ্য, আশীর্ব্বাদ্য সেই সুখ পরলোকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, আমরা এরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি। কিন্তু কি ধনী, কি মানী—জন্ম সকলের পক্ষে দুঃখদায়ক। সকল জীবেরই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কারণ, প্রতিকূল বেদনীয়কেই দুঃখ বলে;—যে কোন প্রকারের বাধা পীড়া বা তাপকেই গৌতম ঋষি দুঃখ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

দুঃখের অভাবকেই মুক্তি বলে। কিন্তু উহা দ্বিবিধ। জীবন্মুক্তি ও

মুক্তি। নির্ব্বাণমুক্তি। দেহত্যাগে

পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় হওয়ার নাম নির্ব্বাণমুক্তি। পরন্তু, তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তরই জীবন্মুক্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, নিরন্তর অনুশীলনে তাঁহার মিথ্যাজ্ঞান অপহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু, যে যে কর্ম্মফল ভোগের জন্য তাঁহাকে বর্ত্তমান জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে, সেই সেই কর্ম্মফল তাঁহাকে ভোগ করিতেই হইবে; তদনন্তর তাঁহার নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হইবে। সময়ে সময়ে জ্ঞানীদেরও রাগদ্বেষ দৃষ্ট হয় বটে—কিন্তু, তাহা উৎকট নহে। বিশেষতঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মও সর্ব্বত্র রাগদ্বেষমূলক নহে। অনিচ্ছা বশতঃ গঙ্গাস্নানেও পাপক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং, কেহ কেহ উপর্যুক্ত 'দোষ' শব্দে রাগদ্বেষ গ্রহণ না করিয়া, মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা গ্রহণ করা সঙ্গত বোধ করেন। তাঁহাদের মতে, মিথ্যাজ্ঞানের নাশে বা তত্ত্বজ্ঞান-জনিত উৎকৃষ্ট বাসনার উৎপত্তিতেই সেই মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনার নাশ হয়।

তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় ও বিষয়বিভাগ।

পূর্ব্বে আত্মা, শরীর প্রভৃতি যে দ্বাদশ প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় উক্ত হইয়াছে,—উহাদের তত্ত্বজ্ঞানই ন্যায়দর্শনের মতে তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং ব্যাকরণে যেমন, গুণ, বৃদ্ধি, নদী, ঘি প্রভৃতির পারিভাষিক অর্থ আছে, ন্যায়দর্শনেও "তত্ত্ব" শব্দের পারিভাষিক অর্থে উক্ত দ্বাদশটী পদার্থের তত্ত্বই বুঝিতে হইবে। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই মেয় বা জ্ঞানের বিষয় বটে, কিন্তু, উহারা সকলেই প্রকৃষ্ট মেয় নহে। যে যে পদার্থ আমাদের মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় হইয়া আমাদের সংসারের কারণ হয়, অথচ তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হইয়া মোক্ষের কারণ হয়, কেবল তাহারাই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিষয়, প্রকৃষ্ট মেয় বা প্রমেয়। উক্ত দ্বাদশটী পদার্থের মধ্যে ছয়টী কারণতত্ত্ব ও ছয়টী কার্য্যতত্ত্ব। কারণ তত্ত্ব যথা,—আত্মতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, (রূপরসাদি) অর্থতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব। কার্য্যতত্ত্ব ষট্‌ক এই—প্রবৃত্তিতত্ত্ব, দোষতত্ত্ব, (পুনর্জন্ম বা) প্রেত্যভাবতত্ত্ব, (সুখ বা) ফলতত্ত্ব, দুঃখতত্ত্ব ও (মোক্ষ বা) অপবর্গতত্ত্ব। উক্ত দ্বাদশটীর মধ্যে 'আত্মা'ই প্রধান বলিয়া, আমরা সর্ব্বাগ্রে আত্মার বিষয়ে আলোচনা করিব।

"আত্মজন্যা ভবেদ্ ইচ্ছা, ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা, তজ্জন্যৈব ক্রিয়া ভবেৎ॥"

আত্মা।

আত্মা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ, সকলেরই মানসপ্রত্যক্ষ। আমরা, সকলেই বলিয়া থাকি—আমি সুখী, আমি দুঃখী; আমার বাড়ী, আমার ঘর; আমার জন, আমার ধন। আমি দেখি, আমি শুনি। চুক্র আমের প্রতি আমার বড়ই বিদ্বেষ, কিন্তু তদ্দর্শনে আমার রসনায় লালা স্রাব হয় ইত্যাদি। এ সমুদয় 'আমি' ও 'আমার' শব্দের লক্ষ্যই আত্মা। আত্মার ইতরব্যবচ্ছেদক (distinguishing characteristic) ধর্ম্ম ছয়টী ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান। পূর্ব্বে যে বস্তু দর্শনে আমি সুখী হইয়াছি, এক্ষণে সেই বস্তু পুনর্দর্শনে যদ্ধেতু তাহা গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা হয়, তাহাই আত্মা। আমার শত্রুকে দেখিলে, যদ্ধেতু তাহার প্রতি আমার বিদ্বেষ ভাবের উদয় হয়, তাহাই আত্মা। সুখের সামগ্রী দেখিলে, যাহার প্রভাবে আমি তাহা পাইতে যত্ন বা চেষ্টা করি, তাহাই আত্মা। যাহার প্রভাবে, আমি বিদ্বেষের বস্তু পরিহার করিতে চেষ্টা করি, তাহাই আত্মা। যাহার প্রভাবে সুখকর কার্য্যে আমার সুখ, এবং দুঃখকর কার্য্যে আমার দুঃখ হয়, তাহাই আত্মা। কোনও বস্তু দেখিলে, যাহার প্রভাবে আমি পূর্ব্বে 'এটা কি?' এইরূপ পরামর্শ করিয়া, পশ্চাৎ উহা যথার্থ বুঝিতে পারি, তাহাই আমার আত্মা। যাহার প্রভাবে, আমি একাকী হইয়াও, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই আমার আত্মা। আমার অনেকার্থদর্শী এক আত্মা আছে বলিয়াই, একই আমার, বুভুৎসা, বিমর্শ ও জ্ঞান এই ভাবত্রয়ের আবেশ হইয়া থাকে। যাহারা অনেকার্থদর্শী স্থায়ী এক আত্মা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে একই

বিষয় একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হওয়া উচিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয়না। আমার দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞান বা স্মৃতি, মৎকর্তৃক স্বয়ংদৃষ্ট পদার্থেরই সম্ভবে। কোনও পদার্থ দেখিবে যজ্ঞদত্ত, আর তাহা স্মরণ করিবে দেবদত্ত, ইহা কখনই হইতে পারেনা। সুতরাং "উপপন্নম্ অন্যোব আত্মেতি"।

কিন্তু, ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত আত্মা স্বীকার না করিলে চলে না কি? আত্মার উপর্যাক্ত লক্ষণ গুলি ইন্দ্রিয়েরই হইতে পারে না কি? লোকেও ত বলে "চক্ষু দ্বারা দেখে, মনোদ্বারা জানে ও বুদ্ধিদ্বার বিচার করে, এবং দেহ দ্বারা সুখদুঃখ ভোগ করে।" কর্ত্তা ও করণ এক হইতে পারে না কি? আপনারাও ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, বরং জ্ঞানের করণ্ বলিয়া মানেন, তথাপি মানেন ত? উহারাই চৈতন্য-বিশিষ্ট-আত্মা, এরূপ বলি না কেন? অনর্থক অধিক ধর্ম্মী আত্মা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? আপনারা ত 'আত্মা' শব্দের অর্থ বুঝিয়া থাকেন। আমরা বরং 'আত্মা' শব্দে ইন্দ্রিয়ই বুঝিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? ইন্দ্রিয় ভৌতিক হইলে, সাঙ্কর্য্য (cross-division) হইত,—আমরা ত ইন্দ্রিয়কে ভৌতিক (*) বলিয়া স্বীকার করি না।

ইন্দ্রিয়ই আত্মা। পূর্ব্বপক্ষ।

তাহা হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও আত্মা এক পদার্থ নহে। একই কাষ্ঠখণ্ড—যাহা আমি পূর্ব্বে চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে আমি ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ করিলাম এবং যাহা আমি পূর্ব্বে ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে আমি চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিতেছি। এই দুইটী প্রত্যয় (assimilation) কেবল এক বিষয়ক নহে—কেবল একই কাষ্ঠখণ্ড বিষয়ক নহে,—উহারা এককর্ত্তৃকও বটে,—উহাদের গ্রহণকর্ত্তাও এক মাত্র আমি। যে আমি স্পর্শ করিয়াছিলাম, সেই আমিই দর্শন করিতেছি। চাক্ষুষ জ্ঞান ও যাহার হইল, স্পার্শন জ্ঞানও তাহারই হইল। সেই ধর্ম্মী এই উভয় ইন্দ্রিয় হইতেই পৃথক্। সেই ধর্ম্মী ইন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত, এবং ঐ দুইটী ইন্দ্রিয় জ্ঞানের নিমিত্ত হইলেও, উহাদের গ্রহীতা এক মাত্র আত্মা।

উত্তর।

যদি আপত্তি হয় যে, ঐ দুইটী জ্ঞান ঐ দুইটী ইন্দ্রিয়ের সংঘাত কর্ত্তৃক হইয়াছে—যেমন একজন অন্ধ ও তৎস্কন্ধারূঢ় একজন পঙ্গু, ক্রমে চলন ও দর্শন ক্রিয়া দ্বারা উভয়ে একই গমন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহাও অযৌক্তিক—অন্ধও পঙ্গু উভয়েই সচেতন, একের কার্য্য অন্যে বুঝিতে পারে। কিন্তু এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে না। চক্ষু কখনই মিষ্টান্নের রস আস্বাদন করিতে পারে না। সেই সৌভাগ্য রসনারই।

(*) নৈয়ায়িক মতে ইন্দ্রিয়ত্ব জাতি হইতে পারে না, হইলে সাংকর্য্য দোষ হয়। যেমন পৃথিবীশূন্য শ্রোত্রে ইন্দ্রিয়ত্ব আছে; ইন্দ্রিয়ত্বশূন্য ঘটে পৃথিবীত্ব আছে; আবার পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ত্ব ও পৃথিবীত্ব উভয়ই আছে।

এইরূপ, কোনও ইন্দ্রিয়ই নিজ গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় (object of perception) গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানগ্রহণ ব্যাপারে, অচেতন কোনও ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত যে কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহাও অসম্ভব। আর আত্মা ইন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত না হইলে, মনুষ্য উন্মত্তই হইত না। উন্মত্তের ইন্দ্রিয়গ্রাম সতেজঃ থাকিলেও, তন্নিমিত্ত তাহার জ্ঞান হয় না। যদি কেহ বলেন যে, (চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি) ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য (রূপ শব্দ প্রভৃতি) বিষয় একবারে ব্যবস্থিত (fixed) আছে,—চক্ষুর্ভিন্ন দর্শন হয় না, কর্ণ ভিন্ন শ্রবণ হয় না, নাসিকা ভিন্ন গন্ধ আঘ্রাণ হয় না, সুতরাং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই চৈতন্যবিশিষ্ট, এবং চক্ষুঃই দর্শন করে, কর্ণই শ্রবণ করে। তদুত্তরে আমরা ইহাই বলিব যে, চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণ, জিহ্বার আস্বাদন, ত্বকের স্পর্শ এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় (province) ব্যবস্থিত আছে বলিয়াই, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানের তুলনাকারী ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত এক আত্মা অবশ্য স্বীকার্য্য। আর, যদি স্বীকার করা হয় যে, ইন্দ্রিয় একটী মাত্র এবং তাহার গ্রাহ্য বিষয়ও ব্যবস্থিত নহে, তবে আমরা বলিব যে, ঐ ইন্দ্রিয়ই আমাদের চেতন আত্মা। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় বহুপ্রকার, তাহাদের বিষয়ও নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু আত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগ্রাহী। বিশেষতঃ, বিপণিতে মোদকের রূপ দর্শনেই দর্শক আস্বাদিতপূর্ব্ব মোদকের রস ও গন্ধ অনুমান করিয়া থাকেন। এইরূপ এক এক ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর এক এক গুণ গ্রহণ করিয়া, যে এক কর্ত্তা বস্তুর সমস্তবিষয়ক গুণ গ্রহণ করেন, তিনিই আত্মা। আমরা কর্ণ দ্বারা শব্দ শুনিতে পাই বটে, কিন্তু কর্ণ কখনই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। কর্ণদ্বারা ক্রমে ক্রমে শ্রুত শব্দগুলি হইতে, যাহার প্রভাবে আমরা বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের ভাব বুঝিতে পারি, তিনিই আমাদের আত্মা।

মনঃই আত্মা। পূর্ব্বপক্ষ।

এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং কোনও ইন্দ্রিয়ই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা হইতে পারে না বটে, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়েই মনের অবারিত গতি। সকল ইন্দ্রিয়েই ইহার প্রসর আছে। ইহা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে বিদ্যমান হইয়াই, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান জন্মায়। মনোভিন্ন কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারাই বিষয় গ্রহণ সিদ্ধ হয় না, এবং যে যে হেতুদ্বারা পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় হইতে আত্মার পৃথক্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সেই হেতু যখন মনেও তুল্য ভাবে প্রযোজ্য, তখন মনঃ হইতে পৃথক্ একটী আত্মা স্বীকার না করিয়া, মনকেই আত্মা বলা যাইতে পারে। মনের অতিরিক্ত পৃথক্ একধর্ম্মী আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন কি?

উত্তরপক্ষ।

আমরা বলি, প্রয়োজন আছে। মনঃ আছে বলিয়াই, আমাদের বহু ইন্দ্রিয়দ্বার সর্ব্বদা উদ্ঘাটিত থাকা সত্ত্বেও, এককালে বহু ইন্দ্রিয়-বিষয়ক জ্ঞান উৎ-

পর হয় না। ঘৃতভৃষ্ট স্তনিত সুদীর্ঘ একখানি পিষ্টক ভক্ষণের সময়ে আমাদের চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই বর্ত্তমান থাকে, ইন্দ্রিয় সকলও সুপ্রসন্ন (open) থাকে। কিন্তু, একটু বিবেচনা করিলে, দেখা যাইবে যে, এক মুহূর্ত্তে দুই বা ততোঽধিক ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা যায় না। তাহার কারণ এই যে, মনঃ যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত থাকে, তখন ইন্দ্রিয়ান্তর হইতে বিযুক্ত থাকে ; এবং তখন মনোবিযুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান না হইয়া, মনঃসংযুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারাই জ্ঞান জন্মে। কোনও বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতে হইলে, তদুচিত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। কর্ণের সহিত মনঃসংযোগ থাকে না বলিয়াই, সম্মুখে উপবিষ্ট শিষ্ট ছাত্রও সময়ে সময়ে অধ্যাপকের কথা শুনিতে পায় না। এইরূপ, পাঠ অভ্যাস করিবার সময়ে মনোযোগ না হইলে, পাঠ আয়ত্ত হইতে পারে না। মনঃ বড়ই দ্রুতগামী। উহা ক্ষণে ক্ষণে এক ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে যাইতে পারে। বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত মনঃ কিরূপ দ্রুতবেগে চলিতে পারে, তাহা অকস্মাৎ বজ্রধ্বনিশ্রবণানন্তরবর্ত্তি চমৎকারের বিষয় চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হয়। আকস্মিক শব্দ শ্রবণ করিবার জন্য, কর্ণে মনোযোগ থাকেনা বলিয়াই, এ চমৎকার। তথাপি, ঐ উৎকট ধ্বনিতে মনঃ তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়। এ বিষয় মনের লক্ষণ নিরূপণ প্রস্তাবে বিবৃত হইবে। যাহা হউক, মনের জ্ঞা স্বীকার করিলেও জ্ঞানের অযৌগপদ্য-সাধনের নিমিত্ত কোনও করণান্তর স্বীকারের প্রয়োজন হইবে। জ্ঞানের কর্ত্তা একটী পদার্থ, এবং ইন্দ্রিয়রূপ করণ ভিন্ন পদার্থ। এই দু'টী পদার্থই স্বীকার্য্য। মনের নাম আত্মা হউক্, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু জ্ঞাতৃরূপ আর একটী পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ, দুই জ্ঞান এক সময়ে হইতে পারে না বলিয়া, মনকে অণু বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অপিচ, আমরা মহৎ বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারি বলিয়া, আত্মাকেও মহৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সমষ্টিই আত্মা নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনার সমষ্টিকেই প্রাণী বা আত্মা বলে। তুমি গৌরবর্ণ, আমি বলিষ্ঠ, অমুক হৃষ্ট পুষ্ট, এইরূপ সকলেরই জ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং আমাদের শরীরই আত্মা; তদ্ব্যতীত আত্মা নাই। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। আমার শরীরকে আমার আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে, আমার দেহত্যাগেই আমার সমস্ত পাপ বিদূরিত হইবে। আমি প্রাণিহিংসা করিলেও, তজ্জনিত পাপ আমার দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইবে, শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক— আমি যতপ্রকারের যতদূর বিগর্হিত কার্য্য করিনা কেন, মৃত্যুই আমার সকল পাপের প্রক্ষালন করিবে। আমি যদি কৃতঘ্ন হইয়া থাকি, আমি যদি প্রতারণাপূর্ব্বক পরস্ব

আত্মসাৎ করিয়া থাকি—মৃত্যুই আমাকে সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিবে, মৃত্যুই সমস্ত কলুষের অবসান করিবে। মৃত্যুর পরে, আমার শরীরও থাকিবে না, পাপও থাকিবে না; এইরূপ অদূরব্যাপক নিয়ম কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। দুষ্টের শাস্তি ও শিষ্টের প্রশস্তির নিমিত্ত পরলোক অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য, নতুবা ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতার রাজ্য প্রবর্ত্তিত হইবে। তাহা হইলে, রাজকীয় ও সামাজিক শাস্ত্র-জাল হইতে, কূট তর্কদ্বারা যাহারা ইহলোকে রাজদণ্ড ও সমাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেছে,—তাহারাই পরম সাধু বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু, পরমেশ্বরের শাসন নিশ্চিতই বড় কঠোর। মনুষ্যসমাজ পাপিগণকে ক্ষমা করিলেও, কর্ম্মফলাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। ইহজীবনে সঞ্চিত পাপ-পুণ্যের ফল পর-জীবনে তাহাদিকে ভোগ করিতেই হইবে। সুতরাং পরকাল অবশ্য স্বীকার্য্য। পরকাল স্বীকার করিলে, ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালব্যাপী আত্মা ও স্বীকার্য্য। এই আত্মাই আমাদের ভৌতিক দেহ ক্ষয়ে নিত্য থাকিবে।

যদি আপত্তি হয় যে, আত্মা নিত্য সুতরাং উহা নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত, উহা জীবকৃত পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে পারে না। দেহাত্মবাদ স্বীকার করিলে, দেহদাহে যেমন আমাদের পাতক আশ্রয়াভাবেই বিনষ্ট হয়, আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিলেও, সেইরূপ দেহদাহে নিরাশ্রয় পাতক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায়, একটী স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার না করিয়া, দেহকে আত্মা বলিলেই চলিতে পারে।

তদুত্তরে বলিব যে, আত্মা নিত্য হইলেও, প্রসঙ্গ ইহার একটী লক্ষণ (বা ইতর-ব্যব-চ্ছেদক ধর্ম্ম)। ইহা আত্মার লক্ষণ প্রস্তাবেই উক্ত হইয়াছে। আমাদের চেষ্টার আশ্রয় আত্মাই সকল কার্য্যের কর্ত্তা, শরীর কেবল তাহারই কৃতির আশ্রয়। সুতরাং, কৃতির আশ্রয়ীভূত শরীরের বিনাশেও, আত্মা কর্ম্মফলের সহিত বিদ্যমান থাকে। [আমাদের কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা (desire) ও ইচ্ছা-পূরণানুকূল চেষ্টা (movement) এই দু'এর মধ্যবর্ত্তী চেষ্টা-নুকূল শারীরিক ব্যাপার (will volition, muscular excitement)-কে কৃতি বলে।] সুতরাং 'দেহেন্দ্রিয়মনোবাত্তিরিক্তোহন্যোর আত্মা' ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।
রাজসাহী কলেজ।

ভারত-নীতি।

উপক্রমণিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহাভারতের কালনির্ণয়।

মহাভারত আমাদের কি অমূল্য ধন, মহাভারত কি, কাহার রচিত ও ইহার অবয়বই বা কি, তাহা প্রকাশ করিবার

জন্য সাধ্যায়ত্ত চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐ চেষ্টা যে কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গই জানেন। এ হেন অমূল্য ধন কত জনের রচিত, তন্নির্ণয়জন্যও সাধ্যায়ত্ত চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী করি নাই, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম, বলিতে পারি না। মহাভারতীয় ঘটনা ও মহাভারতের রচনা ঠিক এক সময় না হইলেও, উভয়ই যে অতি সন্নিকটবর্ত্তী কালের, ইহা একরূপ সর্ব্বসম্মত। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, পরীক্ষিতের অভিষেকের অব্যবহিত" পরেই মূল মহাভারত (চতুর্বিংশতিসাহস্র) রচিত। যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব কাল নির্ণীত হইলেই মহাভারতের রচনা-কাল নির্ণীত হইবে। এই কাল নির্দ্ধারণ বড় জটিল সমস্যা। এইজন্য ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী সাধ্যানুসারে গবেষণা করিয়া, প্রত্যেকেই স্ব স্ব বুদ্ধ্যনুযায়ী এক একটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সমস্ত নির্দ্ধারিত কালের পরস্পর সামঞ্জস্য নাই।

কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতীয় সভ্যতা ও উন্নতির আদিমত্ব স্বীকার করিতেই বিশেষ কুণ্ঠিত। তাঁহারা ও তাঁহাদের অনুসরণকারী কতকগুলি দেশীয় শিক্ষিত-ব্যক্তি ও মহাভারতাদির আধুনিকত্ব-প্রতিপাদনেই বিশেষ ব্যগ্র। গ্রন্থকার পদ-সিদ্ধ কোন কোন বঙ্গীয় যুবক মহাভারতের কাল যীশুখৃষ্টের জন্মের পর দ্বিতীয় শতাব্দী নির্দ্ধারণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা মহাভারতের ঘটনা বিশ্বাস করেন না, এবং মহাভারতীয় রচনা কেবল কবিকল্পনা-প্রসূত বলিয়া বলেন। আর এক পক্ষ আছেন, যাঁহারা মহাভারতীয় মৌলিক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। আমরাও ঐ মতের পক্ষপাতী।

মহাভারতের কালনির্ণয় জন্য জ্যোতিষ ও পুরাণাদি প্রধান অবলম্বন। উহাতেও এত বৈষম্য দৃষ্ট হয় যে, এ পর্য্যন্ত কেহই "ইদমেবতত্ত্বং" নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই; পারিবারও সম্ভব নাই। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে আমরা এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই কেন? ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, বহুলোকে সাধ্যানুসারে গবেষণা করিতে করিতে হয়ত কালে এমন একটা সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে, যাহাকে সকলেই পুরাকাল-পরিমাপক "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" সময় বলিয়া স্বীকার করিবেন। ঐ কাল নির্ণীত হইলে, বহুল প্রাচীন ঘটনার ও ঐতিহাসিক তত্ত্বেরও সময় নির্ণীত হইতে পারে।

মহাভারতের কালনির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মার্শম্যান, কোলব্রুক, উইল্‌সন্‌, বুকানন্‌, ওয়েবার, লাসেন প্রভৃতিও বিভিন্নমত। এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা বলেন, মহাভারত খৃষ্টের জন্মের ২।১ শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত; কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমুলার, কোলব্রুক, উইলসন, বুকানন প্রভৃতি যাঁহারা ভারতীয় গৌরবের প্রাচীনত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তাঁহারা অনেকেই মহাভারতের কাল খৃষ্টজন্মের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ণয় করিয়াছেন। দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায়-মধ্যেও বিশেষ মতপার্থক্য। যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব কালনির্ণয় জন্য পণ্ডিত তারানাথ

তর্কবাচস্পতি ও শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত-বাগীশ, স্বর্গীয় ডাঃ রামদাস সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অসাধারণ মনীষাবান্ মহাত্মগণ প্রত্যেকেই বহুল গবেষণা সহকারে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এক একটি বিভিন্ন কাল নির্ণয় করিয়াছেন, ও তৎপোষকতায় প্রমাণাদি প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত মতের সমালোচনা বা উহাতে দোষার্পণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আমাদের অজ্ঞতা বশতই হউক, অথবা ভ্রমবশতই হউক, তাঁহাদের নির্ণীত কাল সম্বন্ধে মতপার্থক্য হেতু আমাদের মতানুযায়ী কাল ও তৎপোষক প্রমাণাদি সাধারণের সমালোচনজন্য প্রকটিত হইল। ভরসা করি, বিদ্বমণ্ডলী সকলের নির্দ্দেশিত কাল ও তৎপোষক প্রমাণাদি সমালোচনা করিয়া, যেটী যুক্তি ও প্রমাণসঙ্গত মনে করিবেন, তাহাই সাধারণের অবলম্বন হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যুধিষ্ঠিরাদির কাল-নির্ণয়জন্য জ্যোতিষ ও পুরাণাদিই আমাদের প্রধান অবলম্বন। পঞ্জিকাকারদিগের নির্ণীত কালাদির গ্রহণব্যতীত এখানে অন্য আশ্রয় নাই। তাঁহাদের মতে কলিযুগের ৫০০৬ বৎসর গত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব কোনও পুরাণে দ্বাপরের শেষে, কোন পুরাণে কলিসন্ধ্যায় বা কলির প্রারম্ভে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব দ্বাপর যুগের শেষভাগে ধরিলে, খৃষ্টের জন্মের ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে হয়। কলিসন্ধ্যায় ধরিলে, খৃষ্টের জন্মের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে হয়। এই মতসমূহের কোনটী অবলম্বনীয়, তাহাও পাঠকের বিবেচনাসাপেক্ষ।

জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব কাল নিরূপণ করিতে গেলেই বৃহৎসংহিতার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। বৃহৎসংহিতার সপ্তর্ষিচার (*) নির্ণয়াধ্যায়ে লিখিত আছে "যুধিষ্ঠির নৃপতির কালনির্ণয় করিতে হইলে, শকাব্দার সহিত ২৫২৬ যোগ করিতে হয়। ঐ সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে ছিলেন। উহাঁরা এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ চরণ করেন, ও উহাঁরা পূর্ব্বোত্তর দিক্ হইতেই সর্ব্বদা উদিত হয়েন (১)।" বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন "সপ্তর্ষিদিগের মধ্যে আকাশে যে দুইটী নক্ষত্র পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্য নক্ষত্র, যাহাকে রাত্রে সমদেশাবস্থিত দেখায়, তাহার সহিত সপ্তর্ষিমণ্ডল যুক্ত হইয়া, শত বর্ষ বাস করেন, এবং তাঁহারা পরীক্ষিতকালে মঘায় ছিলেন, এবং ঐ সময় দ্বাদশ-শতাব্দাত্মক কলিযুগের আরম্ভ হয়। (২) শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক ঐরূপ একটী শ্লোক

(*) বর্ত্তমান যুগে সকলেই সকল বিষয়ে হস্তার্পণ করেন। যুধিষ্ঠিরের অব্দ নিরূপণ করিতে গিয়া, কেহ 'সপ্তর্ষি-চার' শব্দস্থলে 'সপ্তর্ষিবার' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের কোন দোষ নাই, দোষ কালের।

(১) আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিক্ পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥
একৈকস্মিন্ ঋক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাং।
প্রাগুত্তরতশ্চৈতে সদোদয়ন্তে সসাধ্বীকাঃ॥
সপ্তর্ষিচার। বৃহৎসংহিতা।

(২) সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎসমং নিশি॥

আছে। (৩) বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী ঐ শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন— "আকাশে উত্তর দিকে সাতটী তারা আছে, তাহাদিগকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে। ঐ সপ্তর্ষি-মণ্ডলে লাঙ্গলাকারে অগ্রে, মধ্যে ও মূলে মরীচি, অরুন্ধতীসহ বশিষ্ঠ ও অঙ্গিরা নামক তারাত্রয়, ও তাহার পশ্চিমে খট্টাকারে ঈশান, অগ্নি, নৈঋৎ ও বায়ুকোণে অত্রি, পুলস্ত, পুলহ ও ক্রতু নামক তারা চতুষ্টয় আছে। তাহাদের মধ্যে পুলহ ও ক্রতু নামক যে দুইটী তারা পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তাহাদেরও পূর্ব্বের দুইটীর অর্থাৎ অত্রি ও পুলস্তের মধ্যে সমভাবে দক্ষিণোত্তর রেখায় সমদেশাবস্থিত অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের অন্যতম নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে ঐ ভাবে যুক্ত হইলে, তদবস্থায় শতবর্ষ অতিবাহন করে। ঐ সপ্তর্ষি-মণ্ডল পারীক্ষিত-কালে মঘায় সমদেশাবস্থিত ছিলেন। (৪)। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায়ও শ্রীধরস্বামী ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ঠিক ঐ মর্ম্মে টীকা করিয়া, বিশেষ বলিলেন যে—এতাবতা বলা যায়, সপ্তর্ষি-মণ্ডল যখন অশ্লেষায়—অর্থাৎ অশ্লেষার সম-দেশাবস্থিত ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহার অন্তর্ধান সময়ে ঐ সপ্তর্ষি মঘার সমদেশাবস্থিত ছিলেন এবং যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল পূর্ব্বাষাঢ়ার সমদেশাবস্থিত হই-বেন, তখনই কলির বৃদ্ধি হইবে। "ঈশগু যেমন ভারতবর্ষে থাকিতে পারে না, সেইরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে থাকিতে পারে না।" (*) সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রে থাকা বলিলে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের 'সশরীরে' নক্ষত্রে থাকা বুঝায় না। উহাতে বুঝিতে হইবে, যে, সপ্তর্ষি-মণ্ডল নক্ষত্রের বা নক্ষত্রপুঞ্জের সমদেশাবস্থিত আছে। ঐটী বিশদ ও বিস্তৃতরূপে বুঝিতে হইলে, কতকগুলি জ্যোতিষিক পরিভাষা জানা প্রয়োজন।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন,—পৃথিবীর উভয় মেরুর সমদূরবর্ত্তী স্থানে যে মণ্ডলাকার কল্পিত রেখা পূর্ব্বপশ্চিমে ভূগোলকের চতু-র্দ্দিক ব্যাপিয়া থাকিয়া, গোলকক্কে সমদ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, তাহাকে বিষুব রেখা

তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তা স্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাং।
তেতুপারীক্ষিতেকালেমঘাস্বাসন্‌দ্বিজোত্তম॥
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্দশাব্দশতাত্মকঃ।
২৪ অধ্যায়। ৪র্থ অংশ। বিষ্ণুপুরাণ।

(৩) সপ্তর্ষীণাঞ্চ পূর্ব্বৌ যৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্য নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাং।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাং॥
২ অ। ১২স্কন্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত।

(৪) "সপ্তর্ষীণামিতি=প্রাগগ্রশকটা-কারং তারা-সপ্তকং সপ্তর্ষিমণ্ডলং তত্র পূর্ব্বত ঈশাকারে অগ্রমধ্যমূলেষু মরীচিঃ সভার্য্য-বশিষ্ঠাঙ্গীরসৌ ততঃ পশ্চিমে খট্টাকারে তারা-চতুষ্কে ঈশানাগ্নেয়ৌ নৈঋতি বায়ব্যকোণে অত্রিপুলস্ত্যপুলহক্রতবো যথাক্রমং, তত্র যৌ পূর্ব্বৌ প্রাগুদিতৌ পুলহক্রতুসংজ্ঞৌ দৃশ্যেতে, তয়োস্তৎপূর্ব্বয়োশ্চ মধ্যে সমং দক্ষিণোত্তররে-খায়াং সমদেশাবস্থিতং যদশ্বিন্যাদিনক্ষত্রে-ষন্যতমং নক্ষত্রং দৃশ্যতে, তেন তথৈব যুক্তা নৃণামব্দশতং তিষ্ঠতি। তেচ, দ্বিজাঃ ত্বদীয়ে কালে অধুনা মঘাশ্রিতা বর্ত্তন্তে।"
শ্রীধরস্বামী। বিষ্ণুপুরাণ।

(*) ৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহো-দয়ের রচিত 'কৃষ্ণচরিত্র' দ্রষ্টব্য।

(equator) বলে। সূর্য্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে, দিবারাত্রি সমান হয়। সূর্য্যের ভ্রমমান গতি না থাকিলেও, গণনা-সৌকর্য্যজন্য সূর্য্যের একপ্রকার গতি ধরা হয়। উহাকে আপেক্ষিক গতি বলে। খগোলের মধ্যস্থিত কল্পিত ঈষদ্বক্র বৃত্তাকার রেখাকে (যে রেখা দিয়া সূর্য্য গমন করেন।) ক্রান্তিরেখা (ecliptic) বলে। ঐ রেখাই সুতরাং রাশিচক্রের মধ্যরেখা। বিষুবরেখা ও ক্রান্তিরেখা সমসূত্রপাতে যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম অয়নান্তবিন্দু (equinox)। সূর্য্য যে গতি দ্বারা ঐ রেখায় ক্রমশঃ ২৭অংশ উত্তরে ও ২৭ অংশ দক্ষিণে গমন করেন, তাহার নাম অয়নগতি। এই গতি সম্বন্ধেও বিশেষ মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে ২৭ অংশ উত্তরে ও ২৭ অংশ দক্ষিণে অপর যে দুইটী কল্পিত বৃত্তরেখা আছে, তাহাদিগকে অয়নান্ত বৃত্ত (tropic of cancer and tropic of capricorn) বলে। উহারাই সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ গমনের সীমা। ঐ (২৭+২৭) ৫৪ অংশ গমন করিতে সূর্য্যের ৩৬০০ বৎসর লাগে। ঐ অংশের প্রত্যেক অংশের নাম অয়নাংশ। এক অয়নাংশ গমন করিতে, সূর্য্যের ৬৬বৎসর ৮ মাস লাগে। ঐ অয়নাংশ গতিদ্বারাই দিবারাত্রির ব্যত্যয় হয়। যে বৎসর অয়নাংশ শূন্য, সেই বৎসর ৩০ চৈত্র ও ৩০ আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হয়, কারণ ঐ দিবস সূর্য্য মধ্যাহ্ন কালে ক্রান্তিপাত-বিন্দুতে গমন করেন। ঐ অয়নাংশ ক্রমে যত অংশ বৃদ্ধি হইবে, ততদিন পূর্ব্বে দিবারাত্রি সমান হইবে। বর্ত্তমান অয়নাংশ ২১।০।০ হওয়াতেই ৯ চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হইতেছে। প্রত্যেক নাক্ষত্র দিবারাত্রে দ্বাদশটী রাশির উদয় হয়। ঐ দ্বাদশ উদয় সকল দেশ হইতে সমানভাবে সমান কালে দৃষ্ট হয় না, এজন্য লগ্নমানও সকল দেশে সমান হয় না। যে যে রাশির যত অংশে সূর্য্য অবস্থান করেন, সেই লগ্নের তত অংশ প্রাতঃকাল। যে সমস্ত কল্পিত মণ্ডলাকার রেখা ভূগোলকের উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র দিয়া, বিষুবরেখায় সমকোণে ঐ গোলককে সমবিভাগে বিভক্ত করে, তাহাদিগকে মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমা (meridans) বলে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের দ্রাঘিমা হইতে সেই স্থানের পূর্ব্ব বা পশ্চিমবর্ত্তী স্থানসমূহের দূরত্বকে দ্রাঘিমান্তর (longitude) বলে। বিষুবরেখার অপর নাম নিরক্ষ রেখা। নিরক্ষরেখার সমদূরবর্ত্তী উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকেই যে সকল কল্পিত বৃত্তাকার রেখা গোলকের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ব্যাপিয়া আছে, তাহাদিগকে অক্ষরেখা (lines of latitude) বলে। নিরক্ষবৃত্তের সমস্ত কালে দশ দশ অংশ অন্তরে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত কল্পিত হয়, তাহাদিগকে অক্ষসমসূত্রপাত বা অক্ষবৃত্ত (paralels of latitude) বলে। গোলকে যে সমস্ত বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয়, উহারা প্রত্যেকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগকে এক অক্ষাংশ (digree) বলে। দ্রাঘিমা বা কদম্বসূত্র দ্বারা নক্ষত্রচক্র ১২ ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগ এক এক রাশির অধিকার স্থান। এক এক রাশির অধিকার স্থানে ২।০ নক্ষত্রের অধিকার স্থান। এক এক নক্ষত্রের অধি-

-কার ১৩⅓ অক্ষাংশ বা ডিগ্রী। সাধারণতঃ "নক্ষত্র" শব্দে নক্ষত্রপুঞ্জ বা তাহাদের অধিকৃত রাশিচক্রের ৮০০ কলাপরিমিত স্থান সূচিত হয়। ধ্রুব নক্ষত্র ... টী, কিন্তু সাধারণতঃ উত্তর-মেরুসন্নিহিত উত্তর-ধ্রুবই দৃষ্ট হয়। অপর ধ্রুব দক্ষিণমেরু সান্নিহিত। উত্তরধ্রুব-সন্নিহিত সাতটী তারাপুঞ্জের নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল (Great Bear or Ursa major)। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটী তারকাপুঞ্জের নাম ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সপ্তর্ষিমণ্ডল অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে থাকা বলিলে, তাহাদের ঐ সমস্ত নক্ষত্রে 'সশরীরে' থাকা বুঝায় না। উহাতে বুঝায় যে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের অত্রি ও পুলস্ত্য নামক নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমভাবাপন্ন দক্ষিণোত্তর কল্পিত রেখা—অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে অবস্থিত, অথবা ঐ সমস্ত নক্ষত্রের স্বক্ষেত্র ১৩⅓ অক্ষাংশ পরিমিত স্থানের—অর্থাৎ রাশিচক্রের ঐ ঐ নক্ষত্রাধিকৃত ৮০০ কলাপরিমিত স্থানের সমদেশে—সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত। আপত্তি হইতে পারে যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল বর্ত্তমান কল্পিত রাশিচক্রের বহির্ভাগে অবস্থিত, সুতরাং কিরূপে রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রের সমদেশাবস্থিত হইবে? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে, লুব্ধক (Sirius) তারা ক্রান্তিপাতবৃত্তের ৪০ অংশ দক্ষিণে রাশিচক্রের বাহিরে অবস্থিত; অথচ লুব্ধক মিথুনাদি রাশিতে অবস্থিতি করে, এইটী সর্ব্বসম্মত প্রাচীন উক্তি। ঐ বিষয়টী বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য পরে চেষ্টা করা হইবে।

শাকল্যসংহিতাকার বলিয়াছেন "জ্যোতি-র্যুগ-প্রারম্ভে, অর্থাৎ যে সময়ে ... প্রথম কল্পিত হয়, তখন সপ্তর্ষি... শ্রবণানক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী ... অক্ষাংশ দূরে পুলহ, পু... দূরে পুলস্ত্য, পুলস্ত্য হইতে ৩ অক্ষাংশ দূরে অত্রি, অত্রি হইতে ৮ অক্ষাংশ দূরে অঙ্গিরা, অঙ্গিরা হইতে ৭ অক্ষাংশ দূরে বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ হইতে ... দূরে মরীচি। উহাদের ... ৮ কলা ... উত্তর অয়নবৃত্ত হইতে ... সর ... দূরত্ব ৫৭°, ৫০°, ৫০°, ৫৬° ৫৭° ...। উত্তরদিকে গমনজন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল ২৭০০ বৎসরে সমস্ত নক্ষত্রচক্র পরিভ্রমণ করে। সুতরাং যে কোন সময় তাহাদের অবস্থান নির্ণীত হইতে পারে।" আর্য্য জ্যোতির্ব্বিৎ-পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই সপ্তর্ষিদিগের গতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে স্বচক্রে থাকিয়া, নক্ষত্রচক্রকে পরিভ্রমণ করেন, এবং ঐ পরিভ্রমণ কালে, এক এক নক্ষত্রে ১০০ বর্ষ বাস করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তকার এই গতির কোন উল্লেখ করেন নাই। সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌমকার বলেন যে "অয়নচক্রে যেরূপ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র স্থির বলিয়া অনুমিত হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল সেরূপ নহে। অয়নমণ্ডলের উত্তরকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকস্থ কল্পিত ক্ষুদ্র বৃত্তে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভ্রাম্যমান।" কমলকর বলেন, যে, "সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌমকার সপ্তর্ষির যে গতির উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ গতি অনস্তুমেয়। কিন্তু যখন পুরাণকার ও সংহিতাকার ঋষিগণ সপ্তর্ষির গতির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহা অখণ্ডনীয়। নক্ষত্রগণ স্থির, কিন্তু

সপ্তর্ষিগণ অদৃশ্য দেবতা; তাঁহারা যে ঐরূপে ভ্রমণ করেন, ইহা ঋষিবাক্য-হেতু স্বীকার্য্য।”

(ক্রমশঃ)

তত্ত্বচিন্তা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

১১। আবার তোমার রূপ আছে,—যাহাতে—যে রূপপ্রতিমায় তুমি প্রকাশ, অর্থাৎ যাহা দেখিয়া তোমাকে চিনিতে পারা যায়। তোমার নাম আছে,—যাহা বলিয়া তোমাকে ডাকে, অথবা যাহা বলিয়া ডাকিলে তোমাকে নির্দ্দেশ করিতেছে বুঝিতে পার।

এই রূপ ও নাম তোমার হউক, আর নাই হউক, উহা তোমারই শরীরের, যে শরীরে তুমি অবস্থিতি কর।

১২। অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ লইয়া যে তুমি,

উহার অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, কিন্তু ইহারাও পরস্পর বিভিন্ন।

জাগ্রত অবস্থায়—তোমার সকলই জাগ্রত অর্থাৎ কর্ম্মোপযোগী।

সুষুপ্ত বা নিদ্রিত অবস্থায়—বহির্বিভাগ অননুভূত, অন্তর্বিভাগেও সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকে না।

স্বপ্নাবস্থায়—বহির্বিভাগ সম্পূর্ণত অনুভূত বা অননুভূত থাকে না। ইন্দ্রিয় সুচারুরূপে চালিত হয় না, অনুভবও প্রকৃত ঘটে না, কেবল বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে ভাণ হয়। স্বপ্নে সর্প দেখিলে, যাহা দেখিলে উহা প্রকৃত সর্প নহে, তোমার দেখাও প্রকৃত দেখা নহে;—তবে অন্তর্বিভাগের অনেকগুলি জাগ্রত থাকে।

১৩। তাহার পর—

সহজেই বোধ হয়—জগৎ কি তাহা না

(১) জানি, কিন্তু জগতে কতক আমার আছে, অথবা জগতের কতক আমি।

(২) জগতে কতক অপরের আছে, অথবা জগতের কতক অপর।

(৩) জগতে কতক আমারও নহে, অপরেরও নহে; হয় অন্য কাহারও, নয় তাহা আপনা-আপনি।

(১) ও (২) এর দৃষ্টান্ত যথা—অস্তিত্ব, তনু, ইন্দ্রিয় বা উপায়, বৃত্তি, শক্তি, জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, নিধন, ভোগ, ভোগ্য ইত্যাদি।

(৩) এর উদাহরণ যথা—সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বায়ু, রাত্রি, দিন, শীত, গ্রীষ্ম, ইত্যাদি। সংক্ষেপে পঞ্চভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কাল, শক্তি, চৈতন্য, জড়ত্ব, জগৎ।

জগৎ কি,—জগতে আমি কি,—আমার কি—এই ত্রিবিধ প্রশ্নের উত্তরে আত্ম-জ্ঞান লাভ হয়। তল্লাভে—জগতে পর কি, বা পরের কি,—অথবা অন্য আবার কে,—ও তাহার কি, অথবা আপনা-আপনি কি, এই সমুদয়ের উত্তর পাওয়া যায়। অতএব বিচার্য্য—

(১) জগৎ কি

(২) জগতে আমার কি ?

(৩) আমি কি ?

একত্র করিয়া দেখ তোমাতে কি কি আছে ? যাহা আছে তাহা এই—

১। শরীর (ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট) (২) প্রাণ (৩) রিপু (৪) বৃত্তি (৫) বাসনা (৬) শক্তি (৭) চৈতন্য (৮) ভাব (৯) রূপ ও নাম (১০) অবস্থা (১১) ভোগার্থ অপরাপর বস্তু।

তুমি যে তোমার রূপ, নাম, অথবা ভাব নহ, তাহা আর বিচার করিয়া বুঝাইতে হইবে না; সহজেই বুঝিতে পার। কারণ রূপ, নাম ও ভাব—শরীর ব্যতীত সম্ভব নহে।

১৫। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ—

(১) তুমি কি শরীর ?

(২) তুমি কি প্রাণ ?

(৩) তুমি কি মন ? *

(৪) তুমি কি বুদ্ধি ?

(৫) তুমি কি শক্তি ?

(৬) তুমি কি বাসনা ?

(৭) তুমি কি চৈতন্য ?

(১) তুমি শরীর নহ। কারণ—

(ক) "তোমার শরীর" এই সংস্কার চিরকালীন।

(খ) দৈহিক অনুভূতিশূন্য তুমি থাকিতে পার।

[নিদ্রায় দৈহিক যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। যন্ত্রণাযুক্ত দেহ আর তুমি যেন পৃথক্ বোধ হয়।]

(গ) স্বপ্নাবস্থায় দেহশূন্য তুমি কাজ করিতে পার।

(ঘ) মৃত্যুতে দেহ পড়িয়া থাকে, তুমি থাক না; ইহা কথিত আছে। সুতরাং তুমি দেহী, দেহে থাক, কিন্তু দেহ নহ।

(২) তুমি প্রাণ নহ। কারণ সহজ সুগম। যখন তোমার প্রাণ চঞ্চল হয়, তখন তোমার অনুভূতিতে ব্যতিক্রম ঘটে ও চৈতন্যের লাঘব হয় সত্য, কিন্তু তুমি সে প্রাণকে সুস্থির করিতে সক্ষম। আবার হয়ত সুস্থির করিতে অক্ষম হইয়া, তোমার শরীর ত্যাগ করিয়া ফেল। আবার মন প্রাণকে চঞ্চল করিতে পারে। সুতরাং তুমি প্রাণ নহ।

(৩) তুমি মন নহ। কারণ (ক) "তোমার মন" এরূপ প্রসিদ্ধ-ব্যবহার।

(খ) মনের কার্য্যানুসারে তাহাকে (১) বুঝাও, (২) আশীর্ব্বাদ কর (৩) ঘৃণা কর।

(গ) শরীরকে অগ্রাহ্য করিয়া যেমন থাকিতে পার, মনকে অগ্রাহ্য করিয়া তুমি থাকিতে পার—ইহাও কথিত আছে।

[ইহা উন্নত অবস্থার কথা, সাধারণতঃ বোধগম্য না হইতে পারে।]

(ঘ) মন স্বীয় বৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে থাকে, তুমি পৃথক্ থাকিতে পার।

[ইহাও উন্নত অবস্থায় ঘটিয়া থাকে।]

সুতরাং তুমি মনের সহিত মিলিত থাকিয়াও মনী নহ।

(৪) তুমি 'মনপ্রাণের সমষ্টি' হইতেই পার না। কারণ তোমাতে প্রাণবায়ু•

---

* রিপু ও বৃত্তি মনের অন্তর্গত বলিয়া উহার বিচার অগ্র[illegible]ন।

লক্ষণ না থাকিতে পারে, অথচ তুমি থাকিতে পার। (নিয়তপ্রাণ সিদ্ধ মহাত্মগণ প্রসিদ্ধ উদাহরণ)

অতএব দেহে থাকিয়া মনপ্রাণের সহিত মিলিত থাকা—তোমার পক্ষে যেমন সত্য, দেহেতে থাকিয়া বা না থাকিয়া মনপ্রাণের সহিত মিলিত বা উহাদিগের হইতে পৃথক্ থাকাও তোমার পক্ষে তেমনি সম্ভব। (সাধনার উন্নত অবস্থার কথা।)

তাহারা থাকুক্ আর না থাকুক্, তথাপি তোমার থাকার ব্যতিক্রম ঘটে না।

সুতরাং তুমি দেহ নহ, প্রাণ নহ, মনও নহ।

(৬) তুমি বাসনা নহ। কারণ বাসনা না থাকিলেও তোমার অস্তিত্ব থাকে। সুষুপ্তি একটী উদাহরণ। আবার জাগ্রত অবস্থায়ও সম্ভাবনা আছে।

তুমি শক্তি নহ। শক্তি স্থূল ও সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। তুমি শক্তি হইলে, তোমাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম বলিতে হয়। স্থূল হইলে, স্থূল শরীর হইতে পৃথক্ থাকিতে পারিতে না।

বলিবে—তুমি সূক্ষ্ম শক্তি! শক্তি জড়, শক্তি অন্যকর্ত্তৃক চালিত হয়। বলিবে—চৈতন্যকর্ত্তৃক শক্তি চালিত হয়। তাহা হইলে, তুমি শক্তি না হইয়া চৈতন্য—এই কথা বলিতে হয়।

(৭) তুমি চৈতন্য কি না, তাহাই বিচার কর। তুমি চৈতন্য হইলে, দেহরূপ যন্ত্রকে শক্তিসাহায্যে অনায়াসে চালাইতে পার, সত্য, কিন্তু তোমাকে শক্তির মুখাপেক্ষী বলিতে হইবে। তাহা হইলে, তুমি শুধু চৈতন্য এরূপ বলিতে পার না।

(৮) এখন বলিবে, তুমি শক্তিচৈতন্যের সমষ্টি। তাহাও সঙ্গত নহে। শক্তি চৈতন্যদ্বারা চালিত। বলিতে পার, তুমি শক্তিসম্পন্ন চৈতন্য। তাহা হইলে শুধু শক্তি কেন, মনবুদ্ধিবাসনাসম্পন্ন চৈতন্য—বলিতে পার। আবার এই সমষ্টিই শরীর ধারণ করে, শরীরধারণে প্রাণের সঞ্চার করে। তাহা হইলে, এক কথায় তুমি যেই হও, চৈতন্য, শক্তি, বাসনা, মন, বুদ্ধি প্রাণ ও শরীর লইয়া তুমি, নয় তোমাকে ধরিয়া উহারা সকল।

৬। এক্ষণে প্রশ্ন (১) তুমি উহাদের সমষ্টি কি না? উত্তর—তুমি উহাদিগের সমষ্টি নহ।

১, ২, ৩, ৪, ও ৫, অঙ্কের সমষ্টিতে ১৫ হয়। ঐ কয় অঙ্কের কোনটীর অভাবে আর ১৫ হয় না। তুমি যাহাদিগের সমষ্টি, তাহাদের কোনটীর অভাবে আর তোমার "হওয়া" সম্ভব নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা লইয়া সমষ্টি, তাহাদের দুই একটীর অভাবেও তুমি থাক, যথা—

(১) মূর্চ্ছায় তোমার চৈতন্য, শক্তি, বাসনা থাকে না, তবু "তুমি" থাক।

(২) নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) তোমার কি থাকে, কি থাকে না,—তাহা তুমি বলিতে পার না, অথচ তুমি থাক, অস্বীকার করিতে পার না।

(৩) স্বপ্নে তুমি কর্ম্মকর, অথচ সে কর্ম্ম অলীক। সে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ স্বীকার পাওনা, অথচ উহ তোমাকর্ত্তৃক কৃত বলিয়া থাক।

(৪) সমাধিতে [illegible]সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান

থাকে না। সমাধিস্থ নী হইয়া সে অবস্থা অস্বীকার করিতে পার, কিন্তু ঘোর চিন্তায় তুমি কি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হও না? তখন তুমি থাক না, ইহা স্বীকার পাও না কি?

(৫) মৃত্যুতে সমষ্টির একটা ভাগ পড়িয়া থাকে অপরগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাণ বায়ু বাহির হয়—ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। বাহির হউক্ বা অন্য যে অবস্থায় থাকুক্, উহা নষ্ট হয় না। সুতরাং মৃত্যুতে তুমি নষ্ট হও—একথা বলিতে পার না।

এখন বলিবে, উক্ত প্রথম চারি অবস্থায় তোমার সমস্ত তোমাতেই থাকে, অথচ কার্য্যকারী থাকে না। অর্থাৎ যাহাদের সমষ্টি তুমি, তাহারা স্বগুণে বঞ্চিত হইয়াও তোমাকে থাকে, তাই তুমি থাক।

প্রথমতঃ—সগুণসত্তার সমষ্টি—আর স্বগুণবিহীন সেই সেই পদার্থের সমষ্টি—কখনও এক হইতে পারে না, ইহাতে "তোমার" থাকা প্রমাণ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ:—স্বগুণবিহীন সমষ্টিভাগ তখন তোমাকে ধরিয়া থাকে, বলিতে হইবে। যখন তাহাদেরই ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিতেছ তখন তাহাদের সমষ্টিতে তোমার "হওয়া" বা "থাকা" ত আর সম্ভব নহে। আর যদি তাহারা তোমাকে ধরিয়া থাকে, তাহা হইলেও তুমি তোমাকে সমষ্টি-নিরপেক্ষ করিলে।

অতএব তুমি উহাদের সমষ্টি—একথা প্রমাণ হয় না, সুতরাং তুমি ঐ সমষ্টির নিরপেক্ষ। সমষ্টি থাক আর নাই থাক, তুমি থাকিতে পার, থাক ও আছ।

১৭। পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখিয়াছ, কল্পিত বিন্দুতে যে যে গুণ ও শক্তি আরোপ করিয়াছিলে, তাহার কতক কতক তোমাতেও আছে।

এখন তোমার মনে হইতে পারে—

(১) তুমি কি সেই বিন্দু?

(২) অথবা উহার অংশ বা কণা?

(৩) কিম্বা তাহার প্রতিভা, প্রতিমা, বা ছায়া?

(১) অনন্তের কণা বা অংশ সেই অনন্ত হইতে পৃথক্ সম্ভব নহে। অংশ বা কণা—অথচ উহাতেই স্থিত—ইহা সম্ভব, ইহা ধারণা—ইহা কল্পনা।

(২) অনন্তের প্রতিভা, প্রতিমা বা ছায়া অনন্ত হইতে পৃথক থাকিতে পারে না। উহার প্রতিভা, প্রতিমা, বা ছায়া উহাতে আছে; ইহাও কল্পনা—এই ধারণাও অসম্ভব নহে।

অংশ বা কণাভাব হইতেই "প্রভুদাস" ভাবের উদয়। প্রতিভা বা ছায়া ভাব হইতেই "সখাসখি" ভাবের উদয়। জীব সেই বিন্দুকে "প্রভু" ও আপনাকে "দাস" স্বীকার করিয়াছে। জীব সেই বিন্দুকে "সখা" আর আপনার "তৎসখিত্ব" স্বীকার করিয়াছে।

উপরোক্ত দুই ভাবেই তুমি তোমাকে বিন্দু হইতে পৃথক্ ভাবনা করিতেছ। এই ধারণাসত্ত্বে তুমি "জীব"।

(৩) তাহার পর—তুমি সেই বিন্দু—এই নিশ্চয়ে তোমার অস্তিত্ব বিন্দুতে লীন হয়। আর তুমি থাক না। তুমি তোমার সর্ব্বস্ব হইতে মুক্ত হইলে কি হও, তাহা হইয়া দেখ।

১৮। এখন বুঝিতে পারিলে, হয় তুমি

"জীব" নয় "ব্রহ্ম"। জীবভাবে আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া ধারণা করিতে সাহস হয় না, ইহা সত্য; কিন্তু জীবভাবে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক ধারণা করাও যুক্তিসিদ্ধ নহে।

কি করিলে জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া, পূর্ণ স্বরূপভাব প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা শাস্ত্রে ও গুরুর নিকট তত্ত্ব কর।

১৯। যাহা জাননা, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। কেন ইচ্ছা হয়, তাহা আলোচনার সময় উপস্থিত নহে।

জানিবার ইচ্ছা * হইলে চেষ্টার (বৃত্তিসহ শক্তি ?) উদয় হয়।

চেষ্টার আরম্ভে—অনুসন্ধান (তত্ত্ব করা)

তৎপরে শিক্ষা—(সংগ্রহ করা)

তৎপরে—অনুশীলন (বিচারসহ যুক্ত থাকা)

তৎপরে—ধারণা (আয়ত্ত করা)

চেষ্টার শেষ—জানা বা জ্ঞানলাভ।

অনুসন্ধানে—আগ্রহ প্রয়োজন। (আকাঙ্ক্ষা-হেতু যত্ন।)

শিক্ষায়—শ্রবণ, দর্শন, অনুভব প্রয়োজন। (উপায়।)

অনুশীলনে—চিন্তা, বিচার, আকর্ষণ (অর্থাৎ তৎবিষয় পরিত্যাগ না করা)—প্রয়োজন। (অবলম্বন।)

ধারণায়—বিশ্বাস, উপলব্ধি, দৃঢ়তা, সংরক্ষণ (অর্থাৎ মূলীভূত করা)—প্রয়োজন। (স্থিতি)

জ্ঞানে—না জানা—অজ্ঞান থাকে না।

* ইচ্ছা, চেষ্টা, অনুশীলন ইত্যাদির উৎপত্তি—এবং অর্থ এক্ষণে বিশেষ করিয়া বুঝিবার আবশ্যক নাই। আপাততঃ যাহা সাধারণজ্ঞান—তাহা লইয়াই অগ্রসর হইতে হয়।

অতএব যদি জাননা—জানিতে চাহ;

জানিতে চাহ—অনুসন্ধান কর;

অনুসন্ধান পাইলে—শিক্ষা কর;

শিক্ষা করিয়া—অনুশীলন কর;

অনুশীলন করিতে করিতে—ধারণা কর,

ধারণা করিলেই—জ্ঞানলাভ হইবে।

ইন্দ্রিয়ের অধীন বস্তুসমুদায় এইরূপে অনায়াসে জানা যায়। কিন্তু অবস্তু—অর্থাৎ যাহা ভৌতিক বা ইন্দ্রিয়ের অধীন নহে, তাহা জানা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

যে প্রণালীতে বস্তু জানা যায়, সেই প্রণালীতে অবস্তুর জ্ঞানও লব্ধ হয়, কিন্তু একের উপায় হইতে অপরের উপায় ভিন্নতর।

ভৌতিক বস্তু জানিতে ভৌতিক বা স্থূল উপায়, অবস্তু জানিতে অভৌতিক অথবা সূক্ষ্ম উপায়।

২০। অবস্তু কাহাকে বলিতেছি?

(১) "আমি" (সাধারণজ্ঞানে যাহা আমি।)

(২) এই আমি—যাহাকে বড় আমির মত বলিয়া বোধ করে, চিন্তা করে, যাহার আশ্রয় চাহে, আর যাহা হইতে তপস্যা করে।

সহজ কথায় জীব ও আত্মা,

বা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা,—

নয় সৃষ্ট এবং স্রষ্টা।

২১। এক্ষণে জানিবার উপায় কি?

জানিবার উপায়—দর্শন, পাঠ ও শ্রবণ। ইহাদের মধ্যে কোনটী সহজ ও সুলভ? যাহা জানিনা, তাহা জানিবার জন্য যে কেবল "শ্রবণ" প্রয়োজন, এমন নহে। দর্শনে

(১) ও পাঠে (২) কতক প্রকার জ্ঞান জন্মে। বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞান "শ্রবণ" অপেক্ষা "দর্শনে," সহজে, শীঘ্র ও অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যাহা বিষয় নহে, অর্থাৎ স্থূল বস্তু নহে, বা যাহা ইন্দ্রিয়ায়ত্ত ভৌতিক নহে,—তৎসম্বন্ধে জ্ঞান দর্শনে দুঃসাধ্য, পাঠেও আংশিক সম্ভব। কারণ যাহা বিষয় নহে, অর্থাৎ ভৌতিক নহে, তাহা দেখাইবার উপায় নাই। তৎসম্বন্ধে লেখাও কঠিন, লিখিয়া বুঝানও অধিক কঠিন।

যাহা দেখান যায় না,—বা বুঝান যায় না, তাহা অন্য কেহ—বলেন (৩) কি প্রকারে, ও বলিলেও বুঝা যায় কি প্রকারে,—ইহাই লিখিবার ধারা ও বলিবার ধারা স্বতন্ত্র। সেখানে ভাব ও ভাষা থাকে।

বলাতে ভাব ও ভাষা ব্যতীত বলিবার সময় বক্তার আনুষঙ্গিক ইঙ্গিত, শক্তি-প্রকাশ, তৎপরিসমীপে উপস্থিত হইলে কতক বুঝা যায়। জিজ্ঞাসু বিষয়ের মর্ম্ম হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার নানা প্রকার কৌশল ইত্যাদি থাকে। পাঠকালে অকস্মাৎ কোন কূটভাব মনে আসিলে, তাহার মীমাংসা মনে হয় না. কিন্তু বক্তা উপস্থিত থাকিলে তখনই তাহার মীমাংসা পাইবার সম্ভাবনা। আবার লিখিত বিষয় কঠিন হইলে, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য আবার বক্তার প্রয়োজন। আবার, কতক প্রকৃতি আছে, যাহা পাঠের বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না, অথবা যাহাদের পাঠে প্রবৃত্তি যায় না,—অথচ বলিলে শুনিতে চায়। বারম্বার পাঠে তাহাই পঠিত হয়, কিন্তু বারম্বার শ্রবণে (বক্তার তৎতৎকালের ভাবের উপর নির্ভর—হইতে) কিয়দংশ নূতন শুনিবার সম্ভাবনা।

যাহা অব্যক্ত—তাহাকে দেখান, বা লিখিয়া বুঝান অপেক্ষা—সুতরাংই বলিয়া বুঝান অর্থাৎ উহার কতক আভাস দেওয়া অনেক সম্ভব।

২১। এইজন্য যাঁহারা কতক আভাস পাইয়াছেন তাঁহাদের জন্য লিখিত শাস্ত্র, যাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাহাদের জন্য কথিত শাস্ত্র বা বলা, নিরূপিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এই জন্যই ঋষি বক্তা ছিলেন, ও দ্বিজগণকে (অর্থাৎ যাঁহাদের কিঞ্চিৎ আভাসলাভ হইয়াছে তাঁহাদিগকে) বেদের অধিকারী করিয়াছিলেন।

[দ্বিজ হইতে পাঠবিধি ছিল না, শ্রবণ-বিধি ছিল, এখনও চলিয়া আসিতেছে।]

বেদজ্ঞ বিপ্রকুল বৈদিক বিষয়ে বক্তা

(১) আপনি দেখিয়া শিখিতে গেলে, অথবা ঠেকিয়া শিখিতে গেলে, একটা জীবনে কতটুকু শিক্ষার সম্ভাবনা? হয়ত যাহা দেখিবে বা যথায় ঠেকিবে, তাহা উপস্থিতই হইল না! নয়ত উপস্থিত হইল, তুমি উহা বুঝিতে পারিলে না! সুতরাং তোমার শিক্ষা হইল না! অতএব বহুকাল হইতে দেখিয়া বা ঠেকিয়া, যাঁহারা যাহা লিখিয়া বা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই সম্বল করিতে হয়। এই সম্বলকে "শাস্ত্র" বলা হইয়াছে।

(২) পাঠ করিয়া শিখিতে গেলেও অপরকে আশ্রয় করিতে হয়। যাঁহার লেখা পড়িবে, তিনিই তোমার অবলম্বন। কিন্তু তিনি চাক্ষুষ নহেন; প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেনা। সুতরাং এই শিক্ষাদ্বারা সম্পূর্ণ উপকার না দর্শিবার কথা।

(৩) পরে বলিবেন, তুমি শুনিয়া শিখিবে। যিনি বলিবেন, তিনিই তোমার অবলম্বন। প্রয়োজন হইলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার। অতএব এইরূপ শিক্ষাই স্বাভাবিক সহজ ও সুলভ।

ছিলেন, এখনও রহিয়াছেন। বেদাতীত বিষয়ে তাঁহারা বক্তা নহেন, ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ) তদ্বিষয়ে বক্তা পদের অধিকারী।

লিখিত শাস্ত্র এবং বক্তৃকুল এইরূপে প্রচলিত হইয়াছেন।

শাস্ত্রপাঠে উপযুক্ত না হইলেও, উহা শ্রবণ করা, এবং শাস্ত্র কি, তাহা জানা কর্ত্তব্য, ও তাহাতে বিশ্বাস রাখা উচিত।

২৩। শাস্ত্র কতদূর সত্য ইহা জিজ্ঞাস্য; বিশেষতঃ উহাতে এত দুরূহ ও কূট বিষয় লিখিত আছে, যে, সহজে বা সাধারণতঃ উহা বোধগম্য হয় না।

২৪। তাহার পর গুরু কে, এবং গুরু-শিষ্যে কি সম্বন্ধ, ইহাও অবগত হওয়া উচিত।

যথা স্থানে এই দুই বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রবণের পর যে যে ক্রিয়া করিতে হয়, যে যে অবস্থা পাইতে হয়, তাহা গুরু বা শাস্ত্র করাইয়া বা পাওয়াইয়া দেন না, অর্থাৎ তৎ তৎ অবস্থাপ্রাপ্তিহেতু শিষ্যের চেষ্টা, অনুষ্ঠান, একাগ্রতা, তপস্যা বা সাধনা প্রয়োজন।

তবে গুরুকর্ত্তৃক বা শাস্ত্রে—কার্য্যপ্রণালী কথিত হয়, ও বক্তব্য আছে। অর্থাৎ মনন, বা ধ্যানাদি কাহাকে বলে, ও কিরূপে হয়, তাহাই বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু করাইয়া দিতে পারেন না।

প্রথমতঃ শাস্ত্র কি, তাহাই দেখ। শাস্ত্র পাঠে যদি জ্ঞান লাভ হয়—ভালই, নচেৎ ঐ শাস্ত্র যিনি বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার অর্থাৎ গুরুর প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবামাচরণ বসু।

জীবন-সন্ধ্যা।

অবসান হ'য়ে এল বেলা!
কল্পনার নিষ্ফলপ্রয়াস;
বৃথা এই জীবনের খেলা,
নিবে যায় অনন্ত তিয়াস!

২

চিরসুপ্তি কখন নীরবে
আসি দেহে বুলাইবে হাত;
এ নিষ্প্রভ নয়নপল্লবে
হবে দুই বিন্দু অশ্রুপাত!

৩

অকস্মাৎ কি জানি কখন,
ক্লান্তকায় পথিকের প্রায়,
চক্ষু মুদে করিব শয়ন,
জীবনের সৈকত-সীমায়!

৪

মহাকালস্রোতের মাঝারে,
দেহখান ধীরে যাবে মিশি;—
স্নিগ্ধসান্ধ্যছায়া-পর-পারে
লভিব গো বিশ্রামের নিশি!

৫

উপেক্ষিয়া শোক, দুঃখ, আশা,
জগতের যত ভালবাসা;
জীবনের যবনিকা ফেলে
লুকাইব কোন্ সন্ধ্যাকালে!

৬

নিরখিয়া ম্লান শয্যাপরে,
মোর এই সুপ্ত দেহটীরে,
ব্যথা পেয়ে কোমল-অন্তরে,
যদি কেহ ভাসে অশ্রুনীরে;—

৭

চিরপ্রিয় অভাগার তরে,
মুছে ফেলে নয়ন-আসার;
যদি সে গো দিতে ইচ্ছা করে,
মমতার শেষ উপহার!

৮

তবে মুখে ব'লে 'হরি হরি'
শরতের শুভ্র ফুল আনি,
দেয় যেন কুসুমিত করি,
কুসুমের শেষশয্যাখানি!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টরীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৬শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ। ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

মন জড় কি অজড় ?

—·:·:·—

"কর্ম্ম ও চিত্রগুপ্ত" প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম—"বাহ্যবস্তুবৎ চিত্তমপি বহুপরিণামি" কি না, এবং এক পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতিসম্ভূত প্রত্যেক পদার্থ—কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম প্রতি-ক্ষণেই পরিবর্ত্তিত ও অবস্থান্তরিত হইতেছে কি না;—আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব। প্রথমে দেখা যাউক্—চিত্ত জড় কি অজড়? কারণ, জড়পদার্থমাত্রই নশ্বর ও পরিণামী। আর্য্যশাস্ত্র মতে আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যেমন একদিকে এই প্রত্যক্ষীভূত বিশাল জড়জগৎ, সেইরূপ অন্যদিকে সেই পঞ্চভূত হইতেই জীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, "অব্যক্তে"র ব্যক্তাবস্থা—অর্থাৎ "অব্যক্ত" কোন্ মহতী শক্তির বিকাশে একের পর একটী কার্য্যকারণপরম্পরায় এই বিশ্ব বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হয়। অন্যথা এই কোটী কোটী জড় পদার্থ ও অসংখ্যাসংখ্য জীবপূর্ণ বিচিত্র সৃষ্টির আদি কারণ কি? এই বিষয়ে যতই সূক্ষ্মানুসন্ধান হউক্ না কেন, প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারা যায় না। এই কারণে, দূরদর্শী আর্য্য ঋষিগণ—এই শক্তিকে 'অনাদি' বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

গম্ভীর-চিন্তাশীল জন ষ্টুয়ার্ট মিল. কার্য্যের কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে সমুদায় কারণের আদি ও জগতের সর্ব্বব্যাপী কারণ—একমাত্র শক্তি (Force) ভিন্ন অপর কিছুকে মূল কারণ (Primeval cause) বলা যাইতে পারে না; এইমত প্রকাশ করেন *

---

* It would seem then, that, in the only sense in which experience

মহাত্মা হারবার্ট স্পেন্সার এই মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি মিল্-কথিত "ফোর্শ" (force) শব্দের পরিবর্ত্তে এনার্জি (Energy) শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি বলেন "There is an infinite and eternal energy from which every thing proceeds" অর্থাৎ এমন এক অনন্ত ও সনাতন শক্তি আছে—যাহা হইতে এই নিখিল বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত মনীষিদ্বয় এই শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কোথায়ও "it wells up in consciousness" কোথায় বা "somthing more than consciousness" এবম্বিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রফেসর হক্সেলি বলেন—"of these causes which have led to the origination of living matter, it may be said, that we know absolutely nothing." অর্থাৎ যে কারণপরম্পরায় এই সজীব প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে,—তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই অবধারণ করিতে পারি না। কিন্তু আর্য্যঋষিগণ এই শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা এই শক্তিকে সচ্চিদানন্দ প্রভুর সৃষ্টিশক্তি কহেন। *

supports in any shape the doctrine of a First cause-viz, as the primeval and universal element in all causes, the First cause can be no other than Force. (Mills Essay on Theism)

* এই সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মের অনন্তশক্তির একাংশ মাত্র।

জগৎ-কারণ জগদীশ্বরের যে সৃষ্টি ইচ্ছা তাহাই তাঁহার সৃষ্টিশক্তি। শাস্ত্রে এই ইচ্ছা "কামনা" "আলোচনা" "ঈক্ষণ" "তপস্যা" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। (তপঃ অতপ্যত, জগৎসৃষ্টিবিষয়ামালোচনামকরোৎ)

এই শক্তি কদাচ তাঁহা হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহেন। তিনি যখন স্বকীয় মায়া বা প্রকৃতিতে অনুপহিত থাকেন, তখন তাঁহাকে নির্গুণ, এবং যখন সেই প্রকৃতিতে উপহিত হয়েন, তখন তাঁহাকে সগুণ বলা হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত অবস্থাকে কলাযুক্ত কহে, এবং ইহা হইতেই শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিই "আদ্যাশক্তি" নামে বিশেষিত হইয়া থাকেন। ইঁহারও পরমবিভুর মূলপ্রকৃতির ন্যায় সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা আছে, কিন্তু মূলপ্রকৃতি "অবিকৃতি"—অপর ইনি "প্রকৃতি-বিকৃতি", তজ্জন্য ইঁহার গুণক্ষোভ হইয়া থাকে। "প্রকৃতি সংযোগক্ষোভয়োরিতি।" প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া, বিষম অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই তাঁহার পরিণাম

"ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেক-দেশভাক্।
ঘটশক্তি র্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃৎস্বেব বর্ত্ততে॥"

(পঞ্চদশী, মহাভূতবিবেক প্রকরণ ৬৪ শ্লোক)

মৃত্তিকামাত্রেই ঘটোৎপাদিকা শক্তি আছে বটে, কিন্তু, সকল মৃত্তিকাতে ঘটোৎপত্তি হয় না; যে অংশ স্নিগ্ধ (আর্দ্র) তাহাতেই ঘটোৎপত্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্তশক্তির মধ্যে যে অংশে অধ্যাস হয়, সেই অংশই মায়া বা সৃষ্টিশক্তি হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

ঘটিয়া থাকে। এই প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব। ইনি প্রকৃতির প্রথম পরিণাম, তজ্জন্য প্রধান বা মহান্। ইঁহার পরিণাম অহঙ্কার-তত্ত্ব। "অহঙ্কারশ্চ মহতো জায়তে মানবর্দ্ধন:।" গুণত্রয়ভেদে এই পরিণাম ত্রিভাগে বিভক্ত। সাত্ত্বিক পরিণাম "বিন্দু", তামসিক পরিণাম "বীজ", এবং রাজসিক পরিণাম "নাদ" নামে অভিহিত। এই বিন্দু, বীজ, ও নাদ হইতে যথাক্রমে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ও ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এই ত্রিশক্তি কোথায়ও গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী শক্তি নামে—কোথায় রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামে উল্লিখিত হইয়াছে।*

পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে "একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা:।" এক মূর্ত্তি (মহত্তত্ত্ব) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ আদ্যাশক্তি হইতে ব্রহ্মা; বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হয়েন; কিন্তু সৃজনকামনায় আদ্যাশক্তি জ্ঞানরূপী মহেশ্বরেরই শরণাপন্ন হয়েন। তন্ত্রে কথিত আছে "ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতা:" ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি জড়স্বরূপ; তাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কিছুই করিতে পারেন না, যাহা কিছু করেন ঐ শক্তিত্রয়।

* ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী
চ বৈষ্ণবী।
ক্রিয়াশক্তি: স্থিতা লোকে তৎপরং
জ্যোতিরোমিতি॥"
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)
"ইচ্ছাত্তু বিষ্ণবে দত্ত্বা ক্রিয়াশক্তিস্তু ব্রহ্মণে।
মহৎ দত্ত্বা জ্ঞানশক্তি: সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী॥"
(যোগিণী তন্ত্র)

শক্তি ও জড় সম্পূর্ণ পৃথক্‌জ্ঞানাত্মক হইলেও শক্তি ও জড় কদাচ স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে না। শক্তি না থাকিলে জড়ের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না,—জড়াভাবে শক্তিরও বিকাশ হইতে পারে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জড়স্বরূপ হইলেও উল্লিখিত শক্তিত্রয় হইতে কদাচ স্বতন্ত্র নহেন। তাঁহারা নিয়ত অভিন্ন। "প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বং কার্য্যাক্ষমং ধ্রুবং।" প্রকৃতি (আদ্যাশক্তি) বিনা সকলেই কর্ত্তৃত্বে অসমর্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইনি অন্ধ পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না।*

* "অন্ধপঙ্গুন্যায়"—

"এক ব্যক্তি অন্ধ—দর্শনসামর্থ্যহীন, আর এক ব্যক্তি পঙ্গু অর্থাৎ খোঁড়া—গতিশক্তিশূন্য। দুই জনের পার্থক্যে উভয়ের ক্রিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না; পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিলে, যেমন উভয়সংযোগে ক্রিয়াসিদ্ধি হয়। এতন্ন্যায়ে প্রকৃতিপুরুষসংযোগে ভোগমোক্ষক্রিয়াসিদ্ধি হয়, বিয়োগে ক্রিয়াসিদ্ধি হয় না। ইহা সাংখ্যদার্শনিকেরা কহেন।

পাতঞ্জল দার্শনিকেরা এই অন্ধপঙ্গুন্যায়ের প্রকারান্তরে বর্ণনা করেন; যথা—এক মহাপুরুষের ক্ষেত্রজ্ঞ নামে এক পঙ্গুদাস ও প্রকৃতি নামে এক অন্ধ দাসী আছে। এক দিবস মহাপুরুষ পঙ্গু দাসকে কহিলেন, আমার সংসারের ভার তোমাকে দিলাম। অন্য সময়ে অন্ধ দাসীকেও তদ্রূপ আজ্ঞা দিলেন। পরে খোঁড়া ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আমি খোঁড়া—কিপ্রকার সংসার নির্ব্বাহ করিব, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া আছে, এমত সময়ে ঐ অন্ধ দাসীও তাদৃশ ভাবনায় ভাবিত হইয়া তাহার নিকট বসিল।

প্রকৃতিতে কর্তৃত্ব আছে—পুরুষের কর্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু চৈতন্য আছে'। এই জন্য প্রকৃতিতে চিন্ময় ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে কর্তৃত্ব ও চৈতন্য উভয়েরই বিকাশ পাইয়া থাকে কিরূপে জড়শক্তিতে চিৎশক্তির (Consciousness) বিকাশ অথবা সজীব প্রাণীর উদ্ভব,—আর্য্যশাস্ত্রে তাহা যথাসম্ভব-আলোচিত হইয়াছে।

এই আদ্যাশক্তি সৃষ্টিশক্তি, (active force) আর জীবপক্ষে চিৎশক্তি (Consciousness)। শাস্ত্রে ইঁহাকে "কার্য্য-কারণ শক্তি"-যুক্ত কহে। কার্য্য-প্রকাশোপযোগী বলিয়া "কার্য্য-শক্তি" এবং সেই কার্য্যের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া 'কারণ শক্তি' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ইহার পূর্ণমাত্রার কদাচ হ্রাস বৃদ্ধি নাই। বহির্জগতে উষ্মা, তেজ ও তাড়িতাদি, আর অন্তর্জগতে বল, বীর্য্য ও তেজাদি ইহার বিকাশ। ইনি নিত্য, কিন্তু বিকারী; কারণ ইহাঁরই বিকারে সূক্ষ্মভূতাদি উৎপন্ন। ইনি অব্যয়, কিন্তু পরিণামী,—কারণ বীজ-শক্তি বৃক্ষরূপে—বৃক্ষ ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র ব্যয় বা অপচয় হয় না।

"এতদ্রূপে কাকতালীয় ন্যায়ে অথবা অন্ধ-কূপানক্রীয় ন্যায়ে উভয়ের সহবাস হওয়াতে, অন্যোন্যের বিষয় অন্যোন্য অবগত হইয়া, দুইজনে যুক্তি করিয়া, পঙ্গুদাস অন্ধ দাসীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, পরস্পরসাহায্যে প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহার সংসারের সকল কাজ করিতে লাগিল।"

(প্রকৃতিবাদ অভিধান।)

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও ইহা স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন "There exists of it in nature a fixed quantity, which is never increased or diminished" অর্থাৎ এই জগতে যে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে শক্তি আছে, তাহার কখন বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না।

এই বিশ্ববিকাশিনী শক্তি অনন্ত ও বিচিত্র। ইনি সূক্ষ্ম স্থূল যাবদীয় পদার্থের জননী, অপিচ তত্তাবৎ প্রত্যেক পদার্থ হইতেই আবার নানারূপে ইনি বিকাশিত হইয়া থাকেন। তাড়িৎ বা চৌম্বক শক্তিই বল—যোগাকর্ষণ বা বিক্ষেপণ শক্তিই বল—অথবা অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী শক্তিই বল—সকলই এই এক ও অভিন্ন শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই অনন্ত শক্তিই জ্ঞানশক্তিরূপে প্রেরণা কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। আমাদের এই বিচরণক্ষেত্র ও আবাস ভূমি অবণীমণ্ডল—এই অনন্তশক্তি কর্তৃকই শূন্যে ধৃত রহিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণই বল, বা সঙ্কর্ষণাগ্নিই বল, ইহাঁরই নামান্তর মাত্র। এই শক্তি কর্তৃকই পৃথিবীর উর্ব্বরাশক্তি উৎপন্ন হয়, ইহাঁরই কর্তৃক সাগ্নিতোয়াব্ধিকানন কম্পিত হইয়া থাকে। পৌরাণিকগণ এই শক্তিরই বিজৃম্ভণকে ভূমিকম্পের কারণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করেন। *

এই শক্তি প্রধানঃ তিনভাগে বিভক্ত

* "যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিত-লোচনঃ।"
"তদা চলতি ভূরেষা সাগ্নিতোয়াব্ধি-কাননা ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ)

হইলেও, গুণভেদে বহুমূর্ত্তিমতী। ইনি "পাতালানাগধঃ সাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ।" পাতালে বিষ্ণুর তামসী মূর্ত্তি — গোলকে রাসমণ্ডলের রাসময়ী শ্রীরাধিকা। ইনি কখন নির্ম্মল কখন সমল, কখন ব্যক্ত—কখন অব্যক্ত, কখন কারণ—কখন কর্ম্ম, কখন জগৎকারণ-রূপিণী শক্তি—কখন এই পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগৎ।

আর্য্যঋষিগণ—ইঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমা দেখিয়া "মায়া" আখ্যা প্রদান করেন। পরন্তু তাঁহার, অঘটন-ঘটনপটীয়সী অপার মায়ার প্রভাবে, জীব সতত সংসার-অনুকূল অনাদি কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া, তত্ত্বজ্ঞান বা বিদ্যার অভাবে মোক্ষলাভে অসমর্থ, তজ্জন্য ইনি "অজ্ঞান" বা "অবিদ্যা" নামে উক্ত হন। ইনি প্রথম কৃতি বা কর্ম্ম, এই জন্য ইঁহার নাম "প্রকৃতি"। প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি বিধায়, সৃষ্টি বিষয়ে অপর কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ থাকিতে পারে না, তজ্জন্য ইঁহার নাম "অপূর্ব্ব"। আবার প্রলয় কালে প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ তৈজস পদার্থস্বরূপ অনাদি সূক্ষ্মেন্দ্রিয় জীবের শুভাশুভ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বিধায়, প্রকৃতি "সংস্কার" বা "অদৃষ্ট" এবং সৃষ্টিকালে তৎসংস্কার কর্ম্মে পরিণত হওয়ায় "স্বভাব" বা "ধর্ম্মাধর্ম্ম" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

আমার বৈষ্ণবী দীক্ষা

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাংপতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধন-তৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণে-ধুনা মুঞ্চ মাম্॥

অর্থাৎ রত্নলাভের আশায় ভূমিতল কত কত খনন করিয়াছি, কত গিরিজাত ধাতু-রাশিকে অগ্নিতে গালিত করিয়াছি, কত সাগর পার হইয়াছি, যত্ন দ্বারা কত নৃপতি-গণের সন্তোষ-সাধন করিয়াছি, (ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভের ইচ্ছায়) মন্ত্রারাধন-তৎপর হইয়া কত শত যামিনী শ্মশানে কাটাইয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটি কাণা কড়িও পাই নাই; অতএব হে তৃষ্ণে! তুমি এখন আমাকে ত্যাগ কর।

কবির এই উক্তি আমার প্রতি ঠিক খাটে,—অথবা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন খাটিত। গৃহ হইতে "ভৈরবানন্দ ব্রহ্মচারী" নাম লইয়া নির্গত হইয়া, কত কত রাত্রি শ্মশানে কাটাইয়াছি, কত দিন বা বর্ব্বুর বৃক্ষতলে ধনলোভে ভূত প্রেতের উপাসনা করিয়াছি; স্বর্ণ, রৌপ্য প্রস্তুত করিবার জন্য, কত শত ব্যর্থচেষ্টা করিয়াছি; আবার বলিতে কি, কত কত ছাগ-প্রকৃতির লোককে নানা কৌশলে ভেল্কি দেখাইয়া, 'সিদ্ধ' বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছি।

শেষে মনে হইত "ত্বৎকৃতেঽধুনা মুঞ্চ মাম্।" শান্তির জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। এই সময়ে আমি দেশভ্রমণে নির্গত হই। বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, দক্ষিণাপথে এলোরা-গুহা দর্শনকালে এক বৈষ্ণব পরমহংসের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করি। শুনিলাম, তিনি কৃষ্ণানদীর তীরে এক উদ্যানে থাকেন। তাঁহার হস্ত সদা মুষ্টিবদ্ধ, কখন কথা বলেন, কখনও বা বলেন না; কি সম্প্রদায় তাঁহার ঠিক নাই, কিন্তু লোকে তাঁহাকে "বৈষ্ণো বাবা" বলে। গ্রাম্য লোকেরা তাঁহার সমীপে নানাবিধ ভোজ্য নিত্য উপহার দেয় বলিয়া, এক দল হিন্দুস্থানী বৈরাগী তাঁহার নিকট বাস করে।

আমি সেইস্থানের সন্নিকটে উপনীত হইলে, তথাকার এক বৈরাগী বা বৈষ্ণব-সাধু আমাকে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও?" আমি প্রয়োজন বলিলাম। সে আরও রুক্ষস্বরে বলিল "পাষণ্ডিরা এখানে থাকিতে পায় না, অতএব তুমি সোজা রাস্তা দেখ।"

ইহাতে আমি চিম্‌টা হস্তে ভৈরব-ভাব ধারণ করিলে, সে "রঘুবীর বজরঙ্গ" (বৈরাগিদের যুদ্ধরব) বলিয়া হাঁক দিল। তাহা শুনিয়া, আরও দুই তিন জন দৌড়াইয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল। ঠিক সেই সময়, আমার পশ্চাৎস্থ নদীর আড়ালি হইতে, আর একজন সাধু আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, আমার প্রতিপক্ষগণ অপ্রস্তুত হইয়া গেল। আমিও তাঁহাকে 'বৈষ্ণো বাবা' জানিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলাম, "ভগবন্, আপনাকে দর্শন করিতেই আমি আসিয়াছি কিন্তু চন্দন-বৃক্ষ কালসর্পে বেষ্টিত থাকে, তজ্জন্য আমাকে কিছু অপরাধ করিতে হইয়াছে, কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন।"

তিনি আমাকে কিছু না বলিয়া, তথায় উপবেশন করিয়া, সকলকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। পরে তিনি গম্ভীর অথচ সুমধুর স্বরে বলিলেন "তোমরা কেন সম্প্রদায় লইয়া বিবাদ কর? আচ্ছা, বল দেখি হনুমান্ দাস (ইনিই আমাকে প্রথমে রুকিয়া ছিলেন) আমি কি সম্প্রদায়?" হনুমান্ দাস ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনি নিমাৎ।" তিনি বলিলেন "না"। পরে আমাকে বলিলেন "তুমি বল।" আমি বলিলাম আপনি 'রামাৎ' হইবেন।" কারণ—ভাবিলাম যে, রামাৎরা অপেক্ষাকৃত উদার হন।

তিনি হাসিয়া বলিলেন "না, আমি রামাৎ বা নিমাৎ নহি, অথবা, মৎস্য, বরাহ আদি অবতার—এবং তুকারাম (বাঙ্গালার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মত দক্ষিণের এক ভক্ত অবতার) প্রভৃতি ভক্তাবতার, অথবা, বিদেশীয় ঈশা প্রভৃতি কোন অবতারের সম্প্রদায় ভুক্ত নহি। আমি 'বৈষ্ণব।' যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। দেখ মিত্রগণ। এই ধরিত্রীতে সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্ত বিষ্ণুর (স্বদেশী বিদেশী) কতকগুলি অবতার প্রখ্যাত আছেন। ঐ যে আকাশ দেখিতেছ, (এই বলিয়া তিনি সুনির্ম্মল সান্ধ্যগগনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ

করিলেন,) উহাতে এই ধরার মত অসংখ্য লোক বর্ত্তমান আছে। তাহাতেও বিষ্ণুর অসংখ্য অবতার আছে। আবার এই সৃষ্টির পূর্ব্বে আরও অসংখ্যবার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতেও অসংখ্য 'বিষ্ণুর অবতার' হইয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত অবতার সর্ব্বব্যাপী নহেন। রামত্ব কৃষ্ণত্বে ব্যাপ্ত নহে, আবার কৃষ্ণের ভাব বুদ্ধভাবে ব্যাপ্ত নহে; সেই রূপ কেহই কাহাতে ব্যাপ্ত নহে। আর যাহাদের বিষ্ণু কেবল আকার-গত এবং যাহাদের বিষ্ণু কেবল নিরাকারগত, তাহাদের বিষ্ণুও সর্ব্বগত নহেন। অতএব যিনি সাকার নিরাকার সমস্ত ভাবগত—সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্ত মহাপুরুষই (পুরুষোত্তমই) বিষ্ণু। অতএব হে মিত্রগণ! তাদৃশ বিষ্ণুর উপাসক 'বৈষ্ণব' হও। যেমন লোকে ধনবৃদ্ধি হইতে থাকিলে, স্বীয় মৃণ্ময় গৃহদেবতাকে ক্রমশঃ দারুময় ও পাষাণময় করে; তোমরাও সেইরূপ জ্ঞানধনে ধনী হইয়া স্বীয় ইষ্টদেবকে প্রকৃত বিষ্ণুর আদর্শ কর।"

"মিত্রগণ! সেই মহাবিষ্ণুকে যদি 'পরমপ্রেমের' দ্বারা সাধন কর, তবেই উপাসনায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। পিতা, মাতা, দারা, সুত, প্রভু, সখা প্রভৃতির প্রতি যে প্রেম হয়, তদ্দ্বারা 'পরমপ্রেমের' অক্ষর-পরিচয় মাত্র। কারণ পিতা মাতা প্রভৃতি বাহ্য দ্রব্যে কখন নিরতিশয় প্রেম হইতে পারে না। পিতা যতই প্রিয় হউন না, তিনি যদি তোমাকে দীর্ঘকাল নিরন্তর দুঃখ দেন, তবে প্রেম ভগ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু 'আত্মার' প্রতি তোমাদের যে প্রেম, তাহা নিরতিশয়। দেখ, আত্মার জন্যই তোমাদের পিতা মাতা প্রভৃতি প্রিয় হয়। লোকে আত্মার সুখশান্তির জন্যই পরোপকারাদি ধর্ম্মাচরণ করে; এমন কি কখন কখন স্বীয় শরীরের ও ধ্বংসবিধান করে। অতএব আত্মবৎ প্রিয় বা প্রেমাস্পদ আর কিছুই নাই। যে অবস্থায় বা যে যোনিতেই থাক না কেন, সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই আত্মা সমান প্রিয়। আত্মপ্রেমের বিরহ নাই, সুতরাং আত্মাই প্রেমময়।"

"হে সাধুগণ! যদি সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুতে তাদৃশ আত্মবৎ প্রেম কর, তবে পরম-প্রেম-ভাবে উপাসনা হইবে।" এই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবগদ্গদস্বরে এই গীত গাইলেন। উহা হিন্দীতেই দিলাম—

'নাথ! ম্যায় শরণাগত তেরি,
তন্ মন ধন প্রাণ তুমারি।
রূপ অনন্ত অনন্ত নাম তুম্হারি,
বিষ্ণো ম্যায় শরণাগত তেরি।
তুম্ হো বাহার তুম আত্মা মেরি,
নাথ ম্যায় শরণাগত তেরি।'

পরে আবার বলিলেন—"যদি সেই পরম প্রেম সাধিতে চাও, তবে সেই পরমাত্মাকে স্বীয় অন্তরাত্মায় নিরীক্ষণ করিয়া, আত্মবৎ প্রেম কর। অথবা সেই সর্ব্বব্যাপী দেবতায় নিজের আত্মাকে বিসর্জ্জন করিতে শিখ।

"এই নদীজল যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত নৌকারই সমান আশ্রয়, তেমনি সেই মহাবিষ্ণুও সকলের পক্ষে সমান। তিনি যেমন তোমার, ঠিক তেমনি অপর সকলের; ইহা জানিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব ত্যাগ কর।"

অতঃপর তিনি আর কিছু বলিলেন না। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয় স্নিগ্ধ হইতেছিল। পরে সেই গীত শুনিয়া হৃদয় একবারে উদ্বেল হইল ও শরীর মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া বহুক্ষণ তথায় পড়িয়া রহিলাম। পূর্ব্বে শত শত বীজ ও মন্ত্র আমি জপ করিয়াছি, কিন্তু কখনও মন্ত্রচৈতন্য হয় নাই। তাঁহার সেই গীতরূপ মহামন্ত্র সচেতন হইয়া, একেবারেই আমার হৃদয় অধিকার করিল। সেই দিনই আমার "বৈষ্ণবী দীক্ষা" হইয়াছে। তদবধি আমি হইয়াছি— "ভৈরবানন্দ বৈষ্ণব।" ইতি

শ্রী———

শান্তি-সম্ভব।

(পারমার্থিক রূপক)

———

নিত্যকাল হইতে সম্রাট্ পুরুষদেব স্বপুরে অধিরাজমান আছেন। সেই পুরী অনন্ত স্বয়ংপ্রকাশ বোধজ্যোতিতে পরিপূরিত। তদ্বিষয়ে এইরূপ শ্রবণ করা যায় যে "তথায় সূর্য্য-চন্দ্র বা তারকা প্রকাশ পায় না, তথায় বিদ্যুৎও প্রভাহীন, অতএব অগ্নির আর কথা কি? তথাকার প্রকাশ আশ্রয় করিয়া বিশ্ব প্রকাশমান হয়।"* অনাত্ম-প্রদেশে বুদ্ধি নামে যে প্রোত্তুঙ্গ অধিত্যকা আছে, পুরুষদেবের পুরী তাহার ও উপরিস্থিত।

বুদ্ধি অধিত্যকার নিম্নে, অহঙ্কার-ক্ষেত্রে অনাদিকাল হইতে চিত্তনগরী স্থাপিত আছে। উহা কালনদীর তীরে স্থিত। কালনদী নিয়ত অনাগতের দিক্ হইতে অতীতের দিকে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

চিত্তনগরে অভিমান-কুল-সম্ভূতা ইচ্ছা—দেবী অধীশ্বরী। ইচ্ছাদেবী চিরনবীনা। যদিও উচ্চকুলজ 'বিচার' নামে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচারের কিছুই ক্ষমতা নাই। কারণ 'অবিদ্যা' নাম্নী এক নিশাচরী—আত্মজ 'প্রমাদ'কে এরূপ মোহন সাজে সাজাইয়া চিত্ত নগরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, যে, প্রায় সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া গিয়াছে। সে মন্ত্রীবর বিচারকে মোহময়ী প্রমোদ-মদিরা পান করাইয়া, এরূপ মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে—যে, বিচার তাহার সমস্ত কুকার্য্যেই অধুনা সায় দেন। আর স্বভাবতঃ চঞ্চলা ইচ্ছাদেবী প্রমাদের কুমন্ত্রণায় এরূপ উচ্ছৃঙ্খলা হইয়াছেন যে, চিত্তরাজ্যে মহা বিপ্লবের আশঙ্কা অধুনা প্রকটিত হইতেছে। প্রমাদের মন্ত্রনায় ইচ্ছা নিয়তই স্বীয় 'ইন্দ্রিয়' নামে দুর্দ্দান্ত অনুচরগণের দ্বারা 'বিষয়'প্রজাগণকে বড়ই নিষ্পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম্মতঃ প্রজাদের নিকট 'সুখ' নামে যে কর প্রাপ্য, ইচ্ছার তাহাতে আর মন উঠে না, খরচও কুলায় না। কারণ প্রমাদ তাঁহার অনেক সুখ-রাজস্ব হরণ করিয়া, স্বীয় অনুচর 'কাম, ক্রোধ ও লোভকে দেয়। তাহারা মাৎসর্য্যশৌণ্ডিকের নিকট হইতে মদ ক্রয়েই সমস্ত উড়াইয়া দেয়। শেষে এমনি হইয়া উঠিল যে, বিষয়-প্রজারা আর সুখরাজস্ব যোগাইতে অক্ষম

* নতত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

হইল। কিন্তু তথাপি ইন্দ্রিয়গণ উৎপীড়ন করিতে থাকাতে, তাহারা দুঃখ-শর মারিয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে জর্জরিত করিতে লাগিল। ইচ্ছা রাজ্ঞীকে "প্রবৃত্তিরাক্ষসী" নামে গালি দিতে লাগিল। বস্তুতই ইচ্ছা প্রমাদ-রাক্ষসের সাহচর্য্যে রাক্ষসীবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুতেই আর তাহার ক্ষুধা-শান্তি হয় না। এতদিন হয়ত ইচ্ছাদেবী প্রমাদ-রাক্ষসকে আত্ম-সমর্পণ করিত, কেবল স্বীয় উচ্চপৌরুষের অভিমান—ও কুলের অনুরোধে তাহা পারে নাই।

যাহা হউক, পরিশেষে এরূপ সময় আসিল, যে, ইন্দ্রিয়—অনুচরগণ আর ইচ্ছাদেবীর কথা শুনে না। তাহারা অশক্ত হইয়া, আর বিষয়দের মধ্যে সুখ-আহরণে যাইতে চাহে না। সুতরাং ইচ্ছাকে প্রতিকারাসমর্থা ও মনুতে ক্লিশ্যমানা হইয়া কাল যাপন করিতে হইল। সে সদাই "অনীশা" নামে অন্ধকারগৃহে শোকে মুহ্যমানা হইয়া থাকিত।* বাহ্য-বিষয়গণ বাহ্যদুঃখ ও আন্তর-বিষয়গণ আধ্যাত্মিক-দুঃখরূপ শর নিয়ত চিত্তনগরে বর্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে প্রমাদেরও বিষয়-সুখরূপ ধনাগম বন্ধ হওয়ায়, প্রতিপত্তি কমিয়া গেল। সে অনেক চেষ্টায় কাম ও লোভের দ্বারা মুগ্ধ, এবং ক্রোধের দ্বারা উগ্রমদিরা প্রেরণ পূর্ব্বক, অশক্ত ইন্দ্রিয়গণকে মত্ত করিয়া বিষয়-মধ্যে প্রেরণ করিল; কিন্তু শক্তিহীন প্রমত্ত যোদ্ধারা প্রবল শত্রুর সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারে? ইন্দ্রিয়গণ দুঃখশরে জর্জরীভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে ২ ফিরিয়া আসিল।

সেই আর্ত্তনাদে বিচারের মোহভঙ্গ হইল। বিশেষতঃ প্রমাদও আর সুখাভাবে অধুনা বিচারমন্ত্রীকে প্রমোদমদিরা যোগাইতে পারে না। বিচার প্রবুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাদেবীকে প্রমাদের সম্বন্ধে যথার্থ কথা বলিলেন। তাহাতে ইচ্ছা ক্রুদ্ধা হইয়া, প্রমাদকে অতিশয় ভৎর্সনা করিলেন, বলিলেন—"রে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস? তোর জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা; তুই আমার রাজ্য হইতে দূর হ"। এইরূপে চারিদিক্ হইতে ক্লিষ্ট হওয়াতে, প্রমাদের রাক্ষসরূপ বাহির হইয়া পড়িল। মায়া-নিপুণা অবিদ্যা-নিশাচরী—যথাবস্তুকে অন্যথা করা যাহার প্রধান ব্যবসায়, সেও আর প্রমাদের রাক্ষসরূপ ঢাকিতে সম্যক্ সক্ষম হইল না। প্রমাদের রাক্ষসরূপ দেখিয়া, ইচ্ছাদেবী আরও বিরক্ত হইলেন। প্রমাদের অভ্যুত্থান দেখিয়া, বিচারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'তত্ত্ববিচার' স্বীয় ভার্য্যা—বিদ্যা, পুত্র—বিবেক ও অনুচর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহ অতি সংগোপনে বাস করিতেছিলেন। চিত্ত-রাজ্যের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে, তত্ত্ববিচার আসিয়া, স্বীয় অনুজ বিচার-মন্ত্রীকে অনেক তত্ত্বকথা শুনাইলেন। পরে প্রস্তাব করিলেন যে, "ইচ্ছাদেবী চঞ্চলা হইলেও স্বভাবতঃ দুঃশীলা নহেন। সন্মার্গে চালাইলে তিনি সহজেই যাইতে পারেন। আমার পুত্র বিবেক* অতি স্থিরবুদ্ধি; তাহার সহিত যদি ইচ্ছাদেবীকে পরিণীতা করিতে পার, তবেই চিত্তরাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে। বিশেষতঃ•

---

* "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"

আমি আমাদের হিতৈষী পুরোহিত অভ্যাসের নিকট হইতে জানিয়াছি, যে, আমাদের কুলে 'শান্তি' নাম্নী কন্যা উদ্ভূতা হইবে। তাহারই রাজ্যকালে অবিদ্যা নিশাচরী সমাক্রূবে নিহত হইবে। অতএব তুমি ইচ্ছাদেবীকে সম্মতা কর"। বিচার অনীশাগৃহে শোক-কাতরা ইচ্ছার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বহুপ্রকারে প্রবোধ দিয়া, ঐ প্রস্তাবে সম্মতা করিলেন। এই সংবাদে চিত্তরাজ্যের বিপ্লব অনেক শান্ত হইল। তবে মধ্যে ২ প্রমাদের অনুচরেরা অলক্ষিতে আসিয়া উপদ্রব করিত। আর বিবেকদেব ইচ্ছাদেবীর আচরণের জন্য, যে সব নিয়ম সুস্থির করিয়া দিয়াছেন, ইচ্ছা তাহার আচরণ না করাতে, মধ্যে ২ মহাগোল উপস্থিত হইলে, ছদ্মবেশে আসিয়া, বিবেকের কুল ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে নানা নিন্দা করিয়া, বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। কখনও বলিত যে— "বিবেক "শূদ্র"কুলে উৎপন্ন, তোমাকে অভাববেশে লইয়া কষ্ট দিবে।" কখনও বলিত, "তুমি স্বাধীনতা হারাইয়া কিরূপে জড়বৎ থাকিবে?"

ইহাতে বিচার ইচ্ছাদেবীকে প্রবোধ দিয়া সুস্থির করিয়া, যোগ-দুর্গে লইয়া রাখিলেন। তথায় প্রমাদের সহজে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য ছিল না। কারণ, তথায় প্রতিহারিরূপে স্মৃতি সদাই জাগরিতা বা সাবধানা থাকিয়া ইচ্ছাদেবীকে রক্ষা করিত। পাছে নিশাচরী অবিদ্যা সানুচরে আসিয়া যোগদুর্গ আক্রমণ করে, তজ্জন্য বীর্য্য ও বৈরাগ্য সশস্ত্রভাবে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। বীর্য্য—জ্ঞানাসি হস্তে প্রমাদকে তাড়া করিতেন; আর বৈরাগ্য—সংস্কার নামে যে আবর্জ্জনা-লোষ্ট্র ছিল, তাহা শত্রুর অভিমুখে ত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রাণায়াম—তথা হইতে হুঙ্কার করিয়া, প্রমাদকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। রাজপুরুষ ইন্দ্রিয়গণের নেতৃত্ব প্রত্যাহারের উপর অর্পিত হইল। তাহারা পূর্ব্বকার অবাধ্যতা ত্যাগ করিয়া, প্রত্যাহারের সম্যক্ বশীভূত হইল।১ *

শ্রদ্ধা জননীর ন্যায় কল্যাণী হইয়া, যোগদুর্গের সকলকে আহার-দানে সঞ্জীবিত রাখিলেন। সমুদ্রমন্থনকালে মোহিনী যেরূপ ত্রিদিবৌকস-গণকে সুধাদানে সুতৃপ্ত করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধা ও সেইরূপ সত্যামৃত দিয়া সকলকে সুতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।২ *

স্বাধ্যায় প্রণবভেরী বাজাইয়া সকলকে সজাগ করিয়া দিতে থাকিলেন। অতএব যোগদুর্গস্থ সুশীলা ইচ্ছাদেবী বিষয়-প্রজাদের আর অপ্রিয়া রহিলেন না। তাহারা রাজ্ঞীর ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য সংযমসুখ কর প্রদান করিতে, এবং ভক্তিসহকারে তাঁহাকে "নিবৃত্তিদেবী" নাম দিয়া পূজা করিতে লাগিল। আমরাও অতঃপর সময়েং ঐ নামেই তাঁহাকে ডাকিব।

ইহাতেও প্রমাদ-নিশাচর ক্ষান্ত ছিল না। সে ইচ্ছাদেবীকে যোগদুর্গ হইতে বাহিরে আনিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। সে সাধুবেশে ইচ্ছাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া,

---

* ১। ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ যোগসূত্র

* ২। প্রৎসত্যং তস্মিন্ ধীর ভইত শ্রদ্ধা। যাক, নিরুক্ত।

"স্মর" নামে মোহকর বাষ্পের দ্বারা, তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া বলিল "দেবি, আপনি ধন্য-ভাগ্যা? যেহেতু আপনি অচিরাৎ বিবেক-দেবের সহিত পরিণীতা হইবেন। আপনার এই যোগদুর্গের মত সুরক্ষিত দুর্গ বিশ্বে আর কোথায়? এখানকার যিনি অধীশ্বরী, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমতী; আর আপনার শ্বশুর তত্ত্ববিচার অপেক্ষা জ্ঞানী আর কে আছে? * অন্যান্য চিত্তনগরের অধীশ্বরী আপনার যে সব মিত্ররাণী আছেন, তাঁহাদের নিকট আপনার এই মহিমা প্রচার হওয়া উচিত। তাহাতে আপনার কিছু লাভ না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের মহান্ উপকার হইবে; অতএব আপনি যদি তাঁহাদের দেখা দিয়া, সব বুঝাইয়া, তাহাদের শ্রেয়োমার্গ প্রদর্শন করেন, তাহাহইলে বড়ই উত্তম হয়।"

ছদ্মবেশী প্রমাদের কুমন্ত্রণায়, ইচ্ছাদেবী স্মরে স্ফীত হইয়া, যোগদুর্গ হইতে বহির্গত হইতে উদ্যতা হইলেন। কাহারও কথা শুনিলেন না। শেষে তত্ত্ববিচার আসিয়া এইরূপে প্রবোধ দিলেন—"বৎসে নিবৃত্তিদেবি! কেন তুমি যোগদুর্গ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতেছ? এখনও তুমি বিবেকের সহিত পরিণীতা হও নাই। এখন যদি তুমি বাহিরে যাও, তবে পুনশ্চ প্রমাদ-নিশাচরের কবলে পতিতা হইবে। সে-ই সাধুবেশে আসিয়া তোমাকে এই কুমন্ত্রণা দিয়াছে। দেখ, ঐ কালনদীতে যে মৃত্যুনামে ক্ষুদ্র ও প্রলয় নামে বৃহৎ বন্যা আসে, তাহাতে নিমগ্ন হইয়া, এবং প্রমাদের সাহচর্য্যে, কতই দুঃখ পাইয়াছ;—এখন যদি বাহিরে প্রচার করিতে যাও, তাহা হইলে কেবল "সম্প্রদায়" নামে ক্ষুদ্র২ রণক্ষেত্র সৃজন করিয়া আসিবে। আর বিবেকের সহিত পরিণীতা হইয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া, যদি নির্ম্মাণ-চিত্তনির্ম্মিত উত্তুঙ্গ প্রজ্ঞামঞ্চে আরোহণপূর্ব্বক পরমার্থ-গীতি প্রচার কর, তবেই যথার্থ ভক্তির সহিত শ্রুত ও স্তুত হইবে।"

ইহাতে ইচ্ছাদেবীর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি আর বাহির হইলেন না। পরে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। সেইদিনের নাম 'সাধন'। তাহা অতি কষ্টবাপ্য গ্রীষ্মের দিন। বিবাহের দিনে উপোষিত থাকিতে হয়;—কিন্তু চঞ্চলা ইচ্ছা—ততবড় দীর্ঘ দিন উপবাস করিতে, বড়ই গোল উঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে পুরোহিত অভ্যাস—কিছু জ্ঞানগঙ্গার জল, ভক্তি-দুগ্ধ ও সন্তোষ-ফল তাঁহাকে খাইতে দিলেন। নিবৃত্তিদেবী তাহাতেই বেশ স্ফূর্ত্তিমতী হইয়া রহিলেন।

পরে সাধন-দিবসের অবসানে যখন "জ্ঞানদীপ্তি" * নামক চন্দ্রিকায় উৎফুল্লা নির্ম্মলা শান্তিময়ী ত্রিযামা আসিল, তখন বিবেকদেব "তীব্রসম্বেগ" নামে ঘোটকে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। 'অনাহত' শঙ্খধ্বনি করিলেন, ও পরে নানারূপে গম্ভীরতালে বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। পুরোহিত অভ্যাস তখন বিবেকদেবের সহিত ইচ্ছাদেবীর মিলন ঘটাইয়া দিলেন।

* "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগ-সমং বলং॥"

* যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ বিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ॥ যোগসূত্রম্।

ইহার পর, ইচ্ছা বা নিবৃত্তিদেবী স্থিরবুদ্ধি সুস্মদর্শী, বিবেকের সম্যক্ অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে লাগিলেন, ও স্বীয় চাঞ্চল্য ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বিবেক যাহা স্থির করিতেন, ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের শান্তিনাম্নী কন্যা জন্মিল! তাহার সুমধুর মুখ দেখিয়া, নিবৃত্তির সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়া গেল। নিত্য ও পরমসুখের উৎস—নিবৃত্তিদেবী ক্রোড়স্থ শান্তির মুখেই দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার সুখ পরাধীন ছিল, কিন্তু এখন করতলগত হইল। নিবৃত্তিদেবী যখনই শান্তির মুখ দেখেন, তখনই একবারে আত্মহারা ও কৃতকৃতা হইয়া যান, এবং তাঁহার জীবনতন্ত্রী যেন বিশ্লথ হইয়া যায়।

শান্তির উদ্ভবে অবিদ্যাকুল একবারে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল, এবং শেষচেষ্টাস্বরূপ 'লয়', 'অনবস্থিতত্ব' প্রভৃতি প্রধান প্রধান অন্তরায়কে শৈশবেই শান্তির প্রাণ-নাশের চেষ্টায় পাঠাইতে লাগিল। তত্ত্ব-বিচার উহা জ্ঞাত হইয়া, বিবেক ও নিবৃত্তিকে এবং শান্তিকে লইয়া, নিরোধদুর্গে যাইতে বলিলেন, এবং অবিদ্যা-নিশাচরীকে সম্যক্ দমনের উপায়ও বলিয়া দিলেন। নিরোধদুর্গ যোগদুর্গেরই অন্তর্ভূত। উহা বুদ্ধি-অধিত্যকার অগ্র-* ভাগে স্থিত। সম্প্রজ্ঞাত সোপান দিয়া মধুমতী, মধুপ্রতীক প্রভৃতি চত্বর পার হইয়া, তথায় উঠিতে হয়।

অতঃপর নিবৃত্তি প্রাণপ্রতিমা তনয়া শান্তিকে লইয়া, নিরোধ-দুর্গে প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। স্বীয় স্বামীর হস্তে পরবৈরাগ্য নামে ব্রহ্মাস্ত্র তুলিয়া দিয়া বলিলেন "এতদ্দ্বারা সেই শান্তিবিদ্বেষী—নিশাচরী অবিদ্যাকে সবান্ধবে হনন করুন।" অবিদ্যা-নিশাচরী আলোক মোটেই সহ্য করিতে পারে না; তজ্জন্য বিবেকদেব 'বিবেকখ্যাতি' নামে এক অপূর্ব্ব দীপ নির্ম্মাণ করিলেন। উহা পুরুষপুরীর বিমলজ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া, অব্যাহত আলোকে সমস্তই আলোকিত করিতে সমর্থ। বিবেকদেব সেই খ্যাতি-আলোকসহকারে—পরবৈরাগ্য-ব্রহ্মাস্ত্র অবিদ্যা-নিশাচরীর দিকে নিক্ষেপ করাতে, সে সানুচরে "অব্যক্ত কুহরে" লুকাইয়া গেল, আর তাহার বাহিরে আসিবার সামর্থ্য রহিল না।

অতঃপর শান্তি প্রবর্দ্ধিতা (নিরন্তরা) হইলেন। তখন তাঁহাকেই রাজ্যর একাধিপত্য দিয়া, বিবেক ও নিবৃত্তি চিরবিশ্রাম লইবার মানস করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, আমরা স্বীয় শরীরের দ্বারা অবিদ্যা-কুহরের মুখ চিররুদ্ধ করিয়া উপরত হইব। কিন্তু নিবৃত্তির যে মিত্ররাণীদের নিকট স্বীয় প্রাণপ্রতিমা তনয়ার মহামহিমা-প্রচারের বাসনা ছিল, তাহা একবার জাগরূক হওয়াতে, তিনি বিবেকের অনুমতি লইয়া, একবার বিশ্বে "শান্তিগীতি" গাইতে মনস্থ করিলেন। তখন বিবেক একবার খ্যাতি-দীপকে ঈষৎ ঢাকিলেন; কারণ সেই উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদিগকে জগতের কেহই দেখিতে সক্ষম নহেন। খ্যাতি-আলোক ঈষৎ আবৃত হইলে, অবিদ্যা

* দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। শ্রুতিঃ।

অমনি অব্যক্তকুহর হইতে অস্মিতা-মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া উত্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তিদেবী তদুপরি প্রজ্ঞানামে মহা-মঞ্চ স্থাপন করিয়া, তাহার উপর হইতে "উপনিষৎ" নামে শান্তিগীতি গাহিলেন; জগৎ মুগ্ধ হইয়া শুনিল। সেই গীতাবসানে নিবৃত্তিদেবী সম্যক্ কৃতকৃত্যা হইয়া, চির-উপরাম কামনায় সেই মঞ্চ-মধ্যস্থ অবিদ্যার মাথায় পরবৈরাগ্য-ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন। তাহাতে অবিদ্যা পুনশ্চ অব্যক্তকুহরে বিলীন হইল। নিবৃত্তি-দেবী ও বিবেকদেব সেই কুহরের মুখ রুদ্ধ করিয়া, চির উপরাম লাভ করিলেন।

শান্তিদেবী অনাত্মদেশের 'প্রান্তভূমিতে' * অধিরাজমানা থাকিয়া, পুরুষদেবকে 'শাশ্বত শান্তি সুখ' উপঢৌকন দিলেন। তখন দুঃখের উপচার একস্তত ও অত্যন্ততঃ নিরসিত হইয়া—শাশ্বত পরমেষ্ট শান্তি-সুখই পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হইতে লাগিল। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

[ফলিতার্থ :—শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ সংসার হেয়, শান্তি উপাদেয়,—এরূপ নিশ্চয়-মাত্রের দ্বারাই পরমার্থ সিদ্ধি হয় না, পরন্তু অভ্যাসের দ্বারা বিমার্গগামী সংকল্প যখন তাদৃশ নিশ্চয়জ্ঞানের একান্ত অনুগত হয়, অর্থাৎ যোগপুষ্ট ইচ্ছাশক্তির দ্বারা যখন মহজত হৃদয়ের কুবাসনা দূর করিবার সামর্থ্য হয়, তখনই পরমার্থ সিদ্ধি হয়।]

শ্রীহরিহরানন্দ স্বামী
কাপিলাশ্রম।

* তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা। যোগ

সুখ-সম্বাদ।

দাতার দান, জ্ঞানীর জ্ঞান, কর্ম্মীর কর্ম্ম, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, ধীরের ধৈর্য্য, চোরের চৌর্য্য—যাহারই না কেন মূলানুসন্ধান করুন, দেখিবেন, মর্ম্মের মাঝে—প্রবৃত্তির অন্তস্তলে সুখাশার লুক্কায়িত মূর্ত্তি বিরাজমান।

দাতা নিঃস্বার্থপরোপকারী—পরহিত-প্রাণ, পরের জন্য স্বীয় স্বার্থ বলিদান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বলিতে পারেন কি, তাঁহার কার্য্যে সুখাশার সম্পর্ক নাই? অবশ্যই আছে। সকলের সুখ একপ্রকার নহে। সকলে সমান ভাবে সুখদুঃখের সংবাদ লয় না, সকলের সুখদুঃখজ্ঞান ও স্বতন্ত্র। সুখ এরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট সামগ্রী নহে, যাহা সকলের পক্ষেই সমান। সুখের বাহ্যোপকরণ, আন্তরস্বরূপ, প্রার্থনীয় পরিণাম—সর্ব্বত্র সমান নহে; পরন্তু সুখানুভব-কর্ত্তার দশাও সকল স্থানে অসমভাবাপন্ন। জগতের উচ্চাবচভাব, বিভিন্নতা, পারস্পরিক পার্থক্য—গুণত্রয়ের বিচিত্র বিপরিণাম নিবন্ধনই হইয়া থাকে;—সুতরাং এই বৈষম্যের সংসারে, সাম্যের আত্মীয় সমানুভূতি কেবল কল্পনারই কথা, কাজের কথা নহে। যখন সকলের সুখ সমান হওয়া সম্ভব নয়, তখন কেমন করিয়া বলিব, যাহা একের সুখের বিরোধী, তাহা অপরের সুখসাধক হইতে পারে না!

দাতার দানেই সুখ। স্বত্ববিসর্জ্জন অদাতার নিকট মনঃপীড়াকর হইলেও দাতা

তাহাতে প্রীত হন। দান না করিলে, প্রকৃতদাতার চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয়। তিনি অসুখী হন। সেই অসুখ সেই অতৃপ্তি দূর করিয়া, আত্মপ্রসাদ আত্মতৃপ্তি বা সুখ লাভ করিতে হইলেই, তাঁহার দান করা দরকার; কাজেই দাতা নিঃস্বার্থ পরোপকারী বলিয়া কথিত হইলেও, আত্মপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী আত্ম-সুখাশী নহেন—ইহা বলা যায় না।

কর্ম্মী কর্ম্ম করেন, কর্ম্মসমূহ ত্যাগ-গ্রহণাত্মক। কর্ম্মজগতের কোনও অংশ—ত্যাগ বা গ্রহণ ব্যতীত আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না। মানবীয় কর্ম্ম বিশ্লেষণ করিলে দৃষ্ট হইবে, হয় ঈপ্সিত-গ্রহণ, নয় অনীপ্সিত-ত্যাগার্থেই সমস্ত কর্ম্ম। শারীর কর্ম্ম এবং মানস কর্ম্ম—উভয়েরই ত্যাগগ্রহণাত্মতা স্বতঃসিদ্ধ। যাহা স্বপ্রকৃতির অনুকূল অর্থাৎ সম্বেদী, সে তাহারই সংগ্রহণার্থে সতত সচেষ্ট, আর যাহা স্বপ্রকৃতির প্রতিকূল—বিসম্বাদী, তাহা সে প্রতিমুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। এই ত্যাগগ্রহণাত্মিকা প্রবৃত্তিশক্তির যাহা বহিস্ফুরণ—তাহাই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরি-হারাত্মক কর্ম্মের স্বরূপ। শক্তির বহি-স্ফুরণই কর্ম্মের স্বরূপ—অর্থাৎ শক্তির স্থানপরিবৃত্তি বা রূপান্তরপরিণামক্রমই যে কর্ম্ম, তাহা সর্ব্বশিষ্টজন-সম্মত। পাশ্চাত্য প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলম্যন্ বলেন work is any Process of transference or transformation of energy" যে সম্বেদন আত্মার প্রতি-কূল, তাহা কেহই গ্রহণ করে না, যাহা অনুকূল তাহাই স্বীকার করে। এখন আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, দুঃখ-দূরীকরণার্থে এবং সুখপ্রাপ্ত্যাশায়ই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। যাহা প্রতিকূল-বেদনীয় তাহাই দুঃখ, এবং যাহা অনুকূলবেদনীয় তাহাই সুখ, ইহাই শ্রীভগবান্ ব্যাসমুনি পাতঞ্জলভাষ্যে বলিয়াছেন। দুঃখ পরিহার যে অনুকূল-সম্বেদন, এবং তাহা যে গ্রাহ্য—ত্যাজ্য নহে, ইহা বলা বাহুল্য, সুতরাং তাহাকেও 'সুখ' বলা যাইতে পারে। এখন বলিতে পারি, সমস্ত কর্ম্মই সুখাশায় কৃত হয়। ছান্দোগোপনিষৎ বলেন 'যদা বৈ সুখং লভতে অথ করোতি, নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি" সুখের জন্যই লোকে কর্ম্ম করে, যে কর্ম্ম সুখার্থ নয়, তাহার সাধনেও কেহ ব্যগ্র নয়। সুখার্থই লোকের প্রবৃত্তি—একথা অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতায়ও দেখিতে পাই। যথা—সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ইতি।

ধার্ম্মিকের কঠোর তপশ্চর্য্যা, কত তীব্র সংযম, অসাধারণ ত্যাগস্বীকার, উপাবাসাদি শরীরশোষক দুঃখজনক অনুষ্ঠান, ধনব্যয়, এমন কি স্থানে স্থানে আত্মবিনাশ-পর্য্যন্ত—এ সমস্তই কদাচিৎ ঐহিক, কখনও পার-লৌকিক সুখাশায়। বিপুল সুখপ্রত্যাশায় আপাততঃ অসংখ্য দুঃখকে বক্ষে ধারণ করিতেও ধার্ম্মিক কুণ্ঠিত নহেন। বলাবাহুল্য ধর্ম্মও কর্ম্মবিশেষ, সুতরাং সুখাশা ধর্ম্মের প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।

অধীরতা সহস্র দুঃখ প্রসব করিতে সক্ষম। সুতরাং-ই ধীরের ধৈর্য্যে সুখাশার বীজ নিহিত আছে।

জ্ঞানীর জ্ঞানের প্রাণে সুখাশা রাজত্ব করে, তাঁহার ব্যতিরেকি-কারণ অজ্ঞান অসুখ—ভীষণদুঃখ—প্রগাঢ় অন্ধকার। তস্করের শতবিপৎ-সঙ্কুল চৌর্য্যে—প্রাণসঙ্কট কুকার্য্যে প্রবৃত্তিও সুখাশায়। চোর চৌর্য্যকে ভাল বাসে না। যেখানে চৌর্য্যে সুখাশার উজ্জলমূর্ত্তি দর্শন করে, সেখানে সে চৌর্য্যকে স্নেহ করে। নিজ-গৃহে অপর তস্করের চৌর্য্যসাধন—কোনও চোরই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে না, কারণ তাহাতে সুখাশার সম্পর্ক নাই। বরঞ্চ অত্যন্ত অনিষ্টপাতের নিশ্চয়তাই আছে। জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, কর্ম্মস্রোতের বক্ষে সুখাশার তরণী নয়নগোচর হইবে।

সমগ্রজগৎ সুখাশার ছুটাছুটী করিতেছে! সুখের চঞ্চল অঞ্চল ধরিবার আশায়, ব্যগ্রভাবে ধাবিত হইতেছে। সুখের মনোহরমূর্ত্তি দর্শনার্থে শত যোজন পথ নিমেষে অতিক্রম করিতেছে! সুখাশায় বক্ষে বাধা, চক্ষে কোটি ধূলিকণা-পতনের ধাঁধাঁ, মস্তকে শত-লগুড়াঘাত, পদে কোটি-কণ্টকঘাত সহ্য করিতেছে;—ইহা দর্শন করিলাম, কিন্তু সুখের সন্ধান পাইলাম কি? বোধ হয় নয়। কারণ এই যে, প্রত্যেকের নিকট একই বস্তু অনুকূলবেদনীয় নহে। প্রকৃত পক্ষে জাগতিক সুখসামগ্রীর মধ্যে, একটীও প্রকৃতসুখের সাধন নহে। সত্য সকলের পক্ষেই সমান, সত্য চিরদিনই সত্য, কখনও অন্যথাভাব ধারণ করে না, কিন্তু জাগতিক যে সুখ,—অদ্য আমার নিকট 'সুখ' বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তাহা পরক্ষণেই আমার নিকট, কিম্বা তৎক্ষণেই অপরের নিকট অপ্রীতিকর ভীষণ 'দুঃখ' রূপে প্রতিভাত হইতেছে। অতএব এই পরিবর্ত্তনশীল সুখদুঃখানুভব অর্থাৎ অনুকূলতাজ্ঞান এবং প্রতিকূলতাজ্ঞান—প্রকৃত সুখদুঃখানুভব হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলেন, জগতের সমস্ত জ্ঞান সাংসারিক-জ্ঞান, ইহা সত্যের আভাস লইয়া প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রকৃত সত্য নহে। শিশুর সুখে বৃদ্ধের বিরাগ, যুবকের সুখে শিশুর অসুখ। ধনীর সুখ দরিদ্রের দুষ্পাচ্য, দরিদ্রের সুখে ধনীর দুঃসহ দুঃখজ্ঞান। এইত সংসারের দশা! এখানে প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া সত্যই অত্যন্ত দুষ্কর। আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন, তজ্জন্য আমরা সুখের যে অবস্থা দর্শন করিব, তাহাও সার্ব্বজনীন না হইয়া পরিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব ক্ষুদ্রব্যক্তিত্ব লইয়া, সার্ব্বজনীন সুখের অনুসন্ধান করিতে যাওয়া—মূঢ়তা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যতদিন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ববারিবিন্দু অসীম আত্মসমুদ্রে লীন হইয়া স্বসত্তা না হারাইবে, ততদিন প্রকৃত সুখের সমাগম-লাভ-প্রয়াস বাতুলতামাত্র। পরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টিতে যাহা একের সুখ, তাহা অপরের পক্ষে দুঃখ।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে সুখদুঃখজ্ঞান—অনুকূলপ্রতিকূলতা-জ্ঞানের যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তুরস্ক দেশের প্রকৃতিতে অহিফেণের বিষভাব—প্রতিকূলবেদনীয়তা অত্যল্প, অন্যত্র তাহা নহে। গ্রীসদেশের প্রকৃতিতে হেমলক্ Hemlock ভয়ঙ্কর বিষ—অত্যন্ত প্রতিকূলবেদনীয়, অন্যত্র

তদ্রূপ নহে। * এই ব্যবস্থা, দেশভেদে অনুকূলতাজ্ঞান-পার্থক্যের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। যে পদার্থ শীতে স্বাস্থ্যকর, তাহা গ্রীষ্মে ক্লেশকর হইয়া থাকে। আমার পক্ষে যাহা সুখকর, অপরের প্রকৃতিতে তাহা দুঃখদায়ক হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ব্যবহারবিশেষে প্রাণপ্রদ অন্নও বিষক্রিয়া করে, পক্ষান্তরে প্রাণনাশক বিষ ও প্রাণপ্রদ হয়। চরকসংহিতায় আছে,—"প্রাণঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা নিহন্ত্যসূন্। বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্।

সকল দ্রব্য, সকল দেশে সকল কালে, সকল পাত্রে—সমফলপ্রদ নহে, সুতরাং অনুকূলবেদন ও বাধনালক্ষণ সুখদুঃখও সর্ব্বত্র এক নহে। পিতা শৈশবিকপুত্রের বদনকমলে স্বীয় কণ্টকশ্মশ্রু মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিয়া সুখানুভব করেন, কিন্তু শ্মশ্রুকণ্টকাঘাতে পুত্র দুঃখানুভবই করিয়া থাকে; অপিচ আকুল ক্রন্দনে কর্ণপীড়া উৎপাদন করে। যতই আলোচনা করি, ততই দেখি, জগতে সুখের কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নাই।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমরা সুখান্বেষণ করি, কেহই জানে না যে—সুখের স্বরূপ কি! আমরা প্রতিক্ষণেই এক একটীকে সুখকর জ্ঞানে গ্রহণ করিতেছি, পরক্ষণেই তাহাকে দুঃখকর জ্ঞানে ত্যাগ করিতেছি। সুখ খুঁজিয়া পাইতেছি না, সুখভ্রমে প্রতারিত হইতেছি!

শাস্ত্র অগাধজ্ঞানসিন্ধু, শাস্ত্র মন্দ্রমধুর ধ্বনিতে বলিতেছেন, "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং" যাহা ভূমা—মহৎ—নিরতিশয়—অপরিচ্ছিন্ন তাহাই সুখ, যাহা অল্প—সাতিশয়—পরিচ্ছিন্ন—বাধিত, তাহা কখনই সুখ হইতে পারে না। অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, দেশকালাতীত, অবাধিত নিত্যসিদ্ধ আত্ম-সত্ত্বই সুখস্বরূপ। স্বরূপানুভূতিই সুখানুভব। আত্মভাব সুখদুঃখের অতীত, ঐ ভাবই প্রকৃত সার্ব্বজনীন সুখরূপ। সার্ব্বভৌম সুখের সংবাদ লইতে হইলে, সুখদুঃখের অতীত অবস্থা—যাহা প্রকৃতসুখ—তাহা জানিতে হইলে, আত্মানুসন্ধান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শ্রুতি গভীর নিস্বনে ঘোষণা করিতেছেন, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ,' "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" আত্মাই প্রকৃতসুখস্বরূপ, অর্থাৎ সুখদুঃখাতীত। সাধক বলিয়াছেন "সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।" পরিচ্ছিন্ন সুখদুঃখের পরপারে নিত্যানন্দধামে আত্মা অধিষ্ঠিত। সাধক! সবলে অগ্রসর হও, আত্মানন্দ প্রকৃতসুখ অনুভব কর, আত্মার আনন্দে রমণ কর। সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত নিরুপদ্রব দশা—তোমাকে চিরতরে শান্তি প্রদান করিবে। সুখ আত্মস্বরূপ, তাই আত্মসুখে প্রেম হয়। পরসুখে যদি প্রেম হইত, তবে বুঝিতাম আগন্তিক সুখই সুখ;—কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সাময়িক ভ্রমাত্মক সুখজ্ঞান মাত্র। আমাদের

(১) Opium in Turkey doth scarce offend with us in a small quantity it stupifies. Cicuta or Hemlock is a strong poison in greece, but with us it hath no such veolent effects. Cure of Melancholy.

যদি আমি জানিতে পারি, তবে আমি যে দশা লাভ করি, তাহাই আমার সুখ। তখনকার অবস্থা 'জ্ঞাত' জ্ঞেয়ং' 'প্রাপ্তঃ প্রাপ্তব্যং' 'ত্যক্তং ত্যাজ্যং'—যাহা জানিবার জানিয়াছি, যাহা পাইবার পাইয়াছি, যাহা ছাড়িবার ছাড়িয়াছি, আর চাই না, যাই না, নমি না, দমি না, চলি না, গলি না! ইহাই আমার আপ্তকাম দশা, ইহাই প্রকৃত সুখ! কবে সে সুখে সুখী হইব, ভগবান্ জানেন্!!

শ্রীকেদারনাথ ভারতী
ভারতী কুটীর, প্রতাপকাটী।

বৈদ্যনাথ।

সামাজিক আচার-ব্যবহার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

———

নামবিয়াথিগণ বলেন যে, এই সর্প-মন্দির প্রায় ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, কলিযুগের প্রারম্ভে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাদের পারিবারিক খাতাপত্রও পুরাকালের কোন খবর রাখে না। বর্ত্তমান মন্দির ১২১৩ শত বৎসরের অধিক পুরাতন বলিয়া অনুমিত হয় না। যখন সহস্র সহস্র 'নাগীর' (সর্প) সারি বাঁধিয়া, কিম্বা বিক্ষিপ্তভাবে মন্দিরের নিকট বিচরণ করে, তখন উহাদিগকে দেখিয়া বহু প্রাচীনকালের বলিয়া বোধ হয় না। তদ্দেশবাসী অন্যান্য ব্যক্তিগণের মত এই যে, এই মন্দির প্রায় সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন। মন্দিরের পার্শ্বস্থ ভূমি ও কুঞ্জবন প্রভৃতি নাগরাজার রাজ্য এবং সচরাচর উহাকে মনসারকার (সঙ্কেতভূমি) বলে। নাগরাজার আদেশ এই যে, তাহার রাজ্যের মধ্যে কেহ সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিবে না। যদিও তথায় সহস্র প্রকারের সর্প বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তথাপি এপর্য্যন্ত একটী লোককেও সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিতে শুনা যায় নাই। নামবিয়াথিগণের ধারণা—সঙ্কেতভূমির মধ্যে কেহ সর্পদষ্ট হইলেও, তাহার কোনরূপ ঔষধ বা ঝাড়া ফুঁকের প্রয়োজন হয় না। কিয়দ্দিবস হইল কালিয়ান জাতীয় এক ব্যক্তিকে মন্দিরের সম্মুখে সর্পে দংশন করে। দষ্টব্যক্তি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলে, নামবিয়াথি ধীরভাবে একটু ছাই লইয়া গিয়া, দংশিত স্থানের উপর দিয়া বলিল— "যাও, তুমি তোমার কাজ কর গে।" আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকটীর ভয় বিদূরিত হইল। সে পূর্ব্বের ন্যায় সবল এবং সুস্থদেহে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

নামবিয়াথিগণ তাহাদের ইলামের মধ্যে সর্প দেখিয়া ভয় করে না। তাহাদের বিশ্বাস, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হইলে, ইলামে সর্প প্রবেশ করে না। তাহাদের স্বভাব এমনি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, রজনীতে শয্যার উপর সর্প উঠিলেও, তাহারা কোন ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করে না। বর্ত্তমান মঠধাত্রী কতিপয় সর্প নিজহস্তে পালন করেন, এবং সোহাগভরে উহাদের অঙ্গে হস্তসঞ্চালন করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগকে "বাবা" "বাছা" বলিয়া অভিহিত করেন। এক লেখক

একজন নাম্বিয়াথিকে একটী পুষ্করিণীর তীরে কুঞ্জের নিকট, হরিদ্বর্ণের এক সর্পের পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিতে দেখেন। তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, যে কোন পবিত্র-চেতা ব্রাহ্মণই সর্পকে স্পর্শ করিতে পারে। তচ্ছ্রবণে আমাদের সঙ্গের এক ব্রাহ্মণ সাহসে ভর করিয়া, একটী সর্পের পৃষ্ঠে ধীরে হস্ত-চালনা করিলেন, সর্পটী যেন আরাম-বোধে অবশ হইয়া পড়িয়া থাকিল। এই পুষ্করিণীর জল অতিশয় শীতল, লোকে বলে সর্প বিষের জন্য এত শৈত্য। ভূমির মধ্যে যে সকল সর্প আছে, উহাদিগকে 'দেবনাগ' বলে। ইহারা অঞ্জুরানাগ, মুকালনাগ, কালকোখিল্‌নাগ, প্রভৃতি হিংস্রক ও অনিষ্টকারী সর্প হইতে স্বভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত। সঙ্কেত-ভূমির সকল সর্পেরই ফণা আছে, এবং বিভিন্ন সময়ে উহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়।

নাগপূজা—যে ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা কিছু বিস্ময়কর। নানাদিক্ হইতে শতশত নীচশ্রেণীর লোক আসিয়া, 'নাগার' মূর্ত্তির সম্মুখে সটানে পড়িয়া যায়। ইহারা অতি প্রত্যূষে ভোগের দ্রব্যসম্ভার দিয়া, মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। নাম্বিয়াথি তাহাদিগকে একখানি করিয়া পিষ্টক প্রদান করে, তাহারা ভক্তিভরে তাহা ভক্ষণ করতঃ স্ব স্ব স্থানে গমন করে। নাম্বিয়াথিগণ এই প্রকারে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করে।

বহুতর পর্ব্বের মধ্যে 'মুরামপালোম' নামে একটী সাধারণ পর্ব্ব আছে। ৬২, ৩২ কি ২৪ সংখ্যক সমচতুষ্কোণ ভূমি প্রস্তুত করতঃ, প্রত্যেকটি এক এক রং-দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। মধ্যটির উপর ধান, চাউল প্রভৃতি রাখিয়া, তদুপরি ময়দা ও দুগ্ধ দিয়া, মন্ত্র পাঠ করা হয়; আর সেই খাদ্য দ্রব্যের স্তূপের উপর পুষ্প বৃষ্টি হইতে থাকে।

'সর্প বালিগ' নামে আর একটী পর্ব্ব আছে। 'মুরাম পালুম' হইতে ইহার কোন পার্থক্য নাই। তবে ইহা জাঁক-জমকের সহিত রাত্রিতে নির্ব্বাহিত হয়। তাহাদের প্রধান পর্ব্বের নাম 'সর্পপাটু'—সর্প সংগীত। এই পর্ব্ব ১২ বৎসর পর একবার অনুষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য—সর্পকুলের তুষ্টিসাধন করা। এই উৎসব বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া, কদাচিৎ কখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ১০৭৩ সালে (M. E.) একবার, ১০৩২ সালে একবার, এবং ৯৯০ সালে একবার এই উৎসব হইয়াছিল। উৎসব ২৭ দিন ধরিয়া চলিতে থাকে, এবং তাহাতে প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন। উৎসবের ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত, নয়জন কুমারী নির্ব্বাচিতা হয়। নাম্বিয়াথি-পরিবারে যদি নয়টী কুমারী না মিলে, তবে 'কারা'র 'নাইর' পরিবার হইতে কুমারী লওয়া হয়। শেষোক্ত পরিবারের কুমারীকে উৎসবের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, কিছু দিন উপবাস করিতে হয়। উৎসবের কোন কোন কার্য্য তাহারা করে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রধান কার্য্য—'থুলাল' (নৃত্য)। তাহারা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, শেষ-পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে পুরুষগণ নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কুমারীগণ নৃত্য করিতে করিতে সর্পাকারে অগ্রসর হইয়া, তাহাদের হস্ত হইতে খাদ্য সামগ্রী লইয়া ভক্ষণ করে। নিকটবর্ত্তি সমস্ত তালুক

হইতে সাহায্য সংগৃহীত হয়। প্রত্যেক কুমারীর কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সহচরী থাকে।

নাগপূজা ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে।

রাখিবন্ধন।—নাগ-পঞ্চমীর দশদিন পর—অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণগণ এই দিবস নূতন যজ্ঞসূত্র গলায় দেন। দরিদ্র দ্বিজসমূহ কিছু প্রাপ্তির আশায় ধনি-সন্তানের দক্ষিণ-হস্তে লোহিত সূত্র বাঁধিয়া দেয়। রাখি-বন্ধনের সহিত প্রীতিবন্ধনের কতকটা সংস্রব আছে। রাখিবন্ধনের সম্মান কি প্রকার, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণের নিকট তাহা আর বলিতে হইবে না। বর্ত্তমানকালে উহার মর্য্যাদা অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়াছে। এখন দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ উদরান্নের নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার ব্যক্তির হস্তে রাখি-সূত্র বাঁধিয়া দিয়া, যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহা দ্বারাই তাহারা পরিজন প্রতিপালন করিয়া থাকে।

রামনবমী। মারাঠি পঞ্জিকায় চৈত্র-মাসের শুক্লপক্ষ হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। 'চৈত্র সুদি প্রতিপদ্' অর্থাৎ নববর্ষ হইতে নয় দিবস কাল রামপূজা হয়। নবম-দিবসে মহা সমারোহের সহিত পূজা সম্পন্ন হয়। ইহাই মারাঠি ও মৈথিলীদিগের রামনবমী। বঙ্গদেশেও এই সময়ে রাম-নবমীর উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

গৌরণী। রামনবমীর পরেই এতদ্দেশে 'গৌরণী' ব্রত আরব্ধ হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাস ধরিয়া, সধবা রমণীগণ গৌরী-আরাধনা করে। ইহাতে বিশেষ আড়ম্বর নাই। বৈশাখের শেষে, রমণীগণ সুবিধামত একটী দিন স্থির করে, সেই দিবস পল্লীর সকল রমণী একত্রিত হইয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকে।

অক্ষয়-তৃতীয়া। বৈশাখ মাসের শুক্লতৃতীয়াতে ইহার অনুষ্ঠান হয়। এই দিবস পূর্ব্বপুরুষগণের প্রীত্যর্থে নানারূপ ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ মৃণ্ময়কুম্ভ দান করে, এবং বাড়ীর সকলে একত্রে তেঁতুল ও শর্করা—মিশ্রিত 'সিচুনী' নামক একপ্রকার মিষ্টান্ন আহার করে।

আষাঢ়ি-পূর্ণিমা। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা আচরিত হয়। ব্রাহ্মণগণ এই দিবস গুরুপূজা করিয়া থাকেন। তৎপর নানারূপ মিষ্টান্ন বিশেষতঃ 'পোরাণ-পুরি' (লুচি-বিশেষ) প্রস্তুতঃ করিয়া, সকলে আহার করে।

আষাঢ় মাস হইতে চারি মাসকে "চতুর্মাস্য" বলে। অনেকে এই ব্রত পালন করিয়া থাকে।

শ্রাবণী। ঋগ্বেদি-ব্রাহ্মণ রাখিবন্ধনের দিন, এবং যজুর্ব্বেদি-ব্রাহ্মণ তৎপরদিন শ্রাবণী করিয়া থাকে। সেই দিন বহুতর ব্রাহ্মণ একত্রিত হয়। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, উপাধ্যায় মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তৎপর হোম হয়। তৎকালে উপাধ্যায় যেরূপ আদেশ করেন, উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাহাই একবাক্যে পালন করিয়া থাকে। হোমের প্রায় দুইঘণ্টা পর তাহারা স্নান করে। স্নানান্তে পুনরায় সকলে সম্মিলিত হইয়া, প্রায়

দুইঘণ্টা মন্ত্রোচ্চারণ করে। বৎসরের পাপ-ক্ষালনের নিমিত্ত, তাহারা ভস্মাদিমিশ্রিত পঞ্চগব্য ভক্ষণ করে। ইহাই শ্রাবণীতে অনুষ্ঠেয়। পরে সকলে আহারাদি করিয়া থাকে। সময় সময় একস্থানে দুইজন উপাধ্যায়ও নিযুক্ত হন।

গোকুল-অষ্টমী। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে গোকুল-অষ্টমী অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের জন্ম হয় বলিয়া, তাহারা জন্মাষ্টমীও বলিয়া থাকে। ব্রহ্মচারিকে এই দিবস উপবাসী থাকিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় বন্ধুবর্গের মৃণ্ময়মূর্ত্তি পূজিত হয়। পূজাবসানে এই সকল মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনেরও ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ বাদ্যভাণ্ড করিয়া, সমারোহের সহিত নগর প্রদক্ষিণান্তে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেয়। বিসর্জ্জন-স্থানে একটী কৌতুকের ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। একটী গর্ত্তের দুই দিকে, দুই দল ছোট ছোট বালিকা দাঁড়াইয়া, একদল অন্যদলের বালিকাকে অকথ্য ও আমাদের অবোধ্য ভাষায় গালাগালি করিতে থাকে ; এবং এরূপ ভাবে হস্তাদি প্রদর্শন ও অঙ্গভঙ্গি করে, যে, তাহারা যেন যুদ্ধ করিতে উদ্যত! প্রত্যেকদলে একজন করিয়া প্রবীণা স্ত্রীলোক থাকেন, তিনিই প্রকৃত যুদ্ধাদি সংঘটিত হইতে দেন না। এই বাগ্‌যুদ্ধের অবসানে, নির্ম্মাল্য প্রভৃতি জলে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই সময় প্রাচীনার দল জলাশয় হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া গৃহে লইয়া যায়। পুণাতে এইরূপ বাগ্‌যুদ্ধের প্রথা নাই। তাহারা ইহাকে 'কুমারীখেল' (কুমারদিগের খেলা) বলে।

শ্রাবণ-বদী—অমাবস্যা। ইহাকে পিতোরি বা পোলাহও বলে। এই দিন পশ্বাদির দ্বারা কার্য্য করান হয় না। গৃহস্বামী গো মহিষাদি ধৌত করতঃ, উহাদের গাত্র লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করে, এবং শৃঙ্গে নানারকম পালকাদি বাঁধিয়া দেয়। তৎপর এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া, উহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ২।৩ ঘণ্টা দাঁড় করাইয়া রাখা হয়। এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে অসংখ্য লোক সমবেত হয়। ধোবী (ধোপা) তাহার বলীবর্দ্দ লইয়া, কিছু প্রাপ্তির আশায়, যজমানের বাড়ী যায়, এবং কাহারো 'টোঙ্গা' থাকিলে টোঙ্গা-চালক বলদ লইয়া মনিবের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের গৃহে বকৃসিস্ লইতে যায়। ইহার সাত দিন পর বালকদের পোলাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত বলীবর্দ্দ ছোট গাড়ীতে যোজিত হইয়া, বালকগণ কর্ত্তৃক রজ্জু দ্বারা আকর্ষিত হয়,—এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া, অপরাপরের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই স্থানে সেই মহল্যার অন্যান্য বালকগণ আসিয়া মিলিত হয়। সন্ধ্যা হইলে আলোক প্রজ্বলিত হয়, 'গীতা' প্রভৃতির বাদ্য চলিতে থাকে। সেই দিন সকলে 'পোরাণপুলি' আহার করে।

কজ্জারতিজ্। পূর্ব্বোল্লিখিত উৎসবের তিন দিন পর অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শুক্লতৃতীয়াতে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন রমণীগণ নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে মৃত্তিকা আনয়ন করতঃ, মহাদেব ও গৌরী

নির্ম্মাণ করিয়া হরগৌরী পূজা করে। তাহাদিগকে এই দিবস উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। গীত বাদ্যের উদ্দীপনার মধ্যে রমণীগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে হরগৌরী লইয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া চলিয়া যায়। রাত্রিতে তাহারা নিমন্ত্রিত সধবা 'এয়ো' দিগকে 'পতি' ও 'পাপর'-ভাজা আহার করায়; তদন্তে হরিদ্রা ও কুঙ্কুমরাগে তাহাদের কপোলদেশ রঞ্জিত করিয়া দেয়। এই ব্যাপারকে 'হরতালিকা' বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা কেবল স্ত্রীলোকগণের অনুষ্ঠিত উৎসব বিশেষ। রজনীতে তাহারা গীতবাদ্যাদি দ্বারা চিত্ত বিনোদন করে।

গণেশ-চতুর্থী। ইহা দশদিনব্যাপী একটী বৃহৎ উৎসব, বঙ্গদেশের দুর্গাপূজার সমতুল্য। বাজারে সুন্দর গণেশমূর্ত্তি বিক্রীত হয়। পূজার স্থান—ঝাড় লণ্ঠনাদি দ্বারা সুন্দর রূপে সজ্জিত করে। গণপতি ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্যগীতাদি হয়।

বিসর্জ্জনের দিন—রমণীগণ ঢোল, সানাই, বাঁশীদ্বারা পল্লী মুখরিত করিয়া, জলাশয়ের তীরে গমন করে। দলে মারাঠি ও অন্যদেশীয় দুইশ্রেণীর রমণী থাকে। মারাঠি রমণীগণ মাথার উপর থালায় করিয়া লুচি পুরি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লয়। জলাশয়ের ধারে দাঁড়াইয়া, তাহারা উহার কতকাংশ জলে নিক্ষেপ করে। ইতরজাতীয় বালকেরা তাহা তুলিয়া আনিয়া, উদরতৃপ্তি করিয়া থাকে। পরদেশীয় রমণীগণের সঙ্গে সসা ও অন্যান্য খাদ্যাদি থাকে। বিসর্জ্জনের স্থানে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে, তাহা অল্প পরিমাণে বিতরিত হয়। এই গণপতি-বিসর্জ্জন লইয়া, ধুলিয়াতে ১৮৯৫ সালে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছিল।

ঋষিপঞ্চমী। গণেশচতুর্থীর পরদিবস ঋষিপঞ্চমী হয়। এই দিন বিধবা-রমণীগণ উপবাসী থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে। পরদিবস 'দেওসারি' নামক খাদ্য আহার করিয়া তাহারা পঞ্চমীর কথা শ্রবণ করে। ইহা বঙ্গদেশের পঞ্চমীব্রতের অনুরূপ।

লক্ষ্মীব্রত। শুক্লাষ্টমীর দিন মহালক্ষ্মী পূজা হয়, ইহাকে 'গৌরীপূজা' ও বলে। পর দিবস 'গৌরী-বিসর্জ্জন' ব্রতের দিন মহালক্ষ্মীদেবীর দুইটী মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। একটীকে 'জ্যেষ্ঠ মহালক্ষ্মী' এবং অপরটীকে 'কনিষ্ঠ মহালক্ষ্মী' বলে। কোন প্রকার তরকারী এবং কোন প্রকার মিষ্টান্ন দ্বারা, দেবীদ্বয়ের ভোগ হয়, পরে ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে।

অনন্ত পূর্ণিমা। ভাদ্রমাসের শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাকে অনন্ত-চতুর্দ্দশীও বলে। রেশমীসূত্রের অনন্ত প্রস্তুত করিয়া, ললনাগণ হস্তে ধারণ করে, এবং 'ঘারঘি' নামক একপ্রকার খাদ্য—ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরিত হয়। বঙ্গদেশে এই দিন অনন্তব্রত হইয়া থাকে।

মহালয়া। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পিতৃপক্ষ বা মহালয়া আরম্ভ হইয়া, পনর দিন পরে শেষ হয়।

নবরাত্র। আশ্বিনমাসের শুক্লা প্রতিপদে নবরাত্র আরম্ভ হয়, এবং দশমীর দিবস শেষ হয়। শেষদিবসকে বিজয়াদশমী বলে। এই সময় বিষ্ণু বা পার্ব্বতীর অবতার 'বালাজী' বা 'ভেনকোটেস্' লৌকিক আচারানুযায়ী

পূজিত হন। বালাজী অর্চিত হইলে, উৎসব কলসার দিবস উত্থাপিত হয়, এবং পার্বতীর অবতার পূজিত হইলে, নবমীর দিবস উৎসব সম্পন্ন হয়। এই নয় দিবস ঘরে অষ্টপ্রহর একটী প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে। নাগপুরে, বিজয়াদশমীর দিন—গৃহস্থ উপস্থিত জনমণ্ডলীকে পানসুপারি দান করে, এবং নৃত্যগীতাদির পর সকলে একত্রিত হইয়া, অপর একটী স্থানে গমন করে। তথায় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক হোম অনুষ্ঠিত হয় তৎপর উপস্থিত সকলে 'সোনা' নামক বৃক্ষের একটী করিয়া পত্র বন্ধুবর্গের হস্তে অর্পণ করতঃ অভিবাদন করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

কর্ম্ম ও ফলিত জ্যোতিষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

প্রত্যেক জীবের কল্প কল্পান্তরব্যাপী অসংখ্যাসংখ্য কর্ম্মের বৈচিত্র্য বশতঃ সৃষ্টির বিচিত্রতা, এবং জীবের নানাবিধ ভোগাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। যত দিন জীবের এই স্নেহো শরীরের প্রতি আত্মাভিমান রহিত না হইবে, যাবৎ শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় না হইবে; এবং যে কাল পর্য্যন্ত আবার নিরুপাধিক ব্রহ্মভাবলাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত জীবের পুনঃ পুনঃ সংসার ভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী।

ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসামতে, কর্ম্মই জগতের অনাদিবীজ। অবিবেক বা অজ্ঞান তাহার নামান্তর মাত্র। অবিদ্যা-স্বরূপিণী বাসনাময়ী প্রকৃতি—অনাদি কাল হইতে জীবের সন্নিধবর্ত্তিনী থাকিয়া, পুনঃপুনঃ দেহ রচনা করিতেছেন। কারণ দেহ অভাবে দৈহিক ব্যাপার সম্পন্ন হয় না; ভোগবাসনা চরিতার্থ হয় না, কোনরূপ সম্ভোগও সম্ভবে না। জীবের দেহে আত্মাভিমান-সংস্কৃতি অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী। "অনাদির-বিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়-প্রসক্তেঃ।" অবিবেককে অনাদি না বলিলে, দুইটী দোষ জন্মিতে পারে। এই জন্য পূর্ব্বতন চিন্তাশীল মহর্ষিগণ ইহাকে অনাদিকর্ম্মাধীন বোধে "অনাদি" নামে বিশেষিত করিয়াছেন *

এই অনাদি অবিবেক কর্ত্তৃক জীবের শরীরের প্রতি আত্মাভিমান জন্মে। "অভিমানাদ্রাগাদয়ো জায়ন্তে।" আত্মাভিমান বশতঃ আমার সন্তান—আমার ঘর—আমার ধনসম্পত্তি—ইত্যাকার সংসারের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। "রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে।" এই অনুরাগ হইতে নানাবিধ কর্ম্মের উদ্ভব হইয়া থাকে। "কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে।" কর্ম্ম হইতে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আর্য্যশাস্ত্র কর্ম্মকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করেন। সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও আগামি। অনন্তকোটী জন্মের কারণীভূত যে কর্ম্ম

---

* মল্লিখিত "কর্ম্ম বা প্রকৃতি" প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছিল। (কল্প ১২৯৯ সাল) লেখক।—

পূর্ব্বার্জ্জিত রূপে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সঞ্চিত কর্ম্ম কহে। ইহা ভোগের দ্বারা অত্যন্ত (একেবারে) বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এমন কি, স্বর্গার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সাকল্যে উপভোগ হইলেও অনুপভুক্ত সঞ্চিত পুণ্য পাপ যথেষ্ট অবশিষ্ট থাকে। অন্যথা সদ্যোজাত বালকের ইহ জন্মের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম অভাবে, সুখ দুঃখ উপভোগ হইত না। * ইহা একমাত্র "ব্রহ্মৈবাহমিতি" নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

যে কর্ম্ম কর্ত্তৃক আমরা এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং নানাবিধ সুখ-দুঃখপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহা প্রারব্ধ। ইহা ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে।

আর মানবের জ্ঞানোৎপত্তির পর বর্ত্তমান দেহে পুণ্যপাপ-রূপ যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে "আগামি" কর্ম্ম কহে। ইহা প্রারব্ধ-কর্ম্মের ন্যায় ভোগের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। কেবল জ্ঞানীর পক্ষেই "নলিনীদলগতজলবৎ সম্বন্ধো নাস্তি।" ইহা "ক্রিয়মাণ" বটে কিন্তু ভবিষ্যৎ জন্মের কারণস্বরূপ সঞ্চিত হইতে থাকে। আমাদের যেরূপ প্রকৃতি, তদনুসারেই কর্ম্ম করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হই, এবং তাহা করিতে না পাইলে, ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হই; কিন্তু ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা আমাদের প্রকৃতির প্রতিকূল, অথবা যাহা আমরা ভাল বাসি না, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে বা সঙ্গগুণে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, এবং পুনঃ পুনঃ সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, আর পূর্ব্বের ন্যায় তাহাতে ঘৃণা বা বিরক্তি বোধ থাকে না। তাহাই করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি, এবং তাহাই করিতে প্রবৃত্তি বাড়িতে থাকে। সেই জন্যই বলে "অভ্যাস এক দ্বিতীয় প্রকৃতি।"

'Sow an act and you reap a habit
"Sow a habit and you reap a character
Sow a character and you reap a desting"
(Lucefer 1881)

অর্থাৎ যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সেইরূপই অভ্যাস জন্মিবে। যেরূপ অভ্যাস জন্মিবে, তদনুরূপ প্রকৃতি গঠিত হইবে। এবং যেরূপ প্রকৃতি হইবে, সেইরূপই অদৃষ্ট রচিত হইবে।

প্রাচীন গ্রীকশাস্ত্রে এক সুখ দুঃখবিধাত্রী দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম "নেমেশিশ" (Nemesis)। তাঁহার তিন কন্যা। "ক্লথো" (Clatho), "ল্যাচেসিশ" (Lachesis) এবং এট্রোপশ (Atropos)। উক্ত কন্যাত্রয় নিশাকুমারী (daughters of night) নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা অদৃষ্ট বা মানবচর্ম্মচক্ষুর অগোচরীভূত। গ্রীকশাস্ত্রমতে "ক্লথো" জীবনসূত্র সূচনা করিয়া থাকেন; "ল্যাচেসিস" জীবের উপজীবিকা—কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করেন, আর

* স্বর্গার্থমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ সাকল্যেনোপভোগেঽপি, অনুপভুক্তানি সঞ্চিতানি পুণ্যপাপানি বহূনি অস্য বিদ্যন্তে, অন্যথা সদ্যঃ সমুৎপন্নস্য বালস্য ইহ জন্মনি অনুষ্ঠিতয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরভাবাৎ সুখদুঃখোপভোগো ন স্যাৎ।" (শারীরকভাষ্যম্) ৩।১।২

"এট্রোপস" কর্ম্মের অপরিহার্য্য ফলবিশেষ। অনেকে ইঁহাদিগকে যথাক্রমে "সঞ্চিত," "প্রারব্ধ" ও "ক্রিয়মাণ" কর্ম্মের সহিত তুলনা করেন। *

পরম মনীষিণী মাডাম্ ব্লাভট্স্কী বলিয়াছেন যে, আমরা এই মহাযাত্রায় অহরহ যেরূপ কর্ম্মবীজ বপন করিতেছি, তদনুরূপই তাহার ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। কারণ এ জগতে পূর্ণনীতি বিরাজমান। কর্ম্মের যেরূপ ভাব ও প্রকৃতি—জ্ঞানের যেরূপ প্রার্থনা ও ভোগস্পৃহা, নবদেহ তদনুরূপই সুখ দুঃখময় উৎপন্ন হইবে ১।

ঈজীপ্টের তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণের মতানুসন্ধান করিলে, তাঁহাদেরও এইরূপ উপদেশ জানিতে পারা যায় ২।

বাইবেলের ও মূল কথা এই যে, মানব যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তদনুসারেই ফল লাভ করিবে ।৩

বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে The effcet is exactly Proportionate to the cause" কারণানুরূপই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, আমাদের সুখ দুঃখের কারণ কি কর্ম্ম বা জন্মলগ্ন? এককার্য্যের দুই কারণ হইতে পারে না। যদি কোন স্থানে একাধিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাহইলে একটী মূল, অপরটী অবান্তর—অথবা একটী মুখ্য, অপরটী গৌণ কারণ, স্বীকার করিতে হয়। জন্মপত্রিকাপাঠে, মানবের যেরূপ সুখ, দুঃখ—সম্পৎ-বিপদ্ জানিতে পারা যায়—মানবের ললাট বা করকোষ্ঠী দর্শনেও তাহা জানিতে পারা যায়, এবং এতৎসম্বন্ধেও আর্য্যগ্রন্থের অভাব নাই।

* "A real thinker begins to feel the truth of the law of Karma—The irresesteble force of Karma is Adrista, because it is not seen but feet. Hence the Hermetic term of Adrista ; for the greek Nemesis, the Goddess of retribution and justice. Hesiad says, the Nemesis has three daughters, called also the daughters of night, because they are unseen, Adrista to us. They are clotho, the spiner of the thread of life, Lachesis who determins the lot of life and Atropos, the inevitable. Thes three respectively represent Karma in its three aspects. Sanchita, Prarobdha and Kriyaman. The idea of irresesteble force of desting or Karma pervader the whole greek philosophy."

(Vide Pause Vol. II Part XII.)

(১) "In the great journey causes shown each hour bear its hornest of effects, for rigid justice rules the world. With mighty sweep of never erring action, it brings to mortals lives of weal or woe, the Kamic projeny of all our former thoughts and deeds."

(২) "It is not grass in the field which he is mowing. It is a crop of heads. But see, behind aim, as soon as he has cut down the heads, a new crop is spreng-ing up, not of heads, but of feet and hands (ordeals and mysteries of Ancient Egypt Jablen the 13th.)"

(৩) "Be not deceived—God is not moeked, for whatever a man soweth that shall be also reap, for he that soweth to the flesh, shall of the flesh reap corruption but he that soweth to the spirit, shall of the spirit, reap life encrlasting."

(Vide Lucefer 1880)

এই মহাসমস্যা-নিবারণ মহর্ষি ভৃগু যেরূপে করিয়াছেন, তাহাই আমরা যথাশক্তি আলোচনা করিব। * বিষয় অতি জটিল ও কঠিন—আমাদের বুদ্ধি যৎসামান্য, ভ্রম পদে পদে সম্ভবপর। কিন্তু বিষয়টী অতি রহস্য-জনক বোধে, যথাসম্ভব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশাকরি ধীমান্ ও চিন্তাশীল পাঠক, যেখানে আমাদের ভ্রম-প্রমাদ বুঝিতে পারিবেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

ঝঞ্জারপুর
২৬শে ফাল্গুন
১৩১২

(ক্রমশঃ)
শ্রীযদুনাথ দে।

শক্তিসমবায়
বা
চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত।

চণ্ডীর তিন চরিত্রের মধ্যে, দ্বিতীয় চরিত্রেরই সমধিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিকই এই চরিতে শক্তি-লীলার অসীম মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। যে ভাবেই ইহার অর্থ গ্রহণ করা যায়, সেই ভাবেই মহত্ত্ব ও সূক্ষ্ম-তত্ত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিতে, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য—মেধস্ ঋষির নিকট মহামায়ার উৎপত্তি ও কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবর বলিয়াছিলেন "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদম্ ততং। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাম্ মম।" সেই মহামায়া নিত্যা, তিনি জগন্মূর্ত্তি, (সুতরাং তাঁহার উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবে? কিন্তু শক্তিমান্‌কে অবলম্বন করিয়াই শক্তিকে বুঝাইতে হয়, তাই মুনিবর বলিলেন "তথাপি") তথাপি সেই মহামায়ার বহুধা সমুৎপত্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অর্থাৎ শক্তির লীলা বর্ণনা করিয়া, শক্তি কি—তাহা বুঝাইবেন;—এই কথাই বলিলেন।

এক্ষণে কথা এই যে—মহিষাসুর বলিয়া বাস্তবিক কোন অসুর ছিল কিনা, এবং মহাশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া, আত্ম-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহার বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন কিনা? অথবা রূপকচ্ছলে ইহা শক্তির লীলাবর্ণন মাত্র?

শক্তি দ্বিবিধা, সংজননী ও সংহারিণী; দুই রূপ পরস্পর বিরুদ্ধ। এক শক্তি সৃষ্টি করিয়া তাহার পালন ও রক্ষণ করেন, আর সংহারিণী শক্তি সেই সৃষ্টির সংহার-সাধন করেন। স্থূলতঃ পৃথক্ হইলেও মূলতঃ এই দুই শক্তিই এক। শ্রীচণ্ডীতেই উক্ত হইয়াছে—"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বম্ স্থিতিরূপা চ পালনে। তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।" মা! তুমি জগন্ময়ী, বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি। সৃষ্টিকার্য্যতঃ তুমি সৃষ্টিরূপা, স্থিতিকার্য্যতঃ তুমি স্থিতিরূপা এবং সংহারকার্য্যতঃ তুমি সংহাররূপা। সংজননী-শক্তিতে শক্তিমান্ দেব-নামে এবং সংহারিণী-শক্তিতে শক্তিমান্ অসুর-নামে অভিহিত হয়। উভয় শক্তিই এক মহাশক্তির দ্বিবিধ লীলামাত্র।

* (Rishi Bhrigu's theory of astrology based on the law of Karma,—Vide Lucefer Vol XIII Page 141)

বাইবেলোক্ত ধর্ম্মে ও বাইবেলের পূর্ব্বার্দ্ধ-ভিত্তিক মুসলমান্-ধর্ম্মে এই দেব ও অসুর-শক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অথচ এই দুই ধর্ম্ম একেশ্বরবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুই ধর্ম্ম প্রতিপাদিত ঈশ্বর অর্দ্ধ-শক্তিতে শক্তিমান্, অপরার্দ্ধ শক্তি শয়তানের। এরূপ স্থলে ইহাকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ কিরূপে বলা যায়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সনাতন ধর্ম্ম—জগতের মূলকে একই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "অনন্ত-শক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্" সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর অনন্ত-শক্তিখচিত।যাহা ঈশ্বর নামে অভিহিত তাহা খণ্ডশক্তিতে শক্তিমান্। খ্রীষ্টান ও মুসলমান্ ধর্ম্মপ্রতিপাদিত ঈশ্বরও এই খণ্ডশক্তিতে শক্তিমান্। এই সকল খণ্ডশক্তির আধার বা প্রস্রবণ সেই মহাশক্তি। তাহাই ব্রহ্ম-নামে অভিহিত হইয়াছে। দেবাসুরসংগ্রাম—যে কেবল সনাতন ধর্ম্মগ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নহে। কি গ্রীসের, কি রোমের, কি মিসরের, কি খ্রীষ্টানের, কি মুসলমানের, কি বৌদ্ধের, সকল ধর্ম্মেই এই দেবাসুর-সংগ্রামের কথা আছে। ইহার অবশ্যই কোন কারণ আছে।

শক্তি-সংঘর্ষেই জগৎ চলিতেছে। এই শক্তি-সংঘর্ষ জড়বুদ্ধি অসভ্য হইতে সূক্ষ্মবুদ্ধি সুসভ্য পর্য্যন্ত সকলেই অনুভব করিতেছে। মনুষ্য মাত্রেই বুঝিতে পারে যে, এ জীবন-সংগ্রামই "সংসার" নামে অভিহিত, আর সেই জীবনসংগ্রামে অনবরত বিরুদ্ধশক্তির সংঘর্ষ চলিতেছে। শক্তি অতীন্দ্রিয়। শক্তি-লীলা বর্ণনা করিতে হইলে, শক্তিমানের সাহায্য বিনা, তাহা করিবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং সংজননী ও সংহারিণী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া, দেব ও দানব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।—এবং এই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষই সর্ব্বত্র দেবাসুরসংগ্রাম নামে অভিহিত। সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশক বেদই এই ব্যাপারের প্রথম প্রবর্ত্তক। অন্যান্য ধর্ম্ম লোকপরম্পরা-শ্রুতি-সাহায্যে তাহা শ্রবণ করিয়া, আপনাদের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে মাত্র। এই ব্যাপারই কবির তুলিকায় রঞ্জিত হইয়া, নানা আকার ধারণ করিয়াছে।

সৃষ্টির প্রারম্ভেই এই দেবাসুরসংগ্রামের কথা শুনা যায়। তাহার পর, আর এ দেবাসুর-সংগ্রামের কোন উল্লেখ নাই। তৎপরে ভগবানের অবতার-গ্রহণের কথা পাওয়া যায়। সেই দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, এই তিন অবতার স্পষ্টতঃই সৃষ্টিপ্রারম্ভে শক্তিসংঘর্ষের ব্যাপারের পরবর্ত্তী। নৃসিংহ ও বামন অবতারে অসুর-দমনের কথা আছে, সংগ্রামের কথা নাই। তাহার পর সর্ব্বত্র সৃষ্টিব্যাপারের কথা। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাকে দেবাসুর-সংগ্রাম বলা যায়, তাহা সৃষ্টির প্রারম্ভে শক্তিসংঘর্ষের ;—এই ব্যাপারই জনশ্রুতি ও কল্পনারক্রমাগত রঞ্জিত হইয়া, গ্রীস্ রোম প্রভৃতির দেবাসুরের কথায় পরিণত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এই সকল জাতির দেবাসুর-ব্যাপার আমাদের দেবাসুর-ব্যাপারের সঙ্গে অনেক মিলে ; কেবল জনশ্রুতি-বশতঃ বিকৃত হইয়া, যতটুকু অবনত হইতে হয়, তাহাই হইয়াছে।

অতএব দেবাসুর-ব্যাপার প্রকৃত ব্যাপার বলিলে কোন দোষই হয় না। অতীন্দ্রিয় ও সাধারণের বুদ্ধির অগম্য ব্যাপারই কল্পনা-যোগে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইল "যে শক্তির লীলা দেবাসুর-যুদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জড়-শক্তি না চৈতন্য-শক্তি? তাহা পূজার্হ কি না?" সুরথ রাজা মেধস্ মুনিকে এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং মেধস্ মুনিও তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। ইহা আমরা চণ্ডীতত্ত্বের প্রথম প্রস্তাবনায়* বিশদরূপে বুঝিয়াছি এবং এ প্রবন্ধেও তাহার সারাংশ দেওয়া হইতেছে। অতএব সে বিষয়ের আর পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। তবে এক কথা, শক্তি জড় হয় না, কারণ শক্তি-শব্দের অর্থই কার্য্যশালিনী। সুতরাং জড়-শক্তি বলিতে "জড়া" শক্তি বুঝায় না, "জড়স্থ" (জড়ের) শক্তি বুঝায়।

এক এক শক্তির এক বা কয়েকটী মাত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে; সে শক্তি তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না; সুতরাং তাহার পূজা করিলেও যে কার্য্য সাধিত হইবে, পূজা না করিলেও তাহাই হইবে। এ কথা সত্য। এই কারণেই তন্ত্রোক্ত সাধনে, আবরণ-দেবতার পূজার বিধান আছে। যে আবরণ-শক্তির যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট, তৎকার্য্য-সাধনকল্পে সেই শক্তির আরাধনার ব্যবস্থা আছে। এই আরাধনার মর্ম্ম এই যে, সেই শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তৎকার্য্যে নিযুক্ত করা। হিন্দুস্থানস্থিতা মহাশক্তি বা মূলশক্তি এই সকল শক্তির নিয়ন্ত্রী। এই সাধনতত্ত্ব এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। এইস্থলে এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে—শাস্ত্রোক্ত সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য—আপনাতে শক্তিবিশেষের বা বহুলশক্তির উদ্বোধন করা। সমগ্রশক্তি জাগ্রত ও কার্য্যকারিণী হইলেই, আমিই যে সমস্তশক্তি-খচিত ব্রহ্ম এই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হওয়ায় সাধনার চরম হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় চরিতে, এই শক্তি-লীলাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম চরিতে প্রলয়ান্তে পুনশ্চ সৃষ্টির সূত্রপাত বা প্রারম্ভ দেখাইয়া, দ্বিতীয় চরিতে সৃষ্টির দ্বিতীয়াবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

মহিষ অসুরগণের রাজা হইয়া দেবতাগণকে পরাজিত করে। দেবগণ অসুরবিধ্বস্ত হইয়া অনাথবৎ মর্ত্তলোকে ভ্রমণ করেন। পরে মহাশক্তির উদ্বোধন করায়, সমগ্র দেবশক্তি-সমুদ্ভূতা মহাশক্তি সমরে সসৈন্য মহিষাসুরের বিনাশসাধন পূর্ব্বক পুনশ্চ দেবগণকে স্বপদে স্থাপন করেন। ইহাই দ্বিতীয় চরিতের মর্ম্ম।

এই মহিষাসুরের যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মহিষাসুর মহাপরাক্রান্ত অসুর-রাজ; তিনি চতুরঙ্গ সুশিক্ষিত বলের অধিপতি; তাঁহার সেনাপতিরা সকলেই সুশিক্ষিত ও যুদ্ধকুশল। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মূর্ত্তি বা স্বরূপ মহিষের ন্যায়। যুদ্ধকালে সেই মহিষমূর্ত্তি ক্ষুর, শৃঙ্গ ও লাঙ্গূলের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছে। মহিষ কামরূপী। মহিষ-রূপে যুদ্ধ করিতে করিতে, যখন সে দেবী কর্তৃক আহত হইল, তখন মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল; আবার দেবীর

অস্ত্র প্রহারে ব্যথিত হইয়া মহাগজের রূপধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; পুনশ্চ দেবীর অস্ত্রে আহত হইয়া, আপনার স্বরূপ অর্থাৎ মহিষরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই মহিষরূপে পাশবদ্ধ হইয়া, যখন দেবীর পদতলে আকৃষ্ট হইল ও দেবী তাহার মস্তক চ্ছেদন করিলেন, তখন সেই ছিন্নমস্তক মহিষদেহ হইতে এক সশস্ত্র পুরুষ অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইহারই বক্ষঃস্থলে দেবী শূল-প্রহার করেন; এবং তাহাতেই তাহার নিপাত হয়।

মহিষাসুরের দ্বিতীয় বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে—আরণ্য পাশব শক্তিকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া, মহিষাসুর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এত পশু থাকিতে আরণ্য পাশব শক্তি মহিষরূপে বর্ণিত হইল কেন? আরণ্য পশুর মধ্যে মহিষ বলবান্ ও একগুঁয়ে। ক্রুদ্ধ হইলে মহিষ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বনহস্তীকেও উৎপীড়িত করিয়া তুলে। সাধারণতঃ দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকে লোক "অবাধ্য মোষ" বলিয়া থাকে। এই কারণেই বোধহয় আরণ্য পাশব মূর্ত্তিকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া বর্ণনা করিবার জন্য, মহিষরূপই গ্রহণ করা হইয়াছে। কামরূপী মহিষাসুর স্বরূপ, তৎপরে মনুষ্য, তৎপরে মহাগজ এবং শেষে পুনশ্চ যে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহাতেও সৃষ্টির দ্বিতীয়াবস্থাই সুস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির দ্বিতীয়াবস্থায় মানব বন্যপশুর সহিত একত্রে বাস্ করে। আবাসস্থান ও আহারের জন্য তাহাদের পরস্পর নিয়ত বিবাদ হয়।" এই বন্যভাব প্রশমিত হইলে, মানব সভ্যতা-পদবীতে উপনীত হয়, এবং তাহাই সৃষ্টির তৃতীয়াবস্থা।

দেবশক্তি মধুময়ী শক্তি ও উন্নতি-সাধিকা। আরণ্য পাশবশক্তি সেই দেবশক্তিকে নিরুদ্ধ বা পরাজিত করিয়া রাখিলে, উন্নতির গতি রুদ্ধ হয়। পাশবশক্তির প্রশমন পূর্ব্বক, এই উন্নতিসাধিকা শক্তির অবাধকার্য্যের ব্যবস্থাপূর্ব্বক সৃষ্টির দ্বিতীয়াবস্থা প্রকট করাই মহিষাসুরবধরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আবার আধ্যাত্মিকভাবে দেখিলে দেখা যায় যে, মানবের পাশব-ভাবই এই মহিষরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। মহামোহ এই মহিষাসুর, দম্ভ অহংকারাদি ইহার সেনাপতি। সদ্বৃত্তির মিলনে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া, মানবকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই মহিষাসুরবধরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বহির্জগৎ অন্তর্জগতের ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র। সুতরাং যে ভাষায় বহির্জগতের ভাব বর্ণিত হয়, সেই ভাষায়ই অন্তর্জগতের ব্যাপার বর্ণিত হইয়া থাকে। পরন্তু রূপক ভিন্ন কোন সূক্ষ্মতত্ত্বই বিশদরূপে প্রকাশ করা যায় না।

এই মহিষাসুর সমস্ত দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া, ইন্দ্রপদ গ্রহণ করিয়া বসিল, এবং দেবগণ অসুরবিধ্বস্ত ও নিরাশ্রয় হইয়া অনাথবৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা লোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া, আপনাদের দুঃখের কথা জানাইলেন। ব্রহ্মা একাকী তাহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া, দেবগণসহ বিষ্ণু ও মহেশ্বরের

নিকট গমন করিলেন। পরাজিত দেবগণের মুখে তাঁহাদের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করায়, বিষ্ণু ও মহেশের ক্রোধোদয় হইল। তখন তাঁহাদের শরীর হইতে তেজোরাশি বহির্গত হইল; তাহার সঙ্গে ব্রহ্মা ও অপরাপর দেবতাদিগের শরীর হইতেও তেজোরাশি নির্গত হইতে লাগিল। এই সর্ব্বদেব-শরীরজ তেজোরাশি একীকৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি ধারণ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

শ্রীচণ্ডী ও শ্রীগীতা।

বিশ্বপ্রদীপ সবিতা সহস্রকর সংহার পুরঃসর অস্তগিরিকন্দরে নিদ্রামগ্ন। জ্যোৎস্না-ধারার উৎসস্বরূপ উজ্জ্বলমূর্ত্তি চন্দ্রমাও অজ্ঞেয়লোকে অজ্ঞাতবাসের ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। নভঃসরোবরে তারকা কমল-কুলের চপল হাসিরও দেখা নাই। অন্ধকারের রাজত্ব ও তীব্রত্ব প্রতিষ্ঠিত দর্শনশক্তি মূর্চ্ছিত। বিশাল সংসার তমোময়--অন্ধকারা-বৃত। কিন্তু সত্যের মনোরমমূর্ত্তি—প্রোজ্জ্বল প্রতিভা তখনও অনাবৃত। অন্ধকার সে রাজ্যে যাইবার পথ পায় না। তাই 'সত্য' ঘনান্ধকারেও প্রকাশিত।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে দুইখানি মহামান্য গ্রন্থের নাম লিখিত আছে, তাহা যে হিন্দু ভারতবাসীর জীবনে মরণে— সম্পদে বিপদে—ভোগে মোক্ষে—উভয়ত্রই প্রধান অবলম্বন—এ তথ্য চিরদিনই সত্য। আমরা বুঝি বা না বুঝি, উপরমে গীতার সেবা ও স্বস্ত্যয়নে চণ্ডীর সেবা—নিতান্ত অপরিহার্য্যভাবে আমাদের জীবনের সহিত সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা কি স্বভাবের সত্য-পক্ষপাতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে! বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত চিন্তাশীল মনের অগম্যস্থানে অবস্থিত নহে!

বর্ত্তমানযুগে প্রধানতঃ প্রতিভাশালী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুগ্রহে, শিক্ষিত-ভারতবাসীর ভবনে সসম্মানে "গীতা" গৃহীত হইতেছে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সপ্তশতীর সে সৌভাগ্যের দশা এখনও আসে নাই! রূপকের আবর্জ্জনাময় পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া, বোধ করি, সাধারণে এখনও ইহার প্রকৃত পূজামূর্ত্তি দর্শনে সক্ষম হন নাই। আমরা আশাকরি, অবসরে, সপ্তশতীর অনাবৃত মঙ্গলময় মূর্ত্তি হিন্দু-পত্রিকার পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারিব। অদ্য তাহার উপক্রমণিকা-স্বরূপ দুই একটী কথা বলিব।

গীতা অমূল্য রত্ন। শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি। গীতা সর্ব্বোপনিষদের সার। শাস্ত্রে আছে—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থোবৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।" গোপতনয় জগন্নাথ কৃষ্ণ উপনিষদ্‌গাভীকুল দোহন করিয়া, যে মহার্ঘ অমৃতময় দুগ্ধ পার্থ-বৎসকে উপহার দেন, তাহাই গীতা। ইহা অপেক্ষা প্রশংসার কথা আর কি আছে? আমাদের মনে হয়, গীতাকে সর্ব্বোপনিষদের সার বলিলেও, প্রকৃত বলা হয় না। ঔপনিষদ যুগে, যে সকল

সত্য অপরিস্ফুট ছায়াময়রূপে প্রতিভাত হইত, তাহারা গীতাযুগে পূর্ণতা—স্পষ্টতা—প্রকটতা লাভ করিয়াছে। গীতার নিষ্কাম-কর্ম্ম—ঔপনিষদ-যুগে নিতান্ত কুজ্ঝটিকাকুল-ভাবে বিদ্যমান ছিল, গীতায় জগৎ—আপামরসাধারণ তাহার উলঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে! কোনটী রাখিয়া কোনটী বলিব! ব্যক্তিরূপ ঈশ্বরের (Personal God এর) ধারণা এরূপ সুন্দরভাবে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। দর্শনের সাম্প্রদায়িক মত-সমূহ গীতায় এরূপভাবে বিন্যস্ত আছে, যাহা পাঠমাত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিই গীতাকে 'স্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থ' বলিয়া মনে করিতে পারেন। গীতায় বৈজ্ঞানিকের বিবাদ নাই, দার্শনিকের অসন্তোষ দৃষ্ট হয় না। ভক্তের ভক্তিপ্রবাহ, জ্ঞানীর জ্ঞানামৃত, কর্ম্মীর কর্ম্মকাণ্ড, সন্ন্যাসীর ত্যাগ বিরাগ কিছুরই অভাব নাই। বৌদ্ধ গীতায় নীতি পাইবেন। খৃষ্টান ঈশ্বরের পিতৃ-ভাব পাইবেন। মুসলমান্, সখ্যভাবের শিক্ষা লাভ করিবেন। অবিশ্বাসী নাস্তিক নিরীশ্বরবাদীও নিরাশ হইবেন না; তাঁহারও মতরত্ন গীতার অমূল্য ভাণ্ডারে জাজ্বল্যমান। সংক্ষেপে গীতার প্রশংসা করিতে হইলে, আমরা বলিব, "অতীত ও বর্ত্তমান-জগতের জ্ঞান-রাশি পুঞ্জীকৃত করিয়া গীতার রচনা সম্পাদন করা হইয়াছে।" এরূপ অমূল্য গ্রন্থ কোনও জাতির কোনও ভাষায় দ্বিতীয় নাই, ইহা আমরা অত্যুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নহি। গীতায় গৌরবের যখন এত সামগ্রী আছে, তখন গীতা যে গৃহে গৃহে আদৃত হয় কেন, তাহা স্থূলবুদ্ধিরও অগম্য নয়।

এখন সপ্তশতীর কথা। সপ্তশতী গীতার ন্যায় গভীর-দার্শনিকতা-পূর্ণা নহে, ইহাতে জ্ঞান-যোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের বিস্তৃত বর্ণনা নাই। উপনিষৎশাস্ত্রের সারতত্ত্ব ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। জগতের যাবদীয় ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্বের সমবায়-স্বরূপেও ইহার নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু ইহার মাহাত্ম্য অসীম! সর্ব্বস্তবমধ্যে সপ্তশতীর শ্রেষ্ঠস্থান। শাস্ত্র বলেন—"যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ দেবানাঞ্চ যথাহরিঃ। স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ। অথবা বহুনোক্তেন কিমেতন বরাননে! চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তিপাঠাৎ সর্ব্বাঃ সিদ্ধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ।" শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে সর্ব্ব-সিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীমন্মহাদেবের মুখ-নিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণে মনে কি চিন্তা উপস্থিত হয় না? সপ্তশতীর এত উচ্চস্থান কেন? ইহা কি কেহ ভাবিবার যোগ্য মনে করেন না?

আমরা শ্রীচণ্ডীর উৎকর্ষ - ও শ্রীগীতার সহিত তাহার বিষয়-গৌরবের তুলনা করা, এ প্রসঙ্গে সম্ভব মনে করি না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহা করিব। এখানে ইঙ্গিতমাত্র প্রদান করিতেছি।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রারম্ভে, মোহাক্রান্ত অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, শ্রীভগবানের গীতাজ্ঞানের অবতারণা। অর্জ্জুনের মত অধিকারীর জন্য গীতার সকল উপদেশ উক্ত হয় নাই; অর্জ্জুন উপলক্ষ্য, লক্ষ্য সমগ্র বিশ্ব, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। অর্জ্জুন গভীর জ্ঞান-ভক্তি এবং কর্ম্মতত্ত্বাদি শ্রবণ করিয়াও, "যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য"—ইহার অধিক কিছু বুঝেন নাই।

প্রবৃত্তি-মার্গের গণ্ডী অতিক্রম করিতে, তাঁহার সাধ্য হয় নাই। তিনি ধর্ম্মাশ্রমধর্ম্মের পর-পারে—গীতার তাবৎ উপদেশের যাহা লক্ষ্য—সেদিকে যাইবার অধিকারী নহেন! এমতাবস্থায় অর্জ্জুনের ন্যায় অধিকারীর নিকট গীতা-জ্ঞান ব্যর্থ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। সে জ্ঞান যে অর্জ্জুনের উদরে পরিপাক পায় নাই, তিনি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ে ধারণা করিতে সক্ষম হন নাই, প্রত্যুত তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহার সাক্ষী "উত্তরগীতা"। অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে, ভ্রংশন বা বিস্মৃতি অসম্ভব; পরোক্ষজ্ঞানেই তাহা সম্ভব; অতএব গীতা কার্য্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে।

অন্য দিকে শ্রীচণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। হৃতস্বারাজ্য ভূপতি সুরথ ও স্বজননিকৃত বৈশ্য সমাধি—মহামুনি মেধার নিকট উপস্থিত। তাঁহাদের প্রশ্ন সংসারের মোহের মূল কোথায়? মহামুনি মায়াময় সংসারের মূলস্বরূপ শক্তির বিচিত্র লীলা বর্ণনা করেন। আর বলেন, সেই মহাশক্তির আরাধনায় অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হয়। মুনিমুখ-বাণী শ্রবণ করিয়া, আশ্বস্ত ও বিশ্বস্ত শিষ্যদ্বয় (নৃপতি ও বৈশ্য) শক্তিসাধনায় অগ্রসর হইলেন। কঠোর সাধনা—তীব্রতপঃ—হৃদয়ের রক্ত উপহার! সন্তানের প্রতি মায়ের দয়া হইল। ভগবতী আবির্ভূতা হইয়া, বরদান করিতে চাহিলেন। নৃপ সুরথ প্রবৃত্তিমার্গের পথিক, তিনি পরলোকে অক্ষয় রাজ্য এবং ইহলোকে হৃত-স্বরাজ্য কামনা করিলেন। নির্ব্বিণ্ণচিত্ত বিরক্ত বৈশ্য সমাধি—নিবৃত্তিমার্গে উপনীত হইয়াছেন, তিনি 'জ্ঞানোদয়' প্রার্থনা করিলেন। রাজা ভোগ এবং বৈশ্য জ্ঞান—অর্থাৎ জ্ঞানোত্তরবর্ত্তী মোক্ষ লাভ করিলেন। ধর্ম্মের দুইরূপ—প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ। যিনি যে সাধনার উপযুক্ত, তিনি তাহাতেই কৃতকার্য্য হইলেন। ধন্য (মহামুনি) গুরুর উপদেশ! ধন্য শিষ্যের সাধনা!! ধন্য পরিণাম!!! মহামুনি কণাদের উক্তি স্মরণ করুন—"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

এখন বলা যাইতে পারে, শ্রীচণ্ডী কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই একটী মাত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিলেই বোধ হইবে, শ্রীচণ্ডীর আনুষ্ঠানিক সত্য কত মূল্যবান্;—পক্ষান্তরের শ্রীগীতার সিদ্ধান্তানুগত মূল্যই বা কত! শ্রীচণ্ডীর ও শ্রীগীতার রূপক-পরিচ্ছদ দেখাইবার সময় এখানে নাই, তাহাই আগ্রহশালী পাঠককে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

এখন একটী কথা। তীব্র-তপঃ সম্পন্ন কঠোর-সংযম-পরায়ণ ধ্রুবের দীর্ঘকালব্যাপী সাধন সফল হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বড় কঠোর—বড় দুঃসাধ্য! এমন কি, সাধারণের অবোধ্য। সুতরাই তাহার মাধুর্য্য কেহ অনুভব করে না। আর প্রহ্লাদের প্রেম-ভক্তিও সফলতালাভ করিয়াছিল; কিন্তু তাহা বড় মধুর মনোহর সুন্দর! কি রঙ্গমঞ্চে, কি সামাজিকগণের মনোমঞ্চে—প্রহ্লাদ সাজে ভাল; ধ্রুব সেরূপ সাজে না। সপ্তর্ষির মস্তকোপরি জগদ্দুর্ল্লভ-গৌরব ধ্রুবলোক—ধ্রুবের পরিশ্রমের অদ্বিতীয় পুরস্কার, কিন্তু তাহার কেহ খবর লয় না। প্রহ্লাদের প্রেম-ভক্তি সকলেই কামনা করে। তীব্রতার ফল সুন্দর হউক, কিন্তু তাহা আর এখন ভাল লাগে না। এখন মাধুর্য্যের যুগ। তাই গৃহে গৃহে গীতার পূজা; চণ্ডীর সেরূপ সমাদর নাই। "গীতা" কেবল বক্তৃতা-স্বরূপ মনে করা হয়, এই জন্যই গীতার এত আদর! যদি কেহ উহার সাধনাংশ খুলিয়া দেখান—কুসুমশয্যায় শায়িত সমাজ

গীতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। চণ্ডীতে সাধনাংশ পরিস্ফুট, সিদ্ধান্তাংশ পিহিত, কাজেই এ সমাজে তাহার তাদৃশ সম্মান নাই। ভোগ মোক্ষ উভয়ত্রই চণ্ডীর রাজ্য। গীতার রাজ্য তত বিস্তৃত নহে। কারণ, গীতা দুগ্ধপায়ী বৎস অর্জ্জুন জ্ঞান বা মোক্ষলাভে অধিকার প্রাপ্ত হন নাই; কেননা অধিকার-লাভ কর্ম্মানুষ্ঠান-সাপেক্ষ। শুধু বচন রচনায় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, পরে জ্ঞানোদয়, অনন্তর মোক্ষ। অর্জ্জুনের কর্ম্মসাধনা ক্ষীণাতিক্ষীণা, কাজেই মলিন চিত্ত-আদর্শে জ্ঞান-ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হয় নাই। গীতার উপকরণ—মোক্ষরাজ্যের কিন্তু অধিকারী ভোগরাজ্যের উভয়ের সমাবেশ সম্ভব হয় নাই। এই ব্যর্থতা চিন্তা করিয়াই, গীতাকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলেন; কেহবা রূপকে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। আমরা গীতাপাঠে মনে করি, গীতার অধিকার মোক্ষরাজ্য, কিন্তু অর্জ্জুনের দিকে তাকাইয়া বলি ভোগরাজ্য। যাহাই হউক্ গীতার অধিকার উভয়-ব্যাপী নহে, চণ্ডীর অধিকার উভয়ত্র বিস্তৃত। এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী, ভারতীকুটীর,
প্রতাপবাটী।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

স্বদেশী সরল ফলিত-পঞ্জিকা। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পঞ্জিকাখানি পাঠ করিয়া, আমরা পরম প্রীত হইলাম। এই পঞ্জিকার গণনায় অবলম্বন মহামান্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত। গ্রন্থকার নিপুণ ফলগণক, শুনিয়াছি। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা-প্রণেতা ৺মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত শশিবাবু উপদেশ প্রাপ্ত হন—এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার গণনা সূক্ষ্ম গণিতানুযায়িনী, একথা পঞ্জিকাকার নিজে বলিতেছেন। ৺মাধব বাবুও সেই কথা বলিতেন। দৃক্ ও গণিতের ঐক্যের গৌরব মাধব বাবু—করিতেন—এ পঞ্জিকায়ও দেখিতেছি। মাধব বাবুর বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার গণিতসম্বন্ধে যত গৌরব করা হইত, তাহা প্রকৃত তত সূক্ষ্ম বা গৌরবার্হ ছিল না। এ পঞ্জিকার গণিতের পরিচয়ও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। পঞ্জিকাখানি প্রচলিত সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, স্ত্রীলোকেরাও ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারেন। পঞ্জিকা ব্যতীত একদণ্ডও হিন্দুজীবন চলিতে পারে না, সুতরাং উহা সরল ভাষায় লিখিত হওয়া সুখের বিষয়। প্রচলিত পঞ্জিকার সহিত ইহার কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইল। প্রত্যক্ষ ফলই সে বিবাদের ভঞ্জন করিবে, ভরসা করি। নাম-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে শ্রীযুত শশিবাবু বলেন, "এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রকাশজন্য, ও স্বদেশের মঙ্গলার্থ ও ব্যক্তিগত সুবিধার্থে, এই পঞ্জিকা গণিত হওয়ায়, ইহার নাম স্বদেশী—ও সরল বাঙ্গালায় লিখিত বলিয়া ইহার নাম সরল—ইহার ফল প্রত্যক্ষীভূত হইবে বলিয়া ইহার নাম ফলিত—সুতরাং ইহার নাম স্বদেশী সরল—ফলিত—পঞ্জিকা।" আমরা বলি, প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিলে, সকলের নিকটই আদৃত হইবে, নিঃসংশয়। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম—সূক্ষ্মগণিতাগত-কালে বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে, যিনি প্রকৃত সহায়তা করেন, তিনি ধর্ম্মরক্ষক, সুতরাং সমাজের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পাত্র,—সন্দেহ নাই। আমরা শশিবাবুর উদ্যম, সহিষ্ণুতা এবং নির্ভরশীলতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই।

১৩শ বর্ষ। আষাঢ়-শ্রাবণ। ৩য় ৪র্থ সংখ্যা।

১৮২৮, ১৩১৩।

গ্রাহকগণ!

বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৮।

সম্পাদক রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এইক্ষণে হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইলে ২৩ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা এই ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টরীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

ধর্ম্ম-কথা।

যথাবিহিত বিনয়পুরঃসর ঋষি জাবালি, গোস্বামী বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করেন,—

মহর্ষে কে কলৌধর্ম্মাঃ কিমাচারাশ্চ কীদৃশাঃ।
বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ কিং কৃত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ॥

অর্থাৎ, হে ঋষে! কলিতে ধর্ম্ম কি, আচার-ব্যবহার কিরূপ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মই বা কেমন? কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে কলি-ভয় হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়? উত্তরে বেদব্যাস বলেন—

ধর্ম্মেমতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং সহ্যেক
এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাঃস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপিসেব্যমানা নৈবাপ্ত-
ভাবমুপযান্তি ন চ স্থিরত্বং॥

তোমরা ধর্ম্মমর্ম্ম অবগত হইবার জন্য উত্থিত হইয়াছ, এ জন্য তোমাদিগের ধর্ম্মে মতি হউক। সেই ধর্ম্মই পরলোকগত ব্যক্তির পরম বন্ধু; ধনদারাদি নিপুণব্যক্তি-দ্বারা সেবিত হইলেও আপ্তভাবাপন্ন হয় না, হইলেও চিরস্থায়ী হয় না। (কেবল ধর্ম্মই পরকালের সাহায্য করিয়া থাকেন।)

ধর্ম্মঃ সনাতনঃ সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদা মুনে।
ধর্ম্মএব পরোবন্ধুঃ পিতা মাতা পিতামহঃ॥

হে মুনে! একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই সদা সর্ব্বপ্রকারে সকলেরই সেবনীয়; ধর্ম্মই পরম বন্ধু, ধর্ম্মই পিতা, ধর্ম্মই মাতা, ধর্ম্মই পিতামহ, অর্থাৎ ধর্ম্মই আত্মরূপে সর্ব্বঘটে বিরাজিত।

সদসৎকর্ম্মণাং দ্রষ্টা ধর্ম্ম এব সনাতনঃ।
ধর্ম্মে মতিঃ পরোলাভস্তস্তদ্ধ্যপচয়োঽন্যথা॥

সৎই হউক বা অসৎই হউক, যখন যে কর্ম্ম করা যায়, একমাত্র ভগবান্ ধর্ম্মই তাহার সাক্ষী; অতএব সেই ধর্ম্মে মতি হইলে, তাহাই পরম লাভ; তদন্যৎ ধর্ম্মে বিতৃষ্ণাই অপচয়ের কারণ।

সা চাতুরী চাতুরী যা ধর্ম্মরক্ষাকরী ভবেৎ।
সহস্রোপদ্রবৈর্যুক্তো যো ধর্ম্মং ন জহাতি হি।
সধীর উচ্যতে সদ্ভির্ধর্ম্মহাত্মাত্মহা মতঃ॥

সেই চাতুরীই চাতুরী, যাহা ধর্ম্মরক্ষাকরী হয়; (ধার্ম্মিক ভিন্ন ধর্ম্ম-মর্ম্ম অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না;) সহস্র উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়াও যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করে, বিচক্ষণ সাধুগণ তাঁহাকেই 'ধীর' বলিয়া থাকেন। যাহারা লোভে, মোহে, অসদামোদে অথবা ঔদাস্য করতঃ ধর্ম্মের হানি করে, তাহাদিকে "আত্মঘাতী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ধার্ম্মিকোযত্র তত্তীর্থং ধার্ম্মিকো নিরুপদ্রবঃ।
নাধর্ম্মে রমতাং বুদ্ধির্যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ॥

যে স্থানে ধার্ম্মিকের বাস, সেই স্থান মহাতীর্থ; ধার্ম্মিকের আপৎপাতের সম্ভাবনা নাই। অধর্ম্ম দ্বারা কদাপি ইষ্টলাভ হয় না, সুতরাং তোমরা অধর্ম্মরত হইও না। যেখানে ধর্ম্ম, (সেইখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ,) সেইখানেই জয়।

গৌরেকং পঞ্চ চ ব্যাঘ্রী সিংহী সপ্ত প্রসূয়তে।
হিংসকাঃ প্রলয়ংযান্তি ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং॥

গাভী এক, সিংহী সাত, ব্যাঘ্রী একবারে পাঁচটী সন্তান প্রসব করে; হিংস্রক-ভাবপ্রযুক্ত ব্যাঘ্র ও সিংহ লয় প্রাপ্ত হয়, হিতৈষণা-প্রযুক্ত গো-সকল দ্বারা এই পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ তাৎপর্য্যতঃ ধার্ম্মিকের জয়—অধার্ম্মিকের ক্ষয় অনিবার্য্য।)

ধর্ম্মার্থেধ্রিয়তে দেহো ধর্ম্মার্থে সুস্থিরা মহী।
ধর্ম্মার্থে বর্ষতীন্দ্রোহপি ধর্ম্মার্থে তপতে রবিঃ॥

ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্যই দেহধারণ, ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগার্থে নহে। ধর্ম্মার্থে এই পৃথিবী সুস্থিরা হইয়াছেন। ধর্ম্মার্থে ইন্দ্রদেব বর্ষণ করেন, তাহাতেই শষ্যাদির উৎপত্তি হয়; কেবল তরণার্থ নহে। ধর্ম্মার্জ্জনজন্য সূর্য্যদেব উদিত হয়েন, কেবল প্রকাশের জন্য নহে।

নামুত্রংহি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতি।
ন পুত্রদারায়জ্ঞাতির্ধর্ম্ম স্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

পরলোক-সহায়ার্থ পিতা, মাতা, পুত্রকলত্র—জ্ঞাতি কেহই থাকেন না, কেবল ধর্ম্মই সাহায্য করেন, অতএব সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান একমাত্র কর্ত্তব্য।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোহনুভুঙ্ক্তে সুকৃতমেকএবচ দুষ্কৃতং॥

জীবমাত্রই একা জন্মে, একাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। একাই সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করে। (সুতরাং ধর্ম্মাস্থা-রহিত হইয়া, কাহারও প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী হওয়া অকর্ত্তব্য। যদি কেহ সংসারে আত্যন্তিক প্রসক্তিনিবন্ধন চৌর্য্যাদি দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা, জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ও সংসার-পালন-নিরত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই দুষ্কৃতির জন্য ফলভোগ করিতে হয়। এক ধর্ম্মই জীবের পরম বন্ধু, আর কিছুই কিছু নহে।)

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥

প্রাণহীন দেহকে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া, আত্মীয়, স্বজন, পরিবারবর্গ বিমুখ হইয়া পলায়ন করে, কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই তখন পরিত্যাগ করেন না, তিনি মৃতের আত্মার অনুগমন করেন।

তস্মার্দ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেন হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥

সেজন্য ক্রমশঃ অল্পে অল্পে ধর্ম্মসঞ্চয় করা মানবের কর্ত্তব্য। কারণ (ধর্ম্মের সাহায্যে দুস্তরতম উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

ধর্ম্মঃপ্রধানপুরুষং তপসা দগ্ধকিল্বিষং।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণং॥
তপস্যাগ্নিতে দগ্ধ-পাতক ধার্ম্মিক-ব্যক্তিকে স্বয়ং ধর্ম্মই সমুজ্জল-পরলোকে লইয়া যান।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী

বৈদ্যনাথ।

সামাজিক আচার-ব্যবহার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আশ্বিন সুধ পূর্ণিমা। এই দিন রজনীতে হরপার্ব্বতী-মূর্ত্তি অর্চ্চিত হয়, সকলে 'অক্ষদ' লেপন করে। তণ্ডুল ও কুঙ্কুম-মিশ্রিত এক প্রকার পদার্থকে 'অক্ষদ' বলে। সমস্তরাত্রি মৃণ্ময়প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ—উন্মুক্ত আকাশতলে চন্দ্র-কিরণে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়; পরে পূজা শেষ হইলে, তাহা বাড়ীর লোক-জন ও প্রতিবেশীর মধ্যে বিতরিত হয়। রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যায় না; এই জাগরণকে 'কোজাগরী' বলে। বঙ্গদেশের লক্ষ্মীপূর্ণিমার রজনীতেও আমরা এইরূপ করিয়া থাকি।

দেওয়ালী। তৎপরের মহোৎসব—দেওয়ালী। উৎসব আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী হইতে আরম্ভ হইয়া চৌদ্দদিন চলিতে থাকে। এতন্মধ্যে পাঁচ দিন লক্ষ্মী-পূজা হয়। লোকে স্নান করতঃ নববস্ত্র পরিধান করে। গৃহস্থ, জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী আনে। উৎসবের দ্বিতীয় দিবসে 'গোকৃরিদান' হয়। গোলাহ-উৎসবে যেমন বলীবর্দ্দকে আদর করা হয়, গোকৃরি-দানে তদ্রূপ গাভীসমূহকে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করাইয়া সজ্জিত করা হয়। এত-দ্দেশবাসীগণের মধ্যেও বিলাসিতা ঢুকিয়াছে; ইহারাও এই উপলক্ষে সুগন্ধ-তৈল ও আতরাদি ব্যবহার করে, এবং আতসবাজি প্রভৃতি পোড়ায়। তৃতীয় দিবসে ভগিনী, ভ্রাতার কপালে 'অক্ষদ' লেপন করিয়া থাকে।

তুলসী বিবাহ। কার্ত্তিক মাসের শুক্লদ্বাদশীতে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলসীবৃক্ষের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করে। আখপত্রাচ্ছাদিত একখানি ছোট চালার নিম্নে তুলসীবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ব্রাহ্মণগণ এই ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। দ্বিজগণ উদর-পূর্ত্তি করিতে পান, এবং অন্যান্য সকলের মধ্যে পান্সুপারি বিতরিত হয়। ইহার পূর্ব্বদিবস 'কার্ত্তিক একাদশী' অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুরা এই দিবস উপবাস করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা। কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাকে লোকে 'পুনড়ি পুণিম' বলে। এই দিবস রাত্রে বিষ্ণুমন্দির আলোক-মালায় সুশোভিত হয়। ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, সকলে আহার করে। এই ভোজন-ব্যাপারকে 'পানপিট' বলে। এই উৎসবকে কেহ কেহ 'মার্গশীর্ষ' বা 'পূর্ণিমা' নামেও অভিহিত করিয়া থাকে।

নাগ দেউই। মার্গশীর্ষ মাসের কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে এই উৎসব নির্ব্বাহিত হয়। তৎপর দিবস 'চাঁপাষষ্ঠী'। এই দিবস 'খাণ্ডব' দেব অর্চ্চিত হন। দেবতার সম্মান-বর্দ্ধনের নিমিত্ত একটী ছোট মেলা বসে।

পৌষ-সংক্রান্তি। পৌষ সংক্রান্তির দিবস রমণীগণ 'সৌভাগ্যব্রত' করিয়া থাকে। তাহারা উৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া 'তিল্লি' নামক খাদ্য—বন্ধু ও সহচরী-বর্গকে দান করে। ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হয়। রমণীরা আত্মীয়স্বজনকে ধুতি, চাদর প্রভৃতি উপহার দান করে।

বসন্ত-পঞ্চমী। মাঘমাসের শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে বসন্তপঞ্চমী অনুষ্ঠিত হয়। গৃহ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সহিত নব-নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি এই দিবস আম্র মুকুলের দ্বারা পূজিত হন।

হোলী। বৎসরের শেষ উৎসব হোলী, ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন পার্ব্বতীর পূজা হইয়া থাকে। পূজামণ্ডপের সম্মুখে গোময়-চাপড়া ও এড়ণ্ডবৃক্ষ রক্ষিত হয়, পূজাশেষে তাহাতে অগ্নি সংযোজিত হয়। প্রত্যেক পল্লীর অধিবাসিবৃন্দ এই দিবস কোন প্রকাশ্য স্থানে গোবর-চাপড়া এবং কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে। অশ্লীল গান গাইতে গাইতে রাস্তায় বাহির হয়। রমণীগণ ভয়ে এই দিবস পথে বাহির হয় না। উৎসবের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, উৎসবের পরেও কয়েক দিন লোকে নৃত্যগীতাদি উপভোগ করে।

একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুগণ মোসলমানের মহরম উৎসবে যোগদান করে। উহারা 'তাজি' সহ গায়কদিগকে নিজ বাড়ীতে আহ্বান করিয়া, আমোদ প্রমোদ করে, এবং পরে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় দেয়।

আল্লা। বঙ্গদেশে যেমন বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে শীতলা দেবীর পূজা হইয়া থাকে, এতদ্দেশে তেমনি কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির উপদ্রব হইলে 'আল্লা' দেবীর পূজা হয়। পূজার নির্দ্দিষ্ট কোন তিথি, বা দেবীর কোনও প্রতিমূর্ত্তি নাই। এক খানি কৃষ্ণপ্রস্তরে তৈল-সিন্দুর মাখাইয়া, ব্রাহ্মণগণ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করেন। দেবীর পরিতুষ্টির নিমিত্ত ছাগ, এবং অবস্থা-বিশেষে মহিষাদিও বলি দেওয়া হয়।

দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে পূর্ব্বোক্ত ব্রত ও উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা থাকিল।

উপসংহার।

চতুর্থবর্ষের 'প্রদীপে' 'বৈদ্যনাথ'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ-লেখক একস্থলে লিখিয়াছেন,—'বীরবিক্রম সিংহ ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে গিধোড় রাজধানী সংস্থাপন করেন। পূরণ মল্ল তাঁহার বংশধর। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্বর্গগত ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় আমাদের কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বৈদ্যনাথ-মন্দির ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের আরও অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক। তজ্জন্য তাঁহার মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে যাইয়া, কয়েকটী যুক্তিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ—পূরণমল্ল ও রঘুনাথের সময়ের পূর্ব্বে কোন মন্দির না থাকিলে, রঘুনাথের পিতা বোধন কি পূজা করিতেন? দ্বিতীয়তঃ—খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অনেক

বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থে বৈদ্যনাথের প্রসিদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সহস্রাধিক লিঙ্গের মধ্যে দ্বাদশটী অতি প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। (১) ইহার মধ্যে বৈদ্যনাথের শিবলিঙ্গ একটী। এই লিঙ্গ উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের সমসাময়িক। ভুবনেশ্বর ১২০০ বর্ষের প্রাচীন, সুতরাং ইহার সমকালের হইয়া বৈদ্যনাথ লিঙ্গ এত দীর্ঘ সময় (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত) মন্দির-শূন্য অনাবৃত স্থানে থাকিতে পারে না। কোন না কোন হিন্দু তাহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া থাকিবেক। তৃতীয়তঃ—পূর্ব্বমন্দির ভগ্ন করাইয়া, পূরণমল্লসিংহ নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এইরূপও সম্ভব হয় না। কারণ স্মৃতিতে দেবমন্দির ভগ্ন করার নিষেধ আছে। স্মৃতির অনুশাসন অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং পূরণমল্ল স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুরাজা হইয়া, অনার্য্যোচিতকার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হন নাই। এই সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, তিনি বলেন, পূরণমল্ল বৈদ্যনাথ-মন্দিরের নির্ম্মাতা নহেন। (২) তিনি মন্দির-সংলগ্ন অলিন্দ মাত্র প্রস্তুত করাইয়া, মন্দির-নির্ম্মাণের প্রশংসা ও যশোলাভ কামনায় উক্ত অশাস্ত্র প্রস্তর-লিপি স্বহস্তে লিখিয়াছেন।

বৈদ্যনাথ-মন্দিরে যে দুইটী খোদিত লিপি আছে, তাহার একটী মৈথিল অক্ষরে লিখিত। অন্যটী নাগর অক্ষরে লিখিত হইলেও, প্রথমাংশ অস্পষ্ট, সুতরাং অবোধ্য। যাহা হউক্ আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। মৈথিল অক্ষরে লিখিত লিপি,—

শান্তা সমুদ্রান্তবসুন্ধরায়াঃ
যষ্টাশ্বমেধাত্মমহাক্রতুনাম্।
আদিত্যসেনঃ প্রথিতপ্রভাবো
বভূব রাজা হ্যমরতুল্যতেজাঃ॥
মাসাঃ বিশাখাপদসংযুতায়াং
কৃতে যুগে চোলপুরাদপেত্য।
মহামণীনামযুতত্রয়েণ
ত্রিলক্ষচামীকরটঙ্ককেন॥
ইষ্টাশ্বমেধত্রিতয়েন দত্ত্বা
তুলাসহস্রং হয়কোটিযুক্তম্।
শ্রীকোষদেব্যা সহিতে মহিষ্যা
অচীকরৎ কীর্ত্তিমিমাং স সর্ব্বাং॥
কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং বিধিবদ্দ্বিজেন্দ্রৈঃ
স্বয়ং যথা দেবপথং নরেন্দ্রঃ।
কল্যাণহেতো র্ভুবনত্রয়স্য
চকার সংস্থাংনৃহরেঃ স এব॥

(১) সৌরাষ্ট্রে সোমনাথংচ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্
উজ্জয়িন্যাং মহাকালং ওঁকারমমরেশ্বরে।
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করং
বারাণস্যাং চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে।
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দ্বারকাবনে
সেতুবন্ধেতু রামেশং ঘুমৃণেশং শিবালয়ে॥
(পদ্মপুরাণ)

(২) "It is obvious to me therefore, that the tradition which holds the temple to be old and ascribes the Puranamalla only the lobby, incorrect and that having defrayed the cost of the lobby which because a part and an integral part of the temple, be by a Figure of a Syneedoche" claimed credit for the whole. (On the Temples of Deoghorh; Dr. Rajendra Lal Mitra.)

স্থাপিতো বলভদ্রেণ বরাহোভুক্তিমুক্তিদঃ।
স্বর্গার্থে পিতৃমাতৃণাং জগতঃ সুখহেতবে॥
ইতি মন্দারগিরিপ্রকরণম্॥

আগমুদ্র ক্ষিতীশ্বর, অশ্বমেধযজ্ঞকারী অমরতুল্যতেজস্বী আদিত্য সেন নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি কৃতযুগে মহিষী সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া, এই মহদ্ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন। এই মহৎকার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে, তিনি তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, সজ্জনদিগকে তিন লক্ষ ত্রিশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করেন, এবং সহস্র-বার তুলাপুরুষদান করিয়া, কোটি স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন। তিনি মানবের কল্যাণার্থ দ্বিজ-দ্বারা নরহরিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করাইয়া স্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার করেন। জগতের হিতার্থ এবং পিতৃগণের স্বর্গার্থ তিনি ভুক্তি মুক্তি-প্রদ বরাহমূর্ত্তি স্থাপন করেন। — মন্দার-গিরি প্রকরণ।

অস্পষ্ট-লিপির শেষাংশ যথা,—

শ্রীবৈদ্যনাথচরণাব্জমধুব্রতেন
বিপ্রাব্রতংসরঘুনাথগুণার্ণবেন।
প্রাপ্য প্রসাদম * * * মিদং ব্যধায়ি *
প্রাসাদসেতুবনবারিমঠাদি সর্ব্বম্॥

প্রথমোক্ত লিপিপাঠে জানা যায়, ইহা মন্দারপর্ব্বত হইতে আনীত হইয়াছে। বাবার মন্দিরের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই।

রাজা পুরণমল্ল মন্দিরনির্ম্মাণের প্রশংসা লইতে ইচ্ছুক হইলে, রঘুনাথ ওঝা, বাবার নিকট হত্যা দিয়া, কতিপয় দিবস উপবাসী হইয়া থাকেন। পরে বাবা, তাঁহাকে একটী বারান্দা প্রস্তুত করিয়া, নিজকীর্ত্তি প্রকাশক লিপি খোদিত করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তাহাতেই রঘুনাথ শেষোক্ত লিপি বারান্দায় খোদিত করিয়া গিয়াছেন।

মন্দিরের নির্ম্মাণকারী যিনিই হউন, বৈদ্য-নাথের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। মিঃ গরিক স্বচক্ষে বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া, লিখিয়াছেন যে, বৈদ্যনাথের পশ্চিমভাগে একটি সমুন্নত মৃত্তিকাস্তূপ পরিদৃষ্ট হয়। উহার উপর একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত মন্দিরটী আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয়। উহার অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে আর একটী স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার উপর একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এই স্থান কাকাহিগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহার দক্ষিণদিকে আর একটী স্তূপ আছে, এবং তাহার উত্তরে বৃক্ষাদির পাদ-দেশে খোদিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসমূহ পড়িয়া আছে—ইত্যাদি। বৈদ্যনাথ-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত অবিকল উদ্ধৃত হইল;—

"It is perhaps one of the most interesting sits in India—not so much for its present standing architectural remains, which though ancient, are comparatively few in number, but on account of its historical associations, both archoeological and enthnological, its situation being sourrounded on all sides by countless structural relics of a by-gone time, which alike tell vividly of the rise and fall of un-

known dynasties, and set forth examples of the earliest Bhrahmanical architecture of which we have knowledge"

Archœoloical Survey Reports, 28.

বৈদ্যনাথ সাঁওতাল পরগণার একটী সব্‌ডিভিসন্। মুসলমান্‌-রাজত্বের শেষভাগে বৈদ্যনাথ বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। এখানে স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিদিগের ভিড়,(১) এবং পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত সরকারী-কর্ম্মচারীদিগের আমদানী অধিক। কেহ কেহ ২।৩টী বাঙ্‌লা প্রস্তুত করিয়া, একটীতে নিজে থাকেন ও অপরগুলি ভাড়া দিয়া তল্লব্ধবিত্ত দ্বারা সচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অপরাপর স্থান হইতে এখানে বাড়ীভাড়ার একটু বিশেষত্ব আছে। চৈত্র হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত বাড়ীভাড়া সমান থাকে। আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মনে করুন, একটী বাড়ীর ভাড়া চৈত্র হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত ২৫৲ টাকা। আশ্বিন মাসে তাহার ভাড়া ত্রিশ টাকা হইবে, এবং বৃদ্ধি হইতে হইতে শীতের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াইবে। ইহার কারণ শীতের সময় লোকে বায়ুপরিবর্ত্তনে যায়, এবং সেই সময় অনেক সৌখিন বাবু সখ কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করিতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হন। যিনি যে অভিপ্রায়েই তথায় পদার্পণ করুন না কেন, তিনি সেই পুণ্যেই শুভফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ রামচন্দ্র দশরথকে বলিয়াছিলেন,—

যশ্চ সর্ব্বগণারাধ্যঃ মমারাধ্যো বিশেষতঃ।
অত্রাহং বৈদ্যনাথস্তং দর্শয়ামি জগৎপতিং॥
বৈদ্যনাথদেবঃ যাবদ্দৃষ্টিসায় প্রজায়তে।
তাবচ্চ মুক্তিবৃক্ষস্য ফলানি ন ফলন্তি বৈ॥
নৃণাং সুকৃতপুণ্যানাং সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহং।
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা নৃভিঃ কার্য্যং বৈদ্যনাথস্য দর্শনং॥
(পদ্মপুরাণ।)

বৈদ্যনাথ সাঁওতাল পরগণার মধ্যে হইলেও, উহার অধিবাসীগণ সকলেই সাঁওতাল নহে। অন্যূন নয় সহস্র অধিবাসীর মধ্যে, বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় দুইশত। হিন্দী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত "কায়েতি" এখানকার প্রচলিত ভাষা।

বৈদ্যনাথে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহার সন্নিকটে তত্রত্য ইংরাজি-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ৮৯২ খৃষ্টাব্দে একটী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরলোকাগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় উক্ত আশ্রম নির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয়ভার একাকী বহন করিয়া, নিরাশ্রয় কুষ্ঠরোগী এবং জনসাধারণের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায়ক্রমে, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামানুযায়ী আশ্রমের নাম 'রাজকুমারী-কুষ্ঠাশ্রম' হইয়াছে। আশ্রমের দেওয়ালে একখানি কাষ্ঠফলকে লেখা আছে,— "Please contribute something for those unfortunate sons of God." এই কাতর করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলে, কাহার প্রাণে না দয়ার সঞ্চার হয়? অযথা কত অর্থ ব্যয় করিতেছি, ছাইপাঁশ ভক্ষণে উদর-পূর্ত্তি করিতেছি, কিন্তু

(১) "আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী"—দেবী-ভাগবত,৩৮ অধ্যায়।

আমাদের মধ্যে কয়জন এই সকল দুঃখী ব্যাধিক্লিষ্ট আতুর ব্যক্তিগণের পরিম্লান মুখশ্রীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন? কয়জন আহারে বসিয়া, ইহাদের জন্য একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন? হায় মানব! যতদিন তুমি পরের দুঃখে কাঁদিতে না শিখিবে, যতদিন না তোমার 'বারাঙ্গনা-বিলাস-বিভ্রম-বিমূঢ়তা' বিদূরিত হইবে, ততদিন তুমি প্রকৃত সুখ পাইবে না! পরের দুঃখ অপনোদন করিয়া যে বিমল আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। তত দিন তোমাদিগকে আত্মশূন্য, পরিচয়শূন্য, মনুষ্যত্বশূন্য হইয়া, মরণ-ভয়ে ভীত এবং অরুন্তুদ ক্রন্দনে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিতে হইবে!

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

চারুচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুর্য্যান্নীচজনাভ্যস্তাং ন যাচ্‌ঞাং মানহারিণীম্।
বলিযাচ্‌ঞাপরঃ প্রাপ লাঘবং পুরুষোত্তমঃ ॥৭১॥

নীচজনের অভ্যস্ত মানহারিণী যাচ্‌ঞা করিবে না; পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলির নিকট যাচ্‌ঞা করিতে গিয়া খর্ব্ব হইয়াছিলেন।

[(বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি যাচ্‌ঞা করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বামনরূপ হইয়াছিলেন, এবৃত্তান্ত শ্রীভাগবতে ৮ স্কন্ধে ২১ অধ্যায় ও বামনপুরাণে ৮৯ হইতে ৯২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। এ উপাখ্যান সাধারণ-শ্রুতিগত বিধায় বর্ণনা অনাবশ্যক।)

যাচ্‌ঞা দ্বিতীয় মৃত্যুস্বরূপ—
"গতির্ভঙ্গঃ স্বরোহানি গাত্রকম্পঃ শিরোদ্গমঃ
মরণে যানিচিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে॥৭৭॥
গারুড়ে ১১৫ অধ্যায়।

জগৎ-পতিৰ্হি যাচিত্বা বিষ্ণুর্বামনতাং গতঃ।
কোঽন্যোঽধিকতরস্তস্য যোঽর্থী যাতি ন লাঘবম্॥৭৯॥
ঐ ঐ।

তৃণাদপি লঘুস্তূল স্তূলাদপি চ যাচকঃ।
বায়ুনা কিং ন নীতোঽসৌ কিঞ্চিৎপ্রার্থনশঙ্কয়া॥
কুব্জস্য কীটঘাতস্য বাতান্নিষ্কাসিতস্য চ।
শিখরে বসতস্তস্য বরং জন্ম ন যাচিতম্॥
ঐ ঐ

মৃত্যুঃকিং যদি দুর্জ্জনেষ্ববনতিঃ কিং ধিক্ যদি প্রার্থনা। সপ্তরত্নে।
যাচ্‌ঞায়াঃ পরমং দুঃখং মরণাদপি মানদ!
দেবীভাগবতে ১। ১৯। ১১।] ৫১॥

নজাতুরুন্তুদং কুর্য্যাৎ সতাং মর্ম্মবিদারণং।
চিচ্ছেদ বদনং শম্ভুর্ব্রহ্মণো বেদবাদিনঃ॥৩২॥

কখনও সাধুলোকের মর্ম্মে আঘাত দিবে না; মহাদেব বেদজ্ঞ ব্রহ্মার মুখ ছিন্ন করিয়াছিলেন।

[মহাদেব ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ ছেদন করিয়াছিলেন—
চিচ্ছেদ ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বং রুদ্রঃ ক্রোধাত্তু পঞ্চমম্।
তচ্ছিরোদুস্ত্যজং গৃহ্ন ব্রহ্মাণ্ডং পরিবভ্রমে॥
অত্রাগতো যদা ব্রহ্ম-কপালং পরিমুক্তবান্।
কপালমোচনো ভূত্বা দ্বিতীয়াবর্ত্তসংস্থিতঃ॥
স্কন্দপুরাণে—উৎকলখণ্ডে ৪ অধ্যায়ে।

মহাদেব ক্রোধভরে ব্রহ্মার পঞ্চম বদন ছেদন করিয়াছিলেন, ও সেই দুস্ত্যজ-মস্তক গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া, শঙ্খাকারক্ষেত্রের দ্বিতীয় আবর্ত্তন স্থানে, সেই ব্রহ্ম-কপাল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্ম-কপাল "কপালমোচন" নামে শিব হইয়াছেন।

ন বন্ধুস্বজনং দূষয়েন্নাপি বর্জয়েৎ।
দক্ষযজ্ঞ ক্ষয়ায়াভূৎ ত্রিনেত্রস্য বিমাননা ॥৩৩॥

বন্ধু ও আত্মীয় লোককে দূষিবে না, কিম্বা ত্যাগ করিবে না; মহাদেবের অবমাননা দক্ষযজ্ঞধ্বংসের কারণ হইয়াছিল।

ন বিবাদমদান্ধস্যান্ন পরেষামমর্ষণঃ।
বাক্পারুষ্যাচ্ছিরশ্ছিন্নং শিশুপালস্য
শৌরিণা ॥ ৩৪ ॥

বিবাদমদে অন্ধ হইবে না ও অন্যের মনে ক্লেশ দিবে না; শৌরি শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের দুর্ব্বাক্যে তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলেন।

কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে—
ন সংবসেৎ সুতকিনা ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ।
কূর্ম্মপুরাণে উপবিভাগে ১৬ অধ্যায়ে।
বাক্সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।
পরস্য নামর্ম্মসু তে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু ॥
[ভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২৯৯ অধ্যায়ে] ৩২॥

[মহাদেবের অপমান ও দক্ষযজ্ঞধ্বংস শ্রীভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ২—৫ অধ্যায়ে; লিঙ্গপুরাণে ১০০ অধ্যায়ে ও শিবপুরাণে বায়ুসংহিতায় পূর্ব্বভাগে ১৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। মহতের অপমান করা দোষ;—যথা—
অপূজ্যপূজনে চৈব পূজ্যানাং চাপ্যপূজনে।
নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহদ্ বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥১০
অসতাং সম্মতি র্যত্র সতামবম তিস্তথা।
দণ্ডো দৈবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পততি দারুণঃ ॥
শিবপুরাণে বায়ু-পূর্ব্বভাগে ১৭ অধ্যায়ে।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো
যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে ॥
শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৫।

মহাদেব সতীকে কহিয়াছিলেন, নিজজনের দ্বারা মান্য ব্যক্তির অপমান হইলে উহা মরণের কার্য্য করে। তজ্জন্য তুমি আমার কথা অবজ্ঞা করিয়া, পিত্রালয়ে যাইও না)।] ৩৩॥

[শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৭৪ অধ্যায়ে]

গুণস্তবেন কুর্ব্বীত মহতাং মানবর্দ্ধনম্।
হনুমান ভবৎস্তুত্যা রামকার্য্যভরক্ষমঃ।৩৫॥

মহত্ত্বের গুণ বর্ণন করিয়া, মানবৃদ্ধি করিবে; হনুমান্ স্তুতি দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া শিশুপাল কহিয়াছিলেন, "গোপাল-কুলপাংশুন শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠলোকসকলকে অতিক্রম করিয়া, কাক যেরূপ পুরোডাশকে লাভ করে, তদ্রূপ কি প্রকারে অগ্রে পূজা পাইবে?
সদাপতীনতিক্রম্য গোপালকুলপাংসনঃ।
যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্য্যাং কথমর্হতি॥৩৪॥

কবি মাঘ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—
অসুরস্য হতবধি কোঽপি মধুরিতি কথং
প্রতীয়তে।
দণ্ডদলিতসরঘঃ প্রণসে মধুসূদনস্ত্বমিতি
সূদয়ন্ মধু ॥২৩॥
* * *
ধৃতবান্নচক্রমরিচক্রভয়চকিতমাহবে নিজম্।
চক্রধর ইতি রথাঙ্গমদঃ সততং বিভর্ষি
ভুবনেষু রূঢ়য়ে ॥২৬॥
* * *
শিশুপালবধ কাব্যে ১৫ সর্গে।

তুমি মধুনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছ, ইহা কি প্রকারে প্রতীত হইবে? দণ্ডদলন করিয়া মধুমক্ষিকা নষ্ট করিয়াছ, তজ্জন্য "মধুসূদন" নামে খ্যাত হইয়াছ।২৩।

শত্রুসৈন্য-ভয়ে কখনও নিজসৈন্য রক্ষা কর নাই, তথাপি জগতে 'চক্রধর' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছ, কেবল একটা চক্র ধারণ করিয়া থাক বটে। (কিন্তু উহা বৃথা ভারমাত্র। * * *)

বিবাদ করা কর্ত্তব্য নহে—
আচরেৎ সর্ব্বদা ধর্ম্মং তৎবিরুদ্ধন্তু নাচরেৎ।
মাতাপিত্রাতিথীত্যাদ্যৈর্বিবাদং .. নাচরেদ্-
গৃহী ॥৩৬॥
গরুড়পুরাণে ৯৬ অধ্যায়ে।] ৩৪॥

[ইহার বৃত্তান্ত বাল্মীকি-রামায়ণে-কিষ্কিন্ধ্যা

গুণেম্বেবাদরঃ কুর্য্যান্ন জাতৌ জাতু তত্ত্ববিৎ।
দ্রৌণি র্দ্বিজোঽভবচ্ছূদ্রঃ শূদ্রশ্চ বিদুরঃ ক্ষমী ॥৩৬॥

জ্ঞানীব্যক্তি গুণের আদর করিবেন, কখনও জাতির বিচার করিবেন না। দ্বিজ অশ্বত্থামা শূদ্র হইয়াছিলেন, এবং শূদ্র বিদুরও ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন হইয়াছিলেন।

[(অশ্বত্থামার শূদ্রত্ব সৌপ্তিকপর্ব্বে ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর প্রতি শর-সন্ধান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই বালককে অশ্বত্থামার শর হইতে রক্ষা করিয়া, অশ্বত্থামাকে শাপ দিয়াছিলেন,— "রে ক্ষুদ্র! জনসমাজে তোমার বসতি হইবে না" ইত্যাদি) (মাণ্ডব্যশাপে যমের বিদুররূপে শূদ্র-জন্মগ্রহণ উপাখ্যান আদি-পর্ব্বে ১০৮ অধ্যায়ে, ও পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে ১৩৫ অধ্যায়েও আছে। তাহার বৃত্তান্ত এই। মাণ্ডব্যমুনি তপস্যায় ছিলেন। কতিপয় দস্যু কতকগুলি দ্রব্যাপহরণ করিয়া, মাণ্ডব্যাশ্রমে রাখিয়া, লুক্কায়িত ছিল। রাজ-কর্ম্মচারিগণ আসিয়া মুনিকে হৃতদ্রব্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, কোন উত্তর প্রদান না করিলে, মাণ্ডব্যকে চোর স্থির করিয়া, শূলে প্রদান করিয়াছিল। মাণ্ডব্য দেহ-ত্যাগানন্তর যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন যে "কোন্ পাপে আমার এ দশা হইল"? যম কহিয়াছিলেন যে "তুমি বাল্যকালে একটী পতঙ্গের পুচ্ছে একটী শূল আরোপ করিয়াছিলে, সেই পাপে তোমার শূলে আরোপণ হইয়াছিল"। মাণ্ডব্য ক্রোধে যমকে কহিয়াছিলেন যে, অল্পাপরাধে যখন আমার এ দণ্ড হইল, তখন তুমি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ কর।

গুণেন স্পৃহণীয়ঃ স্যাৎ ন রূপেণ যুতো জনঃ।
সৌগন্ধ্যবর্জ্জ্যং নাদেয়ং পুষ্পং কান্তমপি ক্বচিৎ॥
ভবভূতিঃ। গুণরত্নে।

সুলভা রম্যতা লোকে দুর্লভং হি গুণার্জ্জনম্॥
ভারবিঃ ১১। ১১।] ৩৬॥

[এ বিষয় মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৮ অধ্যায়ে, শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে, পদ্ম কাণ্ডে ৬৬ সর্গে বর্ণিত আছে। পবন স্বীয় পুত্রকে কহিয়াছিলেন—

উত্তিষ্ঠ হরিশার্দ্দূল লঙ্ঘয়স্ব মহার্ণবম্।
পরাহি সর্ব্বভূতানাং হনুমন্ যা গতিস্তব॥
বিষণ্ণা হরয়ঃ সর্ব্বে হনুমন্ কিমুপেক্ষসে।
বিক্রমস্ব মহাবেগ বিষ্ণুস্ত্রীন্ বিক্রমানিব॥

হে বানরশ্রেষ্ঠ! মহাসমুদ্রকে লঙ্ঘন-কর। হে হনুমন্! তোমার এই কার্য্যে সকল জীবের উপকার হইবে। হে হনুমন্! বানর-সকল বিষণ্ণবদনে রহিয়াছে, উপেক্ষা করিতেছ কেন? ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর ন্যায় তুমিও বিক্রম প্রকাশকর]

মানোহি মূলমর্থস্য মানেসতি ধনেন কিম্।
প্রভ্রষ্টমানদর্পস্য কিংধনেন কিমায়ুষা॥৩২॥

অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানোহি মহতাং ধনম্॥৩৩॥
গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে।

তজ্জন্য ভগবান্‌ও সকলের মান দিয়াছিলেন—

ভগবাংস্তত্র বন্ধূনাং পৌরাণামনুবর্ত্তিনাম্।
যথাবিধ্যুপসঙ্গম্য সর্ব্বেষাং মানমাদধে।
শ্রীভাগবতে ১। ১১ ২৭।

অলিতম হিরণ্যরেতসঞ্চয় মাস্কন্দন্তি ভস্ম-নাঙ্গনঃ।
অভিভূতিভয়াদসূনতঃ সুখমুজ্‌ঝন্তি ন ধাম-মানিনঃ॥
ভারবিঃ ২। ২০।] ৩৫॥

নাত্যর্থমর্থার্থনয়া ধীমানুদ্বেজয়েজ্জনম্।
অব্ধির্দ্রত্নাশ্বরত্নশ্রীর্মথ্যমানোঽসৃজদ্ বিষম্॥৩৭

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অত্যন্ত সম্বর্থনা জন্য কাহাকেও উদ্বেজিত করিবে না; সমুদ্র, মন্থন করায় উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌস্তুভরত্ন ও লক্ষ্মীদান করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনরায় মন্থন করাতে বিষ উৎপাদন করিয়াছিলেন।

বক্রৈঃ ক্রূরতরৈর্লুব্ধৈ র্নকুর্য্যাৎ প্রীতি-সঙ্গতিম্
বশিষ্ঠস্যাহরদ্ধেনুং বিশ্বামিত্রো নিমন্ত্রিতঃ॥১৮॥

বক্র, ক্রূরতর ও লুব্ধের সহিত করিবেনা ; বিশ্বামিত্র নিমন্ত্রিত হইয়া বশিষ্ঠের ধেনু হরণ করিয়াছিলেন।

পুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ৪র্থ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ৯ অধ্যায়ে, প্রভৃতি স্থানে বর্ণিত আছে। ইহা সকলের অবগতি আছে, তজ্জন্য পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

মনুষ্যকে উদ্বেজনা করা কর্ত্তব্য নহে—
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১২। ১৫।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, মনুষ্য যাঁহা হইতে উদ্বেজিত না হয়, ও যিনি মনুষ্য হইতে উদ্বেজিত না হন, তিনি আমার প্রিয়।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণে উৎপত্তি-প্রকরণে ৯।১১।
যস্মান্নোদ্বিজতে ভূতং জাতু কিঞ্চিৎ কথঞ্চন।
সোঽভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ সংপ্রাপ্নোতি মহামুনে॥
শান্তিপর্ব্বণি ২৬ । ৩১] ৩৭॥

[এ বিষয়ে আদিপর্ব্বে ১৭৭ অধ্যায়ে উপাখ্যান—

কান্য-কুব্জদেশে গাধিনামে এক মহারাজ ছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্র। তিনি এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠের কামদুঘা একটি ধেনু ছিল। মহর্ষি সেই ধেনুকে যখন যাহা প্রদান করিতে বলিয়া দোহন করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন। মহর্ষি সেই ধেনুর নিকট হইতে নানাবিধ খাদ্য দোহন করিয়া, বিশ্বামিত্রকে দিলে, বিশ্বামিত্র তাহা দর্শন করিয়া, মহর্ষির নিকট অর্ব্বুদ-সংখ্যা গো প্রদানে সেই কামদুঘা ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু মহর্ষি দিতে অস্বীকার করিলে, বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন।

এবমুক্তস্তথা পার্থ বিশ্বামিত্রো বলাদিব।
হংসচন্দ্রপ্রতীকাশাং নন্দিনীং তাং জহার গাম্॥২১॥

অলুব্ধের সহিত বন্ধুত্ব করা কর্ত্তব্য—
উত্তমৈঃ সহ সাঙ্গত্যং পণ্ডিতৈঃ সহ সৎকথাম্।
অলুব্ধৈঃসহ মিত্রত্বং কুর্ব্বাণো নাবসীদতি॥১২॥
গারুড় ১০৮ অধ্যায়ে।

অব্রচ্ছায়া তৃণাদগ্নির্নীচসেবা পথে জলম্।
বেশ্যারাগঃ খলে প্রীতিঃ ষড়েতে বুদ্বুদোপমাঃ॥৩৯॥
ঐ ১১৫ অধ্যায়ে।]॥৩৮॥

[(বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে দেবরাজ ভীত হইয়া, তাঁহার তপস্যা-ভঙ্গ জন্য মেনকাকে পাঠাইয়াছিলেন। মেনকাকে দর্শন করিয়া, বিশ্বামিত্রের মনঃক্ষোভ-বশতঃ মেনকার সহিত সঙ্গম ও শকুন্তলার জন্ম। এই বৃত্তান্ত আদিপর্ব্বের ৭১ অধ্যায়ে আছে।)

তীব্রে তপসি লীনানামিন্দ্রিয়াণাং ন বিশ্বসেৎ।
বিশ্বামিত্রোঽপি সোৎকণ্ঠঃ কণ্ঠে জগ্রাহ মেনকাং॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়গণ কঠোর তপস্যায় লীন হইলেও, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না ; বিশ্বামিত্রও উৎকণ্ঠিত হইয়া মেনকার কণ্ঠ ধারণ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রিয় বশ রাখা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য—
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥
মনুঃ ২য় অধ্যায়ে ৮৮

রথনিযুক্ত অশ্বের সারথির ন্যায়, বিদ্বান্ ব্যক্তি চিত্তাপহারী বিষয়ে বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণ-সংযমে যত্ন করিবেন।

ইন্দ্রিয় দমন না করিলে, মনুষ্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না—
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং।

কুর্য্যাদ্ বিয়োগ-দুঃখেষু ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য দীনতাম্।
অশ্বত্থামবধং শ্রুত্বা দ্রোণো গতধৃতির্হতঃ ॥৪০॥

বিয়োগ-দুঃখে কাতরতা ত্যাগ করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে; অশ্বত্থামার বধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, দ্রোণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হত হইয়াছিলেন।

সংনিযম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥
ঐ ঐ ৯৩॥
প্রকীর্ণ বিষয়ারণ্যে ধাবন্তং বিপ্রমাথিনং।
জ্ঞানাঙ্কুশেন কুর্ব্বীত বশমিন্দ্রিয়-দন্তিনম্ ॥৯৮॥
শুক্রনীতিঃ ১ অধ্যায়ে।] ৩৯॥

[দ্রোণপর্ব্বে ৯১ অধ্যায়ে দ্রোণবধ প্রকরণে] যথা—

দ্রোণকে পাণ্ডবগণ যুদ্ধে পরাভূত করিতে না পারিয়া, যুধিষ্ঠির, যুদ্ধরত দ্রোণকে মিথ্যা কহিয়াছিলেন "আপনি যাঁহার জন্য জীবিত আছেন, সেই অশ্বত্থামা হত হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করুন।" এইবাক্য বলিবার পর, অব্যক্তভাবে অশ্বত্থামা নামক কুঞ্জর হত হইয়াছে, এই কথা কহিয়াছিলেন। যাহা হউক, যুধিষ্ঠির-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, পুত্রশোকে দ্রোণ অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই সময়ে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন।

"অশ্বত্থামা হতো ব্রহ্মন্ নিবর্ত্তস্বাহবাদিতি।
* * * *
অব্যক্তমব্রবীদ্ বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত॥")

মনুষ্যের বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা কর্ত্তব্য। ধৈর্য্যের লক্ষণ যথা—

ব্যবসায়াদচলনং ধৈর্য্যং বিঘ্নে মহত্যপি॥
সাহিত্যদর্পণে ৩। ৬১।

বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচি র্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্॥
হিতোপদেশঃ।

ন ক্রোধবশমাপন্নো ধীমান্ গচ্ছেদধীনতাম্।
পপৌ রাক্ষবদ্ ভীমঃ ক্ষতজং রিপুবক্ষসঃ ॥৪১॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ক্রোধরূপ রাক্ষসের বশ হইবে না; ভীম রাক্ষসের ন্যায় শত্রুর বক্ষঃস্থল হইতে রুধির পান করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

শোভা বিলাসো মাধুর্য্যং গাম্ভীর্য্যং ধৈর্য্যতেজসী।
ললিতৌদার্য্যমিত্যষ্টৌ সত্বজাঃ পৌরষাগুণাঃ।
সাহিত্যদর্পণে ৩। ৫৮।] ৪০

দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই ক্রোধে, ভীম দুঃশাসনের বক্ষস্থলের রক্তপান করিয়াছিলেন। এ কথা কর্ণপর্ব্বে ৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

মনুষ্যের ক্রোধবশবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎত্রয়ং ত্যজেৎ॥
মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি ২২। ৭০।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ॥
শ্রীভগবদ্গীতায়াং ২। ৬২।

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভি ক্রোধোহস্তিচেদ্দেহিনাং
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃৎ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলম্।
কিং সর্পৈঃ যদি দুর্জ্জনঃ কিমু ধনৈঃ বিদ্যানবদ্যা যদি।
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষণেন কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্॥
পঞ্চরত্নে।

ক্রোধঃ কামো লোভমোহৌ বিধিৎসা
কৃপাসূয়ে মানশোকৌ স্পৃহা চ॥
ঈর্ষাজুগুপ্সা চ মনুষ্যদোষাঃ
বর্জ্যাঃ সদা দ্বাদশৈতে নরাণাম্॥
উদ্যোগপর্ব্বণি ৪২। ১৬।] ৪১॥

মহাযোগেশ্বর-স্তোত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

গুণত্রয় প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এক গুণের পর এক গুণ, তৎপরে আর এক গুণের উদয় ও লয় হইতেছে। প্রতিক্ষণেই একগুণ আর একগুণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া যায়। স্থূল দৃষ্টিতে এই সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। একজন বংশী বাজাইতেছে। আমি সেই বংশী শব্দ একতান ভাবে শুনিতেছি এবং সেই শব্দকে একটি বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ শব্দ এক নহে। বংশীতে প্রতিক্ষণে ফুৎকাররূপ ক্রিয়া হইতেছে, সেই ক্রিয়া-তরঙ্গ কর্ণেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক প্রতিক্ষণে গৃহীত হইয়া বুদ্ধিতে প্রতিক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে এবং লীন হইয়া যাইতেছে। তৎপরক্ষণেই আর একটী তরঙ্গ প্রকাশিত হইতেছে। উহা এরূপ দ্রুতবেগে হইতেছে যে, উহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা বুঝা যায় না। চঞ্চলচিত্ত সেই সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলিকে একটীর পর একটী, এরূপে গ্রহণ করিতে পারে না; তবে স্থূল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারে। কোন বস্তুর হরিদ্বর্ণ পীতবর্ণে পরিণত হইলে, আমরা সেই স্থূল পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। প্রতিক্ষণেই একগুণ উদিত থাকিয়া অন্য গুণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া যায়। গুণের স্বভাবই হইতেছে অভিভাবক ও অভিভাব্য। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥" (১৪।১০) হে ভারত! রজঃ ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া সত্ত্ব উদিত হয়, রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভব করিয়া তমোগুণ এবং তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভব করিয়া রজোগুণ উদিত হয়। এই গুণ সকলের পরিবর্ত্তনের সহিত সুখ, দুঃখ ও মোহ আদি সকল দৃশ্য পদার্থই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে বস্তুতে আমরা সুখবোধ করি, কিছু দিন পরে আমাদের চিত্তের পরিণাম জন্য সেই বস্তুতে আর সুখ পাই না, বরং দুঃখ বোধই করি। আরও যে পদার্থে আমি সুখানুভব করি, সেই পদার্থও পরিণামশীল। শত চেষ্টা করিলেও কেহ ঐ পরিণাম রোধ করিতে পারিবে না। একদিনে হউক, দুই দিনে হউক, কোটী বৎসর পরে হউক, সময়ে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবেই যাইবে। তখন উহা প্রিয় বস্তু রূপে না থাকা হেতু মহান্ ক্লেশ বোধ হইবে। এইজন্য প্রত্যক্ষ দুঃখ যেমন ক্লেশদায়ী ও হেয়, (বাহ্য) সুখও সেইরূপ ক্লেশদায়ী এবং হেয়। ইহা প্রথমে মধুর বোধ হইলেও, মধুমিশ্রিত বিষের ন্যায় ত্যাজ্য।

সেই কৃপাময় পরমদেব বিভু। পূর্ব্ব শ্লোকে বিভুত্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার দূর ও নিকট নাই; এই হেতু ও সর্ব্বাধীন বলিয়া সেই কৃপাময় দেব সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার এই সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বাধীশত্ব রূপ ভাবও পর বৈরাগ্যের দ্বারা লীন বলিয়া, সেই পরমদেব বিভু প্রবিলীনলিঙ্গরূপে বিরাজমান। তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বাধীশত্ব চরমোৎকর্ষ

প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে বিভু বলা হইয়াছে। সেই বিভু কৃপাময়। আদৌ করুণাদি সদ্গুণ দ্বারা যিনি প্রবিলীন উপাধি রূপ চরমোৎকর্ষে বিরাজমান এবং যাঁহার চিত্তে করুণাদি অক্লিষ্ট বৃত্তি সমূহের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, এইহেতু তাঁহাকে কৃপাময় বলা হইয়াছে। পুনশ্চ উপাধি প্রবিলীন বলিয়া তাঁহার কোন কার্য্য নাই, তিনি অকর্ম্মদেব। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন "ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ"। ১। ২৪ এই সূত্রে সেই পরম পুরুষ যে ইচ্ছা, দ্বেষ, অস্মিতাদি ক্লেশ; ধর্ম্ম, অধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, জন্ম, আয়ু ও ভোগ রূপ বিপাক এবং সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত, তাহা বলা হইয়াছে। এইহেতু তিনি অকর্ম্মদেব। সেই কৃপাময় অকর্ম্মদেব বিভু সুখ দুঃখের দাতা নহেন। ভগবান বলিয়াছেন "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"॥ (গীতা ৫। ১৪-১৫)

প্রভু (পরম দেব) লোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম সকল সৃষ্টি করেন না এবং (সুখ দুঃখরূপ) কর্ম্মফলের সংযোগও করেন না। স্বভাবই (ত্রিগুণই) তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তক। বিভু কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; জ্ঞান অজ্ঞানের (অবিদ্যার) দ্বারা আবৃত; এইহেতু জীব মোহাবৃত হয়। আরও গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।" প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্ব্ব প্রকারেই কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন হইতেছে। এই হেতু সেই পরমদেব বিভু প্রত্যক্ষ বিষরূপ দুঃখের ও মিশ্রিত বিষের ন্যায় (বাহ্য) সুখের দাতা নহেন; সুতরাং গরদ বা বিষপ্রদাতা নহেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসেবানন্দ।

[কাশী যোগাশ্রম।]

তত্ত্বচিন্তা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—::—

শাস্ত্র।

প্রশ্ন—শাস্ত্র কতটুকু সত্য ?

মনুষ্য স্থান সম্বন্ধে, স্থানীয় আনুষঙ্গিক সম্বন্ধে, কাল সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন পাইলে, অতীত অবস্থার বা অতীত কালের পূর্ণ চিত্র অপরকে প্রদর্শন করাইতে যেমন অক্ষম হয়, অর্থাৎ তাহার অনুভবে যাহা কিছু আসিয়াছে, সেই সমস্ত অনুভূতপ্রায় দেখাইতে বা প্রকাশ করিতে পারেনা, সেইরূপ মহৎতত্ত্ববিৎ (১) অহংতত্ত্বে (২) থাকিয়া মহৎতত্ত্বের বিষয় বলিতে কখনই

(১) স্থূল বস্তু হইতে যাহা অতীত, তদ্‌জ্ঞানযুক্ত। (পরে বলা হইবে।)

(২) স্থূল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান। (পরে বলা হইবে।) এই দুই মধ্যে বিভিন্নতা পরে বুঝা যাইবে।

মহৎতত্ত্বে অবস্থিতি করিয়া সিদ্ধ জন

সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েন না। তিনি যে ভাষা, ভাব বা ইঙ্গিত দ্বারা মহৎতত্ত্বের বিষয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, উহা সমুদয়ই অহংতত্ত্বের, এবং তিনিও তখন অহংতত্ত্বে অবস্থিত। সুতরাং মহৎতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাহেন, প্রকাশ করিবার উপায় গুলি অহংতত্ত্ব-অবলম্বী হওয়া প্রযুক্ত, তিনি তাহা অপূর্ণ বা আংশিক বলিতে পারেন, কখন কখন তৎকথিত বাক্য ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন—

যদি মহৎতত্ত্বের কথা বলিবার উপায় নাই, তবে উহা শাস্ত্রে কি প্রকারে উক্ত হইয়াছে ?

উত্তর—

একটী সুন্দর দ্রব্য দেখিয়া পুলকিত হইলে, সেই দ্রব্যের অনুপস্থিতিতে বলিয়া কহিয়া অপরকে কি সেইরূপ পুলকিত করা সম্ভব ? বর্ণনা করিতে গেলে, বা সেইরূপ অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে গেলে ঠিক সেরূপটী হয়না, অর্থাৎ আদর্শ (আসল), প্রদর্শিত (নকল), উভয় মধ্যে বিভিন্নতা থাকিবেই থাকিবে। অনুভূত যাহা, তাহা পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইতে পারেনা, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা বলিয়া উহা পূর্ণরূপে অপ্রকাশ্যও নহে। অর্থাৎ উহার আভাস—"আদল" প্রকাশ করিতে পারা যায়। বাক্য, ভাব ও ইঙ্গিত দ্বারা উহার আভাস যেমন প্রকাশ্য, অপর দ্বারা উহা তেমনি গৃহীত বা উপলব্ধ হইতে পারে।

[পর্ব্বত না দেখিয়া বর্ণনা হইতে পর্ব্বতের আভাস বোধ, সাগর না দেখিয়া বর্ণনা হইতে সাগরাভাস বোধ—উদাহরণ। পূর্ণরূপে উপলব্ধ না হউক—কিছু অংশও উপলব্ধ হয় না, একথা বলা যায় না।]

এপ্রকার আভাস প্রদর্শন কালে—জিজ্ঞাসুর অনুভূত পদার্থের মধ্যে বক্তব্য বিষয়ের সদৃশ বস্তুর উল্লেখ করিতে হয়।

[পর্ব্বতের সময় মৃত্তিকার স্তূপ, সাগরের সময় কূপ, সরোবর বা নদীর উল্লেখ করিতে হয়—তাহা হইলেই জিজ্ঞাসুর সহজে ধারণা হয়।]

[যে নদী দেখিয়াছে, তাহাকে, সাগর বর্ণন করিতে কূপের বা সরোবরের উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে হয় না,—বেস দেখা যাইতেছে, ধারণা বিশেষে উপমার প্রয়োজন।]

ঈশ্বরের যে হস্ত পদাদি দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার কারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে,—রচয়িতার প্রয়োজনে নহে, জিজ্ঞাসুর জন্যই এ কৌশল।]

ঋষিরা মহৎতত্ত্বে অবস্থিতিকারী, অহংতত্ত্বে অবতরণ করিয়া শাস্ত্র লিখিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে অহংতত্ত্ববাসী দিগকে মহৎতত্ত্ব বুঝাইতে অহংতত্ত্বের বস্তু বা বিষয় প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই কারণ পড়িবামাত্র বা সহজে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝা যায় না। যিনি ইহা, এই চতুরালী বা কৌশল, অনিবার্য্য কৌশল

বুদ্ধিতে কেবল "সোঽহং" দেখেন। অহংতত্ত্বে অবস্থিতি কালে মন কেবল "আমি" (অহং) দেখায়। স্বরূপ দেখায় না। ইহাতে বিষয় (স্থূল বস্তু) থাকে।

বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি গুরু-উপদিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া মহত্তত্ত্বের অনুভব করিয়া দেখেন। তখন দেখিতে পান যে, ঋষিরা যে উপায় দ্বারা এতাদৃশ উপলব্ধি করিতে হয় বলিয়াছেন, তাহা সত্য; আর ইহা অপেক্ষা তাঁহারা অন্য কোনরূপে মহত্তত্ত্বের কথা কহিতে পারিতেন না।

যিনি ইহা বুঝিতে পারেন না, তিনি হয় উহা মিথ্যা কিম্বা বোধাতীত, নয় অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মহত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে নিবৃত্ত হয়েন।

অহংতত্ত্ব হইতে মহত্তত্ত্ব কি—জানিতে হইলে—

প্রথমতঃ—শাস্ত্রে বিশ্বাস,

দ্বিতীয়তঃ—শাস্ত্রে অনুরাগ,

তৃতীয়তঃ—মন্ত্র, অনুষ্ঠান, তপস্যার প্রয়োজন।

মহত্তত্ত্ব কি, বুঝিতে পারিলে, ঋষিরা কোন্ ইঙ্গিতে কি প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, বুঝিতে পারা যায়। যতকাল মহত্তত্ত্ব কি, বুঝিতে নাপারা যায়, ততকাল বিশ্বাস, অনুরাগ, তপস্যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এক মুহূর্ত্তে বা এতদিনেও মহত্তত্ত্ব কি, বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া, কতক অনুষ্ঠান করিয়া কাহারও ক্ষান্ত হওয়া বিধেয় নহে।

[অনুষ্ঠান হইতে যে যোগ্যতার উদয় হয়, তাহার উল্লেখ স্থানান্তরে আছে।]

অনুষ্ঠান সকল গুরু শিখান না। কাঁহার নিকট হইতে কোন্ শিক্ষা সম্ভব, অনুষ্ঠান করিতে করিতে জানিতে পারা যায়। অনুষ্ঠান কখনই পরিত্যাগ করিবে না। অনুষ্ঠান শাস্ত্রজ্ঞ গুরুরাই বলিয়াছেন। [গুরুভক্তির উল্লেখ স্থানান্তরে আছে।]

অধুনা হিন্দুকুলে অনভিজ্ঞ দলে সাধারণ আপত্তি "ভক্তিযোগ্য গুরু পাইনা"। ইহাদের তর্ক, গুরুরা ইহাদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিমান, তার্কিক ও পণ্ডিত নহেন। কুলগুরু কুলোদ্ভবের অপেক্ষা উন্নত নহেন, সুতরাং দীক্ষা লওয়া রহিত হইতেছে, গুরুত্যাগ হইতেছে, আর ক্রমে ক্রমে কুলে কুলে ম্লানবুদ্ধিজাত নির্ব্বোধ সন্তান জন্মিতেছে।

আর্য্যভূমে গুরুর অভাব হয় নাই। শ্রীরামচন্দ্র সময়ে বশিষ্ঠের সাক্ষাৎ লাভ করেন, ইহা উপন্যাসের কথা নহে। শঙ্করাচার্য্য শক্তি মানিতেন না; ৺কাশীধামে তিনি শক্তি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়েন, ইহাও অপ্রকৃত নহে। রামপ্রসাদ "মা মা" করিয়া বাস্তবিকই মায়ের দর্শন পাইয়াছিলেন। সনাতন মথুরায় অবস্থিতি কালে মীরাবাই কর্ত্তৃক দীক্ষিত হয়েন। ৺হলধর তর্কচূড়ামণি পণ্ডিতবিজয়ী হইয়া, শান্তিপ্রার্থী হইয়া, ৺কাশীরাজের গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন; আর সাধারণ লোক প্রতিপদে গুরু-উপদিষ্ট হইতেছে। শাস্ত্রঅধ্যয়নে, নরাকৃতিতে অথবা সুবুদ্ধি দ্বারা স্বতঃউপদিষ্ট হইতেছে; তবে গুরুর অভাব কেমন করিয়া স্বীকার্য্য? ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, শিষ্য প্রস্তুত না হইলে, মন্ত্র কার্য্যকারী হইবে না বলিয়া গুরু তুষ্ট হন্ না। তুমি প্রস্তুত হও, তোমার গুরুও প্রস্তুত আছেন।

২৭। প্রস্তুত হওয়া—কাহাকে বলে?

বিচার করিয়া দেখা যাউক্। আমি জানি না. আমার অভাব; এ অভাব যিনি মোচন করিবেন, তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি যিনি হউন না—যেরূপ কৃতী হউন, আর না হউন, তাহার তত্ত্বে আমার প্রয়োজন কি!

যাহার তত্ত্ব আমি করিতেছি,—তাহা দিতে পারুন না পারুন, যে পথে গেলে উহা পাইব, তাহা যিনি বলিয়া দেন, তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমার উপকারী। তাঁহা হইতে উপকার পাইয়া, আমি তাঁহার কাছে বিনীত হইব না কেন?

সে পথে পাইব কিনা,—সন্দেহ করা, আমার তখন বিধি নহে—প্রাকৃতিক বিধি নহে। (যথা সন্তান হারাইলে, কাতরা জননীকে যে যে দিকে যাইতে বলে—সে সেই পথে পাইবে কিনা বিচার না করিয়া ধাবমানা হয়।) কাতর জিজ্ঞাসু সন্দেহ-বর্জ্জিত। সুতরাং ঈদৃশ সংশয়ীদিগের সে কাতরতা হয় নাই—বলিতে হইবে। তাই গুরুও দৃষ্ট হন না,—অথবা গুরুতে গুরুত্ব দৃষ্ট হয় না।

আগে হারাণ সন্তান পাই, তবে সে পথে যাইব, বলা যেরূপ,—আগে গুরু দেখাইয়া দিউন বা সিদ্ধ করিয়া দিউন, তবে মন্ত্র লইব বা তাঁহাকে গুরু বলিব—ইহা বলাও সেইরূপ।

না হয় অযোগ্যকেই গুরু করিলে? তৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথে যাইলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইলে না, তোমার তাহাতেই বা ক্ষতি কি? স্ফীত আত্মাভিমানকে একটু অবনত করিয়াছ; কিছু অর্থব্যয় (না হয় অপব্যয়ই) করিয়াছ, কতক বৃথা কর্ম্ম করিয়াছ—এই মাত্র ত!

প্রণাম করাতে তোমার শিরোদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থব্যয়ে তুমি ভিখারী হও নাই, আর তদনুষ্ঠানে তোমার অন্য কর্ম্মসকল নষ্ট হয় নাই। তবে তোমার ক্ষতি কোথায়?

"বেটা মূর্খকে গুরু বলিলাম"! আত্মাভিমানের এই উক্তি অতি অসার। এইটুকু অবনতি যাহাতে সহ্য নহে—তাহার দীক্ষা হয় না,—তাহার গুরু নাই,—তাহার গতিও নাই!

তাহার পর, সেই দীক্ষা-হেতু সেই পথে গিয়া যদি বস্তু পাও, তখন কি? গুরুকে কি করিবে? তাঁহার অট্টালিকা করিয়া দিবে, না তাঁহাকে কোলে করিয়া নাচিবে? কেবল মনে করিবে—তিনি ধন্য!

[প্রকৃত গুরু শিষ্যের বিষয় লয়েন না—স্থানান্তরে বলা আছে।] তোমার অভাবে তুমি একটু কাতর হও, একটু অবনতি স্বীকার কর,—তাহাতে তোমার গরিমা বৃদ্ধি পাইবে, (গুরুপ্রসাদে) হ্রাস হইবে না।

তাঁহার উপদিষ্ট অনুষ্ঠানে কিছু না পাও, একবার না হয় ঠকিলে! (ঠকান * হইতে ঠকা ভাল।), যদি কিছু সুখ পাও, অধিক অনুষ্ঠান বা অধিকতর তত্ত্বাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সে গুরুর নিকট কূটতর উপদেশ না পাও, ততোধিক জ্ঞানীর নিকট উপদেশ লইবে, ইহা নিষিদ্ধ নহে। (এরূপ উপদেষ্টাকে উপগুরু কহে, উপগুরু-গ্রহণ শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত।)

* "ইচ্ছা" বিষয়ে পরে জানিতে পারিবে।

[আর যদি তোমার অভাব না হইয়া থাকে, তবে বৃথা আকাঙ্ক্ষা কেন? গুরু বা মন্ত্রের প্রয়োজন কি?]

২৮। গুরু কাঁহারা ও উপগুরু কাঁহারা—এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। বিষয় বা বস্তু-প্রকাশ দেখিতে গেলে, আমরা দেখি—

(১) উহার আভাস—অর্থাৎ উহা নহে, অথচ উহা আছে বলিয়া যাহা আছে।

(২) উহার প্রতিমা—বা আকার বা রূপ—অর্থাৎ দেখিয়া বোধহয় উহাই বটে।

(৩) উহা (প্রকৃত)—অর্থাৎ যাহার আভাস ও প্রতিমা দেখিয়াছি—তাহাই। ব্রহ্মের যিনি আভাস দেখিয়াই চমৎকৃত হয়েন, তিনি প্রতিমা দেখিতে পান না।

যিনি প্রতিমা দেখিয়াই বিমোহিত, তিনি বস্তু (ব্রহ্ম) দেখিতে পান না।

(ক)---আভাস দেখিয়া যিনি প্রতিমা দেখিতে উদ্যোগী না হয়েন, তিনি সাধারণতঃ বাক্য-প্রচারক। তাঁহার কাছে শুধু ভাষা—উপদেশ বা বক্তৃতা পাওয়া যায়।

(খ)---আভাস দেখিয়া যিনি প্রতিমা দেখিতে কাতর, তিনি মৌনী, আভাস প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বা সময় তাঁহার থাকে না।

(গ)—আভাস ও প্রতিমা দেখিয়া যিনি বস্তু (ব্রহ্ম) দেখিতে চাহেন, তিনি ঋষি—আকাঙ্ক্ষী। আভাস বা প্রতিমা লইয়া বিচার করিতে, তাঁহার সময় থাকে না।

[ইঁহারা সকলেই গুরু, শিষ্যবিশেষে গুরু পদবাচ্য।]

কাহার কাছে কি প্রকার উপদেশ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা? প্রথম-শ্রেণীস্থ হইতে কেবল বাহ্যশিক্ষা সম্ভব। "ঈশ্বর দয়াময়, ধর্ম্ম-প্রতিপালক, সর্ব্বব্যাপী; সুখ-দুঃখপ্রদায়ক ইত্যাদি; অতএব সেই ঈশ্বরকে ভক্তি কর, পূজা কর, উপাসনা কর,—"এইরূপ শিক্ষা পাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় হইতে—কিছুই প্রকাশ পায় না; কেবল বুঝিতে পারা যায় যে, মৌনী হইয়া যাঁহার আভাস দেখিবে, তাঁহাকে যথার্থ দেখিতে চেষ্টা কর, এই উপদেশ। [বিষয়-বৈরাগ্য ব্যতীত তাঁহার উপদেশ ক্রিয়াবান্ হইবে না।]

মৌনীর বাক্যব্যয় অল্প। বিষয় হইতে আসক্তি উঠাইয়া লইতেছেন।

আন্তর-দৃষ্টির প্রার্থী হইয়া, বাহির হইতে অভ্যন্তরে যাইবার প্রয়াস পাইতেছেন।

তৃতীয়-শ্রেণীস্থ হইতে—শিক্ষা পাওয়া সুকঠিন। যাহা পাওয়া যায়, যদিও সহজে তাহার উপলব্ধি হয়না, তথাপি সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

ইনি আভাস-দর্শন অবস্থায় যাঁহাকে "মঙ্গলময়" বলিয়া জানিতেন, এখন তাঁহাকে "মঙ্গলস্বরূপ" বলিয়া দেখিতেছেন। "মঙ্গলময়" আর "মঙ্গলস্বরূপে" কি প্রভেদ, তাহা দেখিতেছেন। কেমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহাও দেখিতেছেন।

সুতরাং উদ্দেশ্য, উপায় ও ফল—যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার নিকট শিক্ষা লইলে পরম কল্যাণ—কেননা তাহা হইলে তিনি বলিয়া দেন—

(১) উদ্দেশ্য কি? (স্বরূপদর্শনই উদ্দেশ্য।)
(২) কার্য্যকারী উপায় কি? (তপস্যা।)
(৩) ফল কি? (স্বরূপদর্শনানন্দই ফল।)

হিন্দুদিগের শাস্ত্র—ঋষি-উপদেশগ্রন্থ। যাহার যে প্রকার ধারণা, তাহার জন্য তদুপযোগী উপদেশ নির্দ্দিষ্ট আছে।

এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, যাহারা আভাসদর্শী বক্তার কথায় নির্ভর করে, তাহাদিগের প্রকৃত বস্তুর নির্ণয় বা দর্শন হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

গুরু ও শিষ্য।

প্রকৃত গুরু অর্থাৎ যাঁহার গুরুত্বে অধিকার জন্মিয়াছে, তিনি সাধারণ-জনকে শিষ্য করেন না। ধারণাক্ষম দেখিয়া শিষ্য করেন। যাঁহাকে শিষ্য করেন, তিনিও সিদ্ধ হয়েন। প্রকৃত গুরু ও উপযুক্ত শিষ্য অতি বিরল।

কিন্তু সাধারণ গুরু, অর্থাৎ যাঁহার গুরুত্বে তাদৃশ অধিকার জন্মে নাই, অথচ গুরু হইয়াছেন, তিনি সাধারণের গুরু হইতে ইচ্ছা করেন। ধারণাশক্তি-নির্ব্বিশেষে বহু শিষ্য করেন। নিজে যেমন অসিদ্ধ, শিষ্যেরা বা তাহাদিগের অধিকাংশই তেমনি অসিদ্ধ থাকে। কেহ কেহ গুরুপরিত্যাগী হয়। (যাহার সুকৃতি থাকে, সেই অসাধারণ ধারণাবশতঃ সিদ্ধ হয়।) এইরূপ গুরু ও শিষ্যের সংখ্যা অধিক।

প্রকৃত শিষ্যের প্রধান লক্ষণ—বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভর। সাধারণ-শিষ্যের প্রধান লক্ষণ অনুষ্ঠান, চেষ্টা, কতক বিশ্বাস, কতক ভক্তি এবং নির্ভরের অভাব; সে আপনাকে সামর্থ্যবান্ ও দায়ী মনে করে। যদ্যপি অনুষ্ঠানে অটল বিশ্বাস রাখিয়া চলে, তাহা হইলেও ফল দর্শে। কিন্তু সময় সময় "কেন করি?" "ঠিক হইতেছে কিনা?" "গুরু ঠিক বলিয়া দিয়াছেন ত?" ইত্যাদি সংশয়সকল অনুষ্ঠানকে ব্যর্থ করিয়া ফেলে। দশ বৎসর পরে একবার সংশয়েও উহার সংস্কার রহিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যাহা হইতেছিল, হয়ত তাহা আর হয়না। গুরুর উপদেশে অটল বিশ্বাস রাখিয়া, যদি সংশয়ের উদয় হইতে না দেয়, তবে সে শিষ্যের মঙ্গল। অনুষ্ঠান করিতে করিতে যদি আনন্দলাভ হয়, উহা প্রার্থনীয়। কিন্তু আত্মগরিমা অর্থাৎ 'আমি বড়' এই ভাব মনে আসিলে, উপকারের পরিবর্ত্তে ঘোর অপকার ঘটে। ইহা পতনের একটী কারণ।

নির্ভর না করিয়া, আপনাকে সমর্থ—ও দায়ী মনে করার ফল কি? সংশয় না আসিতে দেওয়ার ক্ষমতা, বা সংশয় হইলেও সংস্কার না জন্মিতে দিবার ক্ষমতা—সাধকের আপনার হাতে নহে। ইচ্ছা করিয়া কে আপনার অমঙ্গল ঘটাইতে চাহে?

যে গুরু শিষ্যকে চেষ্টা করিতে না বলিয়া, নির্ভর করিতে উপদেশ দেন, তিনি ভালই করেন।

চেষ্টা অর্থে শক্তি-ব্যবহার। শক্তি কোথায়—শক্তি দেয় কে? উহা ব্যবহার

অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত করিবে কে ? উহা শিখিবে কোথা ? শিখিবার সে শক্তি পাইবে কোথা ? শক্তি তোমার নহে, শক্তিপ্রয়োগও তোমার সাধ্য নহে।

নির্ভর করিলে, তখন নির্ভর করিবার শক্তিলাভ হয়। করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে; ইহা দেখাইয়া দিবার বিষয় নহে। ঐ শক্তিলাভকে সাধকেরা 'ঈশ্বরের দয়া' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ দয়া-ভাব হইতে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তি হইতে বিশ্বাস জন্মে। অনুরাগহেতু অবিচ্ছিন্নতা জন্মে, সুতরাং তাহার অভাব-বোধ থাকেনা।

প্রথম অংশ সমাপ্ত।

শ্রীবামাচরণ বসু।

শক্তিসমবায়

বা

চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই ব্যাপার যে ভাবেই দেখা যায়, সেই ভাবেই ইহার সমীচীন অর্থ হয়। প্রথমতঃ অসুরের প্রকৃতত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক্। এই বলদৃপ্ত অসুর দেবগণকে পরাস্ত করিয়াছে। ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত অসুরের বিবাদ নাই। তাঁহারা আপন আপন পদে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতে শক্তি-সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ সমস্তশক্তি-খচিত ব্রহ্ম বা মহাবিষ্ণু। সৃষ্টি-কল্পে এই মহাশক্তি হইতে তিনটী প্রধানা শক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। এই তিন শক্তি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। সমগ্র সৃষ্টি-ব্যাপারের তিনটী বিভাগ—সৃজন, পালন ও সংহার। পূর্ব্বোক্ত শক্তিত্রয়ের এক একজন এক একটী বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই তিন বিভাগের বিশেষ বিশেষ কার্য্য-সাধিকা যে ক্ষুদ্র শক্তিসমূহ, তাঁহারাই ত্রেত্রিশ-কোটী দেবদেবী নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহারাই জগতের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। ইহা সর্ব্বজন-বিদিত, যে, অসুর বা রাক্ষসগণ যখনই দৃপ্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত দেবত্রয়ের কাহারও না কাহারও বরে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ইহারা তিন জনেই দেব ও দানব উভয়-শক্তির আধার। ইহার মধ্যে দানবশক্তি প্রবলা হইলে, তাহার কতক অংশ প্রত্যাহার করিয়া সাম্যস্থাপন করেন। এই কারণেই ইঁহাদের সহিত অসুরের সংগ্রাম হয় না, ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিতই সেই সংগ্রাম হইয়াছে। ইঁহারা তিনজন বিধানকর্ত্তা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ—তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্ম-চারীরূপে সেই সকল বিধান প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রথম-চরিতে যখন ইন্দ্রাদি দেব-গণের আবির্ভাবের সূচনাই হয় নাই, তখন এই সংগ্রাম ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিতই হইয়া-ছিল। এ রহস্য প্রথমচরিতে প্রকাশ করিবার জন্য যত্ন করা হইয়াছে। দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকেও যুদ্ধে ব্যাপৃত দেখা যায়, সেখানে কিছু বিশেষত্ব আছে। চণ্ডীর প্রথমচরিতে, মহাসুর

শক্ত্যাবেশে মহানিদ্রায় অভিভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার নাভিকমল অর্থাৎ শক্ত্যাধারের কেন্দ্রস্থান হইতে সৃষ্টি-শক্তি বা মনোরূপী ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে; সেখানে মহেশ্বরের আবির্ভাবের কথা নাই। সুতরাং ব্যবস্থা এরূপ বলিয়াই বোধ হয়। প্রথম—আদ্যাশক্তি মহামায়া; দ্বিতীয়—সেই শক্তিতে শক্তিমান্ মহাবিষ্ণু; তৃতীয়—সেই মহাবিষ্ণু হইতে প্রথম লোক-পিতামহের আবির্ভাব। চতুর্থ—সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কথা দ্বিতীয় চরিতে পাওয়া গেল; সেই মহাবিষ্ণু হইতেই এই তিনের আবির্ভাব। ইঁহারা এক বৃক্ষের তিনশাখা বা একই ত্রিধা-বিভক্ত। এই তিনজন হইতে আবার তিনটী ক্ষুদ্রা শক্তি আবির্ভূত হইয়া, বিশেষ কার্য্যে নিযুক্তা। তাঁহারা (অর্থাৎ সেই শক্তিতে যাঁহারা শক্তিমান্) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া, কোথাও বা দিক্‌পালরূপে, কোথাও অন্যান্য কার্য্যসাধকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তখন তাঁহারা ইন্দ্রাদি-দেবগণ-পর্য্যায়ে পড়েন, এবং তখন ইন্দ্রাদিদেবগণের ন্যায় বিরুদ্ধ-শক্তির সহিত তাঁহাদের সংগ্রাম হয়।

দ্বিতীয় কথা—দেব ও অসুরশক্তি যতক্ষণ সমান প্রবল, ততক্ষণ মঙ্গল। অসুরশক্তি প্রবলতর হইলে এই সাম্যের ব্যতিক্রম ঘটে, ও তাহাতে নানা প্রকার অনর্থ উপস্থিত হয়; কিন্তু মধুময়ী দেবশক্তি প্রবলতরা হইলে, মঙ্গলেরই প্রাবল্য হয়। অসুরশক্তি প্রবলতর হইয়াছে, সৃষ্টি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, সুতরাং তাহার সংযম না হইলে, সৃষ্টিক্রিয়া সুনিষ্পন্ন হয় না। তাই সকল দেবগণের শক্তি বা তেজের মিলনে, এক মহাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন। ইনিই অসুর শক্তিকে দমন করিয়া, সৃষ্টিক্রিয়ার অবাধগতি সাধন করিয়া দিলেন।

অধ্যাত্মজগতেও ঠিক এই ব্যাপারই লক্ষিত হয়। মহামোহ সদলবলে প্রবল হইলে, বিবেককে পরাজিত ও বিতাড়িত হইতে হয়। যখন বিবেক স্বদলের সর্ব্বশক্তি মিলিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত, তখনই প্রবোধচন্দ্রের আবির্ভাব হয়, এবং মহামোহ সদলবলে পরাজিত হইয়া লুক্কায়িত হয়।

ব্যবহারিকজগতেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। যখন কোন জাতি অন্যজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দুর্গতিগ্রস্ত হয়, তখন তাহার পুনরুত্থানের উপায় কি? প্রথম একতা। যখন বিজিতেরা সকলে একমন একপ্রাণ হইয়া দাসত্বমোচনে কৃতসংকল্প হয়, তখন ক্ষুদ্রতম হইতে মহত্তম পর্য্যন্ত সকলেই অভিমান, স্বার্থপরতা ভুলিয়া সেই দাসত্ব-মোচন রূপ মহাকার্য্যে, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে নিযুক্ত হয়। তখন যে নীরন্ধ্র ঘনতম শক্তি-মিলন হয়, তাহা এক মহাশক্তি,—তাহা সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়ে; তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, কাহার সাধ্য? বিজেতা বিবিধ চেষ্টায়ও সে শক্তির স্ফূর্ত্তিরোধ করিতে পারেন না। সেই মিলিতা মহাশক্তির হুঙ্কারে জগৎ স্তম্ভিত—চমকিত ও প্রকম্পিত হয়। ইতালীর ইতিহাসে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শত্রুপদানত হইয়া ইতালীর লাঞ্ছনার একশেষ হইতেছিল। যখন কাভুর,

ম্যাট্সিনী, ও গ্যারিবল্ডিতে ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তির মিলন হইল, যখন সাধারণ জনশক্তি তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইল ; তখন ইতালী আপনার স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইল।

ইহার পর মেধস্ মুনি সর্ব্বদেব-তেজো-রাশি-সমুদ্ভূতা মহাশক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। কোন্ শক্তি সংযোগে দেবীর কোন অঙ্গ গঠিত হইয়াছে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। শম্ভুতেজঃ মুখ, রৌদ্রতেজঃ কেশ, বিষ্ণুতেজঃ বাহু, সৌম্যতেজঃ স্তন, ঐন্দ্রতেজ মধ্য, যাম্যতেজঃ জঙ্ঘোরু, পৃথিবীর তেজঃ নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজ পদদ্বয়, অর্কতেজে অঙ্গুলী, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলী, কৌবের-তেজে নাসিকা ও প্রজাপতির তেজে দেবীর অবশিষ্টাঙ্গ গঠিত হইল।

এইস্থলে মূর্ত্তিপূজার রহস্য রহিয়াছে। শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নহেন, শক্তি নিরাকারা। সেই নিরাকার শক্তিকে বুঝিতে হইলে, সাকার করিয়া না লইলে, কিছুতেই বুঝা যায় না। গণিতশাস্ত্রবিৎ, জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সরল বা বক্ররেখা, ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজাদি দ্বারা, জড়শক্তির রূপ নির্দ্দেশ করতঃ—তাহার গতি, পরিমাণাদি নির্দ্দেশ করেন। গুরু ও সাধক—সেই সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপা আদ্যামহাশক্তিকে মানবের বোধগম্য করিবার জন্য, মূর্ত্তিমতী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শক্তি স্ত্রী, সুতরাং মূর্ত্তিও স্ত্রীমূর্ত্তি হইয়াছে। সেই মূর্ত্তির পাদাঙ্গ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত শক্তিরই সমাবেশ। মেধস্ মুনি সুরথ ও সমাধির বোধগম্য করিবার জন্য, যেমন মহাশক্তিকে—অনন্ত-শক্তি-খচিত-পরব্রহ্ম-স্বরূপিণীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া, কোন্ শক্তি তাঁহার কোন্ অঙ্গে আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আচার্য্যগণও তদ্রূপ জন-সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য, শক্তিকে বিবিধরূপে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন। গুরু, উপদেশকালে, শিষ্যকে সে মূর্ত্তিরহস্য বুঝাইয়া দেন ; উপাস্যমূর্ত্তির কোন্ অঙ্গে কোন্ শক্তির সমাবেশ, কোন্ কোন্ শক্তি মূলাশক্তির সঙ্গিনী বা আবরণদেবতারূপে বর্ত্তমানা, যন্ত্রের মন্ত্রের রহস্য কি, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রকে মানচিত্রে গঙ্গানদী দেখাইতে বলিলে, সে একটী কৃষ্ণরেখায় হাত দিয়া দেখাইয়া থাকে। সে কৃষ্ণরেখা যে গঙ্গানদী নহে, তাহা সে জানে। শিক্ষক তাহাকে বুঝাইয়া দেন। নদীর উৎপত্তিস্থান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, জলের পরিমাণ, গুণাগুণ প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন, এবং তাহাতে ছাত্র নদী না দেখিয়াই কল্পনাচক্ষে তাহার এক চিত্র অঙ্কিত করিয়া লয়। সে অঙ্কিত চিত্র একেবারে প্রকৃতের ন্যায় না হউক্, তাহা হইতে কোন মতে ভিন্নরূপ নহে। সুশিক্ষকের শিক্ষা পাইলে, সে চিত্র প্রায়ই প্রকৃতের সমান হইয়া থাকে ; এবং প্রকৃতদর্শনে স্বভাবতই কৌতূহল জন্মে। পরিণামে সেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া—যখন সে গঙ্গানদী স্বচক্ষে দেখে, তখন তাহার সকল সন্দেহ দূর হয়। শাস্ত্র-দীক্ষাদি-বিষয়ে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ও কার্য্য ঠিক এইরূপ। গুরুকুলের অবনতি হওয়ায় শিষ্যগণের শিক্ষা ও বিকৃত হইয়া আসিতেছে ; তাহাতে প্রকৃত ব্যাপারের মাহাত্ম্য বাইতে পারে না, বা তাহার অসারতা প্রতিপাদিত হইতে

পারে না। Joolatary পৌত্তলিকতা বলিয়া যে একটা 'কুরব' শুনা যায়, যাহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষিত হিন্দুসন্তান লজ্জিত হয়েন,—ইহা যে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই ঘোর অজ্ঞতার (মূর্খতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) পরিচয়, তাহা তাঁহারা একবার ভাবেন না।

আধ্যাত্মিক-ভাবে দেখিলে ঠিক ইহাই দেখা যায়, তমঃপ্রধান মানবের পশুভাবই মহিষাসুর। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় ইহাকেই সাঙ্গোপাঙ্গ মহামোহ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে দেবভাব এই পশুভাবকে নিরস্ত করিয়া, হৃদয় আকাশে প্রবোধচন্দ্রের উদয় সম্পাদন করে, তাহা শক্তিবিশেষ নহে;—যাবদীয় মঙ্গলকরী শক্তির সমবায়। এই শক্তিই মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব উৎপাদন করে, মানবকে দেবতা করে, মানবের হৃদয়সিংহাসন হইতে অসুরকে দূরীভূত করিয়া, আত্মপুরুষরূপী ইন্দ্রকে স্বপদে স্থাপিত করে। এখানেও সেই ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া ত্রিশক্তির মিলন, এবং সহকারিণী মঙ্গলময়ী শক্তির সহযোগিতায় পরমনিঃশ্রেয়স সাধিত হইয়া থাকে।

ব্যবহারিক জগতেও ঠিক তাই। বিজেতাকে পরাজিত করিয়া, স্বপদলাভ করিতে হইলে, বিজিতের যে মহাশক্তির সাহায্যে সে কার্য্য করিতে হয়, তাহাই যথাবৎ বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহার যেরূপ শক্তি, তিনি মহদুদ্দেশ্য-সাধনকল্পে সেই শক্তির সম্পূর্ণপ্রয়োগ-পূর্ব্বক অপরের সহিত যোগ দিবেন। নেতা এক হইতে তিন জন পর্য্যন্ত হইতে পারেন। সেই নেতৃত্ব ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির সমবায় হওয়া প্রথম কল্প। দ্বিতীয় কল্প,—অপর সাধারণে অভিমান, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন করিয়া, এক মহাস্বার্থ—সাধারণ-স্বার্থ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, সেই শক্তিত্রয়-সমবায়ের সম্পূর্ণ অনুগামী হইবে। তাহাতেই যে মহাশক্তির আবির্ভাব হইবে, তাহার সম্মুখে বিপক্ষের রণ, বিক্রম, মর্য্যাদা, অর্থ প্রভৃতি যাহা কিছু কার্য্যসাধক উপায় বা উপাদান আছে,—তাহা সমস্তই মহিষাসুর-সেনানী ও সেনাগণের ন্যায় নিমেষের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে,—অগ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে;—ভূকম্পে পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূপতিত ও চূর্ণীকৃত হইয়া যাইবে!

অতঃপর দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্র হইতে সারাংশ বাহির করিয়া, দেবীর হস্তে প্রদান করিলেন। সমস্ত সংহারকারী অস্ত্র দেবীর হস্তে শোভা পাইল! এক অপূর্ব্ব মহাশক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া, সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কোমল ও কঠোর ভাব একত্র সমাবেশ করিয়া, দেবগণের হিতসাধনার্থ আবির্ভূতা হইলেন। যে উপায়ে যে মঙ্গলবিনাশিনী বিরুদ্ধা শক্তির বিনাশ সাধিত হয়, সে সকল উপায়েরই একত্র সমাবেশ হইয়াছে!

বাস্তবিকই পরাজিতেরা বিজেতার পরাভব কল্পে আপনাদের শক্তি একত্র সম্মিলিত করিলে, তাহাদের কিছুরই অভাব থাকে না। অস্ত্র-বল, ধন-বল, জন-বল সকলের একত্র সমাবেশ হয়! তখন বিজেতা যতই পরাক্রান্ত হউক্ না কেন, তাহার আর নিস্তার নাই। সে আর কিছুতেই স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে

না। যাহারা তৃণজ্ঞানে অবজ্ঞাত উপেক্ষিত হইত, তাহারাই সুমিলিত হইয়া সুদৃঢ় রজ্জু-রূপে পরিণত! সেই রজ্জু বিজেতারূপ মত্তহস্তীকে বন্ধন করিয়া, আপনাদের কার্য্য-সাধন করিবে, কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিবে না!

অধ্যাত্মজগতেও কামক্রোধাদি রিপুগণ প্রবল হইয়া, বিবেকাদিকে পরাজিত করিয়া, মানসরাজ্যে আধিপত্য করিতে থাকিলে, সাধক সদ্‌গুরুর উপদেশে সাধন-রণে আপন দেবশক্তিকে জাগ্রত করিয়া—যখন রিপুজয়ে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার কোনও রিপুকে বিনষ্ট করিবার উপায় বা অস্ত্রের অভাব হয় না। যোগবলে, সাধনবলে, অধ্যবসায়-বলে তিনি রিপুকুল নির্ম্মূল করিয়া, স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

এই অস্ত্র বিন্যাস-সময়ে ধনাধিপ দেবীর হস্তে সুরাপূর্ণ পাত্র প্রদান করেন, বলিয়া বর্ণন আছে। তাহার পর দেবী মহিষা-সুরকে বধ করিবার ঠিক্ পূর্ব্বেই বলেন—"যত পারিস্ গর্জ্জন কর, আমি মধুপান করিয়া লই, তাহার পর তোর নিধনে দেবগণ গর্জ্জন করিবেন"। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন। বিচার করিয়া দেখিলে, সহজেই রহস্য বুঝিতে পারা যায়।

যোদ্ধা রজোভাবপূর্ণ। রণক্ষেত্রে রক্ত-পাত তাঁহার কার্য্য। সেই রজোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত করিতে হইলে, কোন না কোন প্রকার উত্তেজক পদার্থের প্রয়োজন হয়। সর্ব্বশক্তির সমাবেশ দেখাইতে; সুরার উন্মাদিনী শক্তির সমাবেশও দেখাইতে হই-য়াছে! বীর সমরক্ষেত্রে সময়-খেদ অপন-য়নার্থে সুরাশক্তির সাহায্য লইতে পারেন; তাহাতে কোন দোষ হয় না। কিন্তু, এই ঘটনার দোহাই দিয়া, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মসেবা অতিশয় হেয় ও অবিধেয় অনুষ্ঠান। ব্যবহারিক-জগতে বীর যেমন শক্র-নিধন-কল্পে সমরক্ষেত্রে সুরাপন করিয়া, সংহারিণী শক্তিকে সম্পূর্ণ উদ্দীপ্ত করিয়া শক্রসংহার করেন; অধ্যাত্মজগতেও বীর-সাধক আন্তর-রিপুনিধন কল্পে প্রেমভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতি বিবিধ মদে উন্মত্ত হইয়া, স্বকার্য্য সাধন করেন।

এই সম্মিলিতশক্তি আবির্ভূত হইলে, কি ব্যাপার ঘটিল, তাহাই অতঃপর বর্ণিত হইয়াছে। দেবী মুহুর্ম্মুহুঃ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন; সেই হুঙ্কারে দিগ্দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল, চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল; লোকসমূহ ক্ষোভিত হইল, সমুদ্র প্রচলিত হইল! বাস্তবিকই এই শক্তিসম-বায় সংঘটিত হইলে—যে এক অপূর্ব্বশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার সম্মুখে মনুষ্য কোন্ ছার! দেবগণও স্থির থাকিতে পারেন না! সে শক্তিসমবায় অজেয়, সর্ব্বগ্রাসী, তাহার হুঙ্কারে স্বর্গ-মর্ত্ত পাতাল বাস্তবিকই প্রক-ম্পিত হয়! সে শক্তি বাস্তবিকই মহাশক্তি!

মহাশক্তির সেই হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া, মহিষাসুর "আঃ! এ কি?" ("আঃ কিমেতৎ") এই কথা বলিয়া, সসৈন্যে সেই হুঙ্কারের অনুসরণ করিল। "আঃ!" এই শব্দেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে, মহিষাসুর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। দেবগণ যে তাহার পতনকল্পে এত ব্যাপার

অদ্বৈতবাদী, কি তান্ত্রিক—সকলেরই সৃষ্টি-বিষয়ক দার্শনিক-মীমাংসার উপজীব্য বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। উক্ত শ্রুতি-প্রতিপাদ্য শক্তিকে কেহ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, কেহ বিশ্বস্রষ্ট্রী মহাশক্তি, কেহ বা জগদাকারে পরিণমনশীলা মহামায়া, কেহ বা স্বীয় অভি-প্রেত অপর কোন নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে ঔপনিষদ যুক্তি ও প্রমাণবলে ভারত-গৌরব দার্শনিক মতগুলি সভ্যতাগর্ব্বিত পাণ্ডিত্যাভিমানী ইয়ুরোপকে পর্য্যন্ত বিস্মিত স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই উপনিষদই শক্তিবাদের উচ্চ আধ্যাত্মিকত্ব ও দূরব্যাপ-কত্ব প্রতিপাদন করিতেছে!

পৌরাণিক শক্তিবাদের পুরাতত্ত্ব।—পুরাণে ইতিহাসে যে শক্তিপূজার উল্লেখ দেখা যায়, তাহাও যে ভিত্তিশূন্য এমন নহে; কারণ অথর্ব্বকাণ্ডের—

—"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং,ধ্যাত্বা মুনিঃ"—ইত্যাদি বাক্যে শিবগৌরীর উপাসনারও প্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হয়। আবার "কেন" বা তলবকারোপনিষদের (৩।১২)

—"বহু শোভমানামুমাং, হৈমবতীং তাং হোবাচ।"

(অর্থাৎ সেই বহুশোভাশালিনী হৈমবতী উমাকে বলিলেন)—এই শ্রৌত বচনেও শাক্তমতের পুরাতনত্ব যথেষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। অমরকোষাদি অভিধানে 'উমা কাত্যা-য়নী গৌরী কালী হৈমবতীশ্বরী' এইরূপ নামপর্য্যায় পরিদৃষ্ট হয়, এবং প্রামাণিক দশোপনিষদের অন্তর্ভূত এই প্রাচীন উপ-নিষদে যখন হৈমবতী উমা—ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণকে ব্রহ্মজ্ঞানো-পদেশ-পূর্ব্বক সৎকৃত হইতেছেন, তখন এই আধ্যাত্মিক অজ্ঞতার যুগে ক্ষুদ্র মানব কিরূপে সেই মহীয়সীশক্তি অস্বীকার করিতে সাহসী হইতে পারে, বুঝিতে পারি না! উপনিষদ্ব্যাখ্যাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতমত প্রতিপাদন সময়েও, এই ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষয়িত্রী যে শৈলেশনন্দিনী, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

নাস্তিকের শক্তিতত্ত্ব।—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, প্রত্যক্ষেই হউক বা পরোক্ষেই হউক, সকলেই বিশ্ব-শক্তির সত্তা স্বীকারে নতমস্তক। জড়বাদী ঘোর নাস্তিককে পর্য্যন্ত জটিল অসমাধেয় ব্যাপারে অপজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয় (the unknown & the unknowable) শক্তিবিশেষের কল্পনা করিতে হয়,—অন্ততঃ সেই অল্প সময়ের জন্য তিনি মহাশক্তির উপাসক। অতএব ধরিতে গেলে, চার্ব্বাক, কপিল, বুদ্ধ, এপিকিউরস্, কোমৎ মিল, হক্‌সলি, স্পেন্সার কেহই নিরীশ্বরবাদী নহেন, বরং অধিকতর শ্রদ্ধালু শক্তিসেবক।

বৈজ্ঞানিকের শক্তিবাদ।—আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রকৃতি বা স্বভাব ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরের অপর সত্তাস্বীকারের প্রয়োজনীয়তা প্রায়ই উপলব্ধি করেন না। কিন্তু একটু নিগূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে, পূর্ব্বোদাহৃত শ্রুতিগুলি যে বিশ্বশক্তির সত্তা প্রমাণিত করিতেছে, বক্ষ্যমাণ বাহ্য-স্বভাব বা মহাপ্রকৃতি তাঁহারই বিকাশ মাত্র। অতএব মুখে স্বীকার করি বা না করি, কার্য্যতঃ আমরা সকলেই পরম শাক্ত। কারণ, উদ্ধত নাস্তিক পদার্থ-দর্শনবেত্তাগণও জড়পদার্থ ব্যতিরিক্ত সংস্কার বা বেগাখ্যশক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না!

শক্তিবাদের প্রসার। ভারত বহুদিন হইতে জননীকে মহাশক্তি জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে। তাই প্রত্যক্ষদেবীর আরাধনায় জীবন সার্থক করিতে শিথিল-প্রযত্ন ভারতবাসী নিতান্ত বিরল,—পক্ষা-ন্তরে মাতৃপূজার ক্রমবিকাশে জগজ্জননীর উপাসনায় যাঁহারা ধন্য ও সফলকাম হইয়া গিয়াছেন, প্রতি গ্রামের প্রত্যেক মৃত্তিকাস্তূপ যদি তাঁহাদিগের স্মৃতিস্তম্ভরূপে

পরিগণিত হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের সংখ্যার ইয়ত্তা হয় কিনা, সন্দেহ! মঙ্গলের জন্য কি অমঙ্গের জন্য—তাহার শেষ সিদ্ধান্ত মঙ্গলময় বিশ্বপাতা—ভবিষ্যতের অন্ধতামস কুক্ষিতে এখনও প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন,—আজ আবার সেই ভারতে জননী জন্মভূমির মহাশক্তি নূতন আকারে আবির্ভূত হইয়া, ভারতবাসী সাধারণকে এক নব সঞ্জীবন মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়া দিয়াছেন—সেই দৈবী উদ্দীপনায় ক্ষীণ দুর্বল দেহেও বলাধান লক্ষিত হইতেছে! মৃতপ্রায় থাকিয়া যে জাতি 'ভীরু কাপুরুষ' প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্ভাষণসুখ অনুভব করিয়া আসিতেছেন, লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের পুনরুদ্ধারে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া, সেই ভারতসন্তানগণও আজ সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা নিগ্রহ সহিবার জন্য অটলভাবে প্রস্তুত। ইহা বিশ্বজননীর মোহিনী-শক্তির স্ফুরণ ব্যতীত আর কি বলিব?

বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিতত্ত্ব ও নব্যভারত। অন্যান্য অধঃপতনের মধ্যে, ভারতবাসীগণ কিছু দিন হইতে মোহবশে জননীস্বরূপা ভারতমাতার পূজায়—স্বদেশের কল্যাণ-কামনায়—বিরত ছিলেন, সুতরাং দুর্গতিরও অবধি ছিল না। স্বদেশবাসীর দুরবস্থা-দর্শনে দেশভক্ত মনীষীগণের শোকাবেগ কতই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তবুও তাঁহাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গে নাই। কিন্তু হঠাৎ ভারতবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন রাজ-প্রতিনিধি কর্জনের কৃপায় তাঁহাদিগের চক্ষু ফুটিয়াছে, তাই আজ "সরকারী চাকরী", "রাজা" "রায় বাহাদুরী"-সম্মান লাভের জন্য তাঁহাদিগকে আর পূর্ববৎ লালায়িত দেখা যায় না। ধন্য বঙ্কিমচন্দ্র! ধন্য আপনার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি! আপনার প্রতিভাই স্পষ্টত দেখাইয়া দিয়াছে, মাতৃভক্তিকে জননী হইতে মাতৃ-স্বরূপা জন্মভূমিতে প্রসারিত করিয়া সর্ব্ব-ত্যাগে কৃতসংকল্প হইতে না পারিলে, আত্মোৎসর্গপরায়ণ সন্তান-সম্প্রদায়ের ন্যায় মাতার কালিমাময়ী প্রতিমার বিনিময়ে প্রসন্নময়ী রাজরাজেশ্বরীমূর্ত্তির দর্শন-লাভে আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। আজ দেখিতেছি সার্থক আপনার আনন্দমঠ-রচনা! আপনার লেখনীই শাক্তবৈষ্ণবের চির-নিরূঢ় বিবাদ প্রশমনের পর, তাহাদিগকে এক অখণ্ডনীয় প্রেমপাশে বাঁধিয়া মহত্তর লক্ষ্যের জলন্ত আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছে! আপনি ত্রিদিবস্থিত উচ্চসিংহাসনে বসিয়া, বোধ হয় আনন্দে অবলোকন করিতেছেন,—যে আজ সেই দিন আসিয়াছে, যেদিন হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, জৈন, আর্য্য-সমাজী, শিখ প্রার্থনাসমাজী, খৃষ্টিয় অনার্য্য—ভারতমাতার কৃতী অকৃতী সকল সন্তানই মাতৃপূজারূপ মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা, বিস্মৃতির অতলজলে নিমজ্জিত করিয়া,—একই কল্যাণ-দায়িনী ও বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির অর্চ্চনার জন্য ব্যগ্র! এই নবীন শাক্তসম্প্রদায়ের নবপ্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র, প্রচারক ভারতের প্রত্যেক কৃতী সন্তান, এবং মহামন্ত্র সেই সর্বজন-সমাদৃত স্বদেশ-স্তোত্র—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং,
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং,
সুখদাং বরদাং মাতরম্

* * * *

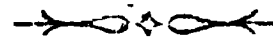
ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং,
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।"

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা



১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ। ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

দ্বৈতবাদে আপত্তি কাহার?

অদ্বৈতবাদের কথা শুনিলে, যাঁহারা কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করেন, তাঁহারা বলেন, দ্বৈতবাদ বিশ্বজনীন সত্য। বর্ত্তমান সমুদয়-সম্প্রদায় মধ্যে শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায়, রুদ্রসম্প্রদায় ও সনকসম্প্রদায়, এই চারিটী সম্প্রদায়ই প্রধান, তন্মধ্যে রামানুজস্বামী শ্রীসম্প্রদায়, মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী রুদ্রসম্প্রদায়, এবং নিম্বাদিত্য সনকসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব ও বস্তুতঃ দ্বৈতবাদী।

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজস্বামী, দাক্ষিণাত্যে পেরুম্বুর জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়া, একাদশশতাব্দীর মধ্যভাগে স্বীয়-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, ইঁহার কৃত দর্শনের নাম রামানুজদর্শন। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য দাক্ষিণাত্যের তুলবদেশে মাধজি-ভট্টের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নামপ্রেম-প্রচারক ভগবান্ চৈতন্যদেব মাধ্বসাম্প্রদায়িক ছিলেন, কিন্তু ইঁহার প্রচারিত মতের সহিত মাধ্বমতের সর্ব্বাংশে ঐক্য নাই। রুদ্রসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বিষ্ণুস্বামী একজন প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার। ইঁহার জীবদ্দশায় রুদ্রসম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয় হয় নাই, ইঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তির পরে, ১৫০০ পনর শত শকাব্দে বল্লভাচার্য্য ইঁহার মত বিশেষ রূপে প্রচার করেন। এ কারণ এই মতাবলম্বী বৈষ্ণব-গণ 'বল্লভাচারী' নামে প্রসিদ্ধ। বল্লভাচার্য্য দাক্ষিণাত্যের ত্রৈলিঙ্গদেশীয় লক্ষণভট্ট নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। সনকসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক নিম্বাদিত্য, বৃন্দা-বনের নিকটে থাকিতেন, যমুনাতীরে ধ্রুব-ক্ষেত্রে নিম্বাদিত্যের এক গদী আছে। পশ্চিমাঞ্চলে ইহার মতাবলম্বী বৈষ্ণব অনেক

আছেন, তাঁহারা "নিমাওৎ"নামে বিখ্যাত। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে, যে, নিম্বাদিত্যের পূর্ব্বনাম ভাস্করাচার্য্য, ইনি প্রয়োজন বশতঃ সূর্য্যদেবকে নিম্ববৃক্ষে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার "নিম্বাদিত্য" নাম হইয়াছিল।

এই চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে, শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী হইলেও, দ্বৈতবাদে তাঁহার আপত্তি নাই, পরন্তু বৈষ্ণবসম্প্রদায় চিরদিনই দ্বৈতবাদের দাস। বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি পূর্ণানন্দ পণ্ডিত "তত্ত্বমুক্তাবলী" নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থেও অপ্রতিহতভাবে দ্বৈতবাদের রাজত্ব সমর্থন করা হইয়াছে। ঐগ্রন্থে অদ্বৈতবাদের উপরে শতদোষ প্রদর্শন থাকায়, সচারাচর উহাকে "শতদূষণী" বলে। শতদূষণীকার বলেন "যে জীব ব্রহ্মের দাস, তাহাকে 'ব্রহ্মস্বরূপ' বলা মহাপাপের কার্য্য।" ঐ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ, সেবানন্দ পাইয়া নরকে যাইতে চান, তথাপি নির্ব্বাণমুক্তি কামনা করেন না। ইঁহারা স্বর্গ, নরক ও নির্ব্বাণকে তুল্য মনে করেন। "স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ" ইত্যাদি প্রমাণ ইঁহাদের অভিমত।

এইত গেল, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কথা,—এখন একটু উপরে উঠিয়া, প্রাচীন ঋষিগণের সংবাদ লওয়া যাউক্। ঋষিগণের মধ্যে বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কণাদ দ্বৈতবাদী, এবং সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কপিল, ও পাতঞ্জলদর্শনপ্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি চিরদিন দ্বৈতবাদের আরাধনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, প্রতিভার অবতার, উদয়নাচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইলেও, বৃত্তিকার ও ভাষ্যকারাদির মতে, ন্যায়দর্শন সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদ-মূলক। ন্যায় ও সাংখ্যাদি দর্শনে, জীবাত্মা-সকল পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর এক, সুতরাং বহু জীবাত্মা এক ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহা সহজেই অনুমেয়। এ কারণ জীবাত্মার বহুত্ববাদী ন্যায়াদি-দর্শনকারেরা যে দ্বৈতবাদী, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বমীমাংসাপ্রণেতা মহর্ষি জৈমিনিও দ্বৈতবাদী। বেদান্তসূত্রপ্রণেতা বেদব্যাসেরও দ্বৈতবাদেই তাৎপর্য্য,—ইহা উল্লিখিত রামানুজ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই দেখাইয়াছেন;—অতএব এখন জিজ্ঞাসা করি "দ্বৈতবাদে আপত্তি কাহার"?

এতগুলি লোক যে দ্বৈতবাদের সমর্থন করিতেছেন, এবং নির্জ্জন-প্রদেশে নিস্তরঙ্গ গভীর সাগর গর্ভ-নিহিত মীনের ন্যায় স্তিমিত-লোচনে, ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া, যাঁহারা কোটিসূর্য্যপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া, আধ্যাত্মিক-চিন্তায় কাল-কর্ত্তন করিতেন, সেই কপিল-কণাদাদি মহর্ষি, যে দ্বৈতবাদকে অমোঘ আশীর্ব্বাদে অমর করিয়া গিয়াছেন, সেই দ্বৈতবাদে আপত্তি করিবার শক্তিই বা আছে কাহার?

এই প্রৌঢ়বাদের ছড়াছড়ির মধ্যে যদি কেহ শঙ্কর-সেবক থাকেন, অবশ্যই তিনি জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিবেন--"আপত্তি আমার। দ্বৈতবাদে আমারই আপত্তি বজ্রের ন্যায় রহিয়াছে। দ্বৈতিগণ শ্রুতির মীমাংসা না জানিয়া, বৃথা মোহে ঘুরিতেছে, জীব ও ব্রহ্মকে

ভিন্ন বলিয়া বুঝিয়া, কেবল অবিদ্যার সেবা করিতেছে, উপনিষদের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়া, কেবল শুষ্ক তর্কে কালকর্ত্তন করিতেছে। যদি সেই চিরসঙ্গিনী বিশ্বমোহিনী অবিদ্যা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আইস, সেই শঙ্করমূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রদর্শিত পথে উপস্থিত হও, আর বিলম্ব করিও না, ঐ শুন,—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ।

যিনি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে সমস্ত দর্শনকারের মত খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈতবাদের পরমসত্যতা সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন, এবং তৎকালীন অদ্বিতীয়মীমাংসক পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রকে, তৎপত্নী সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা উভয়-ভারতীর মধ্যস্থতায় বিচারে পরাস্ত করিয়া, "তত্ত্বমসি" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং তৎকালে সকলদেশের সমস্ত দার্শনিক যাঁহার অদ্বৈতবাদের যুক্তি-জালে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহারাই শরণাগত হইয়াছিলেন, (শত শত ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে) ভারতের সর্ব্বপ্রধান-রত্ন সেই শঙ্করের সেবক হইয়া, তাঁহারই মীমাংসিত উপনিষদ্বাক্যাবলী ও তাঁহারই বিরচিত উপদেশসাহস্রী, জ্ঞানোপদেশবিধি, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থের যথেষ্ট অনুগ্রহ পাইয়াও কেন দ্বৈতবাদে আপত্তি করিবনা? তাই তারস্বরে বলিতেছি—"দ্বৈতবাদে আপত্তি আমার"।

তত্ত্ব জানিবার জন্য কৌতূহল সকলেরই স্বাভাবিক, কিন্তু সেই অদ্বিতীয় পুরুষের নিকট হইতে বুদ্ধিযোগ না মহাদে পাচ্ছন্ন- কোনও দিনই যে তাহা জানা যায় না, এ বুদ্ধি কাহারও স্বাভাবিক নহে! তাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে অগ্রে সেই বুদ্ধিযোগ পাইবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি, নচেৎ অভিলাষ পূর্ণ হইবে না; ইহাই আমার শেষ বক্তব্য ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদির ফল। ঐ শুনুন, ভগবান্ বলিতেছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং,
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে"।

এখন একবার শঙ্কর-সেবকের দ্বৈতবাদে আপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা যাউক্। একদিকে কপিল-কণাদাদি মহর্ষি, অন্যদিকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ইঁহাদের মতের কোনটী সত্য ও কোনটী মিথ্যা, ইহা নির্দ্ধারণ করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলোকের নিতান্ত অসাধ্য, কারণ আমি ভগবদ্ভজনা করিয়া "বুদ্ধিযোগ" লাভ করিতে পারি নাই; তবে একমাত্র গুরূপদেশের সহায়তায় ঐ উভয় মতের একটু মূলানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বেদান্ত-শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে—"নৈয়ায়িকগণ শ্রুতি জানেন না, শ্রুতি লইয়া কোন আলোচনা করেন না, পরন্তু বেদবিরুদ্ধ তর্কজাল লইয়া সময়কর্ত্তন করেন, অপিচ শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম তাঁহাদের নিকট কিছুই পাওয়া যায় না।" এইরূপ একটী প্রবাদ অনেকস্থানে শুনা যায়। এই প্রবাদের সত্যতা, অন্যে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেও, বর্ত্তমানকালে আধুনিক নৈয়ায়িকদিগের সম্বন্ধে উহার সত্যতা আমি সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিতে বাধ্য, কিন্তু

তত্ত্বমাল্য-বিবৃতিতে রঘুনাথ শিরোমণির এদিদেমম্বয়, ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্ত ভট্টের ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির শ্রুতি-বিচারাদি দেখিয়া, প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমি ঐ প্রবাদের আংশিক সত্যতা স্বীকার করিতেও পারিনা। কারণ, জ্ঞানকৃত মিথ্যাবাদের ভয় সত্যসেবক মাত্রেরই আছে।

পরন্তু অদ্বৈতবাদের কথা শুনিয়া যাঁহারা নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতিও সহানুভূতিসম্পন্ন নহি। কেহ কেহ অদ্বৈতবাদ-নিন্দায় তৃপ্তিলাভ না করিয়া, বলিয়া থাকেন "অদ্বৈতবাদ একটা কিছুই নহে। উহা নিতান্ত ভ্রমবিলসিত। জগতের সমস্ত বস্তুই সত্য বলিয়া লোকের অনুভূত। কোন ব্যক্তি গমনকালে প্রাচীর সম্মুখে পড়িলে, তাহা ভেদ করিয়া যাইতে পারেনা, অতএব কখনই প্রাচীর মিথ্যা পদার্থ নহে। মিথ্যা হইলে ঐরূপ গমনপ্রতিবন্ধক হইত না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যাহা সিদ্ধ, তাহার অপলাপ করিতে যাওয়া বা তাহাকে মিথ্যা বলা উন্মত্তপ্রলাপমাত্র।" কেহবা সেই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের "প্রত্যক্ষাদি-প্রমাসিদ্ধ-বিরুদ্ধার্থাভিধায়িনঃ। বেদান্তা যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে।" এই শ্লোকটী উল্লেখ করিয়া, বেদান্তশাস্ত্রের প্রতি একটু কটাক্ষ করেন ও উচ্চহাস্যে দিগ্বলয় মুখরিত করেন। আমি তাঁহাদের সকলকেই একবার উপযুক্ত গুরুর নিকট, সংযতচিত্তে বেদান্তের "অদ্বৈতবাদের" মর্ম্ম জানিবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করি। তাঁহারা যেন বিস্মৃত না হন, শাস্ত্রনিন্দা মহাপাপ। প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত কোনও সত্যলাভ সহজ নহে, অপরোক্ষানুভব ও অনায়াসলব্ধব্য নয়, বহু-সাধনায়—বহুসুকৃতি বলে সদ্‌গুরু-কৃপায় কদাচিৎ কেহ সত্যের উলঙ্গমূর্ত্তির অপরোক্ষ-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন।

সমস্ত অদ্বৈতবাদী একবাক্যে শ্রুতিই অদ্বৈতবাদের মূলপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতির তাৎপর্য্যালোচনা দ্বারা যাহা স্থির হইবে, সকলকেই তাহা অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। যেটী শ্রুতি-বিরুদ্ধ হইবে, তাহা সহস্র-তর্কসিদ্ধ হইলেও অগ্রাহ্য। কারণ, শ্রুতিবিরোধি তর্ক কোন দিনই পদার্থসাধক হয় না, যেহেতু তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই।

এখন দেখা যাউক্, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈত-বাদের মধ্যে, কোনটী শ্রুতি-বিরুদ্ধ আর কোনটী বা শ্রুতিসিদ্ধ। গৌতম-কণাদ-কপিলাদি শ্রুতিমর্ম্ম জানিতেন না, বা শ্রুতিবিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের অনুমত দ্বৈতবাদ, শ্রুতিবিরুদ্ধ, ইহা বিশ্বাস করিতে হৃদয় বিকম্পিত হয়! কি বিষমসমস্যা!

যদি কেহ বলেন, সাংখ্য-প্রবচনভাষ্যে আমরা বিজ্ঞানভিক্ষুর মুখে শুনিয়াছি যে—"ন্যায়াদিদর্শনে অনেক বেদবিরুদ্ধ অংশ আছে, উহা ত্যাজ্য"। পরন্তু উহা বিজ্ঞান-ভিক্ষুর নিজমত নহে, তিনি শাস্ত্র অবলম্বনেই যে সিদ্ধান্তের সমীপে পৌছিয়াছেন। পুরাণবচনেই এরূপ মীমাংসা রহিয়াছে যথা—

"অক্ষপাদপ্রণীতেচ কাণাদেসাংখ্য যোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃশ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভি।

জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো নকশ্চন। শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারংগতৌহিতৌ”। অর্থাৎ—অক্ষপাদপ্রণীত ন্যায়, কণাদপ্রণীত বৈশেষিকদর্শন এবং সাংখ্যাদিশাস্ত্রে অনেক শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে, উহা পরিত্যাজ্য। কারণ, উহা উদ্দেশ্যবিশেষবশতঃ তাঁহারা বলিয়াছেন। এই সকল অংশের প্রামাণ্য নাই। যেমন ন্যায়মতে ও বৈশেষিকমতে আকাশের নিত্যত্ব,আত্মার কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি, এবং সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরিহার প্রভৃতি। এই সমস্ত বেদবিরুদ্ধ অংশ বাদ দিয়া, অন্যান্য অংশের প্রামাণ্যেই ঐ সকল দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য স্থাপিত। বেদ-ব্যাসকৃত বেদান্তে ও জৈমিনিপ্রণীত পূর্বমীমাংসায় বেদবিরুদ্ধ কিছুই নাই,সুতরাং উহার সর্বাংশই অকাট্য প্রমাণ—সার্বজনীন সত্য—অভ্রান্ত বাণী।

দার্শনিকজগতের প্রধানরত্ন বিজ্ঞানভিক্ষু আধুনিক লোক নহেন। বিশেষতঃ তাঁহার উদ্ধৃত পুরাণ-বচনকে অপ্রমাণ বা অমূলক বলা যায় না, অতএব ন্যায়াদিদর্শনে বেদবিরুদ্ধ মত গ্রথিত আছে, ইহা শাস্ত্রসম্মত। যাঁহারা এই কৌশলে দ্বৈতবাদের নিষ্করুক পান করিতে চাহেন, তাহাদিগকে আমরা বলি,—বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মীমাংসায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই যদি সকল গোল মিটাইতে চান, তবে আসুন, তাঁহারই উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের বচনের নিকট আপনাদিগকে লইয়া যাই; তাহা হইলে সর্বসংশয়ের নিরসন হইবে। ঐ দেখুন পদ্মপুরাণে লিখিত রহিয়াছে—“মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নংবৌদ্ধমেবচ ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা” মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন, মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধশাস্ত্র বিশেষ উহা অসৎশাস্ত্র, জগৎ উচ্ছিন্ন দিবার জন্য মায়াবাদের সৃষ্টি আমিই করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে এই নিন্দিত মায়াবাদই শঙ্করের “অদ্বৈতবাদ”। এ বিষয়ে যাঁহার সংশয় আছে, তিনি পদ্মপুরাণে মায়াবাদের যে স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং শঙ্করের কর্ম-সন্ন্যাস প্রতিপাদনের উল্লেখ আছে, সেই প্রমাণ পাঠ করুন। পদ্মপুরাণে সুস্পষ্ট রহিয়াছে “পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। কর্মস্বরূপত্যাজ্যত্বং অত্র চ প্রতিপাদ্যতে।” মায়াবাদে জড়জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, জড়জগৎ মায়াকল্পিত মায়াময়—বলাতে উহার নাম মায়াবাদ হইয়াছে। মায়াবাদ অতি প্রাচীন মত। পুরাণাদিশাস্ত্রেও ইহারই উল্লেখ দেখা যায় ভগবান শঙ্করাচার্য্য ইহাকে নূতন অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, অতি বিস্তৃতরূপে প্রচার করিয়াছেন। বেদবাক্যকে ছদ্মবেশ পরাইয়া জগৎ সমক্ষে বাহির করিয়াছেন। বোধ হয় যেন এই শাস্ত্র কতই বেদার্থবিশিষ্ট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বেদের কদর্থ মাত্র। পদ্মপুরাণে আছে—উহার শ্রবণ মাত্রে জ্ঞানিগণেরও পাতিত্য জন্মে। মায়াবাদের নিন্দাজ্ঞাপক সেই পদ্মপুরাণীয় শ্লোকটী এই “যস্যশ্রবণ মাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি”। এখন দেখুন বিজ্ঞানভিক্ষুর প্রদর্শিত পুরাণবচনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলে, সংগ্রামে দ্বৈতবাদীর পক্ষেই জয়শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইবে। দ্বৈতবাদী বলিবেন, “আর কেন? শাস্ত্রই তোমার অদ্বৈতবাদের বেদবিরুদ্ধতা সম্বন্ধে

সাক্ষ্য দিতেছেন"। অতএব কএকটী পুরাণ-বচনের প্রতি নির্ভর করিয়াই, শাস্ত্রমীমাংসা করা অপেক্ষা, শ্রুতিবিচার করিয়া, শাস্ত্র-মীমাংসা করাই সঙ্গত। বিজ্ঞানভিক্ষুর ন্যায় অদ্বৈতবাদীকে এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়না। এখন দেখা যাউক্, শ্রুতিতে অদ্বৈতবাদের ভিত্তি কোথায়?

প্রথমতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে পাওয়া যায়—"ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বংতৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"। অর্থাৎ "এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক, এবং সদ্বস্তুই এসমস্তের আত্মা, তাহাই সত্য, এবং তাহাই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমি সেইআছ"। এস্থানে "সেই সদ্বস্তু সত্য," এরূপ বলাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, কার্য্য অর্থাৎ জগৎ সত্য নহে, অর্থাৎ মিথ্যা। "তুমি সেই আছ" বলাতে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে এক, ইহাই বলা হইয়াছে।

পরে আরও বলা হইতেছে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ মাত্র ছিল, নাম ও রূপ ছিলনা, সমস্তই একমাত্র ও অদ্বিতীয়।"

অন্যান্য শ্রুতিতেও এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। যথা—"যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি"। এই শ্রুতিতে "দ্বৈতমিব" এই 'ইব'শব্দের দ্বারা, দ্বৈতের মিথ্যাত্ব জানান হইতেছে। কারণ, যদি কেহ বলে, "মন্দান্ধকারে রজ্জুঃ সর্প ইব ভবতি" তাহা-হইলে, রজ্জু সর্পের ন্যায় হয়—এইরূপ বুঝিয়া, সর্পের মিথ্যাত্বই স্থির হয়।

অন্য শ্রুতিতে পাওয়া যায় "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু লাভ করে। এখানেও "নানেব" এইরূপ বলাতে নানাত্ব বাস্তবিক নহে, ব্যবহারিক, ইহা জানান হইয়াছে।

অন্যত্র দেখাযায় "একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" এক ব্রহ্মকে নানারূপে কল্পনা করে। এই সমস্ত শ্রুতিবলেই অদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ কাহারও কল্পনা-প্রসুত নহে। যাঁহারা, অদ্বৈতবাদ নিতান্ত যুক্তিহীন—উহাতে গুরুশিষ্যভাব উপাস্য-উপাসকভাব, কিছুই থাকেনা—প্রত্যক্ষসিদ্ধ সমস্ত বস্তুর অপলাপ করিতে হয়—উপনিষদে দ্বৈতপ্রপঞ্চেরও উল্লেখ রহিয়াছে—ইত্যাদি বলেন,—তাঁহারা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিবেন, অদ্বৈতবাদীরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগৎপ্রপঞ্চের অপলাপ করেন না। তাঁহারাও শাস্ত্র মানেন, গুরুশিষ্যভাবে আত্মবিদ্যার অনুশীলন করেন। সত্ত্বশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। সুতরাং উপাস্য-উপাসকভাবে জীব ও ব্রহ্মের ঔপাধিকভেদও স্বীকার করেন। আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য যোগমার্গ আশ্রয় করেন, কিন্তু তাঁহারা দ্বৈতপ্রপঞ্চের সত্যতা ও পারমার্থিকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ ব্যবহারিক ও মায়াময়, অদ্বৈতই পারমার্থিক ও সত্য। উপনিষদে দ্বৈতপ্রপঞ্চের উল্লেখ আছে, কিন্তু দ্বৈতপ্রপঞ্চ সত্য, ইহা কোনও উপনিষদে নাই। পরন্তু দ্বৈতপ্রপঞ্চের মায়াময়ত্বই উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে যথা—

"ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে"। পরমেশ্বর মায়াদ্বারা বহুরূপ দৃষ্ট হন ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক, উপনিষদে দ্বৈতবাদের কথা কোথায় আছে—

কঠোপনিষদে একস্থানে দেখিতে পাই—"ঋতংপিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি পঞ্চাগ্নয়োযেচ ত্রিণাচিকেতাঃ"। অর্থাৎ এই শরীরে একজন স্বকৃতকর্ম্মফল ভোগ করেন, অপর একজন ভোগ করান, উভয়েই হৃদয়াকাশে বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট। তন্মধ্যে একজন জীবাত্মা সংসারী, অপরজন পরমাত্মা অসংসারী;—অতএব ব্রহ্মবেত্তা ও গৃহস্থগণ ঐ উভয়কে ছায়া ও আতপের ন্যায় ভিন্ন বলেন।

এইরূপ মুণ্ডকোপনিষদে একস্থানে দেখিতে পাই,—"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" অর্থাৎ সহচর ও পরস্পর সখা দুইটী পাখী, একটী বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটী পাখী নানাবিধ ফল ভক্ষণ করে, অপরটী কিছুই খায়না, কেবল দেখে মাত্র। এই শ্রুতিতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, শরীর-বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটী পাখী, পুণ্য ও পাপজনিত সুখদুঃখরূপ ফল ভক্ষণ ও দর্শন করেন। অন্য শব্দের দ্বারা, জীবাত্মা পরমাত্মা-ভিন্ন, ইহা আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, দ্বৈতবাদীদিগের স্বমতসমর্থনে (আপাততঃ) এই দুইটী শ্রুতি অনেক সহায়তা করে। শ্রুতি বিরুদ্ধবাক্য বলেন না, তাই শ্রুতি-পন্থী অদ্বৈতবাদীর নিকট এই শ্রুতির প্রকৃত তথ্য জানিতে হইতেছে।

অদ্বৈতবাদীরা বলেন, "ঋতংপিবন্তৌ" এই কঠবল্লীর শ্লোকে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবিক ভেদ প্রদর্শিত হয় নাই। উহাতে একই আত্মার উপাধিভেদে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ ঐ শ্লোকে, ভেদের সত্যতা-বোধক কোনও শব্দ নাই। যদি বলেন, ভেদের মিথ্যাত্ব বোধক শব্দও কিছু নাই, তবে কি করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ব্যবহারিক, উহা পারমার্থিক নহে,—ইহাই ঐ শ্লোকের দ্বারা প্রতিপাদিত বলিয়া নীরবে স্বীকার করিব? তাহাহইলে আরও একটু কষ্ট-স্বীকার করিয়া, অদ্বৈতবাদীদিগের আরও কএকটী কথা শুনিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদীগণ অদ্বৈতবোধক বহু প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সমস্ত প্রমাণের দ্বারা, জীবও ব্রহ্মের ভেদ পারমার্থিক নহে, প্রত্যুত ব্যবহারিক, ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ব্যবহারিক হইতে পারেনা। কারণ, জীবও ব্রহ্মকে অভিন্ন বলিয়া কেহই ব্যবহার করেনা, পরন্তু ভিন্ন বলিয়াই সকলে ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং জীবও ব্রহ্মের ভেদের যে সত্তা—তাহা ব্যবহারিক ভিন্ন পারমার্থিক বলিবার উপায় নাই। শঙ্কর সেবক শুদ্ধাদ্বৈতবাদীরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর ন্যায়—ভেদ ও অভেদ এই উভয়কে সত্য বলিতে, উন্মত্তপ্রলাপের আশঙ্কা করেন। তাই জীবব্রহ্মের অভেদই পারমার্থিক

ও সত্য বলিয়া শ্রুতি-সিদ্ধ হওয়ায়, "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি শ্লোকে প্রতিপাদিত জীব্রহ্মের ভেদ ঔপাধিক বলিয়া মীমাংসা করিয়া থাকেন।

পরন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন—কঠবল্লীর শ্লোকটী দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ পারমার্থিকরূপে স্থির করিতে যাওয়া নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় মাত্র। কারণ "ঋতং-পিবন্তৌ" এই শ্লোকের কিছু পরেই কঠবল্লীতেই দ্বৈতের প্রতিষেধ এবং দ্বৈতদর্শীর নিন্দা করা হইয়াছে—যথা "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহনানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি" অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরূপদেশসংস্কৃত মন দ্বারাই এই ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য, এই ব্রহ্মে অনুমাত্রও নানা অর্থাৎ ভেদ নাই; যে এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু পাপ্ত হয়। "ঋতং পিবন্তৌ" এই শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবিক ভেদ অভিপ্রেত হইলে, পূর্ব্বাপরবিরোধ-দোষে শ্রুতি-প্রামাণ্যই থাকেনা, অতএব কঠবল্লীর অদ্বৈতবাদেই তাৎপর্য্য, সন্দেহ নাই।

অপর, মুণ্ডকোপনিষদের "দ্বাসুপর্ণা" এই বাক্যে আপাততঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ বুঝাইলেও, উহার প্রকৃতার্থ অনুসন্ধান করিলে, আর কোন আপত্তিই থাকিবে না। "দ্বাসুপর্ণা" এই মন্ত্রটীর প্রকৃতার্থ বেদেই বিদ্যমান, কপোলকল্পিত ব্যাখ্যায় শাস্ত্রার্থনিশ্চয় হয় না। পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে মন্ত্রটীর বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। "তয়োরন্যঃপিপ্পলংস্বাদ্বত্তীতিসত্ত্বং অনশ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি অনশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞঃ তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি" অর্থাৎ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলংস্বাদ্বত্তি" এতদ্দ্বারা সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণের ফলভোক্তৃতা বলা হইয়াছে। "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইহার এই অর্থ যে—অন্য ভোক্তা নহে কিন্তু দ্রষ্টা, অতএব এই দুইটী পাখী জীবাত্মা ও পরমাত্মা নহে, অন্তঃকরণও জীবাত্মা। পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণে এইরূপে "দ্বাসুপর্ণা" এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়া, পরে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—"তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যতি, অথ যোহয়ং শারীর উপদ্রষ্টা সক্ষেত্রজ্ঞঃ, তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি" অর্থাৎ যদ্দ্বারা স্বপ্নদর্শন সম্পন্ন হয়, সেই অন্তঃকরণের নাম সত্ত্ব, যে শারীর অর্থাৎ জীবাত্মা দ্রষ্টা, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। অতএব অন্তঃকরণ ও জীবাত্মা যথাক্রমে সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ। অচেতন অন্তঃকরণের ফলভোক্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহার মীমাংসা স্বীয়ভাষ্যে করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহার আলোচনায় নিবৃত্ত হইলাম। এখন সকলেই বুঝিলেন, অদ্বৈতবাদীদিগের মত অমূলক বা কল্পিত নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অদ্বৈতবাদীরা প্রতীয়মান দ্বৈতপ্রপঞ্চ বন্ধ্যাপুত্র কূর্ম্মরোম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় অলীক বলেন না। তাঁহারা বলেন, আগন্তুক নিদ্রাদোষজন্য স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেমন মিথ্যা, অবিদ্যাদোষজন্য জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থও সেইরূপ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য। ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও পদার্থের পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা আছে।

স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেমন স্বপ্নকালে যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, জাগতিকপদার্থও তদ্রূপ ব্যবহারদশায় অর্থাৎ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে, যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইলে, আর দ্বৈতবুদ্ধি থাকেনা। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতি-দ্বারা, অদ্বৈতবাদ ও ব্যবহারিক দ্বৈতবাদ, উভয়ই সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং উপনিষদে উপাস্য-উপাসক ভাবে পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদনির্দ্দেশ থাকা কিছু বিচিত্র নহে। উহা অবশ্যই থাকিবে। উহার দ্বারা অদ্বৈত-বাদের কোনই ক্ষতি হইতে পারেনা। ফলতঃ অদ্বৈতবাদীরাও ব্যবহারদশাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, ও দ্বৈতপ্রপঞ্চ, এবং পরমাত্মা ও জীবাত্মার উপাস্য উপাসকভাব স্বীকার করেন। তাঁহাদের এতাদৃশ অদ্বৈতবাদের কথা শুনিয়া, কাহারও কর্ণে অঙ্গুলীদিবার কারণ দেখিনা। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক গাহিয়া থাকেন—

মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্ব্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বন্ত্বদ্বৈতমেবহি॥

মায়া-নাম্নী কামধেনুর দুইটী বৎস, জীব ও ঈশ্বর। এই বৎসদ্বয় ইচ্ছানুসারে দ্বৈতরূপ দুগ্ধ পান করুক, কিন্তু অদ্বৈতই প্রকৃত সত্য।

আর এবিষয়ে অধিক লিখিয়া, অসংক্ষিপ্তবাদিতার পরিচয় দিতে চাহিনা। বারান্তরে দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকও মীমাংসক-প্রভৃতির স্বমতসমর্থনে শ্রুতিবিচারাদি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
পাবনা (দর্শনবিদ্যালয়।)

কষ্ট-সহিষ্ণুতা।

ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ঈশ্বরলাভ দ্বারাই মানবের প্রকৃত মানবত্বের পরিচয় হয়। অধ্যাত্ম-রাজ্যের ভক্তি-মুক্তির সঙ্গে জড়রাজ্যের শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্যের পারমার্থিক-রূপের সাম্য বড় সুব্যক্ত। মানব এই দুর্লভ শক্তি-লাভের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। মুক্তিপ্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ। কিন্তু মুক্তিমার্গ বড় দুরা-রোহ—বড় দুর্গম!

ভারতের মানব—বিশেষ প্রাচীন ভারতের মানবগণ—মুক্তিকামনায় উৎকট তপস্যায় জীবনের প্রায় সমস্তাংশ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে মুক্তির চারি প্রকার রূপ নির্দ্ধারিত আছে। সামীপ্য, সাযুজ্য, সালোক্য ও নির্ব্বাণ—এই চারি প্রকার মুক্তির অনুগামী হইয়া, প্রাচীন হিন্দু ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্য, তপশ্চর্য্যা, সৎ শিক্ষা-সাধনা, নিষ্কামতা, পরার্থপরতা, সংযতচিত্ততা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেন। সে তপশ্চরণ কি কঠোর, কি তীব্র, কি কষ্টসহিষ্ণুতাসাধ্য—তাহার পরিচয় শাস্ত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সুবর্ণবর্ণে প্রকটিত আছে।

জগতের সমস্ত দেশের লোকেই ঈশ্বর-লাভের জন্য কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু হিন্দুর ন্যায়, বোধ হয় অন্য কোন দেশের লোকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। অনেকানেক ইউরোপীয় মহাত্মা, ভারতীয় প্রাচীন হিন্দুকে Ease loving men অর্থাৎ আরাম-প্রিয় বা বিলাসপ্রেমিক

বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেমন চরিত্রোৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, এবং যেরূপ শিক্ষাদীক্ষার অধিকারী, সেইরূপ ভাবে প্রাচীন-হিন্দুকে ভাবিবেন,ইহা অস্বাভাবিক নয়! প্রাচীন-হিন্দু, তাঁহাদের ন্যায় শীতাতপ অগ্রাহ্য করিয়া পর্ব্বতারোহণ, সমুদ্রাবগাহন, বহু-দেশ-পর্য্যটন, পর্ব্বত বন কাটিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ,—জন্মভূমি-জননীর স্নেহময় ক্রোড় পরিত্যাগপূর্ব্বক আজীবন বিদেশে অবস্থান, পররাজ্য গ্রহণ, পরপীড়ন প্রভৃতি চাঞ্চল্যময় শ্রমশীলতাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মনে করেন নাই। কাজেই পাশ্চাত্য-চক্ষুর নিকট নিশ্চয় আরামপ্রিয় বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহার আশ্চর্য্য কি? হিন্দু বাহ্যসৌন্দর্য্যের সেবক নয়। আন্তরসৌন্দর্য্যের উপাসক। আন্তরজগতের এক অতি মহত্তর লাভের জন্য, হিন্দুজাতি কষ্টসহিষ্ণুতাকে নিত্য-সহচর করিতে পারেন, আভ্যন্তর-শান্তির প্রত্যাশায় বাহ্যসুখের মুখে অগ্নি প্রদান করিতে পারেন। এই জন্য হিন্দু কখন চাঞ্চল্যময় কষ্টসহিষ্ণুতাকে আদর করেন নাই।

হিন্দুসাহিত্য এই সত্যের জলন্ত উদাহরণ। হিন্দুর যাহাতে আসক্তি, যাহা আশা-হিন্দু যে যাতনা সহিতে প্রস্তুত, যে কামনা হৃদয়ে পোষণ করেন,সমস্তই সাহিত্যের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। হিন্দুর সাহিত্যে হিন্দুর জাতীয়-ভাব—জাতীয়প্রকৃতি পূর্ণভাবে আলোচিত বিবেচিত বিধৃত। এই হিন্দুসাহিত্যালোচনায় জানা যায় যে, তাঁহারা স্থায়ী কষ্ট-সহিষ্ণুতাকে যেরূপ বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বাহ্য-সহিষ্ণুতাকে সেরূপভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। ভারতীয় সাহিত্যে ত্যাগস্বীকার ও কষ্টসহিষ্ণুতার চিত্র যেরূপ দৃষ্ট হয়, পাশ্চাত্য জাতির সাহিত্যে তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্টিগোচর হয় না। সেক্সপিয়র্ প্রভৃতি কবিগণ অনেক কষ্টের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাহ্যজগতেই তাহার পরিধি। উহা ক্ষুদ্রসীমার মধ্যেই আপন অস্তিত্ব সমাপ্ত করিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য মানবমনকে তাহা আকর্ষণ করে, পরক্ষণেই দুর্ব্বলহস্তে পরিত্যাগ করে। ইংরেজী সাহিত্যে এণ্টাইগণি, হ্যামলেট্, লীয়র, কিলকটিটিস্—ইহা সমস্তই কষ্টের চিত্র বটে, কিন্তু বড় অল্প সময়ের—বড় অল্প মুহূর্ত্তের! এই ক্ষণস্থায়ি কষ্টস্বীকার, তাহাদের জাতীয়চরিত্রে কষ্টসহিষ্ণুতার স্থলাঙ্কন প্রমাণ করিতে পারে না।

যে যন্ত্রণা পলে পলে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, বৎসরে বৎসরে—বাড়িয়া উঠে, এবং জীবন-কালের একটি বিশেষ অংশ ব্যাপিয়া ঘোর-বাত্যাবিতাড়িত প্রবাহের ন্যায় প্রতিনিয়ত বহিতে থাকে, অথবা সমগ্র জীবন যাহার কর্ম্মক্ষেত্র, কিম্বা জীবনের পরেও যাহার নিবৃত্তি নাই, এরূপ কষ্ট অকাতরে হৃদয় পাতিয়া সহ্য করিতে পারে। এরূপ আদর্শচিত্র ইউরোপে আদৌ নাই। তাহা থাকিবারও কথা নহে। কেননা, ইউরোপ বাহ্য-প্রকৃতির সেবক, ভারত আবহমান কালই অন্তঃপ্রকৃতির পূজক উপাসক। এই ভারতীয় সাহিত্যেই সীতার বনবাস, অগ্নিপরীক্ষা, রামবনবাস, পাণ্ডবনির্ব্বাসন, নল ও

দময়ন্তীর নিগ্রহ, শ্রীবৎসচিন্তার অদৃষ্ট-পরীক্ষা, হরিশ্চন্দ্রের আত্মবিক্রয়, ঔশীনরের আত্মত্যাগ ইত্যাদি অসংখ্যেয় অপরিমেয় কষ্টকাহিনী যন্ত্রণার জ্বালাময়ী স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। কষ্টসহিষ্ণুতার কঠোর সেবা—যে কত উজ্জ্বলভাবে এসমস্ত স্থলে চিত্রিত, তাহা বর্ণনীয় নয়। এইসব চিত্রের প্রতিরূপ সমগ্র বিশ্বে দ্বিতীয় নাই। অসূর্য্যাম্পশ্যা রাজবধূ পতিসঙ্গিনী, অথচ বনবাসের অসহনীয় কষ্টে পতিতা, তথাপি তাঁহার চিরকোমল হৃদয় পতিদেবতার সঙ্গসুখে কত সুখে কত প্রীতিতে অবস্থিত! হিন্দু চিত্রকর, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত নহেন। মহাপাপের প্রতিমূর্ত্তির নিকট ঐ ছিন্নবৃন্ত কুসুমটী লইয়া রাখিলেন। চেটির বেত্রাঘাতে অশোকবনে কতরূপে কাঁদাইলেন। স্বামীকর্তৃক—প্রাণের আরাধ্য দেবতা কর্তৃক অগ্নিতে পোঁড়াইলেন, তাহার পর যথাস্থানে আনিলেন! তাহার পর আবার বনবাস! আবার অগ্নিপরীক্ষা!! কঠোরতায় অনভ্যস্ত হইলে, পরিশেষে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। হিন্দুকবি, তাই ধরাগর্ভে সতী সীতাকে আশ্রয় দিলেন। এইস্থানে সকল জ্বালা—সকল যন্ত্রণা ফুরাইয়া গেল! হিন্দুরমণী প্রকৃত-হিন্দুরমণীর ন্যায় ভগবানে লয়প্রাপ্ত হইলেন! আহা! যেমন কষ্টস্বীকার, তেমনি পুরস্কার! এরূপ যন্ত্রণা এরূপ কষ্ট, এক হিন্দুনারী ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় কামিনীকুল সহ্য করিতে পারেন না। এইস্থানেই হিন্দুর বিশেষত্ব, এইস্থানেই হিন্দুর মহত্ত্ব।

তাহার পর, রাজা শিবি কপোতরূপী অগ্নির পরীক্ষায় আপন দেহের মাংস কাটিয়া দিলেন। শ্যেনরূপী দেব তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, রাজার শরীরের সমস্ত মাংস কাটিয়া লইলেন, তথাপি কপোতরূপী অগ্নির সমান ওজন হইল না; তখন রাজা তুলাদণ্ডে উঠিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন তাঁহার দানের পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। এইরূপ দান—হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতীয় লোকের কল্পনায়ও আসিতে পারে না। আবার বৃষকেতুর মুণ্ডচ্ছেদ—রাজা শিখিধ্বজের মস্তককর্ত্তন ইত্যাদিরূপ দানপরীক্ষা—এতদ্রূপ কষ্টসহিষ্ণুতা—হে ইউরোপ! তোমার কোন সাহিত্যে আছে কি?

এইজন্য বলিতে ছিলাম, হিন্দুর কষ্টসহিষ্ণুতা, হিন্দুর আত্মত্যাগ—নিজের জন্য—দেহের জন্য নয়,—ধর্ম্মের জন্য আর সর্ব্বভূতের জন্য। ইউরোপেও অনেক কষ্টসহিষ্ণুতা আছে; কিন্তু তাহা প্রায়ই দেহের জন্য—নিজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য বা সর্ব্বভূতের জন্য নহে। এইস্থানেই ভারতে আর ইউরোপে মহাপার্থক্য। ইউরোপ বাহ্য উন্নতির কেন্দ্রস্থান; ভারত আন্তর-উন্নতির অনন্তউর্ব্বরভূমি। এইজন্য অদ্যাপি হিন্দু মৃত নয়। ইসলামের তরবারি, আর ইউরোপের কামান্—হিন্দুকে এইজন্য বিনাশ করিতে পারে নাই। যে জাতি নিজের জন্য আর দেহের জন্য কষ্ট এবং পরিশ্রম করে, সে জাতির নাম এবং উন্নতি দীর্ঘসময়ের জন্য নহে। গ্রীক্ আর রোম-সাম্রাজ্য তাহার উদাহরণ। সেই যে অতবড় পার্থিব ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি রোম, সে আজ কোথায়? কিন্তু হিন্দু আজ এই সুদীর্ঘ—আটশত বর্ষ

গ্রীক্ মোসলমান্ ইংরেজ প্রভৃতির আঘাত আক্রমণ সহ্য করিয়াও, প্রকৃত-সম্পত্তি আন্তর-শক্তি বা আত্মিক উন্নতি হারায় নাই।

একদা। এমন ছিল—যখন ইচ্ছা করিলে, হিন্দুরা, জগতের সসাগরাসাম্রাজ্য জয় করিতে পারিতেন। কিন্তু বাহ্য সম্পদের প্রতি ঔদাস্য বশতঃ করেন নাই। যে জাতীয় লোক গুরুদক্ষিণার জন্য স্বর্গমর্ত্ত-রসাতল ভেদ করিতেন, অশ্বমেধ-যজ্ঞের জন্য যে দেশবাসী—পৃথিবী খনন করিয়া সাগর প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, এরূপ প্রবাদ—সে জাতি ইচ্ছা করিলে কি করিতে না পারিতেন?—হিন্দুর এইরূপ শক্তিসামর্থ্য তাঁহার আধ্যাত্মিক হৃদয়ের ক্ষমতা-অর্জ্জিত। ইহাদের এই উন্নতি অদ্যাপি—এই ঘোর দুর্দশার দিনে, প্রতি গৃহস্থের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগৃহী এখনও পরের জন্য—ধর্ম্মের জন্য নিজের সুখভোগ পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত। এখনও হিন্দু, পরের জন্য কার্য্য করিতে অসীম কষ্টসহিষ্ণু।

আমাদের সাহিত্যের কষ্টভোগের কথাই—আমাদের এই উন্নতির মূল। প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের শিক্ষা, সংস্কার সমস্তই দুঃখের কাহিনীতে পরিপূর্ণ,—তাই অদ্যাপি হিন্দুর কষ্টসহিষ্ণুতা অন্যজাতির জীবনপথের মহান্ আদর্শ। একথা বলা বাহুল্য, হিন্দু এখনও আভ্যন্তরিক কষ্ট সহ্য করিতে পূর্ব্বমতই অভ্যস্ত। বস্তুতঃ হিন্দুপ্রকৃতিই প্রকৃতিগত কষ্টভোগের জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। তবে একটা কথা আছে—ভারতের প্রাকৃতিক রাজ্য অতিগৌরবশালী। ইহার নৈসর্গিক জলবায়ু, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, স্বভাবজাত উর্ব্বরতা, হিন্দুকে দৈহিক কষ্ট-সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত করাইয়া আধ্যাত্মিকতার দিকে লইয়া যায়। এইজন্য হিন্দুমস্তিষ্ক আধ্যাত্মিক-চিন্তার আগার।

জগতের মানব-সাধারণের উন্নতির মূল কষ্টসহিষ্ণুতাকে একটি ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ঘরে বসিয়া আজীবন হিন্দু আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়াছেন বলিয়া, যে, তাঁহাকে লৌকিক জ্ঞান ও ধন উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে যাইতে হইবে না, এরূপ কথা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে আমাদের যেরূপ অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে বিদেশ হইতে লৌকিক জ্ঞান ও ধন উপার্জ্জন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে।

তাই হিন্দু, মনে রাখিও যে তোমার সাহিত্যে, তোমার ইতিহাসে, কষ্ট-সহিষ্ণুতার যে উজ্জল চিত্র আছে, তাহা অন্য কোন জাতীয় সাহিত্য বা ইতিহাসে নাই। বর্ত্তমান কালের উপযোগী সাংসারিক কষ্ট-সহিষ্ণুতার অনুরোধে, যেন তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের সেই "সনাতন আধ্যাত্মিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা" বিস্মৃত না হও। সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মভাবটিকে জীবন্ত রাখিয়া, উদ্যমশীল ইউরোপের উন্নতির পন্থা অবলম্বন কর। তোমার বাহ্য-উন্নতি অধিক নাই বলিয়া, যেন আন্তর-উন্নতির পথ বিস্মৃত না হও। অনেকানেক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুর আন্তর-উন্নতির প্রসর অধিক বলিয়া, তাহার বাহ্য উন্নতি মৃত। উদাহরণ-স্বরূপ—ভারতের বাণিজ্য ইউরোপকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত, ইহার উল্লেখ করেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া বুঝিলে, দেখিতে পাওয়া

যায়, যেমন বাহ্য উন্নতি নাই বলিয়া, হিন্দু মৃতকল্প, তদ্রূপ আন্তর উন্নতি নাই বলিয়া, ইউরোপও মৃত বলিতে হয়। কিন্তু, প্রকৃত-জ্ঞানী, প্রকৃত-চিন্তাশীলের নিকট এউক্তি যুক্তিপদবাচ্য নয়। যে উন্নতি ঈশ্বরাভিমুখ, সেই উন্নতিই উন্নতি, আর সব অবনতি। এই জন্যই বলি, যে কষ্টসহিষ্ণুতা দ্বারা ঈশ্বরলাভ অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, সেই কষ্টসহিষ্ণুতাই যথার্থ। ভাই হিন্দু! তুমি কি তোমার পুর্ব্বপুরুষগণের পথ অনুসরণ করিয়া প্রকৃত উন্নতিলাভ করিবে না?—

তোমার পূজনীয় পিতৃপুরুষ তুষানলে বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তুমি কি সেই পবিত্র হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সংসারের অনন্ত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারিবে না?—তুষানলের—জহরব্রতের ভীষণ জ্বালা যে হিন্দুর হৃদয়ে সহ্য হইয়াছিল, তুমি কি সেই হিন্দুর বংশধর? ভাই! পাপে তুষানল—যেজাতির ব্যবস্থা, তুমি-আমি কি সেই জাতির রক্ত লইয়া আসিয়াছি? তবে কেন সামান্য ব্রত-উপবাসে একদিন দুইদিনের কষ্ট সহ্য হইবে না! ছি ছি! এত হীন—এত লঘু—এত বংশ-গৌরবনাশক হইও না! যদি প্রকৃত হিন্দুত্ব—প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চাও, তবে তুষানলের কষ্টসহিষ্ণুতা স্মরণ করিয়া, হিন্দুর দেশে প্রকৃতহিন্দুত্বের পদাশ্রয়ে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াও। স্মরণকর, ভাই! সেই জ্বালাময়ী কষ্টসহিষ্ণুতাস্মৃতিকে, স্মরণকর—তুষানল! স্মরণকর জহরব্রত! স্মরণকর আত্মত্যাগ! মনে রাখিও দানের পরীক্ষা! মনে কর হৃৎশক্তির মহানিরোধ! স্মরণকর হিন্দুর হিন্দুত্বকে, স্মরণকর কষ্টসহিষ্ণুতাশিক্ষক আর্য্যশাস্ত্রকে। তবেই তোমার হিন্দুত্ব—তোমার মনুষ্যত্ব জগতে আবার উদ্দীপ্ত হইবে।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীসূক্তম্।

সাধারণের বিশ্বাস 'শ্রী' কেবল পৌরাণিক-যুগেই পূজিতা। বৈদিকদেবতার মধ্যে 'শ্রী'র অস্তিত্ব নাই। শ্রীপূজাদির বিধিও স্মৃতিমূলক। বৈদিকযুগে আর্য্যগণ কেবল প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট ভূতভৌতিক-শক্তিসমূহের উপাসনায়—সেবায় সময়পাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রকৃতিপূজক ছিলেন। অগ্নি, বায়ু, সোম, আদিত্য, উষা, সন্ধ্যা প্রভৃতিই তাঁহাদের নিকট দেবতা-জ্ঞানে আদৃত ও অর্চ্চিত হইতেন। উপরোক্ত মতবাদে যাঁহারা বিশ্বস্ত, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন্। জগতের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ ঋগ্বেদে 'শ্রীসূক্ত' আছে। শ্রীদেবতার আবির্ভাব আধুনিক নহে। প্রাচীন ভারতের তপঃক্লিষ্ট জ্ঞানজ্যেষ্ঠ ঋষিগণ মন্ত্রমধুর স্বরসংযোগে এই লক্ষ্মীসূক্ত পাঠ করিতেন। প্রজ্বলিত জাতবেদার সমক্ষে, শ্রীদেবতার আহ্বানোপহার লইয়া সোৎকণ্ঠে কালাতিপাত করিতেন।

শ্রীসূক্তে পঞ্চদশটী ঋক্ আছে। শ্রী—অগ্নি এই সূক্তের দেবতা। আনন্দ, কর্দ্দম, চিক্লীত, ইন্দিরা, সুত—ঋষি। প্রথম ঋক্ত্রয় অনুষ্টুপ্-ছন্দে গ্রথিত, চতুর্থ মন্ত্রের ছন্দ বৃহতী,

পঞ্চম-ষষ্ঠ মন্ত্র ত্রিষ্টুভ্ ছন্দোবদ্ধ, তৎপরবর্ত্তি আটটী মন্ত্র অনুষ্টুপ্‌ছন্দোময়, শেষ অর্থাৎ পঞ্চদশ মন্ত্রটীর ছন্দ—প্রস্তারপংক্তি।

বেদপথগামী পাঠক! ঐ শুনুন বৈদিক মহর্ষিগণ তারস্বরে শ্রীসূক্তের আদিম ঋক্ উচ্চারণ করিতেছেন, যথা—

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজত-
স্রজাং।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবে-
দো ম আবহ॥

অন্বয়ঃ। হে জাতবেদঃ! ত্বং মে মহ্যং (মদর্থমিতিভাবঃ) হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণ-রজতস্রজাং চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং আবহ আহ্বয়।

সংস্কৃত-ব্যাখ্যা। হে জাতপ্রজ্ঞ অগ্নে! ত্বং সুবর্ণবর্ণাং হরিণীরূপধরাং সুবর্ণরজত-স্রজাং (সুবর্ণস্য পুষ্পাণি সুবর্ণানি এবং রজতস্য রজতানি তেষাং স্রজো মালা যস্যাস্তাম্ সুবর্ণ-রজতবিকৃতশৃঙ্খলাং বা, সুষ্ঠুবর্ণঃ যস্য তৎসুবর্ণং যদ্ রজতং চ তৎপুষ্পস্রজাং বা ইতি বিস্তা-রণাঃ।) চন্দ্রবৎ প্রকাশমানাং হিরণ্যস্বরূপাং (হিরণ্যবিগ্রহাং বা) লক্ষ্মীং লক্ষণবতীং অন্বর্থনামধেয়াং দেবীং মদর্থং আহ্বয়।

বঙ্গ-ব্যাখ্যা। হে অগ্নিদেব! যাঁহার কান্তি সুবর্ণসদৃশ, যিনি হরিণীরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন, যিনি কাঞ্চনরজতমাল্যধারিণী, যাঁহার মূর্ত্তি চন্দ্র-তুল্য মনোজ্ঞ, যিনি সুবর্ণবিগ্রহবতী অথবা সুবর্ণস্বরূপা, সেই লক্ষণবিশিষ্টা পরমজ্যোতি-র্ম্ময়ী শ্রীদেবতাকে আমার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত আহ্বান কর।

এই মন্ত্রে শ্রীদেবতার মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে। লক্ষ্মী যে মৃগীরূপে অরণ্যে বিচরণ করেন,—এ প্রসঙ্গ পুরাণপাঠকের অবিদিত নহে। প্রমাণ যথা,—শ্রীর্ধৃত্বা হরিণী-রূপং অরণ্যে বিচচারহ।” সাধক অগ্নির নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন, কারণ অগ্নি ‘দেবহোতা’। যজ্ঞে এই অগ্নিদেবতাই অপ-রাপর দেবকে আহ্বান করেন। বেদে আছে—‘অগ্নির্হোতা’। হোতা শব্দের অর্থ—‘দেবানাং আহ্বাতা’ অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকারী। শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, “যৎ এহীতি ব্রূতে তদ্ধোতু-র্হোতৃত্বম্।” দেবতাগণকে যে ‘এহি’ (আসুন) বলিয়া আহ্বান করেন, তাহাই হোতার হোতৃত্ব। অতএব অগ্নি অপর-দেবতার আহ্বাতা হওয়ায় তিনি হোতা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অগ্নি যে কেবল দেবগণের আহ্বান-কর্ত্তা—তাহা নহে, তিনি দেবগণের নিকট যজ্ঞভাগ-উপহর্ত্তা। সর্ব্বত্র যজমান বহ্নি-তেই দেবদেয় দ্রব্য প্রদান করেন, আর অগ্নি তাহা যথাযথস্থানে লইয়া যান। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলেন—“অগ্নিমুখা হি দেবাঃ। অগ্নি দেবগণের মুখস্বরূপ। এই হবিঃপ্রদান লক্ষ্য করিয়াই, সামসংহি-তায় ‘হব্যদাতয়ে’ বলা হইয়াছে। যজমান, দেবদূত অগ্নিদেবের মধ্যস্থতায় তাঁহার নিকট দেবোদ্দিষ্ট হবিঃ প্রদান করেন। অগ্নি, যথোচিত দেবতাকে তাহা পৌছা-ইয়া দেন। অনুষ্ঠাতা অভীষ্টলাভে অভ্য-র্থিত হন।

শ্রীদেবতাকে ‘হিরণ্যবর্ণা’ বলিবার রহস্য—শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র বলেন—

"জ্ঞানমাত্মনি ভা সূর্য্যে চন্দ্রে জ্যোৎস্না চ খে ধ্বনিঃ, বর্ণো হিরণ্যে পয়সি ঘৃতং ত্বমসি মাতৃকে!" অর্থাৎ হে মাতর্লক্ষি! তুমি আত্মায় জ্ঞানরূপে, সূর্য্যে প্রভারূপে, চন্দ্রে জ্যোৎস্নারূপে, আকাশে ধ্বনিরূপে, সুবর্ণে বর্ণরূপে, দুগ্ধে ঘৃতরূপে বিরাজ করিতেছ। শ্রীস্তুতিতে মহর্ষি অগস্ত্যের মুখে একথা শুনিলে—কি স্পষ্ট প্রতীত হয়না, শ্রীদেবতা কে? শ্রী যে শুধু শোভা-সৌভাগ্যাদির অধিষ্ঠাতৃদেবতা-মাত্র নহেন, অপিচ জগন্ময়ী শক্তি, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

কেহ কেহ বলেন, শ্রী সৌভাগ্য-দেবতা-মাত্র হইলেও, অগ্নির নিকট তদাহ্বানানুরোধ-জ্ঞাপন সুসঙ্গত, যেহেতু, হুতাশন দেবতাই 'শ্রী'-প্রদানে সক্ষম। প্রমাণ যথা—"শ্রিয়মিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।"

'হরিণী' বিশেষণ থাকায়, কোনও কোনও আচার্য্য—শ্রীকে বহ্নিশক্তিরূপে বর্ণনা করেন। তাঁহারা দক্ষযজ্ঞীয় প্রস্তাব হইতে "যজ্ঞাগ্নির্মৃগরূপেণ ধাবতিস্ম পুরাধ্বরে। রুদ্রস্ত্বাকৃষ্য তচ্ছক্তিং মৃগীং জগ্রাহ বৈষ্ণবীং।" এই প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। যজ্ঞধ্বংসভীত অগ্নি মৃগরূপে ধাবমান হইলেন, রুদ্রদেব সেই বহ্নির শক্তি মৃগীকে আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। এইস্থলে মৃগীরূপা বহ্নিশক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হইল, ইহাই শ্রী,—এরূপ অভিপ্রায়। হিরণ্যে বর্ণরূপে লক্ষ্মী বিরাজমানা,—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ এখানে আরও একটু উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় 'হিরণ্য বিষ্ণুস্বরূপ, লক্ষ্মী তাহার বর্ণস্বরূপা।" মহাপুরুষের সহিত মহাশক্তির অচ্ছেদ্যসম্বন্ধ প্রদর্শন দ্বারা প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। শ্রীপুরাণে লিখিত আছে "হিরণ্যং বিষ্ণুরাখ্যাতঃ তস্য বর্ণস্তু বৈষ্ণবী। লক্ষ্মী হিরণ্যবর্ণেতি শ্রূয়তে কনকপ্রভা।" সুবর্ণ ও বর্ণের যে সম্বন্ধ, বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবী লক্ষ্মীরও তাহাই।

লক্ষ্মী দেবতা শুধু ঋগ্বেদে পূজিতা নহেন, অথর্ব্ববেদেও 'লক্ষ্মীস্তুতি' আছে। যথা—"হরিণীং তু হরেঃ পত্নীং দারিদ্র্যপরিহারিণীং। প্রপদ্যেঽহং হরিদ্রাভাং হরিণাক্ষীং হিরণ্ময়ীম্।" হরিণী—হরিপত্নী দারিদ্র্যহারিণী হরিদ্রাবর্ণা হরিণ-নয়না হিরণ্ময়ী লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিতেছি। এখন বলা যাইতে পারে, লক্ষ্মীপূজা পুরাণের প্রসঙ্গ নহে। ধনীর সুরম্য প্রাসাদে, দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণ-কুটীরে, সেই আর্য্যসভ্যতার আদিম সময় হইতেই লক্ষ্মীর অর্চ্চনা চলিতেছে; ইহা আধুনিক অপ্রতিষ্ঠিত অল্পদিনাগত অতিথি নহে। ১

দ্বিতীয় ঋকে শ্রীদেবতার অভ্যুদয়-দাত্রীত্ব উল্লেখ করিয়া, অগ্নিদেবের নিকট আহ্বান প্রার্থনা করা হইতেছে। যথা,—

তাংম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীং। যস্যাংহিরণ্যং বিন্দেয়ংগামশ্বং পুরুষানহম্। ২

অন্বয়ঃ। হে জাতবেদঃ! তাং অনপগামিনীং, লক্ষ্মীং মহ্যং আবহ, যস্যাং (আহুতায়াং সত্যাম্) হিরণ্যং গাং অশ্বং পুরুষাংশ্চ অহং বিন্দেয়ং।

সংস্কৃত-ব্যাখ্যা। হে শাস্ত্রযোনে অগ্নে! যস্যাং শ্রীদেব্যাং আহুতায়াং অহং সুবর্ণং (সুবর্ণমিত্যুপলক্ষণং নিধীনাম্) পশূন্ (গামিত্যুপলক্ষণং) পুত্রভৃত্যাদিপুরুষান্ চ লভেয়ম্ তাং প্রসিদ্ধাং অনপায়িনীং (চিরন্তনীং) লক্ষ্মীং মদর্থং আহ্বয়।

বঙ্গব্যাখ্যা। হে শাস্ত্রযোনে অগ্নিদেব! যে লক্ষ্মীদেবী আহুতা হইলে, (তাঁহার অনুগ্রহে) আমি গবাশ্বাদি পশুসমূহ, সুবর্ণ-রজতাদি নিধিসকল, পুত্রদাসাদি জনসমস্ত লাভ করিতে পারিব, সেই অনপায়িনী লক্ষ্মীদেবীকে আমার নিমিত্ত আহ্বান কর।

এই ঋকে শ্রীদেবীকে লৌকিক-সৌভাগ্য-সম্পৎ-প্রাপ্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে বর্ণনা করা হইতেছে। ধনবল, জনবল, জ্ঞানবল—এই ত্রিধারার সমবায় না হইলে কোনও জাতি প্রকৃত মঙ্গলের সন্নিহিত হইতে পারেনা। এই ত্রিবেণীসঙ্গমরূপ মহাপুণ্য-তীর্থে যে জাতি—যে দেশ স্নান করিতে পারে, সে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণলাভের অধিকারী হয়। এই ঋকে ঐহিক মঙ্গলের কথাই কথিত হইতেছে। ঐহিক কুশল প্রধানতঃ ধনবল-জনবলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের সিংহাসন সকলের শিরোদেশে সংস্থিত, ইহকাল পরকাল—উভয়ত্রই জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত; কিন্তু ধনবল-জনবলের ইহলোকেই পরি-নিষ্ঠা। জ্ঞান আত্মার অঙ্গসঙ্গী, ধন-জন দেহ-সম্বন্ধ-বিচ্ছেদের পর সম্বন্ধশূন্য হয়। এখানে সুবর্ণাদি এবং গবাদি পশুসম্পত্তি উভয়ই স্থাবর-জঙ্গম-ভেদে ধনপর্য্যায়ে পতিত। পুত্র দাসাদি জনবলের পরিচায়ক।

লক্ষ্মীকে 'অনপায়িনী' বলায় কেহ কেহ মনে করেন,—লক্ষ্মী কোনও সময় বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন না, ভগবদ্বিষ্ণুর লক্ষ্মীসংসর্গের অপায় নাই, ইহাই ঐ শব্দদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। লক্ষ্মী অর্থে সৌভাগ্য সম্পৎ বুঝিলে, তাহা কদাচ জীব-জগতে 'অনপায়িনী' হইতে পারেনা। কারণ প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করা যায় যে, লক্ষ্মীর (সৌভাগ্যসম্পদের) স্থিরতা নাই। শাস্ত্রেও আছে,"ছায়েব লক্ষ্মীশ্চপলা প্রতীতা, তারুণ্যমম্বূর্ম্মিবদধ্রুবঞ্চ। স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখ-মায়ুরল্পং তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ।" লক্ষ্মী চিরচঞ্চলা। লক্ষ্মী যে কদাচ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করেন না, তাহার প্রমাণ,—"রাঘবত্বেহ-ভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। অন্যেষ্যবতারেষু বিষ্ণোরেবানপায়িনী।" পরাশর-পুরাণের এই বচনে জ্ঞাত হওয়া যায়, ভগবান্ যখন দূর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ ধারণ করেন, তখন শ্রী জনকনন্দিনী রূপে তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন;—যখন কৃষ্ণকান্তি গ্রহণ করেন, তখন রুক্মিণীরূপে বিরাজমানা ছিলেন;—অন্যান্য অবতারেও শ্রী শ্রীপতির অনপায়িনীই ছিলেন। ভাষ্যকার পৃথ্বী-ধরাচার্য্যের মতে 'অনপায়িনী' অর্থ—মদেকা-শ্রয়নিষ্ঠা। অর্থাৎ, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, কদাচিৎ শ্রী অন্যত্র গমন না করেন,—এইরূপ চিরন্তনী শ্রী কামনা করা হই-তেছে। পৃথ্বীধরের উক্তি—"তাং অনপ-গামিনীং কদাচিদপি মাংত্যক্ত্বা অন্যত্র গন্তমনুত্ক্রাং মদেকনিষ্ঠাশ্রয়াং লক্ষ্মীং।" তাঁহার মতে 'আবহ' অর্থ প্রেরয়—অর্থাৎ

যে লক্ষ্মী চিরস্থায়িনী, তাহাকেই প্রেরণ কর—প্রদান কর। অগ্নির নিকট শ্রী কামনা করিতে হয়, অগ্নি শ্রীপ্রদ, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বমন্ত্রের সমালোচনায় প্রদত্ত হইয়াছে। সেই অভিপ্রায় হৃদয়ে নিহিত করিয়াই পৃথ্বীধর এখানে এরূপ ব্যাখ্যা করেন। লক্ষ্মী যে কখনও চিরস্থায়িনী হননা, প্রত্যুত কমলা চিরচপলা, ইঁহার সমাধানে তিনি কিছুই বলেন নাই। মনে হয়, সাধক ইষ্টদেবতার নিকট অনেক অসম্ভব আগ্রহও ব্যক্ত করেন। জননীর অঞ্চলসেবী চঞ্চল শিশু, আকাশের সুধাকর করায়ত্ত করিতে চায়, মাতার নিকট ঐ অসম্ভব আব্দার প্রকাশে সে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয়না;—ইহা কি তাহারই প্রতিরূপ অপূরণীয় আবেদন? সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতি ভগবতী শ্রুতিই জানেন, প্রকৃত সত্যের অনাবৃত অঙ্গজ্যোতি কিরূপ!

জগদর্হণীয়া শ্রীদেবতার সম্পন্মূর্ত্তি আরও বিশদরূপে বিবৃত করিবার আশায়, অপর একটী সুন্দর চিত্র তৃতীয় ঋকে প্রকটিত হইতেছে।—

অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীং। শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্। ৩।

অন্বয়ঃ। অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীং দেবীং শ্রিয়ং উপহ্বয়ে, দেবীঃ-শ্রীঃ মাং জুষতাম্।

সংস্কৃত-ব্যাখ্যা। অশ্বপুরোগাং রথমধ্যাং হস্তিনাং নাদেন বৃংহিতেন প্রবোধিনীং প্রকর্ষেণ জ্ঞাপিকাম্—(আগমনকালে গজধ্বনীনাং জ্ঞাপয়িত্রীং ইতি পৃথ্বীধরঃ) দেবনশীলাং (দ্যোতনস্বভাবাং বা) শ্রিয়ং (শ্রয়ণীয়াং সেনারূপাম্) অহং সমীপং প্রত্যাহ্বয়ে, (মৎসমীপমাগচ্ছেত্যাহ্বয়ে।) দেবীঃ দেবী (ছান্দসঃ বচনব্যত্যাসঃ।) শ্রীঃ মাং সেবতাম্।

বঙ্গব্যাখ্যা। যে সেনারূপা শ্রীদেবীর পুরোভাগে অশ্বসমূহ গমন করে, মধ্যে রথযূথ অবস্থিত হয়, যিনি হস্তিবৃংহিতজ্ঞাপিকা, সেই দীপ্তিময়ী আশ্রয়ণীয়া শ্রীকে সমীপে আগমনের জন্য আহ্বান করি। শ্রীদেবী আমাকে সেবা করুন, অথবা মৎপ্রতি প্রীতিপরায়ণা হউন।

এখানে সাধক, শ্রীদেবীর নৃপাশ্রয়া সেনামূর্ত্তিকে আহ্বান করিতেছেন। অশ্বরথাদির সমবায়রূপ সেনামূর্ত্তি অভ্যুদয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। ঘোটক-ঘটা, রথরাজী, রথিবৃন্দ, করি-চীৎকার এসমস্তই শ্রীর মূর্ত্তি। শ্রী এত স্পষ্টরূপে অন্যত্র বিরাজমানা নহেন, এই জন্যই এ চিত্রের প্রদর্শন। "হস্ত্যশ্বরথপাদাতং সেনাঙ্গং স্যাৎ চতুর্ব্বিধং।" হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সেনা। এখানে হস্তি, অশ্ব, রথ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা পদাতির বিদ্যমানতাও বুঝিতে হইবে। এই সকল যথায় দৃষ্ট হয়, তথায় শ্রীর অবস্থিতিতে কেহই সন্দিহান নহে। শ্রীর বহিঃপ্রকাশ একত্র সংস্থিত হইলে, রাজ-সম্পৎ-রূপে প্রতিভাত হয়।

এই কামনাত্মক মন্ত্রটীর অসামান্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রকল্পার্ণবে দৃষ্ট হয়।

"শ্রীসূক্তে তু তৃতীয়র্চ শ্রীবীজেন সমায়কং। ন্যাসং কৃত্বা জপেন্নিত্যং প্রাতঃ প্রাতঃ সহস্রকম্। আদ্বাদশাব্দাৎ সিদ্ধিঃ স্যাৎ অন্তদুর্গাবিধানবৎ। মন্ত্রসিদ্ধৌ ভবেদ্রাজা শত্রূন্‌ জিত্বা লভেচ্ছ্রিয়ম্"। শ্রীসূক্তের তৃতীয় ঋক্ শ্রীবীজ ও মায়াবীজ সমন্বিত করিয়া, ন্যাসপূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতে যে ব্যক্তি সহস্র জপ করে, সে দ্বাদশবর্ষ মধ্যে, সিদ্ধি লাভ করে। অপর দুর্গামন্ত্রবিধি পালন দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি যেরূপ কৃতার্থ হয় তদ্রূপ। মন্ত্রসিদ্ধ হইলে সাধক রাজা হইবে, শত্রুজয় করিয়া শ্রীলাভ করিবে। এই অংশ কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিক বিশ্বাসীর গোচরার্থ লিখিত হইল।

এই মন্ত্রে "দেবীঃ" এই দ্বিতীয়া-বহুবচন-প্রয়োগ প্রথমার একবচনের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এতাদৃশ বিভক্তিব্যত্যয় বৈদিক-গ্রন্থে ভূরি পরিদৃষ্ট হয়। যাঁহারা ছান্দস-প্রক্রিয়া অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা অনুচিত মনে করিবেন না। ৩

চতুর্থ ঋকে সাধক, বিবিধবিভূতি-বিভূষিতা শ্রীদেবতাকে আহ্বান করিতেছেন। এখানে দেবতার কেবল সম্পদ্রূপ (লৌকিক-সম্পৎ) গৃহীত হয় নাই, অপিচ মহিমময় অলৌকিক স্বরূপসম্বন্ধেও ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হয় নাই।

কাং সোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারাং
আর্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।
পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণাং তাং ইহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ।৪

অন্বয়ঃ। কাং সোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারাং আর্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণাং তাং শ্রিয়ং ইহ অহং উপহ্বয়ে।

সংস্কৃত-ব্যাখ্যা। কাং ব্রহ্মরূপাং ঈষদুদ্গতস্মিতসহিতাং হিরণ্যোত্তমাকৃতিমতীং ক্লিন্নাং (ক্ষীরোদধেরাবির্ভূতত্বাৎ) আর্দ্রানক্ষত্রাবির্ভূতাং বা প্রকাশমানাং পূর্ণকামাং মনোরথসম্পাদনৈঃ ভক্তান্ তর্পয়ন্তীম্ কমলাসীনাং কমলবদচ্ছায়চ্ছবিং প্রসিদ্ধাং শ্রিয়ং অহং আহ্বয়ে।

বঙ্গব্যাখ্যা। যিনি অবাঙ্‌মনসগোচরা অথবা ব্রহ্মরূপা, ঈষৎপ্রকাশিতস্মিতযুক্তা, সুবর্ণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কান্তিমতী, ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থিতি-জনিত আর্দ্রা, জলমূর্ত্তি, আপ্তকামা, যিনি অভীপ্সিত প্রদান দ্বারা ভক্তজনগণের অতুল তৃপ্তি সাধন করেন, যিনি কমলাসনে আসীনা, কমলদল-বিমলবর্ণা সেই সুপ্রসিদ্ধা লক্ষ্মীদেবীকে আমি অহ্বান করি।

'কাং' বলিলে আপাততঃ প্রতীত হয়, 'যাহাকে জানিনা, তাহাকে'। এ স্থলে অর্থ গভীর, যাহাকে জানিনা, অর্থাৎ যাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য আয়ত্ত করিতে পারি না, তাৎপর্য্যতঃ যিনি তত্ত্বরূপে বাক্য ও মনের অগোচরীভূতা, তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। অথবা—'ক' অর্থ প্রজাপতি বা ব্রহ্ম, তৎস্বরূপা 'কা'। শ্রুতিতে আছে, "কোহি তে নাম প্রজাপতে!" পুরাণেও পরিদৃষ্ট হয় "ক ইতি ব্রহ্মণো নাম।" 'ক' ব্রহ্মের নাম, তৎস্বরূপা 'কা'। 'সোস্মিতা' শব্দ নিষ্পত্তি করিতে, ছান্দসপ্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। "আ ঈষৎ উৎ উদ্গতং স্মিত যস্যাঃ সা সোস্মিতা।"

'উদ্' ভাগের অন্তলোপ হইয়াছে। আচার্য্য বিদ্যারণ্য মুনি লিখিয়াছেন-"উদন্তলোপশ্ছান্দসঃ।"

'প্রাকার' অর্থে বিদ্যারণ্যমুনি প্রকৃষ্ট আকার বা বর্ণ বুঝিয়াছেন। তাঁহার উক্তি "হিরণ্যস্য প্রাকারো বর্ণঃ প্রকৃষ্টা আকৃতিঃ যস্যাস্তাম্" কেহ কেহ 'প্রাকার' অর্থে আবরণ বুঝিয়াছেন। সুবর্ণাবরণবিশিষ্টা লক্ষ্মী, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত অর্থ। লক্ষ্মী সুবর্ণাবরণবেষ্টিতা অর্থাৎ সুবর্ণসমূহ মধ্যে লক্ষ্মীর অবস্থিতি; লৌকিক-তাৎপর্য্যে স্বীকার করা যাইতে পারে।

'আর্দ্রা' অর্থে কেহ কেহ 'শীতলগুণা' বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যার রহস্য এই যে, তিনি জ্বলন্তী—দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ম্ময়ী হইলেও রৌদ্ররূপা বা ভীষণগুণা নহেন, কিন্তু স্নিগ্ধরূপা শীতলগুণা।

কাহারও মতে 'আর্দ্রা' অর্থ রুদ্রশক্তি। শ্রী রুদ্রশক্তি, ইহা প্রমাণ করিতে তাঁহারা বলেন—রুদ্র আর্দ্রার অধিষ্ঠাতা। লক্ষ্মী আর্দ্রা নক্ষত্রে আবির্ভূতা হয়েন, আর্দ্রা রুদ্রাধিষ্ঠিতা, সুতরাং লক্ষ্মী রুদ্রশক্তি হওয়াই সঙ্গত।

'তৃপ্তা' বলিতে কোনও আচার্য্য, ভক্তপ্রদত্ত পূজোপহারপ্রভৃতি দ্বারা শ্রী সর্ব্বদা পরিতৃপ্তা—এরূপ বুঝিতে চাহেন। পরমতৃপ্তি উপহারের অপেক্ষা করেনা, অপিচ তাহা উপহারনিষ্পাদ্যা বা পূজাসাধ্যা নহে।

পৃথ্বীধরাচার্য্য, 'কাং' বাণীং বাক্যরূপাং তাং শ্রিয়ং" এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। শ্রীকে বাক্যরূপা বলিতে আপত্তি নাই। পৌরাণিকযুগে শ্রী ও বাণীর সপত্নীত্ব ও বিদ্বেষবিবাদ প্রকল্পিত হইলেও, মূলতঃ মহাশক্তির সহিত বাক্যশক্তির বিভেদ নাই। কোনও মূর্ত্তি বাণী নামে পূজিতা হন, কোনও মূর্ত্তি শ্রী নামে, তাহাতে বস্তুবিরোধ নাই। শ্রীভগবানের বৈষ্ণবীশক্তি বাণীও বটে শ্রীও বটে। ভগবচ্ছক্তির রূপভেদ নামভেদ ঔপচারিক ব্যতীত পারমার্থিক নহে। সম্ভবতঃ এতাদৃশ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া, আচার্য্য ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লক্ষ্মী যে বাগ্‌রূপা, ইহা মূর্ত্তিভেদে বস্তুভেদবাদীর অভিমত কি?

'তৎ'শব্দের প্রসিদ্ধবাচিত্ব চিরপ্রসিদ্ধ, সুতরাং বুদ্ধিস্থানুকীর্ত্তন-ব্যতিরেকেও "স হরিঃ পায়াৎ ইত্যাদিবৎ" "তাং শ্রিয়ং উপহ্বয়ে" হইতে বাধা নাই।

এই মন্ত্রটীর অসীমমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। সূক্তার্থরত্নাকরে অনুষ্ঠান-প্রকরণে দৃষ্ট হয়।

"ঋচং চতুর্থীং শ্রীসূক্তে প্রজপেৎ অষ্টলক্ষকম্। সহস্রং প্রত্যহং জপ্ত্বা ত্রিসাহস্রং ভৃগোর্দিনে। রাকায়াং পঞ্চসাহস্রং ক্ষীরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। পলাশসমিধা হোমঃ পয়সা গোঘৃতেন চ। তর্পণাশীতিসাহস্রং হোমশ্চাষ্টসহস্রকঃ। ব্রাহ্মণাষ্টশতী পূজ্যা শ্রীর্বাগ্বীজযুতং ন্যসেৎ। সংপৎসারস্বতপ্রাপ্তিঃ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। আপঞ্চ-পুরুষং সিদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।"

অর্থাৎ—শ্রীসূক্তের চতুর্থী ঋক্ অষ্টলক্ষ জপ করিবে। প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক জপ করিয়া, ভৃগুবারে ত্রিসহস্র জপ করিতে হইবে। পূর্ণিমাতিথিতে পঞ্চসহস্র পরিমিত জপ বিহিত। ঐ দিন দুগ্ধপায়ী হইয়া, ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক পলাশবৃক্ষজাত 'সমিধ্' লইয়া

হোম করিতে হইবে। হোমে দুগ্ধ এবং গব্য ঘৃত ব্যবহৃত হইবে। অশীতিসহস্র জপে, আর অষ্টসহস্র হোম করিতে হইবে। (এখানে দশাংশ হোমের ব্যবস্থা লক্ষিত হইতেছে। হোমের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন দ্রষ্টব্য।) অষ্টশত ব্রাহ্মণকে ভোজন প্রদান করিতে হইবে। শ্রীবীজ ও বাগ্বীজ-সমন্বিত ন্যাস করিবার ব্যবস্থা আছে। এতাদৃশ অনুষ্ঠানসম্পাদন দ্বারা, বিভবাদিলাভ ও সারস্বত-সম্পৎপ্রাপ্তি ফল হইবে। কেবল যে নিজে সৌভাগ্যসম্পৎ ও সারস্বত-সিদ্ধির অধিকারী হওয়া যাইবে, এমন নহে। এই সিদ্ধির পরিধি পঞ্চপুরুষ পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই ফলশ্রুতিবিষয়ে ক্রিয়াবান্ ব্যক্তির সন্দেহসম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। এই মন্ত্র বৃহতীছন্দস্ক।

অতঃপর পঞ্চমী ঋক্ আলোচনা করা যাউক্। এই ঋক্ প্রথমবর্গের অন্ত্যা। ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে ইহার অক্ষরবিন্যাস। এ মন্ত্রে সাধক শ্রীদেবতার শরণাগত হইয়া কামনা করিতেছেন, তিনি যেন উপদ্রবভূতা অলক্ষ্মীর আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। অলক্ষ্মীবিনাশ ও লক্ষ্মীপ্রাপ্তি তাৎপর্য্যতঃ একই রূপ।

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং,
শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাং।
তাং পদ্মিনীং শরণমহং প্রপদ্যে,
ঽলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বা বৃণে।৫

অন্বয়ঃ। চন্দ্রাং প্রভাসাং লোকে যশসা জ্বলন্তীং দেবজুষ্টাং উদারাং পদ্মিনীং শ্রিয়ং তাং অহং শরণং প্রপদ্যে, মম অলক্ষ্মীর্নশ্যতু, অহং ত্বাং বৃণে।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। চন্দ্রাং চন্দ্রবৎপ্রকাশমানাং (আহ্লাদ-জননীং বা) প্রকৃষ্টকান্তিযুতাং (প্রকর্ষেণ ভাসতীং বা) লোকে চতুর্দশসু ভুবনেষু যশসা জ্বলন্তীং ঐশ্বর্য্য সম্পদৌদার্য্যাদি-প্রযুক্তকীর্ত্ত্যা প্রকাশমানাং অতএব) ইন্দ্রাদিসেবিতাম্ উদারাং বিস্তারবতীং (সর্ব্বব্যাপিনীমিত্যর্থঃ) করধৃত-কমলকুসুমাং 'ঈ' কারবাচ্যাং (একাক্ষরী কোষাদিষু) তাং তাদৃশীং শ্রিয়ং অহং শরণং প্রপদ্যে রক্ষকীভবেতি ব্রজামি। মম অলক্ষ্মীর্নাশং প্রাপ্নোতু। ত্বাং লক্ষ্মীং অহং বৃণে অলক্ষ্মীনিবারণায় ত্বাং প্রতি বরণং করিষ্যে ইতি ভাবঃ।

বঙ্গব্যাখ্যা। যিনি চন্দ্রবৎ মনোজ্ঞরূপা অথবা আনন্দবর্দ্ধিনী, প্রকৃষ্টকান্তিমতী, যিনি ঐশ্বর্য্যসম্পৎ ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণগণযুক্তকীর্ত্তিকৌমুদী দ্বারা দেদীপ্যমানা, ইন্দ্রাদি দেবগণ যে শ্রীদেবতার সেবা-সাধনে সতত উন্মুক্ত, যিনি উদারস্বভাবা অথবা সর্ব্বব্যাপিনী, যাঁহার কোমল করে কমল শোভা পায়, (কিম্বা যিনি কমলদল-কোমল-দেহধারিণী) শাস্ত্রে স্বল্পাক্ষরে যাঁহার নাম-নির্ব্বাচন করিতে গিয়া, যাঁহাকে দীর্ঘ-ঈকার-বাচ্যা বলা হইয়াছে, সেই লক্ষ্মীর শরণাগত হইলাম। আমার অলক্ষ্মী বিনষ্ট হউক্, হে দেবি! আপনাকে অলক্ষ্মী-দূরীকরণার্থে বরণ করিতেছি।

'চন্দ্রা' শব্দে কেহ চন্দ্রবৎ প্রকাশমানা বুঝেন। কেহ বা 'চন্দয়তি আহ্লাদয়তি ইতি চন্দ্রা' অর্থাৎ যিনি আনন্দ প্রদান করেন তিনি চন্দ্রা, এরূপ নির্দ্দেশ করেন। উভয় ব্যাখ্যাই সামঞ্জস্যযুক্ত, কারণ চন্দ্রবৎ

প্রকাশমানা হইলেও আনন্দদায়িনী হইতে হয়। আনন্দদায়ক বলিয়াই, সোমদেবতা 'চন্দ্র' নামে অভিহিত।

ইন্দ্রাদি দেবগণ যে শ্রীদেবতার পাদপীঠে মৌলিমুকুটমণি স্থাপন করিতে প্রস্তুত, তাহা বহুপ্রসঙ্গে পুরাণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমুদ্রমন্থনব্যাপারের পৌরাণিক কারণ লক্ষ্মীর অনুপস্থিতি। লক্ষ্মীলাভ মুখ্য লক্ষ্য, অন্যান্য আনুষঙ্গিক।

লক্ষ্মী উদারা। পৃথ্বীধর বলেন, উদারা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী। ভগবৎ শক্তি—ঐশ-বিভূতি যে সমগ্র সংসার ব্যাপিয়া বিরাজমানা, তাহাতে অনুমাত্রও সংশয়সংপর্ক পরিলক্ষিত হয় না। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, ঐশী শক্তির বিরাট্ বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ ক্রীড়াক্ষেত্র। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু পরমাণু হইতে মহতোঽপি মহান্, সাগরভূধর প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ভাগবতী শক্তির স্ফূর্ত্তি—বিকাশ—উপলব্ধি। কেনও কোনও পণ্ডিত 'উদারা' বলিতে উদারমূর্ত্তি-সম্পন্না বুঝিয়াছেন। শোভা-সম্পদের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার মূর্ত্তিতে ঔদার্য্যের অসদ্ভাব থাকিবে কেন? অল্পধন লুব্ধব্যক্তির অনুদারতা অসম্ভব নয়, কিন্তু জগতের সমস্ত সম্পত্তির স্থান যাঁহার চরণনিম্নে, তাঁহার উদারতা কি আকৃতিগত, কি প্রকৃতিগত—স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে।

আচার্য্য বিদ্যারণ্য "লোকে শরণং ইহলোকে রক্ষয়িত্রীং প্রপদ্যে প্রপন্নোঽস্মি" এই অন্বয় করিয়াছেন। পৃথ্বীধর "লোকে ভুবনেষু তেজসা জ্বলন্তীম্" এইরূপ অন্বয় করেন।

এই মন্ত্রে যে 'অহং' পদ আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত, ব্যাখ্যাকারগণের এরূপ অভিপ্রায়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ঐ 'অহং' শব্দ পঠিত হয় না। আর্য্যাবর্ত্তে অনেক পণ্ডিত 'অহং' পদের প্রক্ষিপ্ততা স্বীকার করেন না।

এই মন্ত্রের 'মাহাত্ম্যসম্বন্ধে' "ভাগধেয়ভূষণে" উল্লিখিত আছে।

"শ্রীসূক্তে প্রথমে বর্গে প্রজপেৎ পঞ্চমীমৃচম্। মায়াবীজেন বিন্যস্য ভক্তিতো ভুবনেশ্বরীং। অক্ষীণভাসাং চন্দ্রাখ্যাং জ্বলন্তীং যশসাশ্রিয়ম্। দেবৈর্জুষ্টামুদারাঞ্চ পদ্মিনীমীং ভজামহং। ত্বাং বৃণে ত্বৎপ্রসাদেন মমালক্ষ্মীর্বিনশ্যতু। প্রত্যহং চৈকসাহস্রং গোষ্ঠস্থঃ প্রজপেদৃচম্। অখণ্ডং দীপং প্রজ্বাল্য ঘৃতেন চ জিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রত্যক্ষরত্রিসাহস্রজপান্মুচ্যেত সঙ্কটাৎ। মণ্ডলৈশ্চ ত্রিভিঃ পূর্ণৈঃ দারিদ্র্যান্মুচ্যতে ধ্রুবম্। দীক্ষিতশ্চ ত্রিভির্হুত্বা বিরজামঙ্গদেবতাম্। আমিক্ষাশী দনং প্রাপ্য ভুমিস্থঃ রাজবন্দিতঃ। সংগ্রামে বিজয়ং প্রাপ্য চান্দ্রীং গতিমবাপ্নুয়াৎ। অতঃস্থ প্রজপেদ্ গৌরীং দক্ষিণোত্তরমার্গগাং। ত্রিভিঃ শ্বেতৈঃ সতাজ্যেন জুহুয়াৎ পাবকে স্বকে। জপাদ্দশাংশং সংতর্প্য গন্ধপূর্ণবারিভিঃ। হোমং কৃত্বা দশাংশং চ পূজয়েচ্চ সুবাসিনীঃ। কৈলৈর্চ্চয়েৎ দেবীং গোভ্যো ঘাসং প্রদাপয়েৎ। এতৎ পুণ্য প্রভাবেন দরিদ্রোঽপি ধনী ভবেৎ।"

উল্লিখিত শ্লোক সমূহের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীসূক্তের প্রথমবর্গীয়া পঞ্চমী ঋক্ মায়াবীজ-বিন্যাস পূর্ব্বক সভক্তি জপ করিবে। ঐ শ্রীদেবতাক মন্ত্র জপ করিয়া অলক্ষ্মী বিনাশ কামনা করিবে। প্রত্যহ গোষ্ঠস্থিত হইয়া একসহস্র জপ করিবে। গোঘৃত দ্বারা অখণ্ড দীপ প্রজ্বলিত করিয়া,

জিতেন্দ্রিয়ভাবে প্রত্যক্ষর ত্রিসহস্র জপ করিলে, সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ হইবে। মণ্ডলত্রয় পূর্ণ হইলে, নিশ্চয়ই দারিদ্র্যদোষ বিনষ্ট হইবে। দীক্ষিতব্যক্তি তিলদ্বারা অঙ্গ দেবতা বিরজার হোম করিবে, আমিক্ষা-ভোজন করিবে। এতৎ কর্ম্মফলে ভূমিগর্ভস্থ ধন প্রাপ্ত হইয়া, রাজকর্ত্তৃক পূজিত হইবে। সংগ্রামে বিজয়লাভ করিবে, পরিণামে চাক্রীগতি লাভ করিবে। প্রতিদিবস মন্ত্র জপ পূর্ব্বক শ্বেততিল দ্বারা স্বীয় অগ্নিতে হোম করিবে জপের দশাংশ তর্পণ করিবে, চন্দনকর্পূরমিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণের দশাংশ হোম করিবে। কমলকুসুম দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। গোগণকে ঘাস প্রদান করিতে হইবে। এই পুণ্যকর অনুষ্ঠান প্রভাবে দরিদ্রও ধনী হইবে।

শ্রীসূক্ত শুধু পাঠ্য নহে, জপযোগ্যও বটে। তজ্জপও বহুকল্যাণপ্রদ—এরূপ বিশ্বাস আমরা অনুষ্ঠানাংশের ইঙ্গিত প্রদান করিলাম। যাঁহারা ইহা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। অনেকের অনুরোধে অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ২ বলিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রথমবর্গ সমাপ্ত।

ক্রমশঃ—

শ্রীকেদারনাথ ভারতী

ভারতীকুটীর, প্রতাপকাটী।

শূন্যবাদ।

বৌদ্ধ-দর্শনের 'শূন্য' শব্দের অর্থ অভাব-মাত্র বুঝিলে, নিতান্তই ভুল বুঝা হয়। মাধ্যমিকায় আছে "তথা অস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তঃ নাস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তঃ, যদেতদ্বয়োরন্তয়োর্ম্মধ্যং তদবাচ্যমনিদর্শনমপ্রতিষ্ঠমনাভাসমনিকেতমবিজ্ঞপ্তিকমিদমুচ্যতে কাশ্যপ" অর্থাৎ অস্তি এক অন্ত, এবং নাস্তি এ অন্ত—এই দুই অন্তের মধ্যে * যাহা, তাহাকে অবাচ্য অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত অবিজ্ঞপ্তিক বলা যায়।

অন্যত্র যথা 'ন চাভাবোঽপি নির্ব্বাণম্ কুত এবাস্য ভাবতা। ভাবাভাব-পরা-মর্শক্ষয়ঃ নির্ব্বাণ মুচ্যতে॥" (মাধ্যমিকা; ২৫ অঃ।) অতএব নির্ব্বাণ বা শূন্যতায় স্থিতি, * ভাবও নহে অভাবও নহে, বলা হইল। যদিও এতাদৃশ লক্ষণ ন্যায়সঙ্গত ও বোধ্য নহে, তথাপি শূন্য যে অত্যন্তাভাব-মাত্র নহে, তাহা উহা হইতে জানা গেল।

আর্য্য দার্শনিকেরাও প্রকৃতিকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করেন। যথা "যত্তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ নিরসৎ অব্যক্তম্" (যোগ-ভাষ্যম্) ইহাতে সত্তা ও অসত্তা, সৎ ও

---

* জৈনদের স্যাদ্বাদের ন্যায় অস্তি ও নাস্তির মধ্যম পদার্থ নামক শূন্য ধরায়, এই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নাম মাধ্যমিক হইয়াছে।

* "শূন্যতায়াং কৌশিক স্থিতা বোধিসত্ত্বেন" এই বাক্যেও শূন্যতার যখন স্থিতি বলা হইল, তখন শূন্যতাকে স্থিত বা সৎ পদার্থ বলা হইল।

অসৎ একত্র উক্ত হইলেও, উহা অর্থবিশেষে উক্ত হওয়াতে সম্পূর্ণ বোধ্য হইয়াছে। (বাচস্পতিমিশ্রের টীকা দ্রষ্টব্য।) সাংখ্যেরা উহার এক অবস্থায় সৎ, ও অন্য দিকে অসৎ—এইরূপ ব্যাখ্যা করাতে উহা সম্যক্ বোধগম্য ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে "অস্তি নহে, নাস্তি নহে" বা "অস্তি ও নাস্তির সমন্বয়" এরূপ বলায় এবং অন্য ব্যাখ্যাও নিষেধ করাতে, তাদৃশ পদার্থলক্ষণ অযুক্ত, অবোধ্য ও অসম্বদ্ধপ্রলাপ মাত্র হয়।

এবিষয় আরও বিস্তার করিয়া দেখা যাউক। কোন বিষয় আমরা বলিতে গেলে, পদ বা বাক্যের (পদসমষ্টি) দ্বারা বলি, অতএব সমস্ত বক্তব্য বিষয়ই পদার্থ। "অস্তি" ও "নাস্তি" ক্রিয়ার যোগে পদার্থ দ্বিবিধ, ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। যাহা আছে তাহা ভাব, যাহা নাই তাহা অভাব। ইহা ছাড়া তৃতীয় প্রকার পদার্থ হইতে পারে না, কারণ তাদৃশ পদার্থ আছে বলিলেই তাহাকে 'ভাব' বলা হইবে। কোন পদার্থের লক্ষণ করিতে, কি কি নিয়ম অনুসরণীয়—তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) অভাব পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে, যাহার অভাব তাহার অর্থাৎ প্রতিযোগী ভাবার্থ-পদের সহিত নিষেধার্থপদের যোগ করিতে হয়। যথা অন্তের অভাব অনন্ত।

(২) ভাব পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে, কেবল নিষেধার্থ পদের দ্বারা হয় না, ভাবার্থ-পদেরও যোগ থাকা চাই। যথা বায়ুশূন্য, আলোকশূন্য স্থান। শুদ্ধ বায়ুশূন্য আলোকশূন্য ইত্যাদি অসংখ্য নিষেধার্থ পদ বলিলেও, কখনও কোন ভাব পদার্থ লক্ষিত হয় না।

(৩) লক্ষণ করিতে যাইয়া 'অবাচ্য,' 'অনভিলপ্য,' প্রভৃতি পদ উল্লেখ করা কেবল বালকতা মাত্র। 'অবাচ্য' জানিলে, চুপ করিয়া থাকাই উচিত, নচেৎ কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থকারের ন্যায়, সহস্র সহস্র বাক্যের দ্বারা লক্ষণ ও বিবরণ করিতে করিতে, মাঝে মাঝে 'অবাচ্য' 'অনভিলপ্য' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করা—ন্যায়প্রবণ মেধার পরিচায়ক নহে। উহা একরূপ 'দার্শনিক অপরিপাক' মাত্র।

(৪) শক্তিরূপে স্থিতি বা Potential state কে 'অনির্ব্বাচ্য' পদের দ্বারা লক্ষিত করা ন্যায়সঙ্গত। অনুমানের দ্বারা শক্তির অস্তিত্ব-নিশ্চয় হইলেও, তাহা কিরূপে আছে, তাহা মনে ধারণা করিবার যোগ্য নহে বলিয়া, তাহা অনির্ব্বাচ্য—অর্থাৎ স্ফুট ধারণা-বাচক পদের দ্বারা বচনীয় নহে। তাহার অবস্থিতির প্রকার অনির্ব্বাচ্য হইলেও, তাহার সত্তা অনির্ব্বাচ্য নহে। তাহা অনুমানপ্রমাণের বিষয় বলিয়া, 'অস্তি' পদের দ্বারা বাচ্য হয়।

['যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থে কোন কোন অজ্ঞ লোক মনে করেন যে—'পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলাও যায় না, কিছু জানাও যায় না'। বস্তুতঃ উহার অর্থ—বাক্য ও মন নিবৃত্ত হইলে, তবে পরব্রহ্মে স্থিতি হয়। সমগ্র সাধনের তাহাই উদ্দেশ্য।]

(৫) শুদ্ধ 'অস্তি' বা 'নাস্তি' বলিলে, কোন পদার্থের লক্ষণ করা হয় না। তাহাতে

কেবল লক্ষিত পদার্থের সত্তা আছে কি না, তাহা বলা হয়। 'ঘটঃ অস্তি' বলিলে ঘট লক্ষিত হয় না। লক্ষিত ঘটের (অলক্ষিত হইলে কোনও অজ্ঞাত পদার্থের) বিদ্যমানতা আছে, বলা হয়।

কতকগুলি ভাবের অস্তিতা বা নাস্তিতা, অথবা কতকগুলির অস্তিতা ও কতকগুলির নাস্তিতা না বলিলে, কোনও পদার্থ লক্ষিত হয় না।

অতএব "শূন্য ভাবও নহে অভাবও নহে" অর্থাৎ অস্তি-নাস্তির সমন্বয় ইত্যাদি লক্ষণ করিতে যাইলে, নিরর্থক প্রলাপ-বাক্য বলা হয়। যখন, যাহা অস্তির সহিত অসমন্বিত, তাহাই নাস্তি, তখন উহার সমন্বয় বলা, নিজের উক্তির বিরুদ্ধবাক্য-কথন মাত্র। নির্ব্বাণাদি উচ্চবিষয়ক বিচারে বুদ্ধি গুলাইয়া গেলেই, লোকে ঐরূপ নিরর্থক অবোধ্য বাক্যের দ্বারা বিচার-শান্তির চেষ্টা পায়। যেমন আলোক ও অন্ধকারের সন্ধীভূত তৃতীয় দ্রব্য নাই, ও সেই সন্ধি যেমন অনবস্থিত সেইরূপ 'হাঁ' এবং, 'না'র সন্ধি নাই। কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলে—"তোমার টাকা আছে ?" সে উত্তর দিল 'হাঁ এবং না'। অবশ্য ইহার কোন বোধ্য অর্থ নাই। 'সঙ্গে নাই, ঘরে আছে' এইরূপ কোন অর্থ লইলে, তবে উহা বোধ্য হয়। সাধারণ ভাষায় ওরূপ উক্তি মার্জ্জনীয় হইলেও, দার্শনিকের ভাষায় উহা মার্জ্জনীয় নহে। (অবশ্য যদি অন্য কোন বিশেষব্যাখ্যানও নিষিদ্ধ থাকে।)

বিশেষত বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য লক্ষণ করা হয়। অতএব শুদ্ধ 'আছে ও নাই' এরূপ বলা—অবাচ্য বিষয় বলার ন্যায়, নিরর্থক প্রলাপ মাত্র। কারণ, শুদ্ধ অস্তি ও নাস্তির দ্বারা, কোন অলক্ষিত বিষয় লক্ষিত হয় না, সুতরাং কিছু বোধগম্যও হয় না। যদি বলা যায় "হগজট্ আছে এবং নাই" তাহা হইলে কি 'হগজট্' কি, তাহা কেহ বুঝিতে পারে? বস্তুতঃ 'শূন্য' নামক একটি প্রচলিত (বা কথঞ্চিৎ লক্ষিত) শব্দ ধরিয়া, বৌদ্ধগণ ঐরূপ একত্র শুদ্ধ অস্তি ও নাস্তি বলিয়া, লক্ষিত করিতে যাওয়াতেই, উহা যুক্ত্যাভাসের মত বোধ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ওরূপ চিন্তা—মেধার অপ্রতিষ্ঠা বা unhinged reasoning ব্যতীত আর কিছু নয়।

সমস্ত বৌদ্ধেরাই যে ওরূপে শূন্যের লক্ষণ করেন, তাহা নহে। উহার ন্যায়ানুযায়ী লক্ষণও আছে। মহাযানদের যে 'ত্রিপিটক' আছে, তন্মধ্যস্থ অভিধর্ম্ম-পিটকের প্রধান ও সার অঙ্গ, "প্রজ্ঞা-পারমিতা"। অষ্টসাহস্রিকা "প্রজ্ঞাপারমিতা" শূন্যের এইরূপ লক্ষণ আছে—"ভগবানাহ, শূন্যমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনিমিত্তমিত্যপ্রণিহিতমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনভিসংস্কার ইত্যনুৎপাদ ইত্যনিরোধ ইত্যসংক্লেশ ইত্যব্যবদানমিত্যভাব ইতি নির্ব্বাণমিতি ধর্ম্মধাতুরিতি তথতেতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে"।

(দ্বাদশ পরিবর্ত্ত)।

অর্থাৎ শূন্য অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত, অনভিসংস্কৃত, অনুৎপাদ, অনিরোধ, অসংক্লেশ, অব্যবদান, অভাব, ধর্ম্মধাতু, নির্ব্বাণ,

ভবতা। তদ্ব্যতীত অন্যত্র গম্ভীর, অগম্য ও অপ্রমেয় বলা হইয়াছে।

ইহার মধ্যে 'অভাব' পদটী নিষ্প্রয়োজন বা নিরর্থক। ভাবমাত্রেরই নিষেধ যখন অভাব, তখন অনিমিত্তাদি অভাবার্থ পদ-সকল বলা বাহুল্য মাত্র, এবং ধর্ম্মধাতু প্রভৃতি ভাবার্থ-পদ বলাও স্বোক্তিবিরোধ। যাহা হউক, উক্তলক্ষণে যদি বুদ্ধদেবের নিজোক্তি-অনুসারে নির্ব্বাণের স্থানে "পরম-সুখ" বসান যায়, (নির্ব্বাণম্ পরমম্ সুখম্। ধর্ম্মপদ।) তাহা হইলে, ঐ শূন্য উপ-নিষদের আত্মা হইতে বড় বিভিন্ন পদার্থ হয় না। মাণ্ডুক্য উপনিষৎ আত্মার এইরূপ লক্ষণ করেন—"নান্তঃপ্রজ্ঞ, ন বহিঃ-প্রজ্ঞ, নোভয়তঃপ্রজ্ঞ, ন প্রজ্ঞানঘন, নাপ্রজ্ঞ, অদৃষ্ট অব্যবহার্য্য, অচিন্ত্য, অলক্ষ্য, অব্য-পদেশ্য, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, একাত্ম-প্রত্যয়সার, শিব—আত্মা।

বৌদ্ধদের নিষেধবাচক পদসমূহ এবং উপনিষদের নিষেধার্থক পদসমূহ—কার্য্যতঃ একই। অর্থাৎ, সম্যক্ চিত্তবৃত্তির * নিরো-ধাবস্থা, শান্ত ও নির্ব্বাণ একই পদার্থ; শিব ও পরমসুখ একই বস্তু।

একাত্মপ্রত্যয়সারের অর্থ—'কেবল আত্মপ্রত্যয় বা দ্রষ্টৃভাব অবলম্বন করিয়াই আত্মা অধিগম্য'। বৌদ্ধদেরও প্রকারান্তরে ইহাই স্বীকার করিতে হয়। তাহাদের চরম-সমাধিতে এইরূপ হয় যথা—

নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞানায়তনং পশ্যতি শূন্যম্।
সংজ্ঞা বেদয়িতৃ নিরোধঃ পশ্যতি শূন্যম্।
(নাগার্জ্জুনীয় ধর্ম্মসংগ্রহঃ)

পশ্যতি ক্রিয়ার কর্ত্তা অবশ্য থাকিবে। দ্রষ্টা ব্যতীত তৎকর্ত্তা আর কে হইতে পারে? * অতএব "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" "তদা-দ্রষ্টুঃস্বরূপেঽবস্থানম্" এই যোগসূত্রদ্বয়ের অর্থকে বৌদ্ধশাস্ত্র অতিক্রম ও করেনা, বিপর্য্যস্তও করেনা!

ক্রমশঃ—

স্বামী হরিহরানন্দ।

ভগবৎ-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্।

(ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতম্।)

(১)

প্রাতঃ স্মরামি ফণিরাজতনৌ শয়ানং
নাগামরাসুরনরাদিজগন্নিদানম্।
বেদৈঃ সহাগমগণৈরুপগীয়মানং
কান্তারকেতনবতাং পরমং নিধানম্॥

ফণিরাজ অনন্তের মস্তক উপর
শয়ন করিয়া যিনি রন্ নিরন্তর;

* বৌদ্ধভাষায় চিত্তের অবিকার বা পরিণামশূন্য অবস্থা। যথা "অবিকারায়ম্ন্ সারিপুত্রাবিকল্পা, অচিত্ততা" (প্রজ্ঞাপার-মিতা ১ম বিবর্ত্ত।) বৌদ্ধভাষায় চিত্ত তখন 'নির্ব্বাণ-ধাতুতে' স্থিত হয়। সাংখ্যের ভাষায় তাহা অব্যক্তে লীন হয়। বস্তুত কিন্তু একই কথা।

* কোন কোন বৌদ্ধমতে দেখা যায়—যে শূন্যতা ভাবনা করে, সে কেহ নহে বা অসৎ। "ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিৎ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্।" Bounded Infinity র ন্যায় এইরূপ বাক্যের অর্থ সাধারণ-মানবের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। কেবল মাধ্যমিকেরাই (Buddhist Faithful রাই) উহার অর্থ বুঝিতে পারেন।

দেব-দৈত্য-নাগ-নর-যুত ত্রিভুবন
যাঁর সৃষ্ট বলিয়াই খ্যাত সর্ব্বক্ষণ;
নিগম আগম যাঁর গায় গুণচয়,
বনবাসী মুনিদের যিনিই আশ্রয়;
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করি,
তাঁহারেই ভক্তিভরে মনে মনে স্মরি!

(২)

প্রাতর্ভজামি ভবসাগরবারিপারং
দেবর্ষিসিদ্ধনিবহৈর্বিহিতোপহারম্।
সন্দৃপ্তদানবকদম্বমদাপহারং
সৌন্দর্য্যরাশিজলরাশিসুতাবিহারম্॥

পার ক'রে দেন যিনি ভব-পারাবার,
দেব-ঋষি-সিদ্ধ-গণ পূজা করে যাঁর;
পরম দুর্দ্দান্ত যত রহে দৈত্যগণ,
তাহাদের দর্প যিনি করেন হরণ;
যিনি লক্ষ্মী সিন্ধু-সুতা, সৌন্দর্য্য-আধার,
তাঁর সনে নিরন্তর বিহার যাঁহার;
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করি,
তাঁহার ভজনা করি মন প্রাণ ভরি'!

(৩)

প্রাতর্নমামি শরদম্বরকান্তিকান্তং
পাদারবিন্দমকরন্দজুষাং ভবান্তম্।
নানাবতারহৃতভূমিভরং কৃতান্তং
পাথোজকম্বুরথপাদকরং প্রশান্তম্॥

শরতের সুনির্ম্মল আকাশের মত
যাঁহার সুন্দর কান্তি শোভে অবিরত;
যাঁর পাদপদ্ম-মধু করিলেই পান
এ সংসারে জন্মভয় করে অন্তর্দ্ধান;
যিনি নানা অবতার ধারণ করিয়া
পূর্ব্বাপর ধরাভার থাকেন নাশিয়া;
শঙ্খ, চক্র আর পদ্ম নিত্য যাঁর করে,
কৃতান্ত প্রশান্ত যিনি সংসার ভিতরে;
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করি,
তাঁর পদে প্রণিপাত করি ভক্তি ভরি'।

(৪)

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং ব্রহ্মানন্দেন কীর্ত্তিতম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ব্রহ্মানন্দ-বিরচিত এই শ্লোকত্রয়
অতি সারবৎ বস্তু মহাপুণ্যময়;
প্রাতঃকালে যদি ইহা পঠে কোন জন,
যত কিছু পাপ তার করে পলায়ন!

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর
বি, এ
২৬। ২ বৃন্দাবন পালের লেন
শ্যামবাজার, কলিকাতা

—•::•—

পতঞ্জলির কাল নির্ণয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

—•:*:•—

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে পতঞ্জলির কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করেন, তাহা ভ্রমও প্রমাদ বর্জ্জিত নহে, ইহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ৪র্থ যুক্ত্যাভাসঃ—রাজতরঙ্গিণীতে মহাভাষ্যের কথা উল্লিখিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে যে, বৈয়াকরণ চন্দ্রাচার্য্য কর্ত্তৃক কাশ্মীরে রাজা অভিমন্যুর রাজত্বকালে মহাভাষ্য প্রচলিত হয়। তাম্রলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, রাজা

অভিমন্যু খৃষ্টের জন্মগ্রহণের পরে চল্লিশ অব্দে কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে পাণিনি এবং কাত্যায়ন খৃষ্টের পূর্ব্বে তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, এবং পতঞ্জলি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পরে কোন এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন।' তাঁহাদের এই যুক্তি কত অসার তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

কহ্লণ পণ্ডিত তাঁহার রাজতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ, খৃষ্টের জন্মিবার পর দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ তাঁহার সময়ে প্রচলিত বিস্পষ্ট বহু কিম্বদন্তী হইতে সংগৃহীত হইয়া রচিত হয়। সুতরাং এরূপ পুস্তকের উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা, কিম্বা কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সিদ্ধান্তের অনুকূলে বিশেষ কোনরূপ উপকারের আশা করা অনেক সময়েই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। 'চন্দ্রাচার্য্য খৃষ্টীয় প্রথমশতাব্দীতে কাশ্মীরে মহাভাষ্যের প্রচলন করেন', কেবল মাত্র কহ্লনের ইতিহাস-বর্ণিত এই বিবরণের উপরে নির্ভর করিয়া, পতঞ্জলি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত। 'জর্ম্মণ ও ইংরেজী-বিশ্ববিদ্যালয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে যদি বেদ-পাঠের প্রচলন হয়'—এ একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কি ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে—বেদ ইহার দুই তিন শতাব্দী-মাত্র পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল?

হিয়োএন্ সাঙের (Hiouenthsang) ভ্রমণ বৃত্তান্ত ষ্টানিস্লস্ জুলিয়েন (Stanislaus Julien) অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, কাত্যায়ন দুইজন ছিলেন। কেননা, হিয়োএন্ যে কাত্যায়নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনি বৌদ্ধ। তিনি বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকশাস্ত্রের এক গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। হিয়োএন্সাঙ্ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ তাঁহার মাতৃভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ব্রাহ্মণ, ও হিয়ুয়েন্সাঙ্ বর্ণিত কাত্যায়ন হইতে এক 'নাম' ভিন্ন অন্যান্য সকল বিষয়ে পৃথক্।

তাঁহাদের ষষ্ঠ যুক্তি এই যে—পাতঞ্জল যোগসূত্রে,' নির্ব্বাণ', 'অহিংসা' 'পুনর্জ্জন্ম' ইত্যাদি কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত। এইরূপ নিরর্থক উক্তির বিরুদ্ধে তর্ক এই যে,—তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে পাণিনির কোন একটি সূত্রে কাত্যায়ন "নির্ব্বাণ" শব্দের যে অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রের 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থের সহিত কোন প্রকার মিল নাই কেন? কাত্যায়ন বলেন, নির্ব্বাপিত হওয়ার নামই 'নির্ব্বাণ'। পতঞ্জলি দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থ আরও বিষদ করিয়াছেন, যথা— 'অগ্নি যেমন বাতাসে নির্ব্বাপিত হয়', 'প্রদীপ যেমন বাতাসে নির্ব্বাপিত হয়'। যদি কাত্যায়ন কিম্বা পতঞ্জলি শাক্যমুনির জীবদ্দশায়, কিম্বা তাঁহার পরে জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা নির্ব্বাণ-শব্দের বৌদ্ধ-শাস্ত্রানুমোদিত পারিভাষিক অর্থ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ থাকিতেন না। সুতরাং কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া, বার্ত্তিক ও ভাষ্য রচনা করেন, এরূপ অনুমান করা সর্ব্বথা সুসঙ্গত হইতে পারে। 'কর্ম্মফল' ও 'পুনর্জ্জন্ম'-বিশ্বাস,

'অহিংসা'-ভাবানুষ্ঠান—ইহাই প্রাচ্য দার্শনিকদিগের বিশেষত্ব। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এশিয়ার প্রায় সকল জাতিই ইহা বিশ্বাস করে। বেদে গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে বৈধহিংসা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও যতি এই তিন আশ্রমসেবীর পক্ষে উহা একান্ত নিষিদ্ধ। প্রাণিগণের কায়মনোবাক্যে কোনরূপ দুঃখ দিবার ভাববর্জ্জনকেই 'অহিংসা' বলে। পতঞ্জলি 'কর্ম্মফল''পুনর্জন্ম,' 'অহিংসা'-ভাবের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বেদাদি গ্রন্থেও বর্ত্তমান। সুতরাং ঐ সমস্ত শব্দ বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে যে গৃহীত নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

তাঁহাদের ৫ম যুক্ত্যাভাস এই:—হিয়েন্‌সাঙ বলেন—'বুদ্ধের তিনশত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টের প্রায় দুইশত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কাত্যায়ন বিদ্যমান ছিলেন'।—এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া, হিয়েন্‌সাঙ-বর্ণিত বৌদ্ধ-দার্শনিক কাত্যায়নকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পাণিনির বার্ত্তিককার 'কাত্যায়ন' বলিয়া নির্ণয় করেন; কিন্তু এই যুক্তি যে 'নিতান্ত অসার' তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

কাত্যায়নের নাম সংস্কৃত সাহিত্যে বহু স্থানেই দৃষ্ট হয়। কল্প-সূত্র-প্রণেতা একজন কাত্যায়ন ছিলেন। 'সর্ব্বানুক্রমণিকা' নামক বেদাঙ্গ-গ্রন্থ তাঁহারই প্রণীত। ইনি শৌনকশিষ্য আশ্বলায়নের শিষ্য ও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন, ইনিই শুক্ল-যজুর্ব্বেদের এক 'প্রাতিশাখ্য'ও কতকগুলি 'পরিশিষ্ট গ্রন্থ' লিপিবদ্ধ করেন। আবার পাণিনির যিনি বার্ত্তিকপ্রণেতা, ইঁহারও নাম কাত্যায়ন। মহাভাষ্য আর এক কাত্যায়নের কথা উল্লেখ করেন। ইনি একজন কবি ও বররুচি নামে অভিহিত। লিঙ্গানুশাসন-প্রণেতা আর একজন বররুচি ছিলেন। ইনি বিক্রমাদিত্য নামে কোন এক রাজার সভায় একজন সভাসদ। 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' গ্রন্থেও (কেহ কেহ কালিদাসকে ভ্রমক্রমে এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া মনে করেন।) বররুচির নাম উল্লিখিত আছে। আরও একজন বররুচির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি "গীর্ণা-শ্রীয়াদিবাক্য" নামে বাক্যগণিত সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা আর্য্যভট্টের প্রণালী অনুযায়ী জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এক সারণীগ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ হইতেই দাক্ষিণাত্যে "বাক্যপঞ্চাঙ্গ" নামক গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে, ও উহা গণনার পক্ষে একান্ত সাহায্য করিয়াছে। এই শেষোক্ত বররুচি ষষ্ঠশতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। এখন ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, কোন্ বররুচি—কি বৃত্তান্ত—স্থির না করিয়া, বররুচি অমুক সময়ে' বা 'অমুকের পরে' জীবিত ছিলেন—বলিতে যাওয়া প্রলাপ মাত্র।

আরও একটি কথা এই যে, একই ঋষির নামানুসারে, তাঁহার বংশধরগণও সেই নামে অভিহিত হইতেন। পাণিনিতেও এইরূপ একটি সূত্র দৃষ্ট হয়। মহা-কাত্যায়ন বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন; একজন কাত্যায়ন বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে এক আধ্যাত্মিক দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও হিয়েনসাঙ্ তাঁহার মাতৃভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রণয়ন করেন, ইহা পূর্ব্বে

উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কাত্যায়ন ঋষির বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ইঁহারাও যে 'মহা-কাত্যায়ন', ও 'কাত্যায়ন' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন, এরূপ অনুমান সর্ব্বথা সুসঙ্গত। প্রাচীন জনকাদি রাজর্ষিবংশও ইহার সদ্দৃষ্টান্ত।

উপবর্ষ আচার্য্যের নাম কথাসরিৎসাগরে, হেমচন্দ্রের অভিধানে ও পুরুষোত্তম-দেবের 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক পুস্তকেও দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য উপবর্ষ জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা ও বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্রের' ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আচার্য্য উপবর্ষের গ্রন্থ হইতে স্থলে স্থলে শবরস্বামী তাঁহার মীমাংসাভাষ্যে ও স্বামী শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাত্যায়নের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, ও পরস্পর তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। 'কাত্যায়ন' বলিয়া বহুবার উল্লেখ থাকিলেও, তাঁহাদের বিচারস্থলে দুইজনকে মাত্র উপস্থিত করা যাইতে পারে। একজন পাণিনির বার্ত্তিককর্ত্তা 'ভ্রাজ' নামে কতকগুলি শ্লোক প্রণয়নকর্ত্তা, ও আর একজন 'কল্পসূত্র' ও 'প্রাতিশাখ্য'-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই শেষোক্ত কাত্যায়ন কখন 'বররুচি,' কখন বা 'মেধাজিৎ' বা 'পুনর্ব্বসু' নামে অভিহিত হইতেন।

কথিত আছে যে,—পূর্ব্বকালে কাত্যায়ন নামে মহামুনি সপ্তলক্ষ-শ্লোকাত্মক 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া, রাজা কাণভূতিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পরে সোমদেবভট্ট তাহা হইতে সারাংশ সংগ্রহ পূর্ব্বক 'কথাসরিৎসাগর' নামক গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে এইরূপ আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, নন্দ বংশীয় রাজার অধিকার কালে, উপবর্ষ পণ্ডিতের কাত্যায়ন, (অন্য নাম বররুচি) ব্যাড়ি এবং পাণিনি নামে তিনটী প্রধান ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পাণিনির বুদ্ধি অতি অল্প ছিল। একদা তিনি ব্রহ্মচারিগণের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া, নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে মহাদেবের তপস্যা করেন। ক্রমে মহেশ্বর-প্রসাদে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া সূত্রপাঠ, গণপাঠ, ধাতুপাঠ ও লিঙ্গানুশাসনাত্মক চারি ভাগে বিভক্ত ব্যাকরণশাস্ত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিজ গুরু ও সহাধ্যায়ীদিগের নিকট প্রকাশ করেন। অনন্তর তৎপ্রণীত গ্রন্থের কৌশল বুঝিতে পারিয়া, কাত্যায়ন অবশিষ্টাংশ পরিপূরণদ্বারা সংক্ষেপে অর্থাবগতির জন্য বৃত্তি নির্ম্মাণ করেন। ব্যাড়ি তত্তদ্ কার্য্য বিষয়ের 'ন্যায়' প্রদর্শনার্থ—অর্থাৎ কোন ন্যায় দ্বারা কোন্ অর্থ সাধিত হইবে—তজ্জন্য, লক্ষশ্লোকাত্মক 'সংগ্রহ' নামক গ্রন্থপ্রস্তুত করেন। ক্রমে তাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকলের আবির্ভাব হওয়াতে, তৎকালপ্রচলিত সুবিস্তীর্ণ ঐন্দ্রাদি ব্যাকরণের অনাদর হইল, এবং ক্রমে তাহাদের আলোচনাও লোপ পাইতে লাগিল। তদবধিই পাণিনীয় ব্যাকরণের পঠন-পাঠন-ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদিগের মধ্যে শালাতুরগ্রামবাসী দাক্ষীগর্ভ-সমুদ্ভূত পাণিনি, প্রাগুক্ত গ্রন্থচতুষ্টয়াত্মক ব্যাকরণ ও শিক্ষাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কাত্যায়ন কৌশাম্বী-নগরবাসী সংকৃতিগোত্রে উৎপন্ন সোমদত্ত নামক বিপ্রের ঔরসে এবং বসুদত্তার

(শোণোত্তরার) গর্ভে জন্মিয়া উপবর্ষের নিকট হইতে অসীম বিদ্যাভ্যাস করতঃ, 'বৃহৎকথাদি' অনেকানেক গ্রন্থ রচনা করিয়া, নন্দ রাজের প্রিয় মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ব্যাড়ি বেতসাখ্য-পুরে করগুনামে বিপ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, সংগ্রহাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য রাজার জ্যেষ্ঠ-সহোদর ভর্ত্তৃহরি প্রণীত 'বাক্য-পদীয়' গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে,—কালক্রমে লোকদিগের আলস্যাদিসমাবেশে বহু বিস্তৃত ব্যাড়িপ্রণীত সংগ্রহ গ্রন্থে হতাদর হওয়াতে, পাণিনিকৃত ব্যাকরণ লুপ্তপ্রায় হইতেছিল, এমন সময়ে ভগবান্ পতঞ্জলি সংগ্রহ-নিবন্ধ হইতে সারাংশ সংকলন পূর্ব্বক সূত্র,বার্ত্তিক ও ব্যাখ্যামুখে সংগ্রহোক্ত সমস্ত ন্যায় প্রদর্শন করাইয়া, 'মহাভাষ্য' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। পুনরায় কালক্রমে লোকের মেধা-শক্তিহীন হওয়াতে—উক্ত পাণিনীয় ব্যাকরণ ও পতঞ্জলির মহাভাষ্যের পঠন পাঠন-ব্যাপার বিলুপ্ত হইতেছিল। অধিক কি, গ্রন্থগুলিও দুর্লভ হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে চিত্রকূটপর্ব্বতৈকদেশে 'রাবণ' নামে কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত একখানি সুপক্ত ব্যাকরণ ছিল। বিপ্রবেশধারী কোন রাক্ষস তথা হইতে ঐ পুস্তক আনয়ন করতঃ, বসুরাত ও চন্দ্রাচার্য্যাদি পণ্ডিত-দিগকে প্রদান করেন। তাঁহারা ভর্ত্তৃহরি-প্রভৃতি শিষ্যকে অধ্যাপনা করান। তৎ-পাঠে ও তদুপদেশানুসারে ভর্ত্তৃহরি মহাভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার তাৎপর্য্যজ্ঞাপিকা টীকা নির্ম্মাণ করিয়া, ব্রহ্ম বাক্য ও পদভেদে, যে, ত্রিকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাকে 'বাক্যপদীয়' বলে। সুতরাং বাক্যপদীয় গ্রন্থে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে—ভর্ত্তৃহরির পূর্ব্বে পতঞ্জলির আবির্ভাব হইয়াছিল।

পুনশ্চ সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,—কলির অচির প্রবৃত্তি সময়ে অর্থাৎ কলিযুগের অশীতিবর্ষ গত হইলে, উত্তরাগর্ভ-সম্ভূত অভিমন্যু-তনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের ১৫১০ পনরশত দশ বৎসর পরে, নন্দ-বংশীয় নৃপতিগণের প্রথমে রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে। ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবাক্যেও সমর্থিত হইয়াছে। "আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্। এতদ্বর্ষসহস্রং তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥" নন্দবংশীয়েরা একশত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত নামে কোন রাজা সিংহাসন লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—"য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ। নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি॥ তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ। স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।" 'কথাসরিৎসাগরে' লিখিত আছে যে, নন্দবংশীয় রাজাদিগের অধিকার-কালেই পাণিনি ও কাত্যায়ন এই দুই মুনির আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব কলিযুগের পনর শত দশ বৎসর পরে অর্থাৎ এখন হইতে (৫০০৭—১৫১০=) ৩৪৯৭ তিন হাজার চারিশত সপ্তনবতিবৎসর পূর্ব্বে, অথবা খৃষ্ট সম্বতের (৩৪৯৭—১৯০৬=) ১৫৯১ পনরশত একনবতিবর্ষ পূর্ব্বে, ও তৎপরবর্ত্তী একশত বৎসর মধ্যে

অর্থাৎ খৃঃ পূঃ (২৫৯১—১৪৯১) বৎসর মধ্যে, পাণিনি ও কাত্যায়ন আবির্ভূত হ'ন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব ও পাণিন্যাদি-জন্মের অল্পকাল পরেই আবির্ভূত হ'ন। কেননা "সভারাজমনুষ্য-পূর্ব্বেতি" পাণিনির এই সূত্রের উদাহরণে, পতঞ্জলি 'চন্দ্রগুপ্তসভার' কথা উল্লেখ করিয়াছেন,। কিন্তু ইহা কোন 'চন্দ্রগুপ্ত', কিম্বা ইহা দেবদত্ত 'যজ্ঞদত্তে'র ন্যায় দৃষ্টান্ত বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে পণ্ডিতদিগের যথেচ্ছ কল্পিত শব্দ কিনা—সে সমস্ত কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিই পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। মাধবাচার্য্য 'সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে লিখিয়া-ছেন যে;—সর্ব্বপুরাণশাস্ত্রেরও আদিতে যোগ-শাস্ত্রের প্রায় প্রচার ছিল না। পরে কৃপাপরতন্ত্র মহর্ষি ফণিপতি পতঞ্জলি হিরণ্য-গর্ভোপদিষ্ট যোগ-শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া, পাতঞ্জল যোগসূত্র রচনা করেন, এবং সেই গ্রন্থে তিনি নিজের ফণিপতিত্ব অর্থাৎ 'আমিই ফণিপতি পতঞ্জলি' এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। নৈষধকারও—"ফণিভাষিত-ভাষ্য-ফক্কিকাবিষমাকুণ্ডলনামবাপিতা" পদে পতঞ্জলির ফণিপতিত্ব-স্বীকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে—'মহাভাষ্য'-লেখক ও যোগসূত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি একই ব্যক্তি নহেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহারা দুইটি যুক্তি প্রদান করেন। ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা ব্যাস "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই সূত্রে যোগশাস্ত্রের উপর কটাক্ষপাত ও দোষারোপ করিয়াছেন অতএব যোগসূত্র-প্রণয়নকাল বা পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। আর পাণিন্যাদির সমকালে 'মহাভাষ'-কার পতঞ্জলি জন্ম-গ্রহণ করেন—ধরিয়া লইলে, দ্বিতীয় পতঞ্জলি ব্রহ্মসূত্রপ্রণেতা ব্যাসদেবের বহু পরবর্ত্তী স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, তাঁহারা হেতু দেন— মহাভাষ্যে 'চন্দ্রগুপ্তের সভা' বর্ণিত আছে। তাঁহারা এই চন্দ্রগুপ্ত কে, বা চন্দ্রগুপ্ত নামে কয়জন রাজার নাম পাওয়া যায়,—এসকল কিছু নির্ণয় না করিয়া, কি প্রকার যুক্তির আশ্রয় লইয়া এই চন্দ্রগুপ্তকে সেকেন্দরের (Alexander এর) সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা জানা নাই। মহাভাষ্যে—উল্লিখিত 'চন্দ্রগুপ্তের সভা' এই পদ দেখিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কিরূপেই বা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি,—যোগসূত্রকার পত-ঞ্জলি হইতে ভিন্ন, ও যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ব্রহ্মসূত্রপ্রণেতা ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী (বা সম-সাময়িক) ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বহু পরবর্ত্তী—এরূপ অনুমান করেন ?

স্থিরভাবে বিবেচনা করিতে গেলে, এসকল অনুমানের মূলে কোন যুক্তি নাই। তাহার কারণ একটি একটি করিয়া উল্লি-খিত হইতেছে। (১) যিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তিনিই বেদবিভাগকর্ত্তা, মহা-ভারতাদি সংহিতারচয়িতা, ও একই তিনি যে ভাগবতাদি অষ্টাদশপুরাণ ও বহু উপপুরাণের রচয়িতা—তাহা বোধ হয় না। কেননা, শাস্ত্রবিভাগকর্ত্তা পণ্ডিতগণও তখন 'ব্যাস' নামে অভিহিত হইতেন।

ইহা প্রাচীন কালের আর্য্যস্থানের পণ্ডিতদিগের উপাধিবিশেষ। সুতরাং খ্যাতনামা বহু ব্যাসের জন্মগ্রহণ অসম্ভব নহে। (২) ব্রহ্মসূত্র প্রণেতা (ভাষ্যরচয়িতা নহেন) ব্যাস ও পতঞ্জলি-প্রণীত যোগসূত্রের ভাষ্যকার ব্যাস এক নহেন; কেননা তিনি যোগমতে দোষারোপ করিয়া, কিরূপে আবার যোগসূত্রের ভাষ্য লিখিবেন! আরও ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা ব্যাস "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই সূত্রে যোগ মতে দোষারোপ করিয়াছেন—কিন্তু এখানে যে মহর্ষি পতঞ্জলিরই উপর কটাক্ষ আসিতেছে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কেননা, পতঞ্জলিত আর যোগমতের আদি বক্তা নহেন, তিনি প্রবর্ত্তক ও অনুশাসক মাত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

সমালোচনা।

"প্রশ্নোত্তর-মণিরত্নমালা" (শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতা) "প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা" (জৈনযতি-বিমল-বিরচিতা) এবং "প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা" (পরমহংস কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী-বিরচিতা)।—এই তিনখানি পুস্তক একত্র প্রকাশিত হইয়াছে। খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ, কবিভূষণ, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর মহাশয় উক্ত গ্রন্থত্রয়ের সংগ্রাহক, সম্পাদক ও অনুবাদক। "মণিরত্নমালা" এদেশে চলিত ছিল; কিন্তু "রত্নমালা" ও "রত্নমালিকা" এদেশে এতদিন ছিল না,—কেহও জানিত না। পূর্ণ বাবু বহু চেষ্টায় ঐ দুই খানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, "মণিরত্নমালার" সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থগুলি জ্ঞানগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। পূর্ণ বাবুর যত্নে ও পাণ্ডিত্যে অতি বিশুদ্ধভাবে এবং অতি সুন্দররূপে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি অন্যান্য পুস্তক সম্পাদনে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, ইহাতেও তাহার অনুমাত্র ত্রুটি দেখিলাম না। তিনি প্রত্যেক কবিতার যে বাঙ্গলায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহাও অবিকল অথচ প্রকৃত ভাবব্যঞ্জক এবং সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। গ্রন্থের আদিতে ও অন্তে, তাঁহার স্বরচিত যে কয়েকটি কবিতা আছে, সেগুলি পাঠ করিলে, তাঁহাকে প্রকৃত সুপণ্ডিত ও সুকবি বলিয়াই ভক্তি জন্মে। এই রত্নত্রয় তৎকৃত অনুবাদরূপ কাঞ্চনের সহিত মিলিত হইয়া, অতি অপূর্ব্বশোভাই ধারণ করিয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় এবং বঙ্গদেশের সৌভাগ্যে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া, এইরূপ লুপ্তরত্নের উদ্ধারে চিরদিন ব্যাপৃত থাকুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা! পুস্তকখানির কাগজ ও মুদ্রণ অতি সুন্দর হইয়াছে। মূল্য কাগজে বাঁধা ।৵৹ ও কাপড়ে বাঁধা ॥৹ আনা মাত্র। তৎসম্পাদিত "উদ্ভটশ্লোকমালা" কাপড়ে বাঁধা, ২৲ এবং কাগজে বাঁধা ১॥৹; "মোহমুদ্গর ও মোহকুঠার" কাপড়ে বাঁধা ।৵৹ ও কাগজে বাঁধা ।৹; এবং "পাণ্ডবগীতা" কাপড়ে বাঁধা ।৵৹ ও কাগজে বাঁধা ॥৹ আনা মাত্র। উক্ত সমস্ত পুস্তকই অতি উপাদেয়, সুতরাং সাধারণের যত্নের সামগ্রী। পূর্ণ বাবুর পুস্তকগুলি লোকের ঘরে ঘরে বিরাজ করে, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। উক্ত সমস্ত পুস্তকই কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

১৩শ বর্ষ । ভাদ্র-আশ্বিন । ৫ম ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

১৮২৮, ১৩১৩ ।

গ্রাহকগণ !

☞ বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন ।

☞ পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্বীয় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিবেন ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা ।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ।



সূচী ।

যশোহর ।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

শকাব্দা ১৮২৮ ।

☞ ১৩০১।২।৩।৪ সনের বান্ধান হিন্দু-পত্রিকা প্রতি সন ১৷০ এবং ১৩০৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২ সালের বান্ধান পত্রিকা প্রতিসন ১॥০ মূল্যে বিক্রেয়

অগ্রিমবার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১৷০ মাত্র । এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ ।

সম্পাদক রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এইক্ষণে হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইলে ৭৩। ১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সুলভমূল্যে উপহার দেওয়া হইয়া থাকে।

১। ঋগ্বেদভাষ্যোপোদ্‌ঘাত প্রকরণম্ ২৲ টাকা স্থলে ১৲, ২। আস্তিক্যের-প্রসার ৸০ স্থলে ॥০, ৩। শাণ্ডিল্যসূত্র ১৲ স্থলে ৸০, ৪। Three Gospels বা গীতাত্রয় মূল্য।০ ৫। Expansion of Self মূল্য ॥০। ৬। বেদান্তসূত্র ১ম খণ্ড মূল্য ৸০, ৭। ৺প্রভাবতী দেবীর কৃত অমল-প্রসূন ১৲ স্থলে ৸০, ৮। শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত দার্শনিকমীমাংসা ১৲ স্থলে ৸০, মোট ৫।০। যাঁহারা ৮ খানা পুস্তক একসঙ্গে লইবেন, তাঁহারা ৫।০ স্থলে ৪।০ টাকায় পাইবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ম্যানেজার।

হিন্দুপত্রিকা, হিতবাদী ও এডুকেশন-গেজেটের বিখ্যাত উদ্ভট-শ্লোক-প্রকাশক

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ-প্রণীত—

১। "উদ্ভট-শ্লোক-মালা"—(বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের শ্লোক ও অন্যান্য অতি উৎকৃষ্ট কবিতা। পাঁচটী স্ত্রীকবির শ্লোক ও অন্যান্য নানাবিধ মহাকবির কবিতা; প্রাঞ্জল বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ, ব্যাখ্যা, টীকা, টিপ্পনী সহিত) কাপড়ে সোনার জলে বাঁধাই, মূল্য ২৲ দুই টাকা। কাগজে বাঁধাই ১৷০ টাকা। ডাকমাশুল ৵১০ আনা।

২। "পাণ্ডব-গীতা"—(সম্পূর্ণ গ্রন্থ। ভগবানের নিকট এক এক ভক্তের দুঃখ-নিবেদন ও বর-প্রার্থনা। মূল শ্লোক ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহিত) মূল্য কাপড়ে সোনার জলে বাঁধাই ॥৵০ দশআনা; কাগজে বাঁধাই ॥০ আট আনা। ডাকমাশুল ৵০ এক আনা।

৩। "মোহমুদ্গর" ও "মোহকুঠার"—শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত। (মূল শ্লোক, প্রাঞ্জল বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ এবং "মোহমুদ্গরের" সঞ্জীবনী শক্তির অলৌকিক আখ্যায়িকা সহিত) মূল্য কাপড়ে সোনার জলে বাঁধাই ।৵০ ছয় আনা; কাগজে বাঁধাই ।০ চারি আনা। ডাকমাশুল আধ আনা।

৪। "প্রশ্নোত্তর-মণিরত্ন মালা" (শঙ্করাচার্য্য-কৃত), "প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা" (বিমল-কৃত) ও "প্রশ্নোত্তর-রত্ন-মালিকা" (কৃষানন্দ সরস্বতী-কৃত)। তিন খানি গ্রন্থ একত্র বাঁধা। মূল শ্লোক ও প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ সহিত। কাপড়ে সোনার জলে বাঁধাই ॥০ আট আনা; কাগজে বাঁধাই ।৵০ ছয় আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। নং ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। কলিকাতা।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩শ সর্গ, ১৩শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

ভগবদ্‌গীতায় ভক্তিযোগ।

(প্রথম প্রস্তাব।)

ভগবদ্ভক্তি-প্রদায়িনী "গীতা" অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহার প্রত্যেক অধ্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশে পরিপূর্ণ। শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতার যে কোন অধ্যায় পাঠ করুন, মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য, অর্থাৎ মুক্তি বা পরমপদ লাভের জন্য, যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, মহামহর্ষি বেদব্যাস অতি পরিষ্কার রূপে জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, গীতা-শাস্ত্রখানিকে ছয় অংশে বিভক্ত করিয়া, ধর্ম্মপিপাসু বা মোক্ষেচ্ছু ভক্ত পুরুষেরা যদি ইহা মনো-যোগ সহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে ইহা অধ্যয়নের পক্ষে যেরূপ সহজ ও সুবিধা-জনক হইতে পারে, শ্লোকার্থ বুঝিবার ও হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষেও তেমনি কতক-গুলি সুন্দর ও সারবান্ ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। অষ্টাদশ-অধ্যায়িনী গীতা সমভাবে ষড়ংশে বিভক্তা হইলে, প্রত্যেক অংশে তিনটি করিয়া অধ্যায় সংযুক্ত হওয়া উচিত। এবম্প্রকার বিভাগ করিয়া পাঠ করিলে, পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, ইহা-দের প্রথম অংশে কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয় অংশে জ্ঞানকাণ্ড, তৃতীয়ে বিশ্বাস, চতুর্থে অভ্যাস, পঞ্চমে ভক্তি এবং ষষ্ঠে মোক্ষকাণ্ডের উপদেশসমূহ বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নের তালিকায় পাঠক মহাশয়েরা বিভাগগুলিকে আরও সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন।

ভাগের পরিমাণ।	ভাগের নাম।
প্রথম অংশ (প্রথম তিন অধ্যায়)	কর্ম্মকাণ্ড।

দ্বিতীয় অংশ জ্ঞানকাণ্ড।
(৪র্থ ৫ম ও ষষ্ঠ অধ্যায়)
তৃতীয় অংশ বিশ্বাসকাণ্ড।
(৭ম ৮ম ও ৯ম অধ্যায়)
চতুর্থ অংশ অভ্যাসকাণ্ড।
(১০ম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়)
পঞ্চম অংশ ভক্তিকাণ্ড।
(ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়)
ষষ্ঠ অংশ মোক্ষকাণ্ড।
(ষোড়শ, সপ্তদশ ও ১৮শ অধ্যায়)

উপরি-উক্ত ছয়টি ভাগের নামকরণে আমি কর্ম্ম জ্ঞান, বিশ্বাস, অভ্যাস, ভক্তি ও মোক্ষ এই কয়েকটি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি। স্থানান্তরে এই অত্যাবশ্যক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করিবার বাসনা রহিল।

এইরূপ বিভাগ পাঠকের অধ্যয়ন ও চিন্তার পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও গীতার প্রত্যেক অধ্যায়কে কর্ম্ম, জ্ঞান, বিশ্বাস, অভ্যাস, ভক্তি ও মুক্তির সহায় বলিয়া বিবেচনা করা উচিত,—কারণ প্রত্যেক অধ্যায়ই এই সকল বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মসাধনের এই ছয়টি অঙ্গ, সুতরাং ঐ ছয়টি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মহোপকারিণী "গীতা"র তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ভুবনবিখ্যাত গীতাশাস্ত্র কেবল অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য প্রকটিত হয় নাই, পরন্তু অনন্তকাল পর্য্যন্ত মায়ামুগ্ধ মানবের জ্ঞানোৎপাদন, কল্যাণসাধন ও মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শ্রীভগবান্ ইহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কারণে ভগবান্ পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, "যে ব্যক্তি গীতা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং ব্যাখ্যা করেন, বিশেষতঃ যিনি গীতাজ্ঞান প্রচার করিয়া বুঝাইয়া দেন, এবং ভক্তিসহকারে বিধিমতে ইহার উপদেশ দেন, তিনি আমার অতীব প্রিয়ভক্ত এবং তাঁহার মুক্তির পথ নিতান্ত সরল ও প্রশস্ত।" এই জন্য কহা যায়, যাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমৎ অর্জ্জুনকে গীতা শাস্ত্রে কহিয়াছেন, তাহা সমগ্র জগদ্বাসীর নিমিত্ত কহা হইয়াছে। সুতরাং, গীতাশাস্ত্র সাধারণসম্পত্তি; ইহা প্রত্যেক ভক্তের, প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুর ও সরলবিশ্বাসীর পরম কল্যাণের ধন।

গীতার সমুদয় অধ্যায়ের মধ্যে দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের আয়তন ক্ষুদ্রতম। উভয় অধ্যায়েরই শ্লোক সংখ্যা সমতুল্য অর্থাৎ মোটে কুড়িটি। অন্যান্য অধ্যায়ে ভগবদ্ ভক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ থাকিলেও, ঋষিগণ দ্বাদশ অধ্যায়ের "ভক্তিযোগ" নাম দিয়াছেন। অদ্যকার প্রবন্ধে এই সুমধুর ভক্তিযোগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্খা করি। গীতাশাস্ত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ে, ভক্তি সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহারই অনুসরণ করিব, অবান্তরভাবে শাস্ত্রান্তর হইতেও প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু তাহা কেবল পাঠকের সুবিধার জন্য এবং প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে যথাশক্তি সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে সংগৃহীত হইবে। মুখ্য বিষয়টি গীতাশাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবার বাসনা করি। ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ, ভক্তির আদি, মধ্য ও পরিণাম অবস্থা, ভক্তির গুণ ও ফল,

ভক্তের পরিণাম, ভক্তির অঙ্গ ইত্যাদি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। আমি স্থানান্তরে গীতাশাস্ত্রের যে বিভাগ করিয়াছি, তাহাতে পাঠক মহাশয়েরা দেখিয়াছেন দ্বাদশ অধ্যায়টি "অভ্যাস"কাণ্ডের অংশ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মূল গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়টির ঋষিপ্রদত্ত নাম "ভক্তিযোগ"। আমি স্থানান্তরে ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া, পাঠকের কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিব। গীতাশাস্ত্রের বহু স্থানে এবং অনেক অধ্যায়ে, ভক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবের বর্ণনা আছে, কিন্তু তথাপি মহর্ষি মহোদয় ক্ষুদ্রতম দ্বাদশ অধ্যায়টিকে কেন বিশেষ করিয়া "ভক্তিযোগ" নাম দিয়াছেন, এই প্রশ্নের সদুত্তরে বলা যায়, অন্যান্য অধ্যায়ে ভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ প্রচুরপরিমাণে লিপিবদ্ধ থাকিলেও, এই ক্ষুদ্রতম দ্বাদশ অধ্যায়ের একটু "বিশেষত্ব" আছে,—সেই বিশেষত্বের জন্য এই অধ্যায়ের নাম হইয়াছে "ভক্তিযোগ"। এই বিশেষত্ব টুকু বুঝাইয়া দেওয়া বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

যাঁহার দেবদুর্লভ কৃপায় মূকগণ বাগ্মী হইয়া জগতকে বিস্মিত করিতে পারে, পঙ্গুগণ অভ্রভেদী অত্যুচ্চ গিরিশিখরকে লম্ফ দিয়া অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়, যাঁহার শক্তি, বুদ্ধি, সামর্থ্য, কৌশল ও কৃপার অন্ত নাই, যিনি নির্গুণ হইয়াও সকল গুণের আধার, এবং নিরাকার হইয়াও সাকার, যিনি নিত্য স্থায়ী, নিত্য জ্যোতির্ম্ময় এবং পূর্ণানন্দ, যিনি মায়াময় অনিত্য সংসারে একমাত্র সহায়, সেই সর্ব্বারাধ্য পরমপূজনীয় পরমেশ্বরের পদারবিন্দ স্মরণ করিয়া, তাঁহারই অমৃতময় উপদেশবাক্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক, এই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহার করুণা ও আশীর্ব্বাদে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সর্ষপ পর্ব্বতায়তন হইতে পারে, এবং আকাশভেদী গিরিরাজ হিমালয়তুল্য পর্ব্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, সর্ষপাকারে পরিণত হইতে পারে, যিনি মূর্খকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং পাপাত্মাকে পবিত্র ও পুণ্যবান্ করিয়া অপার মহিমা প্রচার করিতে পারেন, সেই চিরকল্যাণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অধম লেখকের সহায় হউন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

প্রবন্ধের প্রথমেই আমি লিখিয়াছি, দ্বাদশ অধ্যায়ের অর্থাৎ "ভক্তিযোগ" নামক অধ্যায়ের আয়তন অতি ক্ষুদ্র। ইহাতে সর্ব্বসমেত কুড়িটি শ্লোক আছে; সুতরাং প্রত্যেক শ্লোকটি মূল গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া, আমি ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করি। এবম্প্রকারে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে, আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি সুখপাঠ্য হইতে পারিবেনা বলিয়া আমার আশঙ্কা আছে। শ্রীভগবানের মুখারবিন্দনিঃসৃত বাক্যসমূহ সর্ব্বাগ্রে ব্যাখ্যা করিয়া, তৎপরে আমাদের বাক্যনিচয় সংযোজিত করাই উচিত। প্রথম শ্লোকটি এই—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ। ১।

টীকা—সংস্কৃত ভাষায় "এবং" শব্দের অর্থ 'এইরূপ' বা 'এবম্প্রকার'। শ্লোকের

প্রথমেই "এবং" শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায়, পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারেন, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের সম্পর্ক আছে। ইতঃ পূর্ব্বে (অর্থাৎ একাদশ অধ্যায়ের শেষে) শ্রীভগবান্ শ্রীমৎ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন "হে পরন্তপ! কেবল মাত্র ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারাই আমি দৃষ্ট হইয়া থাকি, এবং ভক্তিদ্বারাই লোকে আমার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে, আমাতেই তন্ময় ও লীন হইতে সক্ষম হয়। হে পাণ্ডব! যিনি ঈশ্বরার্থেই কর্ম্ম করেন, ঈশ্বরকেই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, যিনি ঈশ্বরে আসক্ত এবং সর্ব্বজীবে দয়াবান্ (বৈরিতা-শূন্য) তিনিই ভক্ত; তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হয়েন এবং (পরিণামে) আমাতেই বিলীন হয়েন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া, দ্বাদশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে শ্রীমৎ অর্জ্জুন কহিতেছেন *, "(হে প্রভো! আপনার কথিত) এবম্প্রকার সতত-তন্ময়তা- (ভক্তি) সহকারে যে ভক্ত আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি অধিকতর যোগতত্ত্ববিৎ (জ্ঞানী), কি যে ব্যক্তি অব্যক্ত (অদর্শনীয় ও অপ্রকটিত) পরমাত্মার প্রকৃষ্ট উপাসক, সেই ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানী?"

এই শ্লোকে প্রথমে বুঝিতে পারা গেল, "সতত যুক্তাবস্থা"র অন্য নাম ভক্তি—এবং ভক্তের উহাই অবস্থা। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভক্তের উপাসনা, সাধারণ পুরোহিতের পূজার ন্যায় নহে, ভক্তেরা ভক্তি সহকারে ভগবানের প্রকৃষ্ট রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন—এবং ঐ উপাসনা সতত তাঁহার হৃদয়ের ভাবের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। বাইবেল্ গ্রন্থে মহাসাধু এবং মহাপণ্ডিত শ্রীমৎ পলুস (পল্) লিখিয়াছেন Pray to God without ceasing (ঈশ্বরের উপাসনা অবি- শ্রান্ত ভাবে কর।) এই উক্তির অর্থে ইহা বুঝা উচিত নহে যে প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইতে সায়াহ্নে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যাস্তকাল হইতে সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত কেবল জানু- পাতিয়া স্তিমিতনেত্রে ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। মহাত্মা পলেরও তাহা উদ্দেশ্য নহে। যে কোন কার্য্য করা যাউক, যাহা কিছু দান বা গ্রহণ করা হউক, অধিক কি শয়নে, ভ্রমণে, আহারে, উপবেশনে, চিন্তায়, কার্য্যে, বাক্যে সকল বিষয়েই এবং সকল সময়েই ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য ব্রহ্মে সমর্পণ। এইজন্য গীতার একস্থলে ভগবান্ কহি- য়াছেন—

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
(পঞ্চম অধ্যায়। ৮ ৯ শ্লোক)

অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, বাক্য- কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ কর্ম্মে একমাত্র ঈশ্বরকেই মুখ্য লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখিবেন। মহর্ষি জনক এত বড় ঋষি হইয়াও মহারাজা ছিলেন,— তিনি যেমন 'মহর্ষি' নামের গৌরব, তেমনি 'মহারাজা' নামেরও গৌরব ছিলেন।

* বন্ধনীমধ্যস্থ বাক্যসমূহ আমার নিজের।—লেখক।

সর্ববিধ গুরুতর রাজকর্ম্ম করিয়াও, তিনি যোগভ্রষ্ট হয়েন নাই. কারণ তিনি রাজা হইয়াও যোগী ছিলেন এবং যোগী হইয়াও রাজা ছিলেন। সকল কর্ম্মে একমাত্র ভগবান্‌কে প্রধানতম লক্ষ্য জ্ঞান করায়, তিনি যোগী হইয়াও রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেন এবং রাজা হইয়াও যোগ সাধন করিতে সক্ষম ছিলেন। নিরন্তর সর্ব্বকর্ম্মে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখার নাম "ভক্তি"। তাঁহাকে এইরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, জীবন যাপন করিলে যে তন্ময়তা জন্মে, তাহাই "ঐকান্তিকী ভক্তি"। এই জন্য ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

অর্থাৎ "অনন্য চিত্ত হইয়া যিনি ঈশ্বরের সর্ব্বদা (নিরন্তর) স্মরণ করেন, হে অর্জ্জুন, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর (সাধুর) পক্ষে ঈশ্বর সুলভ"। অন্যত্র কহিয়াছেন "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর" অর্থাৎ হে পার্থ! সর্ব্বকালেই (সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকর্ম্মে) আমাকে (ঈশ্বরকে) স্মরণ করিবে।" প্রকৃত ভক্তের ইহাই নিয়ম। প্রকৃত ভক্ত যেমন সর্ব্বকর্ম্মে হরিকে লক্ষ্য রাখেন, যেমন সকল কর্ম্ম তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, তেমনি সকল কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সমাধান করিয়া, সর্ব্বজীবে, সর্ব্বপদার্থে ও সর্ব্বস্থানে একমাত্র ভগবানকে দর্শন করেন, এবং তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হয়েন। গোপিকাদিগের সর্ব্ব পদার্থে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ন্যায়, সর্ব্বপদার্থে প্রকৃত ভক্ত হরিকে উপলব্ধি করেন;—ইহারই নাম "সততযুক্ত" বা "নিত্যযুক্ত" অবস্থা। প্রকৃত ভক্তের মনের ইহাই ভাব। ভক্তিবিহীন ব্যক্তির এই অবস্থা হয় না ও হইতে পারে না, কারণ তাহারা বিমূঢ়, এইজন্য ভগবান্ কহিয়াছেন—"বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি, পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।" ভক্তেরা এইরূপে ভগবান্‌কেই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য স্থির করিয়া, ভগবানেই চিত্ত স্থির করেন, এবং তাঁহারই গুণানুকীর্ত্তন ও মহিমা প্রচারে বিমল আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং, সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পিত না হইলে, কেহ প্রকৃত ভক্ত হইতে পারে না—এবং প্রকৃত ভক্তিরও উৎপত্তি হয় না। এইজন্য অর্জ্জুন ভগবানকে কহিয়াছিলেন "হে পরমেশ্বর! আমি এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে তোমারই শরণাগত হইলাম."

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(১৮ অ ৬২ শ্লোক)

দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিকে এক্ষণে পুনরায় পাঠ করিলে পাঠক মহাশয় দেখিবেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত শ্রীমৎ অর্জ্জুন একটু রহস্যময় কৌশল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অর্জ্জুন স্বয়ং জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্, এবং ইতঃপূর্ব্বে (পূর্ববর্ত্তী অন্যান্য অধ্যায়ে) তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে ভগবানের ন্যায় পূজা করিয়াছেন,—তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছেন "(হে প্রভো! যাঁহারা আপনাকে পূজা করেন, তাঁহারা অধিক

যোগী (অর্থাৎ জ্ঞানী এবং ভক্ত), কি যাঁহারা (সেই নির্গুণ) অব্যক্ত অক্ষরকে (পর-ব্রহ্মকে) উপাসনা করেন—তাঁহারা অধিক ভক্ত ?" এই শ্লোকে অর্জ্জুন যেন শ্রীকৃষ্ণকে নির্গুণ পরব্রহ্ম (পরমাত্মা) হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২।

অর্থাৎ "(হে অর্জ্জুন ! যাঁহারা নিত্যযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমাকে (শ্রীকৃষ্ণরূপকে) উপাসনা করেন, তাঁহারা যোগিশ্রেষ্ঠ"; ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আবার তৃতীয় শ্লোকে কহিতেছেন—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং ॥৩।

"(হে অর্জ্জুন !) যাঁহারা আমার সেই অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপক (সর্ব্বত্র গমনশীল) অচিন্তনীয়, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ অচল ও অব্যয় (নির্গুণ) পরমাত্মরূপকে (নিরাকার ভাবে) প্রকৃষ্টোপাসনা করেন, তাঁহারাও যোগিশ্রেষ্ঠ।" এই উভয় শ্লোকেই ভগবান্ দেখাইলেন, যেমন সাকাররূপ উপাস্য, তেমনি নিরাকার উপাস্য,—কিন্তু উভয় উপাসনাই "প্রকৃষ্ট"ভাবে হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মনোনিবেশসহ (ভক্তি সহিত) করা কর্ত্তব্য, নতুবা ফল নাই। উপরি-উক্ত শ্লোকে, নিরাকার ও সাকার উপাসনার তুল্যতা যেমন প্রমাণিত হইল, তেমনি ইহাও বুঝা গেল যে—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ই অব্যয় পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এস্থলে ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিলেন, এবং পরমাত্মার সহিত অভেদ (একত্ব) প্রতিপাদন করিয়া দিলেন। সুতরাং, প্রকৃত ভক্তিমান্ উপাসক সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেই ভগবানের উপাসনায় সমর্থ। তদনন্তর চতুর্থ শ্লোক এই—

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪।

অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযম করিয়া, সমবুদ্ধি হইয়া সর্ব্বজীবকে স্নেহভাবে যিনি দেখেন এবং সর্ব্বজীবের হিতসাধনে আনন্দিত থাকেন, এবম্প্রকার ব্যক্তি আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়েন।" চতুর্থ শ্লোকে কয়েকটা নিয়ম বা সর্ত্ত আছে। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্ম উপাসকের প্রথম কর্ত্তব্য, ইন্দ্রিয়-সংযম। "সংযম" অর্থে ছেদন বা নাশ বা ত্যাগ নহে, সংযম শব্দের অর্থ নিয়মাধীন অথবা আয়ত্তাধীন করা। সংযমের নাম—শিক্ষা ও অভ্যাস; সংযমের নাম স্বার্থত্যাগ এবং সংযমে অভ্যস্ত হইলে, ধর্ম্মপথের দিকে মানব অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন। যেখানে যথেচ্ছাচার, যেখানে নিয়ম-রাহিত্য, যেখানে নিবৃত্তিমার্গের হীনতা এবং প্রবৃত্তিমার্গের প্রশস্ততা, সেইখানে সংযম নাই এবং সংযম থাকিতে পারে না। সংযমের নাম মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব; ধার্ম্মিকের প্রধান কর্ত্তব্য—ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার না করিয়া, ইন্দ্রিয়-গ্রামকে সংযত করিবার চেষ্টা করা। তাহার পরে কর্ত্তব্য—সমবুদ্ধি হওয়া। সূর্য্যের কিরণসমূহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিকীর্ণ হইলে যেমন তাহাতে প্রবল তেজ বা

জ্যোতি জন্মে না, কিন্তু একই স্থানে সমুদয় কিরণরাশি একত্রিত করিতে পারিলে (concentration) যেমন প্রবল তেজের উৎপত্তির কারণ হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়সমূহের তেজকে যথেচ্ছাচার রূপে বিকীর্ণ হইতে না দিয়া, দেহ মধ্যে সংযত করিয়া রাখিতে পারিলে, এক অপূর্ব্ব শক্তির উদয় হয়। সূর্য্যকিরণসমূহ "আতস" নামক প্রস্তরে অতিশীঘ্র সংযত ও একত্রিত হয়, এইজন্য আতস পাথরে দাহ্য বস্তু রাখিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠে। ইন্দ্রিয়-সমূহের সামর্থ্য একত্রিত হইয়া নিয়মাধীনাবস্থায় অবস্থিত হইলে, দেহের পরিচালক মনের মধ্যে যে অপূর্ব্ব শক্তি (সামর্থ্য) জন্মে, তাহা হইতে will force বা will power জন্মিয়া থাকে; তখন বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, সর্ব্ববিধ জ্ঞানের প্রসূতি স্বরূপ হয়, এবং সকল প্রকার কর্ম্মে সমত্ব (balance) রাখিতে পারে। এই ভাবে কঠিন হইতে কঠিনতর বিষয়েও বুদ্ধি পরাস্ত হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া এই ভাব প্রাপ্ত হইলে, ভক্তেরা সর্ব্বভূতের হিতকামনাই করিয়া থাকেন, অহিতের কল্পনাও করেন না। এবম্প্রকার ভক্ত পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে তন্ময় (বিলীন) হইয়া যান। ভক্তের ইহা অতি উন্নত অবস্থা। কিন্তু কি উপায়ে সহজে এই ভাব উপস্থিত হইতে পারে, ভগবান্ তাহা বুঝাইবার জন্য পঞ্চম শ্লোকে কহিতেছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫।

অর্থাৎ "যাঁহারা (অদর্শনীয়) অব্যক্ত পরমাত্মায় (নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে) চিত্ত-সমর্পণ করিয়া পূজা (উপাসনা) করেন, তাঁহাদের অতি কষ্টে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, (কিন্তু যাঁহারা সাকার রূপে ভগবানকে ধ্যান করেন এবং তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারা সহজে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হইতে পারেন,) কারণ শরীরী মানবের পক্ষে অশরীরী স্বরূপের ধ্যান নিতান্ত কঠিন।" এই শ্লোকে ভক্তের জন্য—ঈশ্বরোপাসকের জন্য—ভগবান্ একটি সহজ উপায়ের বিধান করিয়া দিয়াছেন। এস্থলে নিরাকার-উপাসনা অপেক্ষা সাকার-উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল, তদ্ভিন্ন নিরাকার-উপাসনা অপেক্ষা সাকার উপাসনা যে সহজ ও সুগম তাহাও স্বয়ং শ্রীভগবানের বাক্যে প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু, কি কারণে নিরাকার অপেক্ষা সাকার-উপাসনা অধিকতর প্রশস্ত, তৎসম্বন্ধে এদেশে নানা শ্রেণীর লোকের দ্বারা বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে; এখনও এতদ্বিষয়ে আলোচনা কম হয় না; বাস্তবিক এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার এত কথা আছে, যে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে লিখিতে গেলে, একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। বাস্তবিক সাকার ও নিরাকার এই উভয় প্রকার উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ফল এক, সুতরাং ইহাদের একটি যেমন ফলদায়ী অপরটিও তদ্রূপ সুফল-দায়ক। উপাসকের প্রবৃত্তি অনুসারে যে'টি যাহার অধিকতর সুবিধাজনক হয়, সে'টি তিনি অবাধে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু

সাকার-উপাসনায় যত শীঘ্র সিদ্ধি হয়, নিরাকারে তত শীঘ্র ও সহজে হয় না, ইহা ধ্রুব সত্য। যাঁহারা "নিরাকার উপাসনা"র পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে রূপ-কল্পনা করিতে হয়, তদ্ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই পুনঃ পুনঃ আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা ব্যক্ত না করিয়া, কেবল ভগবানের বাক্যে এই কথা বলিতে পারি যে, নিরাকার বা সাকার যে কোন প্রকার উপাসনাই হউক, ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, প্রকৃত ভক্তি লাভ করিতে না পারিলে কোন প্রকার পূজারই ফল হয় না। এইজন্য ভগবান্ পুনরায় কহিতেছেন –

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥৬।

অর্থাৎ "যাঁহারা ঈশ্বরকে একমাত্র মুখ্য লক্ষ স্থির করিয়া, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ঈশ্বরেই অর্পণ করেন এবং ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, (তাঁহারাই সংসার-সাগর পার হইতে সমর্থ হয়েন)"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ভবানী-স্তবং।

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতঃ)

—•:•:•—

(১)

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

পিতা নাই, মাতা নাই, নাই বন্ধুগণ,
পুত্র নাই, কন্যা নাই, নাই দাতা জন;
ভৃত্য নাই, ভর্ত্তা নাই, ভার্য্যা নাই তার,
বিদ্যা নাই, নাই কোন জীবিকা-উপায়;
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(২)

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরে
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুসংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

মহাদুঃখ পরিপূর্ণ অগাধ অপার
পরম ভীষণ এই ভব-পারাবার।
কামী লোভী মত্ত হ'য়ে প'ড়েছি তথায়,
নিজ-পাপ জালে বদ্ধ;—না দেখি উপায়।
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৩)

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

কিছুমাত্র নাহি জানি কারে বলে দান,
কিছুমাত্র নাহি জানি কারে বলে ধ্যান;
তন্ত্র মন্ত্র স্তুতি মোর কিছু নাই জানা,
নাহি জানি ন্যাস যাগ অথবা অর্চ্চনা;
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৪)

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।

ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-
র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

কিবা পুণ্য, কিবা ধর্ম্ম, তাও জানা নাই,
কিবা মুক্তি, কিবা লয়, বুঝিয়া না পাই ;
কাহারে বা ব্রত বলে, কারে বা ভকতি,
তাহাও বুঝিতে মাগো! না আছে শকতি ;
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৫)

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী পুনঃ কুলাচার-হীন,
কুবুদ্ধি কুদাস পুনঃ কদাচার-লীন ;
কুদৃষ্টি সদাই আছে আমার নয়নে,
কুবাক্য সদাই আছে আমার বদনে ;
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৬)

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যৎ কদাচিৎ শরণ্যে
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

কিবা ব্রহ্মা, কিবা বিষ্ণু, কিবা মহেশ্বর,
কিবা ইন্দ্র, কিবা সূর্য্য, কিবা শশধর ;
কাহাকেও কদাচিৎ নাহি আমি জানি,
তুমিই আশ্রয় মোর,—ইহা সদা মানি ;
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৭)

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

বিবাদে বিষাদে কিংবা প্রবাসে অনলে,
প্রমাদে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে কিংবা জলে,
কিংবা অরণ্যেও যদি পড়ি গো জননি!
উদ্ধার করিও মোরে উদ্ধার-কারিণি!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৮)

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥

পরম অনাথ আমি, পরম নির্ধন,
ব্যাধি ও বার্দ্ধক্য মোরে ধ'রেছে এখন।
জড়তা বদনে মোর, আমি দীন ক্ষীণ,
বিপদে বিপদে মোর কেটে গেল দিন।
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন
উদ্ভটসাগর বিএ ২৬।২ বৃন্দাবন পালের
লেন। শ্যামবাজার, কলিকাতা।

কর্ম্ম ও ফলিত জ্যোতিষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহর্ষি ভৃগু ব'লেন,—কর্ম্মই জীবের সুখ-দুঃখের কারণ। জীব জন্মান্তরীণ কর্ম্মের

ফলভোগের সুবিধানুরূপ দেশ, জাতি, স্থান ও সময় নিরূপণ করিয়া, তদুপযোগী দেহ রচনা পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করে, এবং এই বর্ত্তমান দেহে তত্তৎ কর্ম্মের ফলানুরূপ কীদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, গ্রহ-নক্ষত্র তাহাই বিজ্ঞাপন করে। গ্রহ-নক্ষত্রাদি আমাদের কর্ম্মের সূচীপত্র, এবং আমরাই আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা।

এই গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে আমাদের কর্ম্ম ও অদৃষ্টের 'পরিচায়ক' না বলিয়া, 'পরিচালক' বলায় ফলিত জ্যোতিষের প্রতি সাধারণের এত অশ্রদ্ধা। *

মহর্ষি ভৃগু পাঁচটী গ্রহের সহিত পঞ্চমহাভূতের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন এবং এক এক গ্রহকে এক এক তত্ত্বের অধিপতি (Lord) রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—মঙ্গল গ্রহ অগ্নিতত্ত্বের, বুধ পৃথ্বীতত্ত্বের, বৃহস্পতি আকাশতত্ত্বের, শুক্র জলতত্ত্বের এবং শনিগ্রহ বায়ুতত্ত্বের অধিপতি বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

অন্যান্য জ্যোতিষগ্রন্থেও উল্লিখিত সম্বন্ধ-স্থাপন দেখিতে পাওয়া যায়।

* "The lucky or unlucky star under which a man is born is nothing but the Karmic Stamina and affinities which bring about his birth in a particular locality, in a particular nation or in a particular family. This is the secret of astrology an occult science which very few comprehend at the present day.

(Pauses vol II Page 75)

"শিখিভূখপয়োমরুদ্‌গণানাং অধিপা ভূমিসুতাদয়ঃ ক্রমেণ।" (বরাহ-সংহিতা)

অর্থাৎ শিখি (অগ্নি), ভূ (পৃথিবী), খ (আকাশ) পয় (জল) মরুৎ (বায়ু) ইহাদের অধিপতি যথাক্রমে ভূমিসুত- (মঙ্গল) ইত্যাদি গ্রহগণ।

আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থ যেমন একদিকে আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন, অন্যদিকে আমাদের দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ "পঞ্চীকরণ" প্রণালীতে আবির্ভূত হইয়াছে। আমাদের অস্থি-মাংস—ক্ষুধ-তৃষ্ণা—নিদ্রা-ক্লান্তি ইত্যাদি—এমন কি আমাদের মন, বুদ্ধি ও প্রাণাদি উক্ত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারাই হউক, অথবা চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারাই হউক, যেরূপ কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিনা কেন, অথবা মনে মনে যেরূপ চিন্তাই করিনা কেন, তাহা কোন না কোন তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। মহর্ষি ভৃগু পূর্ব্বোক্তরূপে গ্রহের সহিত তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, যে কর্ম্ম যে তত্ত্বান্তর্গত সেই কর্ম্মের ফল সেই তত্ত্বাধিপতি গ্রহ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়, তাহাই উপদেশ দিয়াছেন।

মনে কর,—রাম অগ্নিসংযোগে কাহারও গৃহদাহ করিয়াছে। এই কর্ম্ম অগ্নিতত্ত্বান্তর্গত। এই কর্ম্মের ফল রামকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু সেই ফল কি প্রকারে এবং কতকাল ভোগ করিতে হইবে, তাহা মঙ্গলগ্রহ কর্ত্তৃক নিরূপিত

হইয়া থাকে। কারণ মঙ্গলগ্রহ অগ্নি-তত্ত্বের অধিপতি। সুতরাং জাতক-কোষ্ঠী প্রকৃষ্টরূপে লিখিত হইলে, জাতকের সুখ-দুঃখ, সম্বাদ—বিষাদ ইত্যাদি যথাযথরূপে অবগত হইতে পারা যায়।

যে কর্ম্ম যে তত্ত্বান্তর্গত, সেই কর্ম্মের ফল ঠিক্ সেই তত্ত্বের অধিপতি গ্রহ কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়। মনে কর, রাম গৃহদাহ করিতে যাইয়া কাহারও বা শোণিতপাত করিয়াছে। গৃহদাহ ও শোণিতপাত কর্ম্মের ফল যথাক্রমে মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। কারণ শোণিত জলতত্ত্বের অন্তর্গত—শুক্রগ্রহ জলতত্ত্বের অধিপতি। অতএব গৃহদাহন ও শোণিত-পাত-কর্ম্মের ফল যথাক্রমে মঙ্গল ও শুক্রগ্রহ ভিন্ন অপর কোন গ্রহ কর্ত্তৃক জানিতে পারা যায় না। রাম যদি কোন প্রকার বিষ বা দূষিত পদার্থ সংযোগে স্থানবিশেষের বাতাস কলুষিত করিয়া, কাহারও প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে, তবে তাহার ফলস্বরূপ পরজন্মে জন্মপত্রিকায় বায়ু বা ফুস্‌ফুস্‌ সম্বন্ধীয় পীড়ার ভোগ উল্লিখিত হইবে, এবং সেই ফল শনিগ্রহের উদয়ে সূচিত হইবে। কারণ এই কর্ম্ম বায়ুতত্ত্বান্তর্গত এবং শনিগ্রহ বায়ুতত্ত্বের অধিপতি।

অপিচ প্রত্যেক তত্ত্বান্তর্গত কর্ম্মেরই প্রকৃতি অনুসারে শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অগ্নি-ক্রিয়া অগ্নিতত্ত্বান্তর্গত, অগ্নিক্রিয়া দ্বারা অনেক কুকর্ম্ম হইতে পারে, অনেক সুকর্ম্মও হইতে পারে। গৃহ-দাহ করিয়া শত সহস্রের সর্ব্বনাশ করিতে পারা যায়, আবার আলোক-দানে অনেক পথভ্রান্ত পথিকের প্রাণরক্ষাও করিতে পারা যায়। কুকর্ম্ম কর্ত্তৃক অভিমানী, অবিশ্বাসী ও বিকলাঙ্গ হইবে; সুকর্ম্ম দ্বারা শৌর্য্য, বীর্য্য ও স্বাধীনতা লাভ করিবে। তজ্জন্য পুরা-কালে হোমযজ্ঞাদি—এত আদরণীয় ছিল।

জলদানে তৃষ্ণাতুরের প্রাণরক্ষা হইতে পারে, আবার জলে ডুবাইয়া কাহারও প্রাণ নাশ করা যাইতে পারে। জলতত্ত্বান্তর্গত শুভকর্ম্ম দ্বারা শান্তি ও ধীরতা লাভ হয়, আর কুকর্ম্মের ফলে কর্ত্তা মূর্খ ও মদ্যপায়ী হইয়া থাকে। এই শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা, গ্রহের অনুকূল ও প্রতিকূল গতি—অথবা গ্রহের "সুদৃষ্টি ও কুদৃষ্টি" অভিহিত হইয়া থাকে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে, প্রত্যেক গ্রহেরই অনুকূল ও প্রতিকূল গতি সবিশেষ বর্ণিত আছে, এবং কোন কর্ম্মের কি ফল বা পরিণাম, তাহাও পুরাণ ও সংহিতাদিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

জগৎপাতার বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমাদের এই পরিদৃশ্যমান অবনীমণ্ডল একটী বালুকাকণাপেক্ষাও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান কর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত নভো-মণ্ডলস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদি যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের পরিমাণ, অবস্থান, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও দূরত্ব ইত্যাদি আলো-চনা করিলে, শরীর রোমাঞ্চিত ও জগৎ-পাতার অপার মহিমা ও অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া, পুলকিত ও আত্মহারা হইতে হয়। এই ভূমণ্ডল একটী প্রচণ্ড-দীপ্তিশালী নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের

নাম সূর্য্য। আর যাহারা তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাদের নাম গ্রহ (Planet)। ইহারা সূর্য্য বা অন্যান্য নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তিমান্ নহে। ইহারা অনুজ্জ্বল ও প্রভাহীন। ইহারা সূর্য্যের জ্যোতি গ্রহণ করিয়া দেদীপ্যমান হয়। এই গ্রহাদি ও সূর্য্য লইয়াই আমাদের এই সৌরজগৎ। জগৎস্রষ্টার বিশাল জগতে এইরূপ কত যে সৌরজগৎ আছে, তাহা কে বলিতে পারে? হয়তঃ আমরা যে নক্ষত্রটীকে অতীব ক্ষুদ্র ও প্রভাহীন দেখিতেছি, তাহাই অপর একটী সৌরজগতের সূর্য্য। যাহাহউক্ আমাদের এই পৃথিবীটী অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাই—আমাদের আবাস ভূমি, ইহাই আমাদের সুখদুঃখ হর্ষ-বিষাদ ও সম্পদ্ বিপদের স্থল—এইখানেই আমাদিগকে থাকিতে হইবে, ইহাই আমাদের কুরুক্ষেত্র।

এই পৃথিবী যেমন একটী গ্রহ, তেমনি আরও পাঁচটী গ্রহ আছে। যথা, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। এই গ্রহাদি যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে, চন্দ্র সেইরূপ এই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। সুতরাং চন্দ্র নক্ষত্র নহে। গ্রহও নহে। একটী উপগ্রহ মাত্র। ইংরেজীতে ইহাকে moon বা Satellite কহে। ইহাকে সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ দেখায় বটে, কিন্তু ইহা সূর্য্যাপেক্ষা এতাদৃশ ক্ষুদ্র যে—তাহার সহিত তুলনাই হইতে পারে না। তিন লক্ষ পৃথিবী একত্রিত করিলে, আয়তনে সূর্য্যের সদৃশ হইতে পারে, এবং ৪৯টী চন্দ্র একত্রিত করিলে পৃথিবীর সমান হইতে পারে। চন্দ্র পৃথিবীর অতি নিকট বলিয়া, এতাদৃশ ক্ষুদ্র হইলেও বৃহৎ বলিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান কর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই পৃথিবীর একটী, বৃহস্পতির চারিটী, শনির আটটী, উরনশের চারিটি এবং নেপচুনের একটী চন্দ্র (উপগ্রহ) জানিতে পারা গিয়াছে।

প্রতীচ্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবীকে লইয়া আটটী গ্রহ (Planet) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

১। Mars (মঙ্গল)
২। Mercury (বুধ)
৩। Jupiter (বৃহস্পতি)
৪। Venus (শুক্র)
৫। Saturn (শনি)
৬। Earth (পৃথিবী)
৭। Uranus (উরনশ বা ওরনশ)
৮। Neptune (নেপচুন)

শেষোক্ত গ্রহদ্বয়কে (ওরনশ ও নেপচুনকে) আর্য্য জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ কি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে মিথুনরাশিচক্রে সার উইলিয়ম হর্শেল্ (Sir Walliam Harschel) উরনশ গ্রহ আবিষ্কার করেন। তজ্জন্য এই গ্রহের অপর নাম হর্শেল। ইহা সূর্য্য হইতে ১,৮২২০০০,০০০ মাইল দূরবর্ত্তী এবং ইহার বার্ষিক গতি আমাদের ৮৪ বৎসর পাঁচ মাস ছয় ঘণ্টা ও ৫২ মিনিট। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ১৭০ কোটী মাইল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা লে ভেরিয়ার (Le Verrier) এবং প্রোফেসর এডামস্ (Prof. Adams) নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লল্যাণ্ড (Lalande) সাহেব এই গ্রহ প্রথম পরিদর্শন করেন বটে, কিন্তু উহা গ্রহ কি না, তাহা তিনি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। ইহার দূরত্ব সূর্য্য হইতে ২৭৮০,০০০,০০০, মাইল। ইহার ব্যাস ৩৫০০০ মাইল এবং বার্ষিক গতি আমাদের ১৬৫ বৎসর। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ২৬০ কোটী মাইল।

আজ কাল কেহ "ওরনশ"কে কেহবা "নেচুপ্ন"কে বেদোক্ত বরুণের নামান্তর অনুমান করেন ; কিন্তু এই অনুমান গ্রহণীয় হইলে, সম্ভবতঃ "ওরনশ"ই বরুণ বলিয়া অনুমিত হয়। "অন্তস্থ ব" এর উচ্চারণ আর "ও"র উচ্চারণ প্রায় একই প্রকার। যাহাহউক্ আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই গ্রহ-দ্বয়ের সহিত মানবের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র, উল্লিখিত পঞ্চগ্রহ এবং রাহু-কেতুর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়াছেন। আমরা তাহা ক্রমশঃ আলোচনা করিব। আর্য্য দর্শনাদিতে সূর্য্য ও চন্দ্রকে যথাক্রমে আত্মা ও মনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এমন কি, জ্যোতিষেও "কালাত্মা দিনকৃৎ মনস্তু হিমগুঃ" অর্থাৎ আত্মাকে দিনকর ও মনকে চন্দ্র কহিয়াছেন। আর রাহু বা কেতু প্রকৃতপক্ষে গ্রহ নহে, উপগ্রহ নহে—নক্ষত্রও নহে। তাহারা চন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষের সংমিলন স্থান। ইংরেজীতে ইহাকে "Nodes" কহে। *যেস্থানে উভয়-কক্ষের সংমিলন হয় সেই অয়নান্তবৃত্তের উত্তরাংশকে রাহু (ascending nodes) এবং দক্ষিণাংশকে (descending nodes) কেতু কহে * এই Ascending nodes এবং descending nodes কে যথাক্রমে Head and tail of a dragon কহিয়াও থাকে। আমরাও সাধারণতঃ রাহুকে "রাহুর মস্তক" ও পুচ্ছভাগকে "কেতু" কহিয়া থাকি জ্যোতিষে এই উভয়েরই ফল এক প্রকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

শক্তি-সমবায়।

বা

চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত।

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

—০:০:০—

মহর্ষি মেধস্ প্রথমচরিতে বলিয়াছেন—
"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদম্ ততং।
তথাপি তৎসমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাম্ মম।"

* "The two points in which the moon's orbit or the orbit of any other celestial body, intersects the earth's orbit are called the Nodes. The line joining these two points is called the Line of nodes. The node at which the body passes to the north of the ecliptic is called the Ascending node, the other the descending node" (Astronomy by J. Norman Lockeyer, Page 90)

[যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছি, তিনি নিত্যা, জগন্মূর্ত্তি, তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, তথাপি তাঁহার বহুবিধ উৎপত্তি আমার নিকট শ্রবণ কর।] এই কথা বলিয়া, যে উপায়ে তিনি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা শেষোক্ত উপায়ে। তাহা যে কি সরল, অনায়াসবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী, তাহা আমরা প্রথমচরিতে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয়-চরিতে "শক্রাদয়ঃসুরগণাঃ" ইত্যাদি স্তবে মহাদেবী মহামায়ার পরব্রহ্মত্ব সেইরূপে ও সেই উপায়েই নির্দ্দাচিত হইয়াছে। একে একে প্রধান প্রধান স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, সেই সেই স্থানে শক্তির ক্রিয়ানির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, পুনশ্চ সেই শক্তিসমূহের সমষ্টিভাবই মহামায়া ও পরব্রহ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দেব্যা যয়া ততমিদম্ জগদাত্মশক্ত্যা।
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা॥
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাম্।
ভক্ত্যা নতাস্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥

ইহাই স্তবের সূচনা।

[যে দেবী আত্মশক্তিতে এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন; যাঁহার মূর্ত্তি সমগ্র দেবগণের শক্তির সমষ্টি বা সমবায়; সেই অম্বিকা দেব ও মহর্ষিগণের পূজ্যা; ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করি, তিনি আমাদের শুভ-বিধান করুন।] পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহারই পুনরুক্তি মাত্র রহিয়াছে। দেবগণের "শক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।" বলিবার উদ্দেশ্য—ইহা নয় যে, তাঁহাতে অসুর-শক্তি নাই, কারণ তাহা হইলে পূর্ণত্বে দোষ হয়। ইহার অর্থ এই যে, অসুর বা বিঘ্নকারিণী শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া,সংযত বা নিয়োজিত করিয়া, দেদীপ্যমান দেবশক্তি—সংরক্ষণকারিণী বা মঙ্গল-বিধায়িনী শক্তির সমবায় প্রাধান্যপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা লক্ষ্যভূত নহে বলিয়া, সম্যক্ অনুভূত দেব-শক্তিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর, মহাশক্তিকে অম্বিকা বা জগজ্জননী বা জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং তিনি সাধকের মনোরথ পূর্ণ করেন, তাহাও বলা হইয়াছে। অর্থাৎ—অংশশক্তির স্তব করা হইতেছে না। সর্ব্বদর্শী দেবগণ ও তত্ত্বদর্শী ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ যাঁহার পূজা করেন, তাঁহারই স্তব করা হইতেছে।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাঁহার প্রভাব বর্ণন করিতে অক্ষম। তিনি সুকৃতিগণের গৃহে শ্রী বা লক্ষ্মীরূপা, পাপাত্মার নিকট তিনিই অলক্ষ্মীরূপে প্রতীয়মানা; কৃতবিদ্যগণের হৃদয়ে বুদ্ধি, সজ্জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও কুলজনের লজ্জা রূপে প্রতীয়মানা। তাঁহার রূপ অচিন্ত্য, অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা সেরূপ হৃদয়ে ধারণা করা যায় না। তাঁহার বল-বিক্রমের ত কথাই নাই; তিনিই সমস্ত জগতের হেতু; প্রকৃতিগত দোষের জন্যই তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় না। হরি-হর-প্রভৃতি শক্তি-সমুচ্চয়গুলির একটা সীমা আছে, কিন্তু ইঁহার সীমা নাই, সুতরাং তিনি হরিহরাদিরও দুর্ব্বিজ্ঞেয়া। যাহা জগৎপদবাচ্য,তাহা তাঁহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। তিনি অব্যাকৃতা পরমা প্রকৃতি।

তিনি স্বাহারূপিণী তেজঃশক্তি; তিনি স্বধারূপিণী পিতৃপানশক্তি; অর্থাৎ যে শক্তি প্রবাহরূপে সৃষ্টির নিত্যত্ব নিষ্পাদন করিতেছে তিনিই সেই শক্তি। সেই মহামায়া জীবকে সংসারে মায়াপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আবার তিনিই সেই বন্ধনের মুক্তিহেতু। সাধকগণ এই সংসার-পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য, ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্ব-প্রযত্নে ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া, যোগাভ্যাসে যে পরমা বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তিনিই সেই মহাবিদ্যা। ঋক্, সাম ও যজুঃ—বেদ-ত্রয় যে শব্দব্রহ্মশক্তির প্রচার করিতেছেন, সে শব্দব্রহ্মশক্তিও তিনি। জগতের জীবিকা তিনি, তিনিই সর্ব্বজীবের সকল কষ্ট দূর করেন। যে মেধাশক্তির বলে অখিল শাস্ত্রের সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, সে মেধাশক্তিও তিনি। দুর্গম ভবসাগরের নৌকাস্বরূপ দুর্গা তিনি। কৈটভহারী ভগবান্ বিষ্ণুর হৃদয়বাসিনী লক্ষ্মীও তিনি, আর ভগবান্ শশিমৌলির অর্দ্ধাঙ্গপ্রতি-ষ্ঠিতা গৌরীও তিনি।

এতাবৎ স্তবের সারাংশ যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা প্রথমচরিতে ব্রহ্মকথিত কথা-গুলির পুনরুক্তি মাত্র। "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা" ইত্যাদি শ্লোকগুলির দ্বারা ব্রহ্মা দেবীর এই সকল গুণোচ্চয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে শক্তির আধার অর্থাৎ শক্তিমানের উল্লেখ আছে।

তাহার পর দেবগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—মহিষাসুর দেবীর মুখ দেখিয়া কি করিয়া অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইল! মায়ের মুখ ঈষৎ হাস্যযুক্ত নির্ম্মল-পরিপূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোহর ও কোমল, কষিত কাঞ্চনের ন্যায় মনোহর বর্ণ-বিশিষ্ট; এ মুখ দেখিয়া হৃদয়ে কি ক্রোধের আবেশ হওয়া সম্ভব? কিন্তু দেবগণ ভাবিলেন না, মায়ের এ মনোহর মুখচ্ছবি দেবগণই দেখিয়া-ছেন। তাঁহাদেরই হৃদয়ে আশাভরসা ও আনন্দধারা বর্ষণ করিবার জন্যই মায়ের এই মনোহারিণী মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে। মহিষাসুর মায়ের অন্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিল। মহিষ মায়ের উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি দেখিয়াছে। মায়ের মুখ-মণ্ডল কুপিত-ভ্রুকুটীকরাল! সে মুখ দেখিয়া মহিষ কি রূপে বাঁচিয়া রহিল? সাক্ষাৎ কৃতান্তকে দেখিয়া কে বাঁচিয়া থাকে? একই মূর্ত্তিতে যুগপৎ কঠোর-মধুরের সমা-বেশ! দেবগণ তাহা দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছেন, আর সেই মূর্ত্তিতে মহিষ ভীষণ রৌদ্রভাব দেখিতেছে।

অতঃপর দেবীর কৃপার কথা কহিয়া, দেবীভক্তের সুখ সাচ্ছন্দ্য ও প্রতাপের কথা বলিয়া, দেবগণ—দেবীর শত্রুসংহারের প্রয়ো-জন কি, এবং যিনি দৃষ্টিপাতমাত্র তাহাদের ভস্মসাৎ করিতে পারেন, তিনি যুদ্ধই বা করিলেন কেন, এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ইহারা জগতের অহিতসাধন করিতেছে, ইহাদের নাশ করিলে জগতে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। ইহারা সৃষ্টির অহিতসাধন করিয়া যে পাপ করিয়াছে, তাহার শাস্তিস্বরূপ তাহাদের নরকপ্রাপ্তি বৈধ ব্যবস্থা, কিন্তু সম্মুখসমরে দেবীর হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া, তাহারা পরমানন্দে স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করুক, এই করুণার বশবর্ত্তিনী হইয়া দেবী অসুরনাশে অস্ত্র ধারণ করেন।

দৃষ্টিপাতে তাহাদের ভস্ম না করিয়া যে তাহাদের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই উদ্দেশ্য ছিল, যে—অস্ত্রপূত হইয়া, অসুরেরা আসুরিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যলোক প্রাপ্ত হউক। মূল কথা এই যে, যে অহিতকারিণী শক্তি "অসুর" নামে অভিহিত, তাহা যতক্ষণ শক্ত্যাধারে নিয়মিত থাকে, ততক্ষণ অহিতসাধন করিতে পারে না, আধারচ্যুত হইয়া অবাধ-গতি হইলেই তাহা অনর্থসংঘটন করিয়া থাকে। আধারে ব. স্বস্বরূপে তাহাকে প্রত্যাকর্ষণ করাই এই যুদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর, ভস্মকরা ত' একেবারে বিলুপ্ত করা, তাহা অসম্ভব; সুতরাং পুনরায় তাহাদের পরব্রহ্মে লীন হওয়াই অসুরত্ব-পরিহারব্যাপার। অসুরগণের দেবীর সহিত সংগ্রাম এক সাধনাবিশেষ; ইহাকে শত্রু-ভাবে বীরসাধন কহে। শত্রু যেমন শত্রুর সমগ্র দোষগুণ বিচার করে এবং তাহার বিষয়ে সমস্ত সংবাদ লইয়া, তদ্বিষয়ক জ্ঞান নির্দ্দোষ করিয়া রাখে, মিত্র তেমন পারে না। মিত্র প্রায়ই অন্ধ হইয়া মিত্রকে দেখে; মিত্র মিত্রের এক অংশ মাত্র দেখে, অপরাংশ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই শত্রুভাবে সাধনে সাধক তমোগুণের চরমে উপস্থিত হইয়া, রজোগুণকে অতিক্রম করিয়া, একেবারে সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইয়া, নির্ব্বাণ লাভ করে। রাবণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর সাধক। ব্যবহারিক জগতেও ঠিক তাহাই ঘটে। বিজয়িনী শক্তি সত্ত্বভাব-বিশিষ্টা হইলে, তাহা, বিজিতের সংযমন করে, কিন্তু তাহার সাংঘাতিক অনিষ্ট-সাধন করে না, বরঞ্চ বিজয়ের পর তাহার সবিশেষ মঙ্গল-সাধনই করিয়া থাকে।

তাহার পর দেবগণ বলিতেছেন—দেবী-হস্তস্থিত খড়্গপ্রভা ও শূলাগ্রকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া অসুরের নয়ন অন্ধ হইয়া গেল না কেন? যে মুখ দেখিলে অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হাঁটিয়া যায়, বোবা গীত গায়, বধির শুনে, যে মুখমণ্ডল দর্শনে জীব পরম-নিঃশ্রেয়স লাভ করে, যোগীগণ কঠোর তপস্যায় যে মুখ দেখিতে সক্ষম হন, অনায়াসে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া, অসুরগণও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাই তাহারা অন্ধ হইয়া যায় নাই।

পুনশ্চ দেবগণ দেবীর রূপপ্রভাব ও দুর্বৃত্তদমনকারি শীলের কথা বলিয়া,দেবীতে মধুরকঠোরের সমাবেশের বর্ণনা করিতেছেন। যাহারা দেবশত্রু, তাহাদের উপরও মায়ের কত দয়া! মায়ের হৃদয়ে যুগপৎ কৃপা ও সমরনিষ্ঠুরতা বিদ্যমান। তৎপরে দেবগণ নানা প্রকার প্রার্থনা করিয়া স্তব-সমাপ্তি করিয়াছেন। তাঁহারা দেবীর নিকট এই বর প্রাপ্ত হয়েন যে—যখনই তাঁহাদের দানবোত্থ আপদ্ উপস্থিত হইবে, দেবী তাহার প্রতিকার করিবেন। আর, যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করিয়া দেবীকে তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহার ধনধান্য পুত্রকলত্রাদি ঐহিক সুখের চূড়ান্ত হইবে।

দেবী অন্তর্হিতা হইলে, দেবগণ স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিলেন।

প্রতি বৎসর বাঙ্গালায় শরৎকালে ও বসন্তকালে দেবীর যে মূর্ত্তির পূজা হয়, তাহা উক্ত মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ রূপান্তর

মাত্র। তন্ত্রাচার্য্য সেন পতিত বঙ্গের পুনরুদ্ধারের জন্যই এই পূজার প্রচলন করেন। এই মূর্ত্তির পূজা বীরত্বের উদ্দীপক; বিচ্ছিন্নকে পরমসংহত ও একতাসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ করিবার জন্যই এই মূর্ত্তির পূজা। আধ্যাত্মিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ্য, সে উদ্দেশ্য দূর হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে! ইহার সহিত কত কথা, কত গল্প আসিয়া জড়িত হইয়াছে! সুতরাং, তন্ত্রাচার্য্যের সুমহদুদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

উপদেশ-শতকম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিদ্যাং কচোবুভূৎসুঃ শুক্রাৎ সংজীবিনীং বিনীতাত্মা।
সুরপক্ষগোঽপি লেভে বিনয়াৎ সংসাধয়েৎ কার্য্যম্ ॥৮৮॥ (৫)

দ্রোণে সখ ইতি বাদিনি নারথিরথিনোঃ সখিত্বমিত্যাহ।
দ্রুপদো বিধুয় সখ্যং নৃপং ন মিত্রং বিজানীয়াৎ ॥৮৯॥

বিনীত কচ অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য হইতে সঞ্জীবিনী বিদ্যা জানিতে যাইয়া, যদিও তিনি সুরপক্ষীয় ছিলেন—তথাপি ঐ বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন; বিনয়ে কার্য্য সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য।৮৮॥

দ্রোণ, "সখে!" এই কথা কহিলে, দ্রুপদরাজা দ্রোণের সহিত সখ্য পরিত্যাগ করিয়া "অরথীর সহিত রথীর সখ্য কর্ত্তব্য নহে" এই কথা কহিয়াছিলেন; রাজাকে মিত্র বলিয়া জানিবে না।৮৯॥

অপি শক্তঃ পরিহর্ত্তুং যযাতিশাপং হরির্হতে কংসে।
রাজাসনং ন ভেজে পুরাতনীং পালয়েৎ সংস্থাম্ ॥৯০॥ (৬)

বিমুখোঽভূৎ সদ্গদার্ত্তঃ প্রদ্যুম্নো ধিক্কৃতো রণে হরিণা।
পরিভবমাপ মহান্তং ন ভবেদ্ বিমুখো রণাদ্ বীরঃ ॥৯১॥ (৭)

একাগ্রতাং স্বকর্ম্মণি দত্তাত্রেয়ঃ প্রশস্য শরকর্ত্তুঃ।
সমশিক্ষতাত্মযোগং নীচাদপি সদ্গুণো গ্রাহ্যঃ ॥৯২॥

যদুবংশ রাজ্য পাইবে না—বলিয়া যযাতি শাপ দিয়াছিলেন। কংস হত হইলে শ্রীকৃষ্ণ যযাতির শাপকে দূরীকরণ করিতে সক্ষম হইয়াও নিজে রাজাসন গ্রহণ করেন নাই। (কারণ তিনি উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করিয়াছিলেন;) পুরাতন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।৯০॥

প্রদ্যুম্ন দ্যুমত্রের (শাল্বরাজার সখা) গদার দ্বারা পীড়িত ও বিমুখ হইয়া যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধিক্কারপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত পরাভূত হইয়াছিলেন; বীরব্যক্তি যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইবেন না।।৯১॥

দত্তাত্রেয়, শরনির্ম্মাতার স্বীয়কার্য্যে একাগ্রতা দর্শনে প্রশংসা করিয়া আত্মযোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন; নীচব্যক্তি হইতে সদ্গুণ গ্রহণ করিবে।৯২॥

(৫) আদিপর্ব্বণি ৭৬ অধ্যায়ে

(৬) দশম স্কন্ধে ৪৫ অধ্যায়ে।

(৭) ঐ—৭৬

অপি বঞ্চয়ন্ বিরিঞ্চিঃ কৃষ্ণং বৎসান্ বৎসপান্ হৃত্বা।
স্বয়মেব বঞ্চিতোঽভূন্মায়াবিষু নাচরেন্মায়াম্ ॥৯৩॥

মৃগয়ারতঃ প্রসেনো বিঘটিতসেনোঽটবীমটন্নেকঃ।
কেসরিণা বিনিজয়ে নৈকাকী সঞ্চরেদ্ বিপিনম্ ॥৯৪॥

শিবলিঙ্গান্তমলব্ধং লব্ধং বিধিনেতি কামধুক্ প্রাহ।
অথ নিন্দ্যশাপ শাপং ন বিদধ্যাৎ কূট-সাক্ষিত্বম্ ॥৯৫॥

পুত্রেণ সব্যসাচী পরাজিতো বভ্রুবাহনেনাজৌ।
তুষ্যন্ হৃদি ন ললজ্জে পরাজয়ং পুত্রতোঽন্বিচ্ছেৎ ॥৯৬।

ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণকে বঞ্চনা করিয়া, বৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়া স্বয়ং বঞ্চিত হইয়াছিলেন; মায়াবী-জনে মায়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ৯৩॥

মৃগয়ারত প্রসেন,সেনাভ্রষ্ট হইয়া একাকী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে ২ সিংহ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন; একাকী ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। ৯৪॥

কামধেনু কহিয়াছিলেন যে—"শিবলিঙ্গের শেষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিন্তু ব্রহ্মা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"; এরূপ বলায় তিনি নিন্দ্যশাপ প্রাপ্ত হয়েন, তজ্জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। ৯৫॥

অর্জ্জুন যুদ্ধে স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, হৃদয়ে লজ্জা প্রাপ্ত হয়েন নাই; পুত্র হইতে পরাজয় ইচ্ছা করিবে। [সর্ব্বতোজয়মিচ্ছেৎ তু পুত্রাদেকাৎ পরাজয়ম্] ৯৬॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে

চিরসঙ্গতায় কুন্তী কৃষ্ণায় ক্লেশিতা কুরুক্ষেত্রে।
ব্যসনং স্বমাহ সর্ব্বং সুহৃদে বিনিবেদয়েদ্দুঃখম্ ॥৯৭॥

পাঞ্চালীগজরাজৌ হরিণা দুঃশাসনাবহারাভ্যাম্।
ত্রাতৌ ক্ষণাৎ প্রপন্নৌ হরিং ভয়ার্ত্তঃ প্রপদ্যেত ॥৯৮॥

দৈবাদ্বনোপলব্ধাং যযাতিরব্রাহ্মণোঽপি গতশঙ্কম্।
শুক্রসুতামুপযেমে বিধিপ্রণীতে প্রবর্ত্তেত ॥৯৯॥

অসুরো হিতমুপদিষ্টঃ প্রহ্লাদো নারদেন গর্ভস্থঃ।
তত্ত্ববিদুষাং বরোঽভূদ্ধিতোপদেশং সদা শৃণুয়াৎ ॥১০০॥

স্ফুটমার্য্যাশতগদিতান্ পৃথক্ প্রমাণীকৃতামুদাহরণৈঃ।
শতমেতানুপদেশান্ বিভাবয়ন্ ভাবয়েৎ সিদ্ধিম্ ॥১০১॥

ক্লেশপ্রাপ্তা কুন্তী চিরকালের সুহৃৎ কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে নিজের সমুদয় দুঃখ কহিয়াছিলেন; বন্ধুকে দুঃখ বলা কর্ত্তব্য।৯৭॥

প্রপন্ন দ্রৌপদী ও গজরাজ, দুঃশাসন ও কুম্ভীর হইতে হরি দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিলেন; ভয়ার্ত্ত ব্যক্তির হরির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ৯৮॥

যযাতি ব্রাহ্মণ না হইলেও নিঃশঙ্কচিত্তে দৈবকর্ত্তৃক বনে প্রাপ্ত শুক্রচার্য্যকন্যা দেবযানিকে বিবাহ করিয়াছিলেন; বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য। ৯৯॥

গর্ভস্থ অসুর প্রহ্লাদ নারদ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন; সর্ব্বদা হিতোপদেশ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য॥১০০॥

পৃথক প্রমাণীকৃত উদাহরণ দ্বারা আর্য্যা-

কুতূকায় কোবিদানাং মূঢ়মতীনাং মহোপকারায়।
নিরমাৎ কবিগুমানিঃ শতোপদেশ-প্রবন্ধমমুং ॥১০২॥

উপদেশশতকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীবিধুভূষণ দেব। (শাস্ত্রী)

শূন্যবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—০:০:০—

ধর্ম্মধাতু ও তথতা বা ভূততথতা অর্থে সাধারণ বৌদ্ধেরা যাহা বুঝেন, আর্য শাস্ত্রের দিক্ হইতে ঠিক্ তাহা সম্যক্ বিবেক নহে। আর্য দার্শনিকেরা উহাকে বিবেক করিয়া, চিৎ ও অব্যক্ত নামে দুই মূল পদার্থ নিশ্চয় করেন। ধর্ম্মধাতু অর্থে—ধর্ম্ম বা যাবতীয় প্রতীত্য পদার্থের ধাতু বা চরম অবস্থা। তথতা বা ভূততথতা অর্থেও তাহাই বুঝায়। এই বিক্রিয়মাণ চিত্তের মূলে যে বৃত্তিশূন্য অবিকার, সৎস্বরূপ, শুদ্ধ সদাই একরূপ, মূল ভাব আছে, তাহাই ভূততথতা *। অবশ্য সদাই একরূপ, শুদ্ধ, Unchanging পদার্থ—কোন কারণান্তর ব্যতিরেকে Phenomena বা পরিণাম-বৃত্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ বলিয়া কল্পিতও হইতে পারে না। তজ্জন্য চিৎ ও অব্যক্তের দ্বারাই উহা সুসঙ্গত হইতে পারে।

ফল কথা, বৌদ্ধদের আদর্শ ও ধর্ম্মনীতি যেমন অতুলনীয়, তাহাদের দর্শন তেমন নহে। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে বলেন—

"Instead of the terse, precise, concise, highly condensed, language of the Brahmanic writers, he has adopted a loose, periphrastic, prolix style, loaded with repetitions and insufferably tedious and verbose throughout. Precision should be the first element of an essay on philosophy and this respect our Indian sages afford the most notable examples, but we

---

বৃত্তির (ছন্দের) একশত উপদেশ কথিত হইল, ইহা চিন্তা করিয়া সিদ্ধি ভাবনা করিবে।১০১॥

জ্ঞানীদিগের আনন্দজন্য ও মূঢ়মতিদিগের মহোপকারজন্য, গুমানিকবি এই শতোপদেশ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন॥১০২॥

* Underlying the Phenomena of mind there is an unchanging principle which we call the essence of mind. The fire caused by fagots dies when the fagots are gone, but the essence of fire is never destroyed.

The essence of mind is the entity without ideas and without phenomena and it is always the same. It pervades all things and is pure and unchaging. It is not untrue nor changable, so it is also called Bhutatathata.

Outline of the Doctrine of the Mahayana Buddhists of Japan.

meet with no traces of them here (*i. e.* Buddhist philosophy).

এ কথা সর্ব্বথা সত্য। কাহারও মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে বুদ্ধদেব যদি পারদর্শী, সমাধিসিদ্ধ পুরুষ হন, তবে বৌদ্ধ-দর্শন দোষদুষ্ট হইল কেন? ইহার কয়েকটি সঙ্গত কারণ আছে যথা—

(১ম) বুদ্ধদেব যে আন্বীক্ষিকী বা metaphysics সম্বন্ধে কোন উপদেশ করিতেন না,—তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। ইহার বিশেষ কারণ আছে। যাহারা সমাধিসিদ্ধ পুরুষ, তাঁহাদের চিত্ত অধিকাংশ সময়ই চিন্তাশূন্য, সুতরাং বাক্যশূন্য * থাকে, তজ্জন্য তাঁহারা শব্দজালময় আন্বীক্ষিকীর পক্ষপাতী হন না। বিশেষত তাঁহারা পরমার্থলাভের সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ হওয়াতে, লোককে পরমার্থ নিশ্চয় করাইবার জন্য, তাঁহাদের বাগ্জালের তত প্রয়োজন হয় না। লোকের প্রকৃতি ও ধারণা বুঝিয়া স্বদৃষ্ট বা অনুভূয়মান মার্গ তাঁহারা সহজেই নিশ্চয় করাইয়া দেন। অনুমান অপেক্ষা আগম-প্রমাণেই তদীয় শুশ্রূষুগণের অধিক নিশ্চয় হয়। সাক্ষাৎ উদাহরণ থাকিলে, উহাই অধিক ফলোপধায়ক। উদাহরণের অসাক্ষাতে অবশ্য অনুমানমূলক দর্শনশাস্ত্র অধিক ফলদায়ি। অতএব বুঝিতে হইবে, বৌদ্ধদর্শন বুদ্ধের নহে, কিন্তু উহা বুদ্ধের ভক্তগণের।

(২য়) পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ হইয়াছেন, তাঁহাদের ভক্তগণের জন্যই আমরা তাঁহাদের যথাযথ বিবরণ পাইনা। ভক্তগণ কখনই স্বীয় পূজনীয় পুরুষগণ সম্বন্ধে সত্য বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন না, কিন্তু যাহা নিজেরা সত্য মনে করেন, তাহাই বলেন। এ কথা চিরকালই সমান সত্য। এক ব্যক্তির, এক অতিপ্রিয় র্যাফেলোকৃত ছবি ছিল, সে তাহা রং লাগাইয়া ভাল করিতে যাইয়া, যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছিল, ভক্তগণও অনেক সময়ে স্বীয় পূজ্য পুরুষগণকে ঐরূপ করেন। বুদ্ধকে ভাল করিতে যাইয়া যে—তাঁহার ভক্তগণ কত অলীক, অসার, অপ্রয়োজনীয় কল্পনার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। (অবশ্য লোকশিক্ষার জন্য অনেক কাল্পনিক উপাখ্যানও বুদ্ধদেবকে দিয়া বলাইয়াছেন।) বোধিসত্ত্ব theory, বোধিসত্ত্বের ১০৮ ধর্ম্মালোকমুখ, বোধিসত্ত্বের অঙ্কবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইবার জন্য বহু অব্যবহার্য্য সংখ্যার নাম উদ্ভাবন, স্বর্গের দেবগণকে

---

* বুদ্ধদেব যে চিন্তাশূন্য থাকিতেন, বিনয়পিটকই তাহার প্রমাণ। চিন্তা ভূত-ভবিষ্যৎ বিষয় লইয়াই প্রায়শ হইয়া থাকে, কিন্তু বিনয়পিটক পাঠে জানা যায়, বুদ্ধদেব মোটেই ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেন না। বিনয়পিটকের সমস্ত নিয়মই কোন এক দোষ ঘটিলে, তবে, তাহা সংশোধনের জন্য করা হইয়াছে। অলৌকিক প্রজ্ঞার ত কথাই নাই, সাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাও বিনয়পিটকের ঐ সব নিয়ম—পূর্ব্বে কিছু চিন্তা করিলেই, পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া দিতে পারেন। বিনয়পিটক পাঠে অনেকের সংশয় হয়, বুদ্ধদেব অলৌকিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াও, পূর্ব্ব হইতে সঙ্ঘের অব্যভিচারী সুনিয়ম স্থাপন করিলেন না কেন? সমাধিসিদ্ধ চিত্তের স্বভাব বুঝিলে, আর এ শঙ্কা থাকে না।

বুদ্ধের পরিচর্য্যায় নিয়োগ, বুদ্ধই একমাত্র নির্ব্বাণমার্গের আবিষ্কর্ত্তা প্রভৃতি—ভূরি ভূরি কাল্পনিক বিষয় অতি প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

দর্শন সম্বন্ধেও ঐরূপ। পূর্ব্ব হইতেই মোক্ষমার্গ ও মোক্ষশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিলেও, অপিচ তৎসম্বন্ধে কোন মৌলিক কথা বলিবার না থাকিলেও স্ব সম্প্রদায়ের বিশিষ্টতা স্থাপনের জন্য, বুদ্ধভক্তগণকে অভিনব আকারের বাদ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। নচেৎ স্বীয় গুরুর মৌলিকতা স্থাপিত হয় কিরূপে? এই জন্য বুদ্ধদেব পারদর্শী হইলেও বৌদ্ধদর্শন সদোষ হইতে পারে।

(৩য়) বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ বুদ্ধদেবের দীর্ঘজীবনব্যাপী, বহুলোকের সহিত কথাবার্ত্তা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে কথা ২০, ২৫ বা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে যে কত দোষ হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

চক্ষের সম্মুখে কোন ঘটনা ঘটিলে, ভিন্ন ২ দর্শক যে তাহার কিরূপ বিচিত্র ২ উপাখ্যান করে, তাহা এক পাশ্চাত্য Phsychologist কতকগুলি সুন্দর প্রক্রিয়ার (Oxperiment) দ্বারা দেখাইয়াছেন। পাঠকগণও কাহাকে কোন গল্প বলিয়া যদি পরক্ষণেই তাহাকে তাহা পুনরায় বলিতে বলেন, তবে দেখিবেন, সে তাহাতে কত নিজের ভাব ও ভাষা ঢুকাইয়াছে।

ফলতঃ বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধের মুখ দিয়া যে সমস্ত সংবাদ বলান হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বহুবর্ষ বা শতাব্দী পূর্ব্বকার বুদ্ধের কথা-বার্ত্তা অবলম্বন করিয়া রচিত হওয়াতে, কেহ যদি তাহা সব বুদ্ধের উচ্চারিত কথা মনে করেন, তবে ভ্রান্ত হইবেন সন্দেহ নাই। তবে বুদ্ধদেব গাথাতে যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অদুষ্ট থাকিবার কথা। তজ্জন্য বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের অব্যবহিত পরে সংগৃহীত ধর্ম্মপদ পুস্তক এরূপ অনবদ্য দেখা যায়। অতএব মূলবক্তা প্রাচীন ঋষিগণ বা বুদ্ধদেবের ন্যায় পারদর্শী পুরুষগণের উচ্চারিত বাক্যের ছায়াবলম্বনে যাহা রচিত, তাদৃশ শাস্ত্রের দোষের জন্য সেই উপদেষ্টা পুরুষগণ দায়ী নন।

(৪র্থ) বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরেই তদীয় শিষ্যগণের নানা মতভেদ হয়। তখন প্রধান ২ শিষ্যগণের যাহা অভিমত ও যাহা স্মরণ ছিল, তাহা লইয়াই বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হয়। তন্মধ্যে কাশ্যপ অভিধর্ম্ম বা বৌদ্ধদর্শনের গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য সমস্ত অভিধর্ম্ম যে এক সময়ে রচিত নহে, তাহারও প্রমাণ আছে। আর্যদর্শনের বিষয়সকল যেরূপ স্পষ্ট, বহ্বর্থ, অনবদ্য সূত্রে রচিত, বৌদ্ধদর্শন ঠিক তাহার বিপরীত ভাষায় রচিত। স্মৃতিশাস্ত্র মনে রাখার জন্য যেমন ছন্দে রচিত হইয়াছে; বৌদ্ধগণও সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি লম্বা ২ "বাঁধা গৎ" পুনঃ ২ আবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। শব্দবাহুল্যময় ঐ শাস্ত্র রচিত হইয়া, বহু শতাব্দ কণ্ঠে ২ ছিল। লিখিত পুস্তকের ব্যবহার তখন মোটেই ছিল না। এমন কি, বহু পরেই হিউয়েন্ সাঙ্ ভারতবর্ষে ২। ১ খানির বেশী সম্পূর্ণ লিখিত ত্রিপিটক পান নাই। কণ্ঠে ২ এতাদৃশ শব্দবাহুল্যময় পুস্তক বহুবর্ষ থাকিলে, যে কিরূপ বিপর্য্যস্ত

হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। অতএব বুদ্ধদেবের উচ্চারিত অনবদ্য পদার্থ-লক্ষণ যাঁহারা প্রচলিত বৌদ্ধশাস্ত্রে খুঁজেন, তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

(৫) প্রাচীনকালেই কাশ্যপাদি রচিত বৌদ্ধশাস্ত্রের শ্রদ্ধেয়তা বিষয়ে সংশয় হওয়াতে, আনন্দ,কাশ্যপ প্রভৃতিকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া, সেই সংশয়নিবৃত্তির চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কাশ্যপাদির অলৌকিক-প্রজ্ঞার প্রমাণ—তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রে কিছুই পাওয়া যায় না। ভূগোল, খগোল সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রভৃতি, তাঁহাদের সাধারণ-জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। বিশেষতঃ, বাদ-বিবাদময়, পরমার্থদৃষ্টিতে অস্তিত্বের শশারণ্যে বিচরণ করা, তাঁহাদের সম্যক্ সমাধিনিষ্ঠার অভাবই সূচিত করে। অতএব তাঁহাদের রচিত শাস্ত্র যে সর্ব্বথা অনবদ্য হইবে, এরূপ আশাকরা যায় না। বৌদ্ধদের দর্শনের কিছু২ দোষ থাকিলেও তাঁহাদের মোক্ষমার্গের কোন দোষ নাই; কারণ বুদ্ধদেব প্রধানত উহারই সম্যক্ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আর তাঁহার নির্ব্বাণমার্গের সহিত আর্য্যশাস্ত্রের নির্ব্বাণমার্গেরও কিছুই ভেদ নাই। শীল (যমনিয়ম) শ্রদ্ধাবীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা, ইহা উভয়েরই সামান্য মার্গ। শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার ষষ্ঠ ও অষ্টম পরিবর্ত্তে, যোগই নির্ব্বাণের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা পতঞ্জলিপ্রোক্ত যোগের সহিত বস্তুত এক। ব্রহ্মমুদ্রা, সিংহাবতীক্রীড়া, বিলোকিত-মুদ্রা, সর্ব্বধাতুনিত্যতা, রশ্মিপ্রযুক্তা প্রভৃতি সমাধিসকলও সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগের অন্তর্গত। সবিতর্কাদি সমাধিও বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

ভূততথতা বা পুরুষপ্রকৃতি-তত্ত্বের সম্যক্ বিবেক না থাকিলেও, নির্ব্বাণগামীর তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় না। কলিকাতা হইতে যে-কাশীর সারনাথে যাইবে, তাহার কাশী-অভিমুখে যাইলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। কলিকাতা হইতে সারনাথের দিকে মুখ করিয়া না যাইলেও চলে। নির্ব্বাণমার্গ-গামীর পক্ষেও তদ্রূপ।

যে অবস্থা, ভাষা ও মনের নিবৃত্তি হইলে তবে লাভ হয়, তাহা যতদূর যুক্তিযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারা যায়, তাহা সাংখ্যেরা করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যে ভাষায় ব্যক্ত করেন, তাহা সম্যক্ যুক্ত না হইলেও তাহার একটি গুণ আছে। তাহাতে চরম-অবস্থা যে দেশ ও কালের অতীত—অর্থাৎ বিস্তারশূন্য এবং মনের ন্যায় পরিণামশূন্য, এই সত্য সম্যক্ সূচিত করে। কিন্তু উহা, আত্মার অভাব এবং অচেতন-গতি (প্রকৃতলীনতা) প্রভৃতি, দোষও আনে।

বৈদান্তিকদের ভাষায় চরমপদার্থ যেরূপ সূচিত হইয়াছে,তাহাতে চৈতন্যের দেশব্যাপিত্ব দোষ আসে (অনেক বৈদান্তিক চৈতন্যকে আকাশের ন্যায় বৃহৎ সর্ব্বদেশব্যাপী কহিয়া থাকেন।); কিন্তু ইহাতে অসত্তা এবং অচিন্ময়তা দোষ আসে না।

সাংখ্যের ভাষায় দেশকালাতীতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উভয় সূচিত হওয়াতে, দোষের জন্য অবকাশ আসে না।

সাংখ্যেরা যেমন সমস্ত জগতের অভিমানাত্মকতা প্রদর্শন করেন, বৌদ্ধেরাও সেইরূপ সমস্ত জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র বা মনোময় বলেন। আর বিভু অন্তঃকরণ বা মহত্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, যেমন যোগীগণ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা সগুণব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করেন, বুদ্ধদেবও সেই দৃষ্টিতে (বিজ্ঞানমাত্র দৃষ্টিতে) বলিয়াছিলেন 'এই বিশ্ব আমার'। "Buddha said this truth and said that the universe was his own."

আরও এক বিষয়ের সাম্য দ্রষ্টব্য। শূন্য চিন্তা বৌদ্ধ ও আর্য উভয়মার্গেই পরম সাধন। ভাগবতে আছে "তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ। তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ সংখ্যাস্ততাপশু নির্ব্বাণম্ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ।১১।১৪

অন্যত্র—"খমধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু। আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।"

বৌদ্ধরাও বলেন—"রূপী রূপাণি পশ্যতি শূন্যম্। বিজ্ঞানন্ত্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্" ইত্যাদি। অন্যত্র—"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যম্ বহির্গতম্। (মাধ্যমিকা ১৮ অঃ)। শরীরাদিকে শূন্য ভাবনা করিতে করিতে নিবৃত্তিমার্গে যে শীঘ্র ফললাভ হয়; সেই সত্যাশ্রয় করিয়াই এবম্প্রকার সাধন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষত বিকারশীল পদার্থের তুচ্ছতা, এই ধ্যান সম্যক্ উপলব্ধি করায়। বৌদ্ধেরা বলেন "As all things have no constant value of thus own. * * * On this account it is some times said that all things are nothing." অন্যত্র "ভাবানাং নিঃস্বভাবানাং ন সত্তা বিদ্যতে যতঃ।" অন্যত্র "নির্ব্বাণমপি দেবপুত্রা স্বপ্নোপমং মায়োপমমিতি বদামি কিং পুনরন্যং ধর্ম্মং"।

ঠিক এই ভাবেই ভিন্নদিক্ হইতে আর্য্য শাস্ত্রকারগণ বুঝান। যথা—

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়ৈব সুতুচ্ছকং॥"
(যোগভাষ্য)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অপ্রয়োজনীয়তা-হেতু বুদ্ধদেব প্রায়ই দার্শনিক বিচারের দ্বারা লোকদের উপদেশ দিতেন না। 'বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি' প্রভৃতি শ্রদ্ধামূলক উপদেশেই তিনি লোকদের নির্ব্বাণপথে স্থাপিত করিতেন। তাঁহার উদাহরণই তদ্বিষয়ে প্রধানযুক্তি ছিল। তাঁহার তিরোভাবের পরই প্রধানতঃ বৌদ্ধদের দর্শনের সহায়তা প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বুদ্ধের চরিত্রের মোহিনী-শক্তি হইতেই প্রধানতঃ হয়। বৌদ্ধগণ যখন তাদৃশ চরিত্রের অনুকরণে বিরত হইয়া তবল হারাইয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত আর্যদর্শনের দ্বারা ভারত হইতে অপসারিত হন।

"যাহা কোনদিকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, তাহাই ঈশ্বরের অবতার।" গীতার এই মত যদি সত্য হয়, তবে বুদ্ধদেব যে বিশুদ্ধচরিত্র ও বিবেকবৈরাগ্য ঈশ্বরের অবতার, তাহা নিশ্চিত সত্য। তাঁহার "ধর্ম্মপদে"র ন্যায় ধর্ম্মনীতি এবং তাঁহার ন্যায় মুমুক্ষুদের আদর্শ আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। ইতি

স্বামী হরিহরানন্দ।
কাপিলাশ্রম।

তত্ত্বচিন্তা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শাস্ত্র এবং গুরুগণ বলেন—

জগৎ যেরূপ হউক, উহাতে ভাল থাকুক বা মন্দ থাকুক, উহা তোমার পরীক্ষা করিবার বা বিচার করিবার বিষয় নহে।

তুমি যাহা তাহাই থাক, জগৎকে তোমাতে মিশিতে দিওনা এবং তুমিও জগতে মিশিওনা,—তাহা হইলে তুমি নির্লিপ্ত বা মুক্ত থাকিবে। জগতে মিশিলে বা জগৎকে মিশিতে দিলে, তুমি আবদ্ধ বা বদ্ধ হইবে।

তাঁহারা কারণ নির্দ্দেশ করেন—

যাহা দেখিতেছ, শুনিতেছ এবং তদ্ধেতু ভাবিতেছ, তাহা প্রকৃতই তাহা নহে।

১। তোমার ভ্রান্তিবশতঃ ঐরূপ বোধ হইতেছে। ভ্রান্তি কোথায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে পার, কর, কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ভ্রান্তি প্রমাণগ্রাহ্য হইবেনা—ভ্রান্তি উপলব্ধি হইবে না। অর্থাৎ—যাহা দেখিতেছ, তাহা প্রকৃত তাহা নহে বলিয়া বোধ হইবে না। এই ভ্রান্তির হেতু, দেখিয়া, শুনিয়া, এবং অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা।

ভ্রান্তিসংস্কার আর একটী হেতু। উপস্থিত দেখিয়া, শুনিয়া, বা পড়িয়া না হউক, পূর্ব্বের উপলব্ধিবশতঃ যে সংস্কার, তাহাই উল্লিখিত হইল। সংস্কার সহজে যায় না।

অতএব সংস্কার থাকুক, অথচ তুমি যাহা, তাহাই থাকিবার চেষ্টা কর। "তুমি" কে, ইহা না জানিয়া, তুমি তাহাই থাকিবার চেষ্টা করিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব! সুতরাং সেই পূর্ব্বপ্রশ্নই উপস্থিত। তুমি কি, জগৎ কি, আর বিন্দুই বা কি?

গুরুরা বলেন—

উল্লিখিত বিন্দুকে ব্রহ্ম কল্পনা কর। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ—সৎ, চিৎ, আনন্দ-স্বরূপ। সৎ-স্বরূপে চিৎ-স্বরূপে এবং আনন্দ-স্বরূপে তিনি পূর্ণ।

সৎ - অর্থাৎ আছেন। তিনি কি, কিরূপ, বা কিরূপে আছেন, তাহা প্রকাশ নহে।

চিৎ—অর্থাৎ সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মের বিকাশভাব।

আনন্দ—অর্থাৎ সেই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশভাব।

সৎস্বরূপ, বিকাশমাত্র উহা চিৎস্বরূপ হয়েন। চিৎস্বরূপ প্রকাশমাত্র উহা আনন্দস্বরূপ হয়েন। এই তিন ভাবেই তিনি স্ব—রূপ—অর্থাৎ কাহারও মত নহেন। তিনি পূর্ণ অর্থাৎ তাঁহাতে অভাব নাই।

সৎ—স্বয়ং—স্বরূপ। চিতের স্বরূপ সৎ। অর্থাৎ চিৎস্বরূপ সৎস্বরূপে লীন থাকেন, এবং থাকিতে পারেন। আনন্দের স্বরূপ—চিৎ, অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ চিৎস্বরূপে লীন আছেন, থাকেন এবং থাকিতে পারেন।

সৎস্বরূপে চৈতন্য, শক্তি, বাসনা লীন। চিৎস্বরূপে উহারা লীন নহে, চৈতন্য সত্ত্বে শক্তি ও বাসনা কতক চালিত। আনন্দস্বরূপে—শক্তি, চৈতন্যের ও বাসনার পূর্ণপ্রকাশ।

কাষ্ঠে অগ্নি আছে; আছে সত্য, কিন্তু তদবস্থায় উহার বিকাশ নাই, প্রকাশও নাই। কাষ্ঠে ২ ঘর্ষণ করিলে, উহাতে উত্তাপ উঠে। ঐ উত্তাপ অগ্নির বিকাশভাব।

উহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু আগ্নিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিলে, উহাতে উত্তাপও থাকে, রূপও থাকে। অর্থাৎ উহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই অগ্নির প্রকাশভাব বলিতে হইবে।

ব্রহ্ম এইরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দভাবে জগতে বিরাজমান। প্রকাশ জগৎ ব্রহ্মের আনন্দভাব। অপ্রকাশ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বিকাশভাব। এবং যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড লীন—উহা তাঁহার সৎ-ভাব।

বীজে অঙ্কুরকল্পনা অপ্রকৃত নহে। অঙ্কুরে পত্রপল্লবকল্পনা অপ্রকৃত নহে। অঙ্কুর হইলে, তাহাকে আর 'বীজ' বলে না। কিন্তু সে অঙ্কুর ইতঃপূর্ব্বে বীজ ছিল, স্বীকার করিতে হয়। বৃক্ষকে আর অঙ্কুর বলে না, বীজও বলে না, কিন্তু উহা অঙ্কুরে এবং তৎপূর্ব্ব বীজে ছিল, স্বীকার করিতে হয়। বীজে অঙ্কুর লীন, অঙ্কুরে বৃক্ষ লীন, কল্পনা মিথ্যা নহে। ইহাতে না চৈতন্য, না বাসনা, প্রকাশ এরূপ কল্পনা সঙ্গত। সুতরাং ব্রহ্মবীজের সহিত ইহার তুলনা হয় না. বৃক্ষ অঙ্কুরে এবং অঙ্কুর বীজে পুনর্ব্বার পরিণত হয় না। ব্রহ্মবীজে অঙ্কুর ও বৃক্ষরূপ ব্রহ্মাণ্ড লীন আছে। ব্রহ্মবীজের অঙ্কুর চিৎ-স্বরূপ, ইহাতে কতক প্রকাশ, কতক অপ্রকাশ। অপ্রকাশ ভাগ প্রকাশ হইতেও পারে, না হইতেও পারে। চিৎস্বরূপ অঙ্কুরে, আনন্দস্বরূপ বৃক্ষ পূর্ণপ্রকাশ। আনন্দ-স্বরূপ চিৎস্বরূপে, চিৎস্বরূপ—সৎস্বরূপে লীন আছেন। তখনই তিনি বীজরূপী ব্রহ্ম।

এই ব্রহ্মই শরীর ধারণ করেন।

প্রত্যেক কর্ম্মের পূর্ব্বে কর্ম্মীর চৈতন্য, শক্তি, বাসনার প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্বরূপ ব্রহ্ম শরীর ধারণ করিবার পূর্ব্বে, স্বরূপ হইতেই চেতন্য, শক্তি ও বাসনার উদ্ভাবন করেন।

ব্রহ্ম (অহং) স্বরূপ হইতে রূপান্তরিত (রূপধারী) হইয়া প্রকাশ হইলে, অস্তিত্ব, ভাব, কর্ম্ম ও পরিণাম বোধ করেন।

অস্তিত্ব বোধে—আমি, ইহা হইতে নিত্যতা-বোধ।

ভাবে—আমি কি, ইহা হইতেই রূপ ও গুণ-বোধ।

কর্ম্ম—কি করিব, ইহা হইতেই সৃষ্টি এবং উহার সহিত সম্বন্ধ-বোধ।

পরিণাম—যাহা হইয়াছি, যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কি হইব, কি করিব, অর্থাৎ অস্তিত্ব, ভাব ও কর্ম্ম-বোধ রাখিব, কি আবার স্বরূপ হইব—এরূপ বিচার।

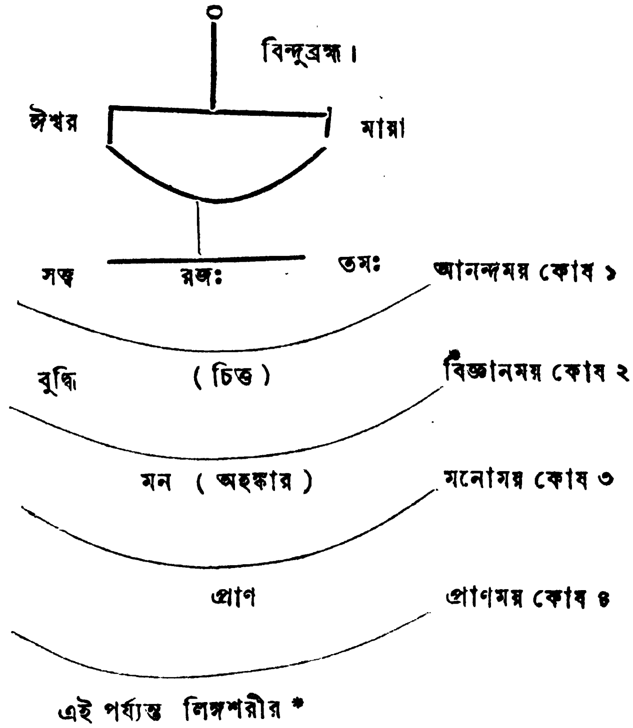
শুধু অস্তিত্ববোধে, ভাবকর্ম্মপরিণাম-বোধ না থাকিতে পারে।

শুধু ভাব-বোধে, অস্তিত্ব-বোধ অনিবার্য্য, কর্ম্ম ও পরিণামবোধ না থাকিতে পারে।

শুধু কর্ম্মবোধে, অস্তিত্ব ও ভাব-বোধ অনিবার্য্য, পরিণামবোধ থাকিতে বা না থাকিতেও পারে।

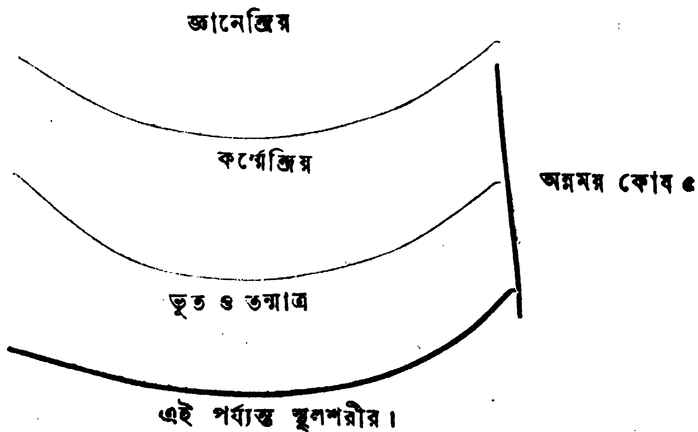
পরিণাম-বোধে প্রথম তিন বোধই অনিবার্য্য।

ব্রহ্ম যে শরীর ধারণ করেন, তাহার নাম লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর।



এই পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর *

তাহার পর—



এই পর্য্যন্ত স্থূলশরীর।

* দেহ—(ক্ষিতি অপ্ তেজ) প্রাণ (বায়ু) দ্বারা চালিত।
প্রাণ—(বায়ু হইতে সূক্ষ্ম) আকাশরূপী মনদ্বারা চালিত।
মন—("আমি"বোধ যাহার সে) অহঙ্কার দ্বারা চালিত।

আনন্দময় কোষে ব্রহ্ম-প্রতিভা বুদ্ধিতে অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিভাত হয়। তাহার প্রতিভা মনোময় কোষে প্রতিভাত হয়। তাহার প্রতিভা প্রাণময় কোষে প্রতিভাত হয়। তাহার প্রতিভা অন্নময় কোষে প্রতিভাত হয়।

প্রথম কোষ হইতে দ্বিতীয় কোষে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ে, তৃতীয় হইতে চতুর্থে এবং চতুর্থ হইতে পঞ্চমে, প্রতিভা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া আইসে। মূল হইতে যত দূর তত অল্প, দূর হইতে যত মূলের নিকট, তত অধিক প্রতিভা—বুঝিতে হইবে। (ক)

একে বহির্মুখ প্রতিভা ক্রমশঃ স্থূল, তাহাতে দূরস্থিত কোষ ক্রমশঃ স্থূল, সুতরাং অন্নময় কোষে শক্তি, আনন্দ, চৈতন্য প্রতিভা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। দেহ হইতে বা দেহে, সেই জন্য সূক্ষ্ম শক্তি, আনন্দ,চৈতন্য বোধ হয় না। দেহকে এইজন্য জড় বলে। তাই বলিয়া উহা চৈতন্যসম্বন্ধ-শূন্য নহে। চৈতন্য যাহা পূর্ণ, তাহাতেই জড়ের অস্তিত্ব। জড়ের চৈতন্য ভোগ না হউক্, উহা চৈতন্য এড়াইয়া থাকিতে পারে না। সেইরূপ শক্তি ও আনন্দ সম্বন্ধে।

এই শরীরীই জীব। ইহারই অহংবোধ। কোথায় স্বরূপব্রহ্ম, কোথায় অহং স্থূল—ভূতবিহারী! যেন কোথা হইতে কত দূর! গুরুরা এই দূরভাব দূর করিবার জন্য একই বস্তুকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। প্রথম ব্রহ্ম, দ্বিতীয় ঈশ্বর, তৃতীয় জীব।

ব্রহ্ম হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জীব, এই রূপান্তর হওয়াকে নিক্রমণ কহেন। আর জীব হইতে ঈশ্বর ও ঈশ্বর হইতে ব্রহ্ম,এই রূপান্তর হওয়াকে লয় কহিয়াছেন। নিক্রান্তের লয় না হইয়া থাকিতে পারা সম্ভব নয়, আর স্বরূপ হইতে নিক্রমণ সঙ্গত। অবতার ও মুক্ত—এই বিচারে সম্ভব হইয়াছে।

ব্রহ্মকে চক্ষুতে দেখা যায় না। কল্পনা করাও কঠিন। অতএব ব্রহ্ম-কল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া, গুরুরা তদপেক্ষা একটী সহজ কল্পনা করিতে বলেন। আমাদের মধ্যে যিনি "আমি", * তাঁহাকেও দেখা যায় না সত্য, তবু যে "আমি" বলিয়া কোন বস্তু আছেন, তাহা বুঝা যায়। এই নিমিত্ত এই "আমি"কে কল্পনা করিতে বলেন।

মৃত্যুতে দেহ ছাড়িয়া প্রাণ চলিয়া যায়, সুতরাং তাহার পরিচালক মন এবং অহঙ্কার চলিয়া যায়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর প্রাণ মন অহঙ্কার থাকে। প্রাণের যেমন দেহ আধার, প্রাণ সেইরূপ মনের আধার স্বরূপ থাকে। ইহারই নাম লিঙ্গশরীর।

লিঙ্গশরীরের মৃত্যু আছে, তখন তাহার আধারস্বরূপ প্রাণ থাকেনা, কেবল মন ও অহঙ্কার আকাশবৎ থাকে।

(ক) মূলের নিকটবর্ত্তী—অবতার, তাই অসাধারণ।

দূর হইতে মূলের নিকটবর্ত্তী—মুক্তপ্রায়, তাই অসাধারণ।

* এখনও যে "আমির" কথা হইতেছে, উহা বাচনিক "আমি তুমি সে"র আমি নহে। ("বাচনিক আমি তুমি সে তে"আধার বুঝায়। অর্থাৎ এক "আমি" হইতে অন্য "আমি"কে পৃথক্ বুঝায়।) যে "আমি"র কথা হইতেছে,সে আমি একমাত্র,পূর্ণস্বরূপ,—ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে প্রকাশ। ইহা জ্ঞানের "আমি",ও অনুরাগের "তুমি" বা "সে"।

"আমি" শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি, মন বা বুদ্ধি নহেন, তাহা পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখিয়াছি।

("আমি") অহং—লিঙ্গ-শরীরী 'অহং'—স্থূলদেহধারী জীবরূপী অহং—অহংই সত্য। কিন্তু প্রথম 'অহং' সৎ—সত্তা, দ্বিতীয় 'অহং' প্রথম 'অহং'এর বিকাশ। তৃতীয় 'অহং' প্রথম 'অহং'এর প্রকাশভাব। প্রথম 'অহং'এ শক্তি, চৈতন্য, বাসনা লীন। ঐ শক্তি, চৈতন্য, বাসনা চালনায়, 'অহং'এর বিকাশ। ঐ বিকাশকে প্রকাশ করিবার জন্য "অহং"এর ভৌতিক দেহ ধারণ।

"আমি আছি" শুদ্ধ এইমাত্র বোধ—"আমি"—সৎ—উহাতে চৈতন্য শক্তি, বাসনা লীন। ঐ বোধহেতু চৈতন্য, শক্তি, বাসনা চালনায় "আমি"র বিকাশ। এই ভাব পূর্ণভাব হইতে ভিন্ন। তাহার পর চৈতন্য, শক্তি, বাসনার চালনাহেতু, স্থূল-দেহধারণ "আমি"র প্রকাশভাব। এ ভাব-টাও দ্বিতীয় ভাব হইতে ভিন্ন।

আমির উপাধি—

আমি—বিষয়ে "অহঙ্কার"নামে বিরাজ করেন।

—ভাবিতে হইলে 'মন' নামে বিরাজ করেন।

—অনুসন্ধানী হইয়া চিত্ত নামে বিরাজ করেন।

—নিশ্চয় করিবার সময় 'বুদ্ধি' নামে বিরাজ করেন।

স্বরূপ জ্যোতি—বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়।
বুদ্ধির জ্যোতি—চিত্তে প্রতিভাত হয়।
চিত্তের জ্যোতি—মনে প্রতিভাত হয়।
মনের জ্যোতি—অভিমান বা অহঙ্কারে প্রতিভাত হয়।

স্বরূপে থাকিবার সময়—চিত্তের আবশ্যকতা নাই।

চিত্তে থাকিবার সময়—মনের আবশ্যকতা নাই।

মনে থাকিবার সময়—অভিমানের প্রয়োজন নাই।

অহঙ্কার—'মন' হইবার সময়, বিষয় ছাড়িয়া 'চিন্তা' অবলম্বন করে।

মন—চিত্ত হইবার সময়, চিন্তা ছাড়িয়া 'অনুসন্ধান' অবলম্বন করে।

চিত্ত—বুদ্ধি হইবার সময়, অনুসন্ধান ছাড়িয়া "নিশ্চয়" অবলম্বন করে।

বুদ্ধি—স্বরূপ দৃষ্টিতে স্থির থাকিতে থাকিতে স্বরূপ 'আমি' হয়।

স্বরূপ হইতে বুদ্ধিতে,
বুদ্ধি হইতে চিত্তে,
চিত্ত হইতে মনে,

মন হইতে অহঙ্কারে অবতীর্ণ হইবার পূর্ণ শক্তি "আমির" আছে। অপর গতিতে উত্তীর্ণ হইবারও পূর্ণ শক্তি আছে। এই সঞ্চরণকে ত্রিগুণের কার্য্য কহে। ত্রিগুণ কি, পরে জানিও। কেহ বিষয় ছাড়িয়া একবারে বৈরাগ্যে, কেহ বা বৈরাগ্য ছাড়িয়া

অর্থাৎ জ্ঞানে যখন জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতার শুধু জ্ঞেয় থাকেন, সেই যে "আমি", তাঁহারই কথা হইতেছে।

অনুরাগে বা ভক্তিতে যখন "আমি" লোপ পায়, আর শুধু "তুমি" থাকে, সেই "তুমি-রূপী" "আমির" কথা হইতেছে। আভিমানিক আমিকে এই "আমির" স্থানে বসাইও না।

বিষয়ে একমুহূর্ত্তে গমনাগমন করিতে পারেন। ইহা গুণ অবলম্বনে ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা গুণকে আয়ত্বে আনিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সহজ।

ভাষায় – ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু এই চারি রূপ হইতে যখন পৃথক্ ভাব অর্থাৎ স্বরূপ-ভাব ধারণ করেন, তখন ঐ ভাব— কোনও ভাবে বা ভাষায় প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ সে ভাব মন, চিত্ত, বুদ্ধি বা অহঙ্কারের ভাষায় বা ভাবে প্রকাশ করিবার নহে। এই স্বরূপে মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার লীন থাকে। সুতরাং প্রকাশ করিবার শক্তি লীন থাকা প্রযুক্ত, উহা অব্যক্ত থাকে। স্বরূপের সাক্ষী স্বরূপ, তাহার ভাষা নাই— ভাব তাহাতে থাকে।

স্বরূপ হইবার পূর্ব্বে 'বুদ্ধি' যাহা দেখে, তাহা বুদ্ধিকে দেখাইতে পারে, 'চিত্ত' বুদ্ধির যে ভাব দেখে, তাহা চিত্তকে দেখাইতে পারে, 'মন' চিত্তের যে ভাব দেখে, তাহা মনকে দেখাইতে পারে, আর 'অহঙ্কার' মনের যে ভাব দেখে, তাহা অহঙ্কারকে দেখাইতে পারে।

ইহারা সকলেই স্বরূপপরিচিত অর্থাৎ স্বরূপপ্রতিভাযুক্ত—সুতরাং সকলেই স্বরূপ দেখিতে চায়।

স্বরূপ দেখিবার বা তাহাতে লীন হইবার পূর্ব্বেই, আর আপন আপন রূপ পুনর্ব্বার লাভ করিবার পরই, যে আভাষ লাভ করে, তাহাই প্রকাশ করিতে সক্ষম। শাস্ত্রসমুদয় তাহাই লিখিয়াছেন। +

+ এই হেতুই পর পর গুরুশিষ্য হইয়া আসিয়াছে। কঠিন ও সহজ শাস্ত্র হইয়া আসিয়াছে।

স্বরূপ হওয়া বা স্বরূপ হইতে অবতরণ চকিতবৎ,—সেইজন্য স্বরূপদর্শন "গো শৃঙ্গে সর্ষপস্থিতি" প্রমাণ কাল হইলেও মানব ধন্য হয়েন। অভ্যাস দ্বারা এই কাল দীর্ঘ হয়, নিত্য হয়। তখন সে আধারধারী মুক্ত হয়েন।

সাত্ত্বিক অহঙ্কার বুদ্ধিদ্বারা স্বরূপ দর্শন করিতে যায়, দেখিয়াই আর নিজের রূপে থাকেনা; "বুদ্ধি" হইয়া দর্শন করিতে থাকে। এ পর্য্যন্তও অহঙ্কারের অস্তিত্ব, তাহার পর বোধস্বরূপে বুদ্ধিও লয়প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং "অহং" যে চারি রূপে প্রকাশ হয়েন, উহার প্রকাশভাব তত্ত্বরূপী, অর্থাৎ মনোরূপী, চিত্তরূপী, বুদ্ধিরূপী ও অহঙ্কাররূপী।

দেহ শরীর ও আমির সম্বন্ধ।

দেহ—অবলম্বনসাপেক্ষ—অবলম্বন সূক্ষ্মশরীর।
—আধারসাপেক্ষ—আধার পঞ্চভূত।

শরীর—অবলম্বনসাপেক্ষ—অবলম্বন আত্মা।
—আধারসাপেক্ষ—আধার স্থূলশরীর।
—আধারসাপেক্ষ নহে—মৃত্যু হইতে পুনর্জ্জন্মপর্য্যন্ত।

আত্মা—অবলম্বনসাপেক্ষ নহে। স্বয়ং নিরালম্ব।
—আধারসাপেক্ষ—জীব-ভাবে, আধার শরীর।
আধারসাপেক্ষ নহে—যখন স্বরূপ পূর্ণভাব।

আত্মা হইতে দেহপর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে স্থূলবিকাশ। স্থূলবিকাশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত

হয়। তদনবিকাশ বুদ্ধির দ্বারা অনুভূত বা বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়।

দেহ হইতে আত্মা পর্যান্ত ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মগম। এই সূক্ষ্মতা অনুভূত হইয়া ক্রমে অনন্নভূত হইয়া আছে। বুদ্ধি পর্যন্ত যে লয়, তাহা অনুভূত হইতে পারে। তদতিক্রান্ত লয় আর অনুভূত হয় না।

আত্মার জ্যোতি বা প্রতিভা—বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও স্থূলদেহ পর্য্যন্ত ক্রমে সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ থাকে। অর্থাৎ দেহজ্যোতিতে দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মরূপে লয় পায়।

প্রথম জ্যোতি-অংশে—বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইয়া লয় পায়।

দ্বিতীয়—ঐ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, মন সূক্ষ্ম হইয়া লয় পায়।

তৃতীয়—ঐ মন অবলম্বন করিয়া, প্রাণ সূক্ষ্ম হইয়া লয় পায়।

চতুর্থ—ঐ প্রাণ অবলম্বন করিয়া, স্থূলদেহ সূক্ষ্ম হইয়া লয় পায়। (ইহাই লিঙ্গশরীর)।

চতুর্থ অবস্থায়—দেহ রূপ ও গুণবিশিষ্ট থাকিয়া অপরের দৃশ্যমান থাকিতে পারে—না ও থাকিতে পারে। কখনও আত্মার প্রতিভা দেহে বোধ হয়, তাহাকে দেহদীপ্তি বা তপোদীপ্তি কহে।

আত্মায়—জটিলতা বা গোল নাই।

পঞ্চভূতে—জটিলতা বা গোল নাই।

দুইয়ের মধ্যে যাহা, তাহা সমুদায়ই গোল—প্রতিমিশ্রণে গোল।

ত্রিগুণ আচারী—প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। ভ্রম, সংশয়, বিশ্বাস, নিশ্চয় ইত্যাদি এই মধ্যস্থলভুক্ত। এই টুকুর নাম "মানস-ব্রহ্মাণ্ড।"

আত্মা—স্বরূপ হইতে গুণ অবলম্বন করিবামাত্র "ভুক্ত" নামবাচ্য। ভুক্ত মাত্রই তদবস্থা-সম্ভূত সমুদয়-বিষয় ভুক্ত। সুতরাং ভ্রমযুক্ত; অমনি "জীব" বলিয়া বোধের উদয়। এই বোধই অভিমান। অভিমানের কার্য্য, ফলভোগ, বদ্ধভাব ইত্যাদি। ভ্রমে, নির্ম্মল, নির্গুণ, অরূপ, মুক্ত আত্মা—"অপর কেহ" বলিয়া পরিচিত হয়েন। স্বরূপ হইতে যেমন উদয় প্রকাশ, অবকাশ—, সেইরূপই সৃষ্টি, স্থিতি লয় হইতেছে বলিয়া থাকি।

যথা—হাস্য, উদয় হইল, প্রকাশ রহিল, ফুরাইয়া গেল।

ছিল—তাই উদয় হইল (সৃষ্টি)

উদয় হইল, তাই প্রকাশ রহিল (স্থিতি)

প্রকাশ রহিল, তাই যাহাতে ছিল তাহাতে মিশাইয়া গেল (লয়)। মনুষ্য—শোকে বা ভ্রমে ঠিক যেন দেহ ও আত্মা দুই ছাড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হয়; যেন দেহী নহে, আর স্বরূপও নহে। তখন সেই মনুষ্য মানসব্রহ্মাণ্ডবাসী। ইহা যেমন সম্ভব, মনুষ্য দেহও মন ছাড়িয়া স্বরূপে থাকে—ইহাও তেমনি সম্ভব। তখন স্বরূপস্বত্ব লব্ধ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবামাচরণ বসু।

চারুচর্য্যা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

—•:•:•—

প্রভু প্রসাদে নোদস্থাং স্ববিনাশাস্পদে মতিম্।
স্বক্ষয়ায়োদ্ধতঃ যুদ্ধং বাণস্ত্রাক্ষ যযাচত ৪২॥

প্রভু প্রসন্ন হইলে, নিজ-বিনাশাস্পদে মতি দিবে না; বাণ নিজ-বিনাশের জন্য মহাদেবের নিকট প্রচণ্ড যুদ্ধ যাচ্ঞা করিয়াছিল। [(এ উপাখ্যান হরিবংশে দ্বিতীয় পর্ব্বে ১৭৩ অধ্যায়ে, শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ৬২ অধ্যায়ে, ব্রহ্মপুরাণে ৯৭ অধ্যায়েও বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ৩৩ অধ্যায়ে আছে। উহার বর্ণনা এই—

'বলির শতপুত্র মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ ছিলেন,

বিদ্যোদ্যোগী গতোদ্বেগঃ সেবয়া তোষয়েদ্ গুরুম্।
গুরুসেবাপরঃ সেহে কায়ক্লেশদশাং কচঃ॥ ৪১॥

তিনি মহাদেবকে উগ্র তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, সহস্র বাহু লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কহিয়াছিলেন, "হে লোকগুরো! আপনি আমার সহস্র বাহু প্রদান করিলেন, কিন্তু কেবল ভার মাত্র হইল, কারণ আপনি ব্যতীত আমার প্রতিযোদ্ধা কেহ নাই।" তখন মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন। "হে মূঢ়! যখন তোমার রথের ধ্বজ ভগ্ন হইবে, তখন তোমার সমান যোদ্ধা পাইবে। তোমার দর্প নাশ হইবে।" বাণের কন্যার নাম উষা। একদিন রাত্রে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বিমনা হইলে, উষার প্রিয়সখী চিত্রলেখা শূন্যমার্গে গমন করিয়া, দ্বারকা হইতে অনিরুদ্ধকে আনয়ন করেন। বাণ কন্যাকে কলুষিতা দেখিয়া অনিরুদ্ধকে কারাবদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিগণ নারদমুখে ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বাণরাজ্যে আগমন পূর্ব্বক বাণের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাণের সহস্র বাহু ছেদন পুরঃসর অনিরুদ্ধ ও উষাকে লইয়া যান।

প্রভুর প্রসন্নতার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—
যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥ মনুঃ ৭। ১১।] ৪২॥

বিদ্যার্থী উদ্বেগশূন্য হইয়া, সেবাদ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে; কচ গুরুসেবাতৎপর হইয়া, শরীরের ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। [(এ কথা আদিপর্ব্বে ৭৬ অধ্যায়ে ও মৎস্য-পুরাণে ২৫ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে—

দেবাসুরে পরস্পর বিবাদ হইলে, দেবগণ জিগীষাবশতঃ যাজ্যকর্ম্মের নিমিত্ত অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। অসুরগণও শুক্রকে বরণ করেন। দেবগণ যুদ্ধে যে সকল দানবকে বধ করিতেন, শুক্র বিদ্যা বলে পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিতেন, কিন্তু অসুরগণ দেবগণকে বধ করিলে, বৃহস্পতি তাহাদিগকে জীবিত করিতে পারিতেন না। তজ্জন্য দেবগণ গুরুপুত্র কচকে কহিলেন "তুমি শুক্রের নিকট গমন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আইস"। কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া, নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুর নিকট বাস করিতে লাগিলেন। দানবগণ জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে বধ করিলও খণ্ড ২ করিয়া শৃগাল কুক্কুরদিগকে প্রদান করিল। শুক্রাচার্য্য কন্যা দেবযানীর বাক্যে পুনরায় সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা তাহাকে জীবিত করিয়াছিলেন। পুনরায় কচ দেবযানীর আদেশে পুষ্প আহরণার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। দানবগণ দেখিতে পাইয়া, নিষ্পেষণ করিয়া সমুদ্রজলে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। পুনরায় শুক্র জীবন দান করেন। তৃতীয়বার দানবগণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া, দগ্ধ ও চূর্ণ করতঃ সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্রকে প্রদান করিলে, কচ আচার্য্যের উদর মধ্যে নিহিত হইয়া, জঠরবাসজন্য ঘোর ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। তাহাতে গুরু সন্তুষ্ট হইয়া, কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

সেবাদ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য—
গুরুং দৃষ্ট্বা সমুত্তিষ্ঠেদাভবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নৈতৈরুপবিশেৎ সার্দ্ধং বিবদেন্নাত্মকারণাৎ॥
কূর্ম্মপুরাণে উপবিভাগে ১১ অধ্যায়।

ঋতস্য দাতার মনুত্তমস্য নিধিং নিধীনামপি লব্ধবিদ্যাঃ।
ভক্তং শক্তং হিতং রক্তং নির্দোষং ন পরিত্যজেৎ।

রামস্ত্যক্ত্বা সতীং সীতাং শোকশল্যাতুরোঽভবৎ॥ ৪৪

যক্ষেৎ খ্যাতিং পুনঃ স্মৃত্যা যশঃ কায়স্থ জীবনীম্।

যে নাদ্রিয়ন্তে গুরু মর্চ্চনীয়ং পাপাংল্লোকাংস্তে ব্রজন্ত্যপ্রতিষ্ঠাঃ॥

আদিপর্ব্বণি ৭৬। ৬২] ৪৩

ভক্ত, আশক্ত, হিতকারী, অনুরক্ত ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবেনা। শ্রীরামচন্দ্র সতী সীতাকে ত্যাগ করিয়া শোকশল্যে কাতর হইয়াছিলেন [সীতা-বর্জ্জন বিষয় বাল্মীকীয় রামায়ণে উত্তর-কাণ্ডে ৫৬ সর্গে, অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তর-কাণ্ডে ৪ সর্গে ও পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ২৭১ অধ্যায় বর্ণিত আছে—

হিতকারী প্রভৃতিকে ত্যাগে দোষ যথা—

জনন্যা বর্দ্ধিতোদেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।

স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ॥

ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।

ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৮ উল্লাসে।] ৪৪॥

শরীরের জীবনী-রূপ যশঃ স্মরণ করিয়া খ্যাতি রক্ষা করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা স্বর্গ-চ্যুত হইয়া, ব্যক্তি দ্বারা স্মৃত হইয়া পুনরায় স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। [(বনপর্ব্বের ১৯৯ অধ্যায়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের পুনঃ স্বর্গারোহণ-বৃত্তান্ত এই;—ইন্দ্রদ্যুম্নের পুণ্য ক্ষয় হওয়াতে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আমায় জানেন" তিনি কহিলেন "না"। পরে মার্কণ্ডেয়কে ইন্দ্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করেন "তোমা অপেক্ষা কেহ দীর্ঘজীবী আছেন?" মার্কণ্ডেয় কহিলেন "হিমাচলে এক উলুক বাস করেন"। ইন্দ্রদ্যুম্ন উলুককে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ও "জানি না" বলিয়াছিলেন। কিন্তু উলুক কহিয়াছিলেন, আমাপেক্ষা দীর্ঘজীবী নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সরোবরে বাস করে। বকও "ইন্দ্রদ্যুম্নকে জানি না" বলায়, ইন্দ্রদ্যুম্ন বকের কথিতমত দীর্ঘজীবী এক কচ্ছপের নিকট গমন করিয়াছিলেন। কচ্ছপ সেই সরোবরে বাস করিতেন। তিনি কহিয়াছিলেন, "আমি ইন্দ্রদ্যুম্নকে জানি, ইনি সহস্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন ও এই সরোবর ইঁহার প্রদত্ত গো সকলের পদক্ষুরচিহ্নে উৎপন্ন হইয়াছে"। এই কথা বলায় স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিল।)

চ্যুতঃ স্মৃতো জনৈঃ স্বর্গমিন্দ্রদ্যুম্নঃ পুনর্গতঃ॥ ৪৫॥

দধীচিমুনি দেবগণকে নিজ অস্থিদানকালে কহিয়াছিলেন—

যো ধ্রুবেনাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্।

ঈহেত ভূত-দয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি॥

শ্রীভাগবতে ৬। ১০। ৮॥

জরাসন্ধ কহিয়াছিলেন—

যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।

নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ সবাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ॥ ঐ ১০। ৭২। ২০] ৪৫

শ্রীবিধুভূষণ দেবশাস্ত্রী।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার—

(চৈতন্যদেব)

—•:•:•—

(কাশীস্থ বঙ্গসাহিত্যসমাজান্তর্গত সুহৃৎসমিতির অধিবেশনে পঠিত।)

গৌরাঙ্গ অথবা চৈতন্যদেবের সংস্কারকার্য্যের আলোচনার সহিত তাঁহার সময়, সমসাময়িক সমাজ, সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তা, আবির্ভাব, নীতিধর্ম্মমূলক সংস্কার ও তাহার পরিণাম, স্থূলতঃ এই বিষয়গুলির পৃথগ্রূপে অনুশীলন করিলে, প্রস্তাবিত বিষয় অধিকতর বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যাইতে পারে।

সময়।—"নিমাই" নামে আবালবৃদ্ধ বঙ্গবাসীর নিকট চিরপরিচিত গৌরাঙ্গ—১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জগতীতলে অবতরণ করিয়া, স্বকীয় কঠোর কার্য্য সমাপনানন্তর ১৫৩৩ অব্দে অন্তর্হিত হন। যদিও ইঁহার নিকটবর্ত্তি সময়ে বঙ্গদেশ সপুত্র-পৌত্র রাজা গণেশ ও মধ্যে মধ্যে হাবশী নামক যবনজাতিবিশেষের করায়ত্ত হইয়াছিল, তবুও স্থূলতঃ স্বাধীন পাঠান-নরপতিগণের রাজ্যসময় বলিয়া এই সময়কে নির্দ্দেশ করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। চৈতন্যদেবের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণের সময়, আকবরের ন্যায় রাজনীতিকুশল বিচক্ষণ মোগল-সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া, উত্তর-খণ্ডের একচ্ছত্র নরপতিরূপে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেন। ইতিবৃত্ত-পাঠে সেই সময়ে বঙ্গবাসীদিগের অর্থসাচ্ছল্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যথেষ্ট পরিচয় সম্যক্ অবগত হওয়া যায়।

কোন কোন বঙ্গীয় গৃহস্থ অতিথিগণকে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করাইতেন। আর আজ সেই বঙ্গদেশে আপাতপ্রতীয়মান ধনাঢ্য ভূস্বামিগণও ঋণদায়ে সর্ব্বদা জর্জ্জরীভূত! তদানীন্তন সমৃদ্ধনগর গৌড়ে ও পণ্ডুয়ায়, অধুনা যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ অট্টালিকারাজি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইতেও বঙ্গীয়দিগের তাৎকালিক ঐশ্বর্য্যের ও শিল্পনৈপুণ্যের কতকটা পরিচয় পাইয়া, আধুনিক অধঃপতিত বাঙ্গালীর হৃদয়ে আংশিক আত্মগৌরবের সঞ্চার হয়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিপুণ-পর্য্যবেক্ষণে, স্থাপত্যবিদ্যায় ভারতবর্ষ সেই সময়ে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। "আইন ই-আকবরী" গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় অবগত হওয়া যায়, বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীরা প্রায়ই কায়স্থ-বংশোদ্ভূত এবং অনেকে স্বীয় কৃতিত্ববলে মুসলমান্-দরবারেও এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের যুদ্ধোপকরণ জলে স্থলে সর্ব্বত্রই মণ্ডলাধিপের সাহায্যার্থ প্রার্থিত ও পরিগৃহীত হইত। বঙ্গজ-কায়স্থ-কুল-প্রদীপ যশোহরাধীপ প্রতাপাদিত্যের নাম কোন অধঃপতিত হৃদয়কে উৎফুল্ল না করে? একজন সাধারণ চাকলাদারকে বশীভূত করিবার জন্য, প্রথিতনামা আকবরের দক্ষিণহস্ত মানসিংহকে কিরূপ চক্রান্ত ও ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে, 'ভীরু কাপুরুষ' প্রভৃতি উপালম্ভ-ভাজন উপস্থিত বাঙ্গালীজাতির ধমনীতেও রুধিরধারা সবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে।* বস্তুতঃ বিধর্ম্মিকবলিত হইলেও, বঙ্গবাসীগণের অভাব ও অভিযোগের কারণ তাদৃশ বর্ত্তমান না থাকায়, বঙ্গদেশ এই সময়ে বিলক্ষণ সমৃদ্ধ ও উন্নত অবস্থায় অধিরূঢ় ছিল; এইরূপ স্বীকার করা যায়।

সমাজ —স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া,

* বঙ্গবাসীগণ যে মুহূর্ত্ত হইতে বীরের যথার্থ সম্মাননা করিতে ভুলিয়াছেন, সেই হইতেই অধঃপতনমার্গে সবেগে প্রধাবিত হইতে আরম্ভ করিয়া, উপস্থিত শোচনীয় নির্য্যাতন ও অশেষবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন। এই পাপে না জানি বাঙ্গালীজাতির ভাগ্যে আরও কত কি দুর্গতি ভবিষ্যতের অন্ধতামসকুক্ষিতে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে! কিন্তু শুভক্ষণে বীরজাতীয় সখারাম গণেশ দেউস্করের বঙ্গভাষার জন্য লেখনী ধারণে ও বীর-চরিত্র-অঙ্কণে, ক্রমশঃ শিবাজী-উৎসবের অবতারণায় এবং ভারতী-সম্পাদিকা বিদুষী সরলাদেবীর প্রতাপাদিত্যোৎসবের আন্দোলনে; বঙ্গবাসীর হৃদয়কন্দরে আত্মমর্য্যাদা ও আত্মগৌরব-বিকাশের একটী ক্ষীণ আশা সঞ্চারিত হইয়াছে। সুতরাং আশা হয়, যদি আমরা যথার্থ বীরপূজায় মনোভিনিবেশ করিতে শিখি, অর্থাৎ যাঁহারা স্বধর্ম্মের, স্বদেশের, স্বজাতির ও সমাজের মঙ্গলকামনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মার্গের সামর্থ্যানুরূপ অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি যথার্থ গৌরব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করি; তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদিগকে আর অধিক দিন জাতীয় উন্নতিসৌধের অধস্তন স্তরে নিপতিত হইয়া, অধোবদনে কালাতিপাত করিতে হইবে না। সুতরাং মনে হয়, জাতীয় মহাত্মগণের ক্রিয়াকলাপ আলোচনের শুভ অবসর বুঝি উপস্থিত হইয়াছে।

বঙ্গবাসীগণের নিয়ামকরূপে "অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব" নামক গ্রন্থরাজী প্রণয়ন করেন। তাঁহারই সিদ্ধান্তানুসারে আজ পর্য্যন্ত—বঙ্গীয়দিগের জাতকর্ম্মাবধি সমস্ত কার্য্যই নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মেল বন্ধন করিয়া, কৌলীন্যমর্য্যাদা দৃঢ়ীভূত করেন। তাহির-পুরাধীপ কংশ নারায়ণের আদেশে উদয়না-চার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ কুলীনগণকে অষ্টশাখায় বিভক্ত করেন। পুরন্দর বসু দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও চন্দ্রদ্বীপাধিপতি পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে কতকগুলি নূতন কৌলীন্য-নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া, উহার অধ্যা-পনাদি দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে নবদ্বীপকে উক্ত শাস্ত্রচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত করেন। তদবধি তর্কশাস্ত্রানুশীলনে নব-দ্বীপের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। সার্ব্ব-ভৌমের পর নব্যন্যায়ের পিতৃস্থানীয় সেই মহাপুরুষ-শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি, গঙ্গেশো-পাধ্যায়ের, চিন্তামণি গ্রন্থের দীধিতি নাম্নী টীকা রচনা করিয়া, স্বীয় অসাধারণ মনীষা ও প্রতিভা বলে, নব নব দার্শনিক মত সমুদ্ঘাটন করিয়া, জগৎকে বিস্মিত করেন। উহাতে তর্কশাস্ত্রের ভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়। কবিকোকিল বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস স্ব স্ব মধুর নিনাদে বঙ্গবাসীগণের হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া, বঙ্গভাষায় মধুর-রস-প্রধান-ভক্তিসর্ব্বস্ব বৈষ্ণব-ধর্ম্মমূলক গীতিকাব্যের প্রথম প্রচার করেন। চৈতন্যসম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ বঙ্গভাষায় নানাবিধ সরস কবিতা লিখিয়া, উক্ত ভাষার সমধিক পুষ্টি-সাধন করায়, ক্রমে তাহার মাধুর্য্যগুণে মুগ্ধ হইয়া, পণ্ডিতগণও সংস্কৃতের বিনিময়ে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দিরের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপন করেন। অতএব, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সামাজিকমর্য্যাদা, কি ভাষার উন্নতি—সকল ব্যাপারেই তখন বঙ্গদেশে বাহ্য উৎকর্ষ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা।—দেশের ও সমাজের উজ্জ্বল অংশ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঈদৃশ সময়েও কোন কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ-তার পরিহার ও ভ্রমের সংশোধন-জন্য সংস্কারকের প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে। এই সত্যের সম্যক্ সমালোচনায় সমুদ্যুক্ত হইলে, অপর অন্ধতামিস্র অংশটিও নয়ন-গোচর হয়। বক্ষ্যমাণ সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই, আর্য্যজাতির শোণিতসদৃশ বেদের প্রচার—বঙ্গদেশে একপ্রকার লুপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ আদিশূরের শাসন-সময়ে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের পুনঃপ্রবর্ত্তনমানসে কান্য-কুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হ'ন, তাঁহাদিগের বৈদিক জ্ঞানও যে স্ব স্ব গোত্র অতিক্রম করিয়া অধিক দূরে অগ্রসর হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। বঙ্গদেশের জলবায়ুর দোষে বা ব্রাহ্মণকুলের দুর্ভাগ্য-বশতঃ বৈদিক আচার বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইতে না পারায়, বেদ-জ্ঞানহীনতা দুরুনই হউক, বা তন্ত্রশাস্ত্র বঙ্গীয়দিগের নিকট অধিকতর রুচিকর বলিয়াই হউক, বঙ্গ-বাসীরা প্রায় সকলেই তন্ত্রশাস্ত্র-প্রেমিক

হইয়া পড়িলেন। তান্ত্রিক রীতি অবলম্বনে মৎস্তমাংসাদি দ্বারা উপাসনাই প্রকৃষ্ট পন্থা জ্ঞানে পরিগৃহীত হইল। পক্ষান্তরে, হিন্দুদিগের মধ্যে বহুবিবাহের বহুল প্রচার ও নিতান্ত নিকৃষ্টজাতীয়ের মধ্যেও বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায়, একের বহু বিবাহ সংঘটিত হওয়ায়,বা কাহারও বিবাহ না হওয়ায়, কাহারও পতিবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয়তাপ্রযুক্ত, সমাজশরীরে ব্যভিচারের বিশেষ উপদ্রব পরিলক্ষিত হইত। লৌকিক-কলঙ্ক-পরিহারার্থ ভ্রূণ-হত্যাজাতীয় লোমহর্ষণব্যাপার কেবল শ্রুতিমাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল না, কার্য্যেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত! পিতৃমাতৃকুল-পরিবর্জ্জন শুদ্ধ বাঙ্মাত্রেরই বিষয় ছিল না! এইরূপ নানাপ্রকার সামাজিক দুর্ব্যবহার প্রচলিত থাকায়, বাহ্য উন্নতির অশেষবিধ কারণ বিদ্যমান থাকিলেও, পূর্ণোন্নতিসাধনার্থ এই আভ্যন্তরোন্নতি-বিঘাতক অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম—বিষয়ক ও সামাজিক দোষগুলি যে একান্ত পরিহার্য্য—তাহা সমাজহিত-চিন্তকমাত্রেই স্বীকার করিতে হয়ত কুণ্ঠিত হইবেন না। বঙ্গের তাৎকালিক শাসক বিধর্ম্মী যবন, সুতরাং তাহার দ্বারা এই আন্তর্জাতিক দোষের উন্মূলন কদাচ সম্ভাবিত নহে। অতএব, সেই ত্রুটীগুলির সংশোধনার্থ—সমাজহিতৈষী একজন দক্ষ সংস্কারকের যে বিশেষ আবশ্যকতা ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়।

সংস্কারকের আবির্ভাব।—ভাগীরথীতীরস্থ নবদ্বীপ-নগরে ১৪৮৫ খৃঃ অঃ গৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও মাতার নাম শচীদেবী। ইঁহাদিগের কোনও পূর্ব্বপুরুষ গঙ্গাতীর-বাসোপলক্ষে পূর্ব্বপ্রদেশ হইতে আসিয়া, সপরিবারে নবদ্বীপেই বাস করেন। জগন্নাথের প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ বা নিত্যানন্দ অশেষশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া, অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর গৃহত্যাগ করেন; সুতরাং শচীদেবী গৌরকেও পাছে হারাইতে হয়—এই আশঙ্কায়, পুত্রকে অপার স্নেহ ও যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। এই কুলপাবন গৌরাঙ্গই পরে "চৈতন্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, স্বকীয় মহিমাতিশয্যে পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক, বিষ্ণুর অবতাররূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন।* চৈতন্যদেব যে প্রেমাবতার, তাহা বোধ হয় সকল সম্প্রদায়েরই স্বীকার্য্য। চৈতন্যদেব পূর্ব্বোল্লিখিত ন্যায়-গুরু বাসুদেব সার্ব্বভৌম-সকাশে শাস্ত্রনিচয় অধ্যয়ন

* বৈষ্ণবধর্ম্মবিদ্বেষী তান্ত্রিকগণ "তন্ত্ররত্নাকর" নামক গ্রন্থে, বৈষ্ণবধর্ম্মোপদেশচ্ছলে জনসমূহকে বঞ্চনা করিবার মানসে, মায়ারূপ ধারণ করিয়া, ত্রিপুরাসুর—চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; এইরূপ বচন রচনা করিয়া প্রক্ষেপ করেন। বিরুদ্ধমতাবলম্বীব শাক্ত শাস্ত্রকারদিগেরও যখন এই জাতীয় অসূয়া-প্রণোদিত সংকীর্ণাশয়তা, তখন লৌকিক নিন্দুকদিগের আর কথা কি? মহৎ চরিত্রের এইরূপ বিপরীত বর্ণের আলেখ্য-অঙ্কণেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইংরাজ-রচিত ভারতেতিহাসে এ অভ্যাসটি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে! আমরা তাহা পাঠ করিয়া, সত্যনির্দ্ধারণই কিরূপে করিব, শিখিবই বা কি মাথামুণ্ড!!

করিয়া, ধর্ম্মসিদ্ধান্তাদিতে যুক্তি ও বিচারে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। মিথিলাদেশীয় তার্কিকপ্রবর পক্ষধর মিশ্র-বিজেতা ও দীধিতি-রচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি, বঙ্গের অদ্বিতীয় স্মার্ত্তসম্রাট্ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ সহাধ্যায়ী পণ্ডিতবর্গ—শাস্ত্রাদিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দর্শনে বিস্মিত ও বিমোহিত হইতেন। কিন্তু, যে মহাপুরুষের অন্তরাত্মা সমাজ ও ধর্ম্মের অধোগতি-দর্শনে দিবানিশি রোদন করিত এবং যাহার সংশোধনজন্যই যাঁহার জন্মগ্রহণ, এতাদৃশ মহাপ্রাণ গৌণবিষয়ের আলোচনায় চিত্তের সামান্যতঃ প্রসাদ বা বিস্মৃতি লাভ করিয়া, কিরূপে তদ্গতচিত্ত হইয়াই জীবনযাপন করিতে পারেন! অতএব সংস্কার কার্য্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য সর্ব্বদাই অবিচলিত থাকিত। অধিক কি প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর অকালে পরলোক গমনের পর, মধুগন্ধসংস্কার-গৌরবিতা অর্দ্ধস্ফুট-কমল-কলিকাসদৃশী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়া, এবং শাস্ত্রমর্ম্ম—বিশদীকরণ-জনিত যশঃসৌরভে দিঙ্মণ্ডল সুরভিত অনুভব করিয়াও, তাঁহার অন্তরাত্মা কি যেন কিসের জন্য সর্ব্বদা উন্মনা ও ব্যগ্র থাকিত। সেই সম্ভোগসুলভ যৌবনেও কঠোর সংস্কারের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরিত ছিল, এবং সেই মহত্তর কার্য্যানুরোধে, সুবিমল যশঃ, অতুলনীয় সৌভাগ্য, কুসুমিতা বাসন্তী বনশ্রীর ন্যায় মনোরমা রামা, ও পুত্রগত-প্রাণা শোকাকুলা স্নেহপ্রতিমা জননীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হ'ন। কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, সেতুবন্ধ হইতে মথুরা পর্য্যন্ত—স্বীয় মত প্রচার করিয়া বেড়ান। নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় সফল-কাম হইয়া, অবশেষে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পবিত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বা জগন্নাথপুরীতে লীলা সম্বরণ করেন।

সংস্কার।—যখনই ধর্ম্মাদিসংস্কারের অপেক্ষা অনুভূত হয়, তখনই জীবদেহে ঐশীশক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্বয়ং নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

(ক) নৈতিক বা সামাজিক সংস্কার।—সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ব্যতিরেকে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের এবং তৎপ্রবর্ত্তিত সংস্কার-কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি-ক্ষেপও সম্ভবপর নহে। সমাজানপেক্ষ ধর্ম্ম-সংস্কার "আকাশ-কুসুম" বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সমাজ যদি অধঃপতিত ও যথেচ্ছাচারী হয়, তাহা হইলে সুরীতিগুণে তাহার উৎকর্ষ-সাধন না করিয়া, ধর্ম্ম-সংস্কারে কিরূপে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে? কর্ষণ না করিয়াই বন্ধুর-ভূমিতে বীজবপন করিয়া, কোন মনস্বী ব্যক্তি সুন্দর শস্য লাভের প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতে সাহসী হ'ন? যদি অধিকাংশ জনসমূহ ব্যভিচার-নিরত আর্য্যাচার-বিরুদ্ধ কার্য্যতৎপর, প্রাণিহত্যা-রসিক, তামসিকোপাসনানিপুণ হয়, তাহা হইলে, সে গুলির প্রতীকারবিধান না করিয়া, "এই ধর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে", এইরূপ সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইলে, কে তাহাতে আস্থা স্থাপন করিবে? আর তাহাতে ফলোদয়েরই বা সম্ভাবনা

কি ? অতএব, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, সমাজসংস্কার ধর্ম্মসংস্কারের একটি প্রধান ও অপরিহার্য্য অঙ্গ ; অতএব দ্বিতীয়টি পূর্ব্বনিরপেক্ষ হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। সুতরাং বিশদরূপে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, উপাসনামার্গে সকলকে সমানস্তরে আনয়নজন্য বর্ণাভিমান-নিষেধ, ব্যভিচার-নিবারণজন্য বিধবা-বিবাহের অপ্রতিষেধ, নৈতিক উৎকর্ষসাধনজন্য জীবহিংসানিবারণ প্রভৃত কার্য্যাবলী—নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক বলিতে প্রবৃত্ত হয় না। প্রবন্ধের বিস্তৃতশঙ্কায় তাদৃশ নিগূঢ় আলোচনার অবকাশ না থাকায়, সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে, যে, "একতা"ই চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত নব-ধর্ম্মের একটি অভিনব মূলতত্ত্ব'। এই তথ্য স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়া, যদি আমরা সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা-পরিশূন্য হইয়া তাঁহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিকেই তাঁহার ঔদার্য্যগুণে ও মহিমাতিশয্যে তাঁহার চরণপ্রান্তে নতশির হইতে হয়, সন্দেহ নাই। বিষ্ণুর উপাসনাই এই ধর্ম্মের উপজীব্য বা জীবনী-স্থানীয় এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আচণ্ডালব্রাহ্মণে একরূপেই বিহিত। জনসংঘে সাম্য-সংস্থাপন ব্যতীত পরস্পর মৈত্রী-সংস্থাপনের আশা সুদূরপরাহত, অতএব চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে, জাতি বা বর্ণ একটি মাত্রই স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেটি "বৈষ্ণবজাতি।" একই বিকল্পশূন্য উপাস্য দেবতার অর্চ্চনার বিধান করা হইয়াছে—তাহাও নারায়ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই। উপাসনাও কান্তাদি কমনীয় ভাবেই বিহিত; —ভয়ভীতের দ্বারা উচ্চপদের সেবা নহে, প্রেমিকের দ্বারা অন্তরঙ্গের সপ্রণয় সম্ভাষণ। উপাসকগণ সকলেই সমশ্রেণী-সন্নিবিষ্ট—কেহ প্রধান কেহ অপ্রধান নহে। একাধারে ঐক্য ও সাম্যের এতাদৃশ মনোহর-সম্মিলনের দৃষ্টান্ত জগতে অত্যন্ত বিরল। এই গুণদ্বয়ের একত্রাবস্থান কাদৃশ ফলোপধায়ক, তাহা চৈতন্য, স্বীয় প্রচারকার্য্যে বিশদরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, একটির পরিহারে অপরটির দ্বারা কার্য্যসাফল্যের আশা—মরুপ্রদেশে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ হ্রদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষারূপে পরিণত হয়। এই নিদর্শনরূপ সত্যটি ভারতবর্ষীয় সাধারণের,—বিশেষতঃ সমবেত চেষ্টাদ্বারা যাঁহারা কোন মহৎ-কার্য্যানুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর তাঁহাদিগের—অনুক্ষণ স্মরণ রাখা উচিত।

(খ) ধর্ম্ম—সংস্কার। যে সময়ে মৎস্য-মাংসাদির দ্বারা, বীরাচার পশ্বাচার প্রভৃতি নামে, তান্ত্রিক উপাসনার বিজয়দুন্দুভি সগর্ব্বে নিনাদিত হইতেছিল, সেই সময়ে "ভক্তি" মাত্র উপকরণেই গোলক বা গোকুল-বিহারীর চরণারবিন্দের সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হওয়া যায়, এই ঘোষণা বাক্যে ভগবান্ চৈতন্য বঙ্গদেশে—সর্ব্বপ্রথমে কষ্টসাধ্য অন্যান্য উপাসনার বিনিময়ে অনায়াসসাধ্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন। সার্ব্বজনীন প্রীতিই (universal love) এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এই ঈশ্বরপ্রীতির স্ফুরণে, ক্রমোদ্ভাসিত ভক্তিসাহায্যেই ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়—ইহাই চৈতন্য-

প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সারমর্ম্ম এবং এই-জন্যই চৈতন্যদেবের প্রেমাবতারত্ব সর্ব্ববাদী-সম্মত। কোনও কঠোর বা বিশেষ নিয়মানু-বর্ত্তনের ত আবশ্যকতাই ছিল না, বরং পরবর্ত্তীগণ অত্যধিক সাফল্যলাভের আশায়, বর্ণভেদের আমূল উচ্ছেদসাধন, বিধবা দিগের পুনর্ব্বিবাহের বিধিপ্রবর্ত্তন এবং বিবাহ ও আহার প্রভৃতি—জাতি-নির পেক্ষরূপে সংস্থাপন করিয়া, সাম্য নীতির পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শনে উদ্যত হ'ন। উপাসনা-বিধি ভক্তির প্রকর্ষলাভেরই নামান্তর মাত্র। সুতরাং ভগবদর্চ্চনার ইহা হইতে অধিক-তর সুগম পন্থা—অপর কি হইতে পারে, এইরূপ বিচার করিয়া, শত শত লোক সানন্দে এই নবধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ রূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতিরেকে, অপর কোন সুখসাধ্য ও মহত্তর ধর্ম্ম পদ্ধতির অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই—জনসমূহে এ সিদ্ধান্ত ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হওয়ায়, ক্রমে প্রচারকার্য্যের যথেষ্ট সুগমতা সম্পাদিত হইতে লাগিল। যে মহাত্মা এই জগৎপাবন উদারমতের প্রবর্ত্তনমানসে লৌকিক অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, উপদেশ দানার্থ পরিভ্রমণ করেন, তিনি যে স্বীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা "ঈশ্বরাবতার" রূপে পরিকল্পিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অহো! ভারতের কি মহৎ সৌভাগ্য, যেখানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, নানক, গুরুগোবিন্দ, কবীর, রামদাস, তুকারাম, চৈতন্য প্রভৃতি উদার-প্রকৃতি দেশমুখ্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন! এতগুলি আত্মবলির দৃষ্টান্ত—বোধ হয় জগতের আর কোন দেশেই পরিলক্ষিত হয় না। পরকল্যাণ-কামনায় আত্মবিসর্জ্জনের কি মহৎ আদর্শ! ভারত-বাসী পুনরায় এইরূপ উচ্চ উদাহরণের অনুসরণে তৎপর হউন, দেখিবেন, ভারতের অধিকার—জগতের জাতিসাধারণ দ্বারা আর তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেনা।

সংস্কারের শেষ পরিণাম।—এতদূর অনুশীলনের পর, স্বতই মনমধ্যে প্রশ্ন উদিত হইতে পারে, চৈতন্যের সংস্কারের শেষফল এক্ষণে কি দাড়াইয়াছে? যে জাতি-বিভাগ আর্য্যজাতির অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়া, বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, যে বিধবাবিবাহ তাঁহাদিগের চক্ষে ঘৃণ্য, এবং যে বর্ণনির্ব্বিশেষে বিবাহাহারাদি তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ সংস্কার-বহির্ভূত, সেগুলি চৈতন্যের সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। বঙ্গে এবং বৃন্দাবনধামে, "বৈষ্ণব" নামে অভিহিত যে একটি অপূর্ব্ব জাতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণভেদ-ধ্বংস-প্রয়াসেরই অব্যবহিত ফল মাত্র। স্ব স্ব সমাজে যাহারা অধঃপতিত ও ঘৃণিত, তাহারা অনা-য়াসেই বৈষ্ণব-জাতিতে প্রবেশ লাভ করিয়া, স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে রত থাকিতে পারে। স্ত্রী বা পুরুষ—যাহারা উন্মার্গগামী ও ব্যভিচারপরায়ণ বলিয়া সাধারণ্যে অবজ্ঞাত, তাহারাই অনেক সময়ে বৈষ্ণব-শ্রেণীতে সাদরে পরিগৃহীত হইয়া, সামাজিক ঘৃণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত। ইহাদিগের বিবাহাদি—প্রায় প্রহ-

সন মাত্রেই পরিণত, উপাসনা—তিলক-গোছা মাত্রেই পর্য্যবসিত, সুতরাং ইহারা যে অধোগতির চরমসীমায় উপনীত, একথা অনেক সামাজিককেই অকপট অঙ্গীকার করিতে শুনা যায়। এই জাতীয় লোকের সংখ্যা অল্প হইলেও, তাহারা ঈদৃশ উদারধর্ম্মে কলঙ্ককালিমা আরোপ করিয়া, ধর্ম্মনিরস্তার পবিত্রনামেও গ্লানির সঞ্চার করিয়াছে। আমরা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরোধী নহি, কিন্তু এরূপ উন্নতধর্ম্ম সম্প্রদায়-বিশেষের গোস্বামী ও বৈষ্ণবজাতির নিজস্ব সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হইতে আরম্ভ হওয়াতেই, ইহার অধঃপতনেরও রেখাপাত হয় মনে করি। অতএব সর্ব্বপ্রত্যক্ষগোচর কার্য্যে বৈগুণ্যের উপলব্ধি করিয়া, অনুমানবলে কারণে দোষ অনুসন্ধান করিলে, ইহাই সপ্রমাণ হয়, উত্তম ধান্যসমষ্টির মধ্যে দুই একটি শ্যামিকাবীজের ন্যায়, সংস্কার-কার্য্যে—বহুসত্যমধ্যে—অতর্কিত ভাবে এক আধটি ভ্রমবীজ রহিয়া গিয়াছে। হইতে পারে, আমাদিগের দুঃসাহসিকতামূলক এতাদৃশ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত; কিন্তু মানবদেহধারী চৈতন্যদেবের বা তাঁহার অনুচরগণের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও যে সময়ে সময়ে ভ্রমপ্রমাদবশবর্ত্তী হইয়া থাকেন, ইহাও শাস্ত্রাদিপাঠে অবগত হওয়া যায়। আর্য্যদিগের জাতি-বন্ধন ও বিবাহবিধি কালবশে তাঁহাদিগের অন্যান্য সংস্কারের সহিত—ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অতএব, যদি কোনও সংস্কার-সাফল্যাভিলাষী আর্য্য প্রচারক তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হ'ন, তিনি অবশ্যই ফলবৈপরীত্য দর্শনে প্রতারিত হইবেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে যে পরিণামবৈষম্য উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? আর এই জন্যই বোধ হয় আমরা মহাত্মা রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের'—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত 'আর্য্য-সমাজের' এবং দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত 'প্রার্থনা-সমাজের' যথাভিলষিত সফলতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। হায়! ঈদৃশ পরোপকারে দৃঢ়-সংকল্প আত্মোৎসর্গ-পরায়ণ মহাত্মগণ যথোচিত আয়াস স্বীকার করিয়াও যে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার জন্য বোধ হয় তাঁহারা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীগণ আমরাই অধিক দায়ী।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
কাশী-বঙ্গসাহিত্যসমাজ-সম্পাদক।

বিবেকবাণী।

(১)

কদাচ স্বকীয় পরিণামশীল বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিবে না; অথবা নিজের চক্ষে নিজেকে জ্ঞানী দেখিবে না। খৃষ্টীয় গ্রন্থে আছে—

"He that trusteth in his own heart, is a fool. Trust in the Lord with all our heart, and not to lean to our own understanding nor to be wise in our own eyes."

(২)

অনন্ত ও আশ্চর্য্য জগতের ব্যাপারাবলীও অনন্ত ও আশ্চর্য্য, তাহা আমাদের ক্ষীণ ও দুর্ব্বল বুদ্ধির অগম্য। অতএব কোন বিষয় পড়িয়া বা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও অসম্ভব বোধ হইলে, নাসিকা কুঞ্চন করিয়া, তাহার প্রতি অবজ্ঞা বা অনাস্থা প্রদর্শন অকর্ত্তব্য। বিশেষ আলোচনা ও গবেষণা পূর্ব্বক সত্যান্বেষণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(৩)

হিন্দু-পুরাণাদি কুসংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া, একেবারে উপেক্ষা করিবেনা। পুরাণোক্ত "যদা বিজৃম্ভতেহনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ। তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধি-কাননা।"

শুনিয়া, উপকথা মনে করিবেনা। ইহা দীর্ঘকালপ্রসূত যোগলব্ধ মহাজন-বাক্য। জড়বিজ্ঞান দ্বারা ইহার জটিলতা পরিষ্কার করা বড় দুরূহ ব্যাপার। অতএব পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান পাঠে যদি ইহা অযৌক্তিক বোধ হয়, তবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানোক্ত কারণ অপেক্ষা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃতহেতু কোন অংশেই হীন নহে। অনন্তশক্তির সর্পাকার বা তির্য্যগ্‌গতি পূর্ণ বৈজ্ঞানিক।*

* প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ টারনার (Mr. Turner. a well known English painter of landscapes) নামক জনৈক চিত্রকর বিদ্যুল্লতার চিত্র অঙ্কণে কোণবিশিষ্ট বক্রাকারের পরিবর্ত্তে তরঙ্গাকারে তির্য্যগ্‌ গতি প্রদর্শন করেন। তজ্জন্য তাহা অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক বোধে তিনি ঘৃণিত ও উপহাসাস্পদ হন। কিন্তু এই অর্দ্ধশতাব্দী পরে এক্ষণে ইহাই স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক রূপে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যুৎ বা তাড়িৎশক্তি এই অনন্ত শক্তিরই বিকাশ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। লেখক

(৪)

দুর্গাপূজা শ্যামাপূজা ইত্যাদিতে অনাস্থা দেখাইবেনা। এই সব পূজা, সময়ে সময়ে সাধু ও মহাত্মগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। যোগী ও অধ্যাত্মবিৎ মহোদয়গণের নিকট ইহা বাল্যক্রীড়নকবৎ হইলেও, আমাদের মত বিকারগ্রস্ত রোগীর পক্ষে মহৌষধ। পূজাবিধির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ইহার মধ্যে ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, মাতৃকান্যাস, যোগাঙ্গাদি অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সদ্‌-ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজাদি অনুষ্ঠিত হইলে, অনেক ফললাভ হইয়া থাকে।

(৫)

দেবদেবীর মূর্ত্তি অমূলক কল্পনা-প্রসূত মনে করিবেনা। তাহা আর্য্য যোগীজনের যোগক্রিয়া দ্বারা উদ্ভাসিত। যোগাদি-আত্ম-ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে তাহা মানসপটে উপনীত হয়, তাহা ক্রিয়াবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের অননুমেয়। ইহাতেও যদি কাহারও আস্থা না হয়, তবে যুক্তি ও বিজ্ঞান মূলক ব্যাখ্যাদি পাঠ ও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

(৬)

ঈশ্বরসমীপে কোন বিষয় প্রার্থনা করিয়া, প্রার্থনানুকূল ফললাভ না হইলে, পরমপিতাকে অনুযোগ করিবে না, বরং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

কারণ তিনি পূর্ণ, আমরা অপূর্ণ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের জ্ঞান পরিমিত। কোন্ কার্য্যের কি পরিণাম অথবা কোন্ প্রার্থনায় কি ফল ফলিবে, মানব তাহা জানিতে পারে না, সুতরাং নানাবিধ কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা করিয়া থাকে। কিন্তু তত্তৎ কার্য্যের ও প্রার্থনার পরিণাম তিনি জানিতে পারেন, সুতরাং আমাদের ভাবী ইষ্টসাধনই করিয়া থাকেন। মহাকবি সেক্সপীয়র বলেন—

"We ignorant of ourselves,
Beg often our own harms, which the wise powers
"Deny us for our good, so find we proofs
By losing of our prayers"

(৭)

সদা সৎ ও পবিত্র চিন্তা করিবে। মনে কোনরূপ পাপচিন্তার উদয় হইলে জ্ঞান ও বিচারবলে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। আমরা যেরূপ ধাতু ও উপাদানে গঠিত, তাহাতে আমাদের মন সহজেই পাপপথে অধিকতর ধাবিত হয়। অতএব তৎসময়ে তর্কবিচার ও ভাবী পরিণাম চিন্তা করিয়া, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

(৮)

দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের তাড়নায় হতভাগ্য মানব অনেক সময়ে অতি ভীষণ ও পাপাবহ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বাধ্য হইয়া থাকে। যদি তৎসময়ে সৌভাগ্যক্রমে জ্ঞানোদয় হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; মনুষ্য একবার পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইলে, ক্রমশঃ তাহাতে কেমন প্রবৃত্তি বাড়িতে থাকে।

"The crime is horribly prolific—
It is like the reptile which brings forth a swarm of a venomous brood."

অপরিচিতের নিকট স্বকীয় গুহ্যকথা প্রকাশ করিবে না। অপরের প্রকৃতি ও সহৃদয়তা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, নিজের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিলে, সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাকুক্ বরং হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এমন কি, পরস্পরের মধ্যে বিরোধও ঘটিতে পারে। তন্ত্রে বা মন্ত্রে, অধ্যাত্ম বা জড়-জগতে, আর্য্যশাস্ত্রে বা রসায়নাদিবিজ্ঞানে, সর্ব্বত্রই এ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। গভর্ণমেণ্টেরও গুপ্ত-কার্য্যালয় আছে। ধর্ম্মেরও গুহ্য ও বাহ্যশিক্ষা আছে। আর্য্যশাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক্, খৃষ্টীয় বাইবেলেও নিদর্শন দৃষ্ট হয়—

"And I, brethern, could not speak unto you as unto the spiritual, but as unto the carnal, even as unto the babes in christ"—

(ক্রমশঃ)
শ্রীযদুনাথ দে।

সামবেদ।

১ম প্রপাঠক, ২য় অর্দ্ধ ৪র্থ দশতি।

—•—

হে অপ্রতিহতগতি! কর আহরণ
আমাদের জন্ত অগ্নি! বলবান ধন;

প্রশস্ত ধনের সহ করহ সংযুক্ত,
আমাদের অন্ন-পথ কর দেব মুক্ত।১
যদি বীরপুত্র জন্ম করিল গ্রহণ,
সমিদ্ধ করিবে মর্ত্ত্য আগুণ তখন;
ক্রমাগত হব্যবস্তু হবন করিবে,
দৈবী শার্ম্ম তাহা হ'তে সে মর্ত্ত্য লভিবে ২
তব শুক্রধূম দিবে হইয়ে আতত,
হইতেছে, দীপ্ত অগ্নে! মেঘে পরিণত;
হে পাবক! স্তুতি আর স্তুতির প্রভায়
শোভিতেছ তুমি যথা সূর্য্য শোভাপায়।৩
যথা মিত্র তথা তুমি হে দেব অনল!
লাভ করিয়াছ শুষ্ককাষ্ঠায় সকল;
তুমি বসো! তুমি অগ্নে! দেব বিচর্যণে!
বৃদ্ধি করি অন্ন, আছ পুষ্টিসম্বর্দ্ধনে।৪
বিশের অতিথি যিনি বহু লোক-প্রিয়,
যে অমর্ত্ত্যে মর্ত্ত্য সব দ্রব হবনীয়
সমিদ্ধ করয়ে, সেই অগ্নি দেবতায়
প্রাতঃকালে হেনরূপে স্তব করা যায়।৫
যে বাহিষ্ঠ স্তব তাহা অগ্নি-দেবতার,
দাও বিভাবসো! বৃহদন্ন আপনার;
তোমা হ'তে মহাধন উর্দ্ধদিকে ধায়,
আমরাও পাই অন্ন তোমার কৃপায়।৬
বিশে বিশে অতিথি বহুল-লোক-প্রিয়
অন্নেচ্ছু তোমরা সবে অগ্নিকে অর্চ্চহ;
আমিও তাঁহাকে সেই গৃহ-হিত-করে,
মননীয় স্তবে তুষি তোমাদের তরে।৭
প্রকৃষ্টস্তুতির জন্য মিত্রের সমান,
মর্ত্ত্যেরা যাঁহাকে দেয় পুরোভাগে স্থান;
তোমরা সে দীপ্তিমান্ অগ্নিদেবতায়,
অর্চ্চনা করহ বৃহদন্ন দিয়ে তাঁয়।৮
ঋক্ষ-পুত্র শ্রুতর্ব্বন্ রাজার নিমিত্ত
হতেছেন যিনি বৃহজ্জালায় বর্দ্ধিত,
যিনি বৃত্রহন্তা, জ্যেষ্ঠ, নরহিত-কারী,
আসিব সে অগ্নি-কাছে পূজার্থে তাঁহারি।৯
পরধর্ম্ম সহকারে অগ্নিদেব জাত,
সবৃত্ ঋত্বিক সহ ভূমিযজ্ঞে স্থিত;
কশ্যপ যাঁহার পিতা মাতা শ্রদ্ধাদেবী,
যাঁহাকে করিলা হেন স্তব মনু কবি। ০

(বেদ সংহিতা, ২য় ভাগ যন্ত্রস্থ)

আমরা এই দশতিটি উদ্ধৃত করিয়া ইহার ৫ম, ৭ম ও ৯ম মন্ত্রের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ৫ম ও ৭ম মন্ত্রে দেখা যায় যে, অগ্নিকে প্রত্যেক বিশের অতিথি বলা হইয়াছে। অগ্নি বিশ্ মাত্রের গৃহেই সময়ে অসময়ে উপস্থিত হইতেন, অর্থাৎ প্রত্যেক বিশ্ই সাগ্নিক ছিলেন—ইহাই উহার ভাবার্থ। প্রত্যেক গৃহেই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত এবং তাহাতে হবিঃপ্রদান পূর্ব্বক দেবার্চ্চন করায় প্রত্যেক বিশেরই অধিকার ছিল।

"আজুহোতা হবিষা মর্জয়ধ্বং নিহোতারং গৃহপতিং দধিধ্বম্।"

১ম প্রপাঠকের ১ম অর্দ্ধের ২য় দশতির ১ম মন্ত্রে অগ্নিকে এই প্রকারে গৃহ-পতি এবং ২য় প্রপাঠকের ১ম অর্দ্ধের ১ম দশতির ১০ম মন্ত্রে অগ্নিকে "বিশ্পতে!" বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

"শ্রুষ্ট্যগ্নে! নবস্য মে স্তোমস্য বীর বিশ্-পতে!"

ইহার দ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থ বিশের সহিত অগ্নির অর্থাৎ যজ্ঞকার্য্যের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। ঋগ্বেদ ও সামবেদ হইতে আরও অনেক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করা যায়।

পুরোহিত ও যোদ্ধৃসম্প্রদায় হইতে ধর্ম্মাধিকারে বিশের স্থান কিছুই ন্যূন ছিল না। ফলে বেদের বিশ্ আর্য্য জাতির সাধারণ নাম। বিশ্ই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি-যোনি।

৯ম মন্ত্রের ঋষি গোপবন। এই গোপবন ঋষি সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত যে উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই; "একদা গোপবন ঋষি শ্রুতর্ব্বন্ রাজার নিকটে উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া দেখেন, রাজা যজ্ঞে উপবিষ্ট আছেন। অগ্নিদেব মহান্ জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া প্রবৃদ্ধ হইতেছেন। তখন তিনি অতি ভক্তি সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—এই সেই মন্ত্র।" ইহার দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যে যজ্ঞে শ্রুতর্ব্বন্ রাজা স্বয়ং পুরোহিতের কার্য্য করিতে ছিলেন, সেই যজ্ঞে একজন ব্যবসায়ী ঋত্বিকের যোগ দেওয়ার পক্ষে কোন সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। ক্রুগার যখন বুয়র যুদ্ধের প্রারম্ভে স্বয়ং গৃজাঘরে খৃষ্টের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং পাদ্রী ও জনমণ্ডলী তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন, ৯ম মন্ত্রপাঠে কি সেইরূপ ঈশ্বরোপাসনার আভাস পাওয়া যায় না? ফলে উপরোক্ত দশতি হইতে বৈদিক সময়ে ঋত্বিক, যোদ্ধা ও বিশ্ বা শিল্পিসম্প্রদায়ের দেবার্চ্চন সম্বন্ধে কিরূপ সাম্য ভাব ছিল, তাহা অনেকটা বুঝা যাইতেছে।

যাঁহারা স্বদেশীয় ভাষাবলম্বনে দেশে শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রগর হইয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রেই বিবেচনা করা উচিত, স্বদেশের কোন ভাবের পুনরুদ্দীপনা তাঁহাদের লক্ষ্য স্থল। একথার গোপন দীর্ঘকাল চলিবে না। সুতরাং বৈদিকভাব কি পৌরাণিক ভাব, ইহার কোনটি আমাদের উন্নতি কার্য্যের সহায় করিয়া লইতে হইবে, তাহা এইক্ষণই নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। জাতি বোধ হয় একথা এইক্ষণই জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

দ্বিতয়তঃ দেশের শিল্পবাণিজ্যের অর্থাৎ বৈশ্যবৃত্তির দুরবস্থার প্রকৃষ্ট কারণ ক্ষত্রিয়ত্বের ম্লানতা ও ক্ষত্র-বৈশ্যের সংযোগের অভাব। ক্ষত্র-বৈশ্যের গূঢ় সংযোগ হইতেই দেশের বল ও ধন রক্ষা হয়; আমাদের দেশে ইহার বিপরীত ঘটিয়াই দেশকে অধঃপাতের দিকে লইয়া যাইতেছে। সুতরাং যাহাতে অতি সত্বর ক্ষত্র-বৈশ্যের যোগ দৃঢ়তর হয়, ক্ষত্র-বৈশ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির তাহাই করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত স্বদেশীয় আন্দোলন ও স্বদেশীয় শিল্প কখনই স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে না।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

দক্ষযজ্ঞ-রহস্য।

(প্রথম প্রস্তাব)

—০:০:০—

সনাতন হিন্দুর শাশ্বত ধর্ম্মশাস্ত্রে 'দক্ষ' নামক প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজের প্রবর্ত্তিত ও সমাধিত যে বিশ্ববিখ্যাত বিরাট যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহা অবিচলিত চিত্তে পাঠ করিয়া, বিবেকী ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা করিলে, সূক্ষ্মদর্শী পাঠকেরা

সহজেই বুঝিতে পারিবেন, এই সুমধুর বিবৃতির আদ্যন্ত অপূর্ব্ব উৎকৃষ্ট উপদেশে পরিপূর্ণ। সাধারণতঃ হিন্দুসমাজে এই বিরাট যজ্ঞ "দক্ষযজ্ঞ" নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ব্যবসায়ী যাত্রা ওয়ালাদিগের রজনীব্যাপিনী সঙ্গীত-সঙ্গতি দ্বারা এবং কবি, পাচালিকার, কীর্ত্তণক, কথক, মুষ্টি-ভিক্ষুক, গীতপ্রণেতা, রঙ্গভূমির অভিনেতা, লেখক, উপদেশক, কাব্যকার প্রভৃতির গানে, বাক্যে, লেখনীতে ও রহস্যে এই চিরসুখপাঠ্য দক্ষযজ্ঞ-বিবরণ পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যাত হইলেও ইহা সদা নবীন, সদা প্রেমময় এবং নিত্যবিনোদক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মহারাজাধিরাজ দক্ষের জীবনচরিত, শিবের যজ্ঞস্থলে অপমান, তজ্জন্য মহেশ্বরপত্নী "সতী"র তনুত্যাগ, যজ্ঞের আনুসঙ্গিক যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা এবং পরিণামে দক্ষের ও শিবপ্রাণা সতীর নবজীবন লাভ প্রভৃতি কথা যেমন মধু হইতে মধুময়ী, তেমনি সমাজিক রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও আধ্যাত্মবিদ্যাজ জ্ঞানরাশিতে পরিপূর্ণ। সর্ব্বপ্রকার সংশয়, কুসংস্কার, বিজাতীয় বিদ্বেষ এবং মোক্ষপথবিরোধী মূঢ়তা পরিহার পূর্ব্বক, তত্ত্বজ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী পুরুষের ন্যায় যদি কেহ দক্ষযজ্ঞের বিবরণ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই দেবানুগৃহীত সৌভাগ্যবান্ নরোত্তমের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? সনাতন হিন্দুর বহুসংখ্যক গ্রন্থে এই যজ্ঞের বিবৃতি পাঠ করা যায়; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় অশেষ জ্ঞান ও ঐকান্তিকী ভক্তিভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহা তুলনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্-ভাগবত গ্রন্থের ভাষা অতীব কঠিন; যেমন তেমন পণ্ডিতের বুদ্ধি এই সুকঠিন গ্রন্থে সহসা ও সহজে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। পণ্ডিতেরা কহেন "শ্রীমদ্ ভাগবতে বিদ্যানের পরীক্ষা হয়" অর্থাৎ কে কেমন পণ্ডিত শ্রীমদ্-ভাগবতের অধিকারে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত শ্রীমদ্ ভাগ গ্রন্থ অতীব কঠিন হইলেও, ইহা অত্যন্ত মধুময় শাস্ত্র; ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন দেবদুর্লভ অমৃতরসে পরিপূর্ণ।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃত-
দ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা-
ভুবি ভাবুকাঃ॥"

আমি প্রধানতঃ এই ভক্তিরস-প্রধান শ্রীমৎ ভাগবত শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া, সুপরিচিত দক্ষযজ্ঞ-রহস্যের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্খা করি। দক্ষযজ্ঞের ঘটনায় আমাদের শিখিবার, বুঝিবার ও অনুকরণ করিবার কি কি জ্ঞানগর্ভ বিষয় আছে তাহার উল্লেখ, তৎসমুদয়ের যথাশক্তি ব্যাখ্যা, এবং সমগ্র দক্ষযজ্ঞ যে অপূর্ব্ব জ্ঞানোপদেশে পরিপূর্ণ তাহা প্রতিপাদন করা—বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীমৎ ভাগবত গ্রন্থে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ-সমাপ্তি-কালে ঋষিপ্রবর লিখিয়াছেন "অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই পুণ্য হয় এবং অধর্ম্মের কারণ পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহা হইতে স্বতন্ত্র

হইতে পারিলেই আত্মমল দূরীভূত হয়"। মহর্ষির এই মধুময়ী উক্তিতে বুঝা গেল, দক্ষযজ্ঞ এই শিক্ষায় পরিপূর্ণ; সুতরাং মহর্ষিমহোদয় পুনরায় লিখিয়াছেন "দক্ষযজ্ঞের বিবরণ অতি পবিত্র, উৎকৃষ্ট যশস্কর আয়ুর্বর্দ্ধক এবং পাপবিনাশক। যে মানব ভক্তিভাবে ইহা শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তন করে, তাহার সকল পাপ বিদূরিত হইয়া যায়"।

যাহাহউক উপরি উক্ত বিশ্ববিখ্যাত বিরাট যজ্ঞের প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ দক্ষ সামান্য নরপতি ছিলেন না। "জগদ্গুরু স্বয়ং স্বয়ম্ভু তাঁহার জামাতা এবং সর্ব্বসতীর আদর্শ স্থানীয়া এবং ত্রিতাপহারিণী শ্রীশ্রীমতী স্বয়ং ভগবতী তাঁহার কন্যা, সুতরাং তিনি ভুবনবিখ্যাত না হইবেন কেন? মহা-রাজাধিরাজ দক্ষ অতুল সাম্রাজ্যের অধিপতি, সমস্ত গিরিকুলের একমাত্র ছত্রপতি, মুনি ও ঋষিদিগের তিনি অনুগৃহীত, অসংখ্য ধনভাণ্ডারের তিনি অধিকারী এবং প্রভূত প্রখ্যাতি, পরাক্রম ও বিদ্যাবুদ্ধিতে দক্ষ অতীব উৎকৃষ্ট। যিনি "পুরুষ" রূপে চরা-চরের শিক্ষক ও আচার্য্য, যিনি কৈলাসের অধীশ্বর এবং অতুলনীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গুরু, এহেন মহাদেবের তিনি শ্বশুর; এবং "সতী"রূপে যিনি ত্রিসংসারের শক্তি এবং শিবপত্নীরূপে অখণ্ডমণ্ডলের গুর্ব্বী, এহেন ভবানীর তিনি পিতা, সুতরাং দক্ষরাজা বড় না হইবেন কেন? শাস্ত্রমধ্যে লিখিত আছে, মহারাজাধিরাজ দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র এবং মনুর জামাতা। দক্ষের ষোড়শ কন্যা মধ্যে একটি কন্যা (সতী) শঙ্করের সহ-ধর্ম্মিণী। এই কন্যা যৌবন কালেই যোগ দ্বারা তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র বা কন্যা জন্মগ্রহণ করে নাই। সতীর জনক শ্রীমৎ রাজা দক্ষ, তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্বামীর (শিবের) অপমান করায় পিতৃপবর্ত্তিত মহাযজ্ঞে সতীদেবী কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই "ভবপত্নী সতী" পতি ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না। এই জন্য তিনি শাস্ত্রমধ্যে 'সতী' নামে সুপ্রসিদ্ধা।

মহারাজা দক্ষের শাসন সময়ে, প্রজা-পতি প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টাগণের একটি মহাযজ্ঞে প্রধান প্রধান দেবতা, ঋষি, মুনি ও সাত্ত্বিক পুরুষগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলে পরমানন্দে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন, এমন সময়ে "সূর্য্যসম তেজঃপূর্ণ-কলেবর-ধারী" রাজা দক্ষ সেই বিরাট সভায় শুভাগমন পূর্ব্বক সমাগত ঋষি, মুনি প্রভৃতিকে যথা বিধি নমস্কার করিলেন। সমাগত সভ্যগণ দক্ষের রাজসম্মান রক্ষা-জন্য, স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার জামাতা শিব, এবং বিষ্ণু ও ব্রহ্মা তাঁহাদের আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষের অভ্যর্থনা করেন নাই। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা এবং লোকপালক বিষ্ণু শ্রীমৎ দক্ষকে অভ্যর্থনা না করায়, রাজাধিরাজ দক্ষ অনুমাত্রও লজ্জিত, অপমানিত বা বিষাদ-গ্রস্ত হইলেন না, বরং অতীব ভক্তি সহকারে তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহাদের আদেশ ও অনুরোধে সভাস্থলে উপবেশন করি-লেন। দক্ষ ও বুঝিতেন যে, ভগবান ব্রহ্মা

ও বিষ্ণু তাঁহা অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং তাঁহারা পূজ্য ও আরাধ্য। কিন্তু মহাদেব যাহাই হউন, দক্ষ তাঁহার শ্বশুর এবং তিনি দক্ষের জামাতা। শ্বশুরগণ পিতৃস্থানীয়, সুতরাং জামাতাগণ শ্বশুরবৃন্দকে পিতাবৎ সম্মান করিতে সামাজিক নিয়মানুসারে বাধ্য। এহেন মহতী সভায়, এহেন বিশ্ববিখ্যাত বিরাট যজ্ঞক্ষেত্রে, বিশেষতঃ চরাচরের প্রধান প্রধান দেবতা, ঋষি, মুনি ও অগ্নিহোত্রীগণের সম্মুখে, মহাদেব তাঁহার শ্বশুর দক্ষের সম্মান রক্ষা করা দূরে থাকুক তাঁহার সভাস্থলে শুভাগমন দর্শন করিয়াও আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন না; ইহাই দক্ষের নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয়। শিবের এই ব্যবহারে দক্ষ রাজা নিজে নিতান্ত অপমান বোধ করিলেন। কিছুক্ষণ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া, রোষকষায়িতলোচনে বক্রীভূত কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে করিতে, সভাস্থিত সমুদয় সভ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক, দক্ষরাজা জলদগম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন "হে মহানুভব দেবতা ও তাপসগণ! আপনাদের সম্মুখে, এই বিরাট সভাস্থলে, আমার জামাতা 'শিব' আমার সম্মান রক্ষা না করিয়া, আমাকে অপমানিত করিল। এই ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, সমাজকে এবং সাধুসমূহের আচরিত পন্থাকে কলঙ্ক-কালিমায় দুষ্ট করিয়া, অসৎ-দৃষ্টান্ত-প্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য হইল। বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও মহাপবিত্র বৈশ্বানরের (অগ্নির) সম্মুখে, এই শিব আমার পরমাসুন্দরী সতী কন্যাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছে, এই পাণিগ্রহণসূত্রে শিব আমার জামাতা বলিয়া গণ্য, সুতরাং সে আমার শিষ্য ও সন্তানসমতুল্য। এখন বুঝিলাম, এই মর্কটলোচন মহাদেব আমার মৃগনয়না তনয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র। এই ব্যক্তি ভীষণ ভূত প্রেতদিগকে সঙ্গে লইয়া, মত্তোন্মত্তের ন্যায়, অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে, নগ্নবেশে শ্মশানে শ্মশানে পরিব্রজন করে এবং চিতাভস্মে স্নান করিয়া, আলুথালুভাবে বিকীর্ণ বিশ্রী কেশগুচ্ছসহ নানাদিক প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, কখন বিকট উচ্চ হাস্য করে, কখন বা নয়ন হইতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে। ইহার কণ্ঠবিবর হইতে বিষম বিরক্তিজনক শব্দ নিঃসৃত হয়। গলদেশে প্রেতমালা, গাত্রে শবাস্থির ভূষণ, হস্তে নরকঙ্কাল এবং বদন-মণ্ডলে বিবিধ বর্ণের চিত্রাঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যক্তিকে লোকে "শিব" কহে, কিন্তু ইহার তুল্য অশিব আর কেহ নাই। এই ব্যক্তি সদাই উন্মত্ত এবং উন্মত্ত ব্যক্তিরই প্রিয় ও অধিনায়ক। অহো! আমি ব্রহ্মার আজ্ঞায় এই অপবিত্র দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে সাধ্বী কন্যা সম্প্রদান করিয়া কি গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছি!!" এবম্প্রকার বাক্যাবলী উচ্চারণ করিয়া জলস্পর্শ পূর্ব্বক দক্ষরাজা মহাদেবকে অভিশাপ প্রদান উদ্দেশে পুনরায় কহিলেন "এই শিব দেবতাদিগের অধম। দেবতাগণের যজ্ঞে ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতির সহিত শিব যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইত, কিন্তু অদ্য হইতে ইহাকে আর যজ্ঞভাগ প্রদত্ত হইবে না।" এই অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া রাজা দক্ষ সেই

সভাস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; শিব ও ব্রহ্মা মৌনীবৎ উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনায় পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, শ্বশুর ও জামাতা এতদুভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত জামাতা হইতেই হইয়াছিল। যাঁহারা বিবেচনা করেন, পরবর্ত্তী মহাযজ্ঞে দক্ষরাজা "বিনা কারণে ও বিনা দোষে" তাঁহার জামাতার (শিবের) অবমাননা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উক্তি সম্পূর্ণ অভ্রমাত্মিকা নহে। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টাদিগের প্রবর্ত্তিত এই যজ্ঞের ঘটনায় একটি উৎকৃষ্ট রহস্য আছে, সর্ব্বপ্রথমে তাহার উন্মেষ হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মার আজ্ঞায় ও অনুরোধে দক্ষরাজা তাঁহার কন্যার সহিত শিবের বিবাহ দিয়াছিলেন একথা সত্য, কিন্তু যজ্ঞক্ষেত্রের সভাস্থলে ব্রহ্মার সম্মুখে দক্ষ যখন কহিলেন "ব্রহ্মার এই পরামর্শে শিবের সহিত আমার কুমারী কন্যার বিবাহ দিয়া আমি কি গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছি।" তখন ভগবান্ ব্রহ্মা একটি মাত্রও কথা কহিলেন না। বিবাদের মীমাংসা অথবা আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য ব্রহ্মার মুখকমল হইতে একটি মাত্রও বাক্য নিঃসৃত হইল না। ইহার কারণ কি? তবে কি তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন জন্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ভগবান ব্রহ্মা দক্ষের উক্তির সমর্থন করিলেন? তাহাও নহে। এই ঘটনার আভ্যন্তরিক রহস্যের উন্মেষণ হইলে, পাঠকেরা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। দক্ষ মহারাজা অত্যন্ত প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন; বিদ্যা, বুদ্ধি, তপ, সাধন, পুণ্যময় কর্ম্ম ইত্যাদি জন্য তিনি দেবতাদিগের নিকটেও সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মগরিমা এতদূর প্রবলা ছিল—তিনি এতাদৃশ অহঙ্কারী পুরুষ ছিলেন—তাঁহার অতুল প্রখ্যাতি, প্রভুত্ব, ধনবল, জনবল, ঐশ্বর্য্য, দৈহিক সৌন্দর্য্য ও একাধিপত্য জন্য এবম্প্রকার মদ ও গর্ব্ব উৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি ধরাকে "সরা"র ন্যায় জ্ঞান করিতেন। অনন্ত আকাশকে তাঁহার মস্তকের ছত্র এবং ধরিত্রিকে পদস্থাপনের আসন বিবেচনা করিতেন। তদ্ভিন্ন প্রায় সমুদয় বিক্রমী রাজা ও বিদ্বান্ পুরুষকে উপহাস বা উপেক্ষা করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতেন। বুদ্ধিমান দক্ষরাজা মনোমধ্যে অবশ্যই ইহা জানিতেন ও বুঝিতেন যে, শিব তাঁহার জামাতা হইলেও অখিল চরাচরের গুরু, সুতরাং তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; ইহাও তিনি অবগত ছিলেন যে, শ্বশুর হইয়াও তিনি শিবের নিকটে দাসানুদাস-তুল্য। দক্ষের এই আত্মগরিমা, অহঙ্কার ও মহাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে দেবতা ও ঋষিরা মন্ত্রণা করিয়া রাখিয়াছিলেন; সংহারকর্ত্তা শিবের সহায়তায় দক্ষের বিনাশ করার মন্ত্রণা—ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মুনি ও ঋষিরা শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে এই যজ্ঞে এই জন্য কৌশল করিয়া বিবাদোৎপাদন করিয়া দিয়াছিলেন; শিব ও ব্রহ্মা তাহা জানিতেন, এই জন্য ব্রহ্মা কোন কথাই কহেন নাই, কিন্তু দক্ষ তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না। দেবদিগের ইচ্ছায় মায়াপ্রভাবে সভাস্থলে

তাঁহার আধ্যাত্মিক বুদ্ধির লোপ হইয়াছিল, সেইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতাকে (ভগবান্ শঙ্করকে) বিষম কটুকথাসমূহ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শিব ও ব্রহ্মা জানিতেন, দক্ষের এই ক্রোধ কেবল মায়ার কুফল স্বরূপ, সুতরাং ইঁহাদের কেহই মুখব্যাদান করেন নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক রহস্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি কেবল সামাজিক ভাবে বা সাধারণ বৈষয়িক ভাবে এই ঘটনার আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে পাঠকেরা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, শ্বশুর ও জামাতার পারস্পরিক বিবাদের মূল কারণ মহাদেব এবং তিনিই প্রথমে অপরাধী।

যাহা হউক, যজ্ঞস্থল হইতে রাগদ্বেষ-পরায়ণ দক্ষ প্রস্থান করিবার পরে, শিবানুচরদিগের প্রধানস্থানীয় মহাবিক্রমী নন্দী নিতান্ত কোপ-সহকারে কহিতে লাগিলেন, "আমার প্রভু ও পূজ্য দেবাদিদেব মহাদেবকে যে ব্যক্তি দক্ষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচনা করে, সে পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিমুখ ও বঞ্চিত হউক। যাহারা শিবের অপমান সহ্য করে, বেদশাস্ত্রীয় জ্ঞান হইতে তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া সামান্য অনিত্য সংসার-সুখে আসক্ত হউক। যাহারা জগৎ-গুরু শঙ্করকে অপমানিত দেখিয়া কোপিত না হয়, তাহারা আত্মাকে দেহের ন্যায় মৃত্যু-পরায়ণ ভাবুক, তাহারা পশুতুল্য হইয়া কামিনী ও কাঞ্চনের মায়ায় আবদ্ধ থাকুক। দক্ষের অনুবর্ত্তীগণ সকল প্রকার শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যাউক এবং দক্ষের বদনমণ্ডল ছাগাকার হউক।" ব্রাহ্মণদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়া ক্রোধান্ধ নন্দী তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু ভৃগুমুনি নন্দীর এই অভিশাপকে মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা খণ্ডন করিয়া, উপদেশ-চ্ছলে কহিতে লাগিলেন "নন্দী বাস্তবিক পাষণ্ড ও মূর্খ, তাহাতেই বেদজ্ঞানের সেতু-স্বরূপ ব্রাহ্মণবর্গের নিন্দা করিয়াছে! যাহারা ভবের ব্রত ধারণ করিয়া ভবের অনুবর্ত্তী হয়, তাহারা শাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী এবং নিশ্চয়ই পাপাত্মা। যে সকল পুরুষ শিবদীক্ষায় দীক্ষিত হয় তাহাদের বুদ্ধি বিকৃত ও চিত্তের পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়া যায়, এবম্প্রকার ব্যক্তি শিবের ন্যায় জটা, ভস্ম, অস্থি ও কঙ্কাল ধারণ পূর্ব্বক সুরা ও আসব-কেই দেবতার ন্যায় আদর করে। শিব-দীক্ষা কেবল তমোময় এবং পরিণামে পাষণ্ডত্ব প্রাপ্তির প্রধান কারণ।" এব-ম্প্রকার বক্তৃতার পরে মহর্ষি ভৃগু তাঁহার বাগ্মীতা সম্বরণ করিয়া সভার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন; সুশীতল সমীরণের দাক্ষিণহিল্লোলে তাঁহার সুদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু সুরম্যভাবে বিচলিত হইতে লাগিল। দেবতা, ঋষি, মুনি, সাগ্নিক ও অপরাপর সভ্যগণ সভা ভঙ্গ করিয়া যজ্ঞক্রিয়ার সমাধা করিলেন, সকলেই স্ব স্ব আশ্রম অভিমুখে প্রয়াণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

পতঞ্জলির কাল নির্ণয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

—•:•:•—

(৪) যিনি মহাভারত রচয়িতা ও বেদবিভাগকর্ত্তা সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই ব্রহ্মসূত্রপ্রণেতা কি না এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি? যদি তাঁহারা সমসাময়িকই হ'ন তাহা হইলে বেদান্তমত—শঙ্কর, রামানুজ, বলদেব—যে ভাবেই লওয়া যাউক না কেন—উহা অতি প্রাচীন। এমন কি পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বেও আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে বেদান্তমতের বিচার হইয়াছিল বলিতে হইবে।

(৫) উপবর্ষের সময় হইতে পুনরায় আর্য্যাবর্ত্তে নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা হয়; লোকের মেধা শক্তি হীন হওয়াতে সুবিস্তীর্ণ মাহেশও ঐন্দ্রাদি ব্যাকরণ বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসে। এই সময়ে কাত্যায়ন বা বররুচি, ব্যাড়ি, পাণিনি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রভূত মাহেশ ও ঐন্দ্র ব্যাকরণ অধিগত করেন। পাণিনি সুবিস্তীর্ণ মাহেশ ব্যাকরণ হইতে সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য ক্ষুদ্রাকারে তাহার সার সঙ্কলন করেন। মাহেশব্যাকরণ পাণিনি অপেক্ষা এত বৃহৎ যে পণ্ডিতেরা পাণিনি ব্যাকরণকে গোষ্পদতুল্য বলিয়া বিবেচনা করেন। মহাভারতে ও অন্যান্য স্থানে যত আর্ষ প্রয়োগ আছে তাহারা কিরূপ নিয়মে সিদ্ধ তাহা একমাত্র মাহেশ ব্যাকরণেই দেখিতে পাওয়া যায়। "যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ। তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে।"

এইরূপ সমসময়ে পতঞ্জলিও প্রাদুর্ভূত হ'ন। যোগসূত্র ভাষ্যকার ব্যাসও এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হ'ন। এই সময়েই আবার ব্রাহ্মণ্য-যুগের প্রাদুর্ভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই ব্রাহ্মণ্যযুগের প্রাধান্য বা প্রাদুর্ভাব হইতেই নূতন নূতন দর্শনমতের পরিপুষ্টি হইয়াছে। এইরূপ সময়ের অন্যূন সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা কেহ বা কপিলের মত, কেহ বা জৈমিনির, কেহ বা বেদব্যাসের মত, আবার কেহ বা হিরণ্যগর্ভপ্রচারিত যোগসূত্র আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই সময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং ক্রিয়াকাণ্ডের মীমাংসা ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নির্ণীত হয়। পাণিনি প্রভৃতি মহর্ষির সময় হইতে অন্যূন সহস্র বৎসর কাল, যে পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রবল না হইয়া উঠে সে পর্য্যন্ত-বেদাঙ্গ-শাস্ত্র, ষড়দর্শন, ও প্রচলিত পুরাণাদি সংগৃহীত হইয়া প্রণীত হইতে থাকে। সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চয় যে একজন ব্যাস ব্রহ্মসূত্রপ্রণেতা ও আর একজন ব্যাস যোগসূত্রভাষ্যকার। যোগভাষ্যের দার্শনিকতত্ত্ব ও যুক্তিসম্বলিত এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। সাধকেরা এই ব্যাসভাষ্য বুঝিয়া বুঝিয়া পড়িয়া যাইলেও তদনুযায়ী ক্রিয়া, পর হইলে, যোগতত্ত্ব সাক্ষাৎকারহেতু উহা যে কিরূপ পদার্থ তাহা অপরোক্ষ করিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইবেন। (৬) সংস্কৃত পুরাণ ইতিহাস ও সাহিত্যশাস্ত্রে—কাত্যায়ন, বররুচি, বিক্রমাদিত্য, ভর্ত্তৃহরি, চন্দ্রগুপ্ত, ইঁহাদের নাম বহুস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং

তাঁহাদের কোন একজনের কথা উল্লেখ করিতে হইলে, পরিচয় দিবার কালে, বিশেষ ভাবে তাহার প্রমাণ দিতে হইবেক।

কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন, অহিংসা বা প্রাণিহত্যা নিবারণাদি নিয়ম প্রতিপালন কেবল বৌদ্ধদিগের মধ্যেই বিশিষ্ট ছিল এবং উহা বৈদিক মতের বিরুদ্ধ; সুতরাং যোগশাস্ত্রে এই অহিংসামত প্রচলিত থাকায় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যোগসূত্রসমূহ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পরে উৎপত্তি হইয়াছিল।

উক্তপ্রকার যুক্ত্যাভাসের মূল কোন সত্য নাই। কেননা যজ্ঞানুষ্ঠান এবং যজ্ঞার্থে পশুবধ, বিবাহিতজীবন গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে সেব্য; কিন্তু উহা ব্রহ্মচারী বা যতির পক্ষে সেব্য নহে। সুতরাং যোগসূত্রে অহিংসানুষ্ঠান সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী ও যতিদিগের সেব্য; কদাচ গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে সেব্য নহে।

সপ্তম যুক্ত্যাভাস।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সপ্তম যুক্ত্যাভাস এই—

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে যোগমতে দোষারোপ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে পতঞ্জলি বাদরায়ণের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হ'ন। পাণিনি ব্রহ্মসূত্র ও পারাশর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনি পারাশর্য্য বাদরায়ণের পরে এবং মহাভাষ্যপ্রণেতা (যোগসূত্র প্রণেতা) পতঞ্জলির অনেক পরে জন্ম গ্রহণ করেন বলিতে হইবে। সুতরাং দুইজন পতঞ্জলি ইহাই স্বীকার করিতে হইতেছে। একজন মহাভাষ্য-প্রণেতা যিনি বাদরায়ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন আর একজন যোগসূত্র-প্রণেতা, যিনি বাদরায়ণের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহাদের সপ্তম যুক্ত্যাভাসের উত্তর এই—

পতঞ্জলি যোগমতের প্রতিষ্ঠাতা নহেন; মহর্ষি হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি যোগমতের প্রতিষ্ঠাতা। হিরণ্যগর্ভের পরে বার্ষগণ্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যোগমত পরিপুষ্ট করেন। কপিলপ্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রও এইরূপে আসুরি, পঞ্চশিখ প্রভৃতি আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হয়। ব্রহ্মসূত্র কিম্বা তাহার ভাষ্যপ্রণেতা শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ যোগমতাবলম্বী কোন দার্শনিক পণ্ডিতের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীরামানুজাচার্য্য একস্থলে হিরণ্যগর্ভের নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে যে যে সূত্র, যোগমতের উপর দোষারোপ করিয়াছেন তাহার কারণ,—সাংখ্য দর্শনের যে যে সূত্রের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে—তাহা হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মসূত্র বলেন, সাংখ্য ও যোগ দর্শন গ্রাহ্য নহে কেননা উহাদের সহিত শ্রুতি বা উপনিষদ্মতের সহিত মিল নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রুতির প্রামাণ্য সাংখ্য ও যোগদর্শন হইতে বলবান্। তৃতীয়তঃ যোগ ও সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা মহর্ষি হিরণ্যগর্ভ ও কপিল ইঁহারা জ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধে আদিগুরু হইলেও, মনুষ্য ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং কোন ২ স্থলে যুক্তিবিরুদ্ধও বলিয়া বোধ হয়। চতুর্থতঃ শ্রুতিকেই সকল মহর্ষিগণ অনুসরণ করিয়া থাকেন।

পুনশ্চ শ্রীশঙ্করাচার্য্য,—বেদান্তসূত্রে যে স্থলে যোগমতের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে সেই স্থলে, তিনি যে যোগসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পতঞ্জলির নহে; তাঁহা বার্ষগণ্য বা হিরণ্যগর্ভপ্রণীত হইবে: কেননা স্বামী শঙ্করাচার্য্য 'যোগ' শব্দের যে পরিভাষা প্রদান করিয়াছেন তাহা হিরণ্যগর্ভ প্রণীত এবং উহা, পতঞ্জলি যে 'যোগ' শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে পৃথক। 'তত্ত্বজ্ঞানের উপায়কে যোগ কহে' ইহাই হিরণ্যগর্ভ প্রণীত যোগ শব্দের পরিভাষা, এবং পতঞ্জলি, 'চিত্তের বৃত্তিসমূহ নিরোধকে যোগ কহে, এইরূপ বলিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভ প্রণীত পরিভাষা বিষ্ণুপুরাণেও উদ্ধৃত হইয়াছে। আরও দেখা যায় পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র—শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রণীত বেদান্তভাষ্যের ভামতী নামে যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে বার্ষগণ্য নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য—তাঁহার 'যাজ্ঞবল্ক্য গীতায়' এই মতের বিশেষরূপে পরিপুষ্টি সাধন করেন।

সুতরাং এই সমস্তমত আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। ইহা পতঞ্জলির পূর্ব্বে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। পতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রের কোন একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন মাত্র এবং এই পতঞ্জলি মুনি পাণিনি ও বাদরায়ণের বহু পরে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতিবাদের দ্বিতীয়াংশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, যদি দুইজন পতঞ্জলি না হইবেন তাহা হইলে পাণিনির মহাভাষ্যে যে যোগমত বর্ণিত আছে ও যোগ শাস্ত্রের যে যোগমত—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে কেন? কেননা তাঁহারা বলেন কোন একজন লোক, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতের অনুসরণ করিয়া দুই খানি বা ততোধিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়। তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ দুই এক স্থলে উল্লেখ করেন। (১) মহাভাষ্য প্রাণিহিংসা অনুমোদন করেন তিনি কোন একস্থলে বলিয়াছেন 'বাহ্লীক প্রদেশের ছাগ যজ্ঞের উপযুক্ত নহে'। (তখন বৌদ্ধধর্ম্ম বোধ হয় প্রাদুর্ভূত হয় নাই।) অপর পক্ষে যোগশাস্ত্র প্রাণিহিংসা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেন। ইহারই উপর যোগশাস্ত্রের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যোগশাস্ত্র যজ্ঞার্থে পশুবধ বা বৈধহিংসা নিষেধ করিয়াছেন। শ্রুতি যদিও বৈধহিংসা অনুমোদন করেন কিন্তু নিষেধ ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। (২) যোগশাস্ত্র ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহার কতকগুলি বিশেষণ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহাভাষ্য ঈশ্বরের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ভিন্ন। মহাভাষ্যকার যজ্ঞফলে বিশ্বাস করেন; এবং আরও বলেন ঈশ্বরই এই যজ্ঞফলদাতা। প্রকৃত পক্ষে সেখানে মহাভাষ্যকার পূর্ব্বমীমাংসা প্রণেতা জৈমিনি মুনির অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। উক্ত দুই কারণ বশতঃ অনেকে বলিয়া থাকেন যে মহর্ষি পতঞ্জলি একই ব্যক্তি হইয়া কিরূপে দুই বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক মতের পোষণ করিবেন? তবে মহাভাষ্য পাঠ করিলে দেখা যায় যে কোন

কোন স্থলে মহর্ষি পতঞ্জলি,—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিদিগের মতও অনুসরণ করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে কৈয়টের সহিত একমতও হইয়াছেন দেখা যায়। পাণিনির পূর্ব্বে আপিশালী, ভারদ্বাজ, গার্গ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিদিগের নাম মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভাষ্যে এরূপ স্থলও বিরল-দর্শন নহে যেখানে মহর্ষি পতঞ্জলি কতকগুলি প্রশ্ন সম্বন্ধে নিরুত্তর থাকিয়া তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বৈয়াকরণিদিগের মত মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

এবং সেই পতঞ্জলিই, তিনি যখন যোগসূত্র রচনা করেন তখন তিনি বার্ষগণ্য এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে অনুসরণ করিয়াছেন। সেই জন্য অনেকে অনুমান করেন একই পতঞ্জলি যিনি মহাভাষ্য রচনা করেন তিনি যোগসূত্র প্রণেতা হইতে পারেন না কেননা উভয় গ্রন্থেই একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মত ও লক্ষণ উল্লিখিত আছে। কিন্তু একথা সমীচীন নহে। পূর্ব্বে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। আরও বলা যাইতে পারে যে, পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র তিনি ষড়-দর্শনেরই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত টীকা পাঠকালে, তিনি সেই বিবিধ দর্শনেরই বিশেষ পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র যোগ দর্শনের 'তত্ত্ববিশারদী' নামে এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। পক্ষিলমিশ্র প্রণীত ন্যায় দর্শনেরও তিনি একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি উদ্যোতকাচার্য্যের এক বার্ত্তিকও প্রণয়ন করেন। এবং তিনিই বেদান্ত সূত্রের শঙ্করভাষ্যের উপর 'ভামতী' নামে এক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত কোন গ্রন্থেই তিনি যে দর্শন বিশেষের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতযুক্ত এরূপ কিছুই লক্ষিত হয় না। তিনি যখন যে দর্শনের টীকা লিখিয়াছেন তখন সেই দর্শনেরই তিনি সবিশেষ অনুশীলনানুরক্ত এইরূপ দৃষ্ট হয়। একই পণ্ডিতের বহুদর্শন-শাস্ত্রের উপর মন্তব্য ও টীকা প্রণয়ন,—এরূপ দৃষ্টান্ত অধুনাও বিরল নহে। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের উপর এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যকারিকার যে এক টীকা প্রণয়ন করেন পণ্ডিত তারানাথ তাহারও এক টীকা প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত তারানাথ 'সিদ্ধান্ত বিন্দুসার' নামক বেদান্ত গ্রন্থেরও এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন পণ্ডিত তারানাথ যখন যোগসূত্রের টীকা লিখিয়াছেন তখন তাহাকে যোগমতের উপাসক বলিয়া বোধ হয়; আবার যখন তিনি সাংখ্য-দর্শনশাস্ত্রের উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তখন তাঁহাকে সাংখ্যমতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সিদ্ধান্ত বিন্দুসারের টীকা প্রণয়ন কালে আবার তাঁহাকে বেদান্তী বলিয়া বোধ হয়। সেই জন্য ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের টীকা লিখিতে সমর্থ। সুতরাং, মহাভাষ্যের যোগমতের সহিত দর্শনোক্ত যোগমতের মিল নাই বলিয়া, উহা একই ব্যক্তির কৃত হইতে পারেনা, এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

হিন্দু পণ্ডিতদিগের মধ্যেও ঐরূপ বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে যে, পতঞ্জলি দুইজন ব্যক্তি নহেন। তাঁহারা বলেন একজনই মহাভাষ্য ও দর্শন লিখিয়াছেন। এখনও মহাভাষ্য অধ্যয়নআরম্ভের পূর্ব্বে বেদান্ত ও অন্যান্য পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের ন্যায় শান্তিপাঠ প্রচলিত আছে। ত্রিবাঙ্কুর হইতে কাশ্মীর, লাহোর হইতে ঢাকা সমস্ত ভারতবর্ষে এই শান্তি পাঠ এখনও হইয়া থাকে। যখন গুরুর নিকটে শিষ্যেরা মহাভাষ্যপাঠ আরম্ভ করেন তখন সেই প্রথম দিনে এই নিম্নলিখিত মন্ত্র তাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন। এই শান্তিপাঠ ভিন্ন মহাভাষ্যপাঠ নাকি নিষ্ফল হয়। "যোগেন চিত্তাশা পদেন বাচাম্ মলম্ শরীরাশা চ বৈদ্যকেন, যোপাকারোত্থম্ প্রবরং মুণীনাম্, পতঞ্জলি মানতোস্মি"। যিনি যোগশাস্ত্র লিখিয়া কিরূপে মনকে বিশুদ্ধ করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছেন, যিনি মহাভাষ্য নামে এক অপূর্ব্ব ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ভাষার বিশুদ্ধতা উপদেশ দিয়াছেন যিনি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কিরূপে শরীরের বিশুদ্ধতা সম্পন্ন করিতে হয় শিক্ষা দিয়াছেন এবং যিনি তাঁহার সমকালীন সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানী প্রবর মহর্ষি পতঞ্জলিকে করযোড়ে প্রণাম করি।

তাহা হইলে এখন পতঞ্জলির জন্ম সময়ে ভাষা ও ধর্ম্ম প্রভাব নির্ণয় করা যাউক। পতঞ্জলির সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই প্রচলিত ছিল। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে উচ্চারণ প্রণালী পৃথক ছিল। ইহা মহাভাষ্য বর্ণিত শকটচালক ও তাহার প্রভু ব্রাহ্মণের কথাবার্ত্তা হইতে সপ্রমাণ হয়। সিন্ধুনদীর অপর পারে যাহারা বাস করিত তাহারা ধাতুসমূহের অর্থ ভিন্ন প্রকার মনে করিত। তাহাদের গ্রাম্যভাষা মহাভাষ্য নিন্দা করিয়াছেন।

শাক্যমুনির সময়ে পালিভাষা প্রচলিত হয়। তাঁহার সময়ে প্রজাবর্গ পালিভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধদেব প্রথমে তাঁহার শিষ্যবর্গকে সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার একটি শিষ্য "পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে বুদ্ধেরা পালিভাষায় উপদেশ দিয়াছেন" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পালিভাষায় উপদেশ দিবার জন্য প্রার্থনা করে।

পতঞ্জলির সময়ে ধর্ম্ম বেদানুমোদিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা তখন বৈদিক মতের অনুসরণ করিতেন। তাঁহার সময়ে যাজ্ঞিক ও ব্রহ্মবাদীর অভাব ছিল না। পতঞ্জলির সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত অতি পবিত্র ভূমি ও জ্ঞানের আকর ছিল। মহাভাষ্যে দেখিতে পাই যে তখন কথাসমূহের বিকৃত উচ্চারণও পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। শিষ্টাচার ও প্রাচীন লোকদিগের প্রতি কিরূপ আচার ব্যবহার প্রদর্শিত হইবে তাহারও প্রতি লোকের যথেষ্ট অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। পতঞ্জলির সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মর্য্যাদানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ ও পবিত্রতাসংরক্ষণ পদ্ধতি সুন্দররূপে বিদ্যমান ছিল। এইরূপে পতঞ্জলির সময়ে সমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিলে বোধ হয় তখন ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য পূর্ণ মাত্রায় প্রবল ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

"কাহার ভ্রম?"

চিরদিনই জানি শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাস-বিরচিত একখান মহাপুরাণ—

পণ্ডিতগণ বিশেষতঃ বৈষ্ণবসম্প্রদায়গণ ইহাকে, সকল পুরাণের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া চিরদিনই পূজা করিয়া আসিতেছেন। দার্শনিকগণ বেদান্ত সূত্রের সহোদর বলিয়া ইহার নিকট সততই বেদান্তের মর্ম্ম জানিতে যাইতেছেন; কিন্তু দুঃসময়ে মহতেরও অপবাদগ্রস্ত হইতে হয়; সময়ে চন্দ্রও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। "সময়এব করোতি বলাবলং" তাই ভীষণকাল চক্রের পরিবর্ত্তনে আজ অনুপযুক্ত স্থানে পড়িয়া মহতেরও দুর্গতি দেখা যাইতেছে—"অস্থানে পততামতীবমহতামেতাদৃশীদুর্গতিঃ"। এখন কোন ২ লোক বলিতেছেন শ্রীমদ্ভগবত বেদব্যাস বিরচিত নহে সুতরাং পুরাণও নহে। উহা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণরচয়িতা শ্রীবোপদেব গোস্বামীর বিরচিত একখানা কাব্য বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণগণনা প্রস্তাবে "ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা" ইত্যাদি বচনে যে ভাগবতকে পঞ্চম পুরাণ বলা হইয়াছে উহা 'দেবীভাগবত'। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান সেবক বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ কিন্তু দ্বৈতবুদ্ধিশক্তিসেবকদিগের বিষ্ণুবিদ্বেষ বা বৈষ্ণববিদ্বেষই শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ অপবাদের মূলভিত্তি বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা তর্ক করিয়া সময়ের অসদ্ব্যবহার করিতে চাহেন, না। আমরা কোন দেববিদ্বেষ বুঝি না, কাহারও দেববিদ্বেষের কথা শুনিয়া গলাগলি ছাড়িয়া দলাদলি করিতে ভালবাসি না। তর্ক করিয়া সময়ের অসদ্ব্যবহারও ভাল বাসি না; তাই ঐ উভয় মতের একটু বিচার করিয়া দেখিব "কাহার ভ্রম?"

শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে জানিতে পাই, বেদবিভাগও মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও বেদব্যাসের আত্মপ্রসাদ উপস্থিত না হওয়ায় দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে পরিশেষে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন।

এতদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের আপেক্ষিক আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হইলেও পদ্মপুরাণাদি প্রায় সমস্ত পুরাণেই শ্রীমদ্ভাগবতের নামও লক্ষণাদি লিখিত থাকায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও, অষ্টাদশ মহাপুরাণের ও উপপুরাণের নাম প্রাপ্ত হওয়ায় মহাপুরাণ ও উপপুরাণের সমসাময়িকতা স্বীকার করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের আধুনিকত্ববাদীগণ স্বমতসমর্থনের জন্য ঐ বচনগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিবেন সন্দেহ নাই।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্তালীলা সংবরণের ত্রিংশৎবর্ষ পরে ভগবান্ শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করান। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে স্বীয় পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট তাঁহার ভাগবতপাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। চারিটীমাত্র শ্লোক হইতে ভাগবত প্রণীত হইয়াছে। ঐ চারিটি শ্লোকই আদি-ভাগবত। একারণে শ্রীমদ্ভাগবত "চতুঃশ্লোকীয় ভাগবত" নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত চারিটি-শ্লোক বর্ত্তমান ভাগবতে পৃথকভাবে পৃথক-রূপে লিখিত আছে। বদরিকাশ্রমবাসী

পর যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হোয়েছিল, কথা প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের কথা উঠলে তিনি বোল্লেন স্বামীজী (শঙ্করাচার্য্য) অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগেই প্রাদুর্ভূত হন তিনি আরও বোল্লেন যে তার সঙ্গে আমাদের যোশীমঠে দেখা হলে এসম্বন্ধে অল্পবিস্তর প্রমাণও দেখাতে পারতেন।”

বোপদেব গোস্বামীর সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানে যেটুকু ইতিবৃত্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় তিনি আধুনিক নিজামরাজ্যের অন্তর্গত দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাপণ্ডিত ছিলেন। হেমাদ্রি প্রথমে দেবগিরির যাদব-বংশীয় মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধিকরণপণ্ডিত ছিলেন। পরে তিনি স্বয়ং দেবগিরির রাজা হইয়া বোপদেবকে নিজের সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত রাখেন। বোপদেব ‘মুক্তাফল’নামে যে গ্রন্থ করিয়াছেন হেমাদ্রি তাহার এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বোপদেবও হেমাদ্রির মতানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের এক উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ টীকার নাম “হরিলীলা”। হেমাদ্রিও ঐ হরিলীলা-টীকার একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বোপদেবের আবির্ভাবকালের প্রকৃততত্ত্ব এখনও নিঃসন্দেহে স্থির না হইলেও অনেকেই ১২৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আবির্ভাব সমর্থন করিয়া থাকেন—আমরা তাঁহার আবির্ভাব কালে অঙ্কপাত করিয়া জানাইতে না পারিলেও—তিনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও চিৎসুখাচার্য্যের অনেক পরবর্ত্তী লোক ইহা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারা যায় কারণ একথার প্রতিবাদপক্ষে কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তির কোন সম্ভাবনা নাই। বোপদেব গোস্বামী শঙ্করাচার্য্য ও চিৎসুখাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, এবিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই—উহা অলীক। বোপদেব বর্ত্তমান সময় হইতে ঊর্দ্ধসংখ্যা সতশাতবৎসরের লোক ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। তাঁহার চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তিতাবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নবদ্বীপে ঐ সময় হইতে বোপদেবকৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পঠনপাঠনা প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেবও মুগ্ধবোধব্যাকরণের এক টীকা প্রণয়ন করেন ইহা শুনা যায়। এখন দেখুন এগারশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী চিৎসুখাচার্য্য যে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকর্ত্তা উহা কতদিনের গ্রন্থ, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ঊর্দ্ধসংখ্যায় সাতশত বৎসরের লোক বোপদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা হইলে তাঁহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী চিৎসুখাচার্য্যের তাহার (অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের) টীকা করা একেবারে আকাশকুসুম হইয়া পড়ে। সুতরাং বোপদেব গোস্বামীই এই ভাগবতের রচয়িতা। ইহা বলিয়া যাঁহারা ভাগবতের অনার্ষত্ব ও আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তাঁহাদের ঐ মত সম্পূর্ণ রূপ নিরস্ত হইল সন্দেহ নাই। এজন্যই কোন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ক্রমসন্দর্ভের টীপ্পনীতে লিখিয়াছেন “এতেনেদং শ্রীমদ্ভাগবতং বোপদেবীয়মনার্ষমিতিবদতাং পাষাণ্ডানাং মুখে বজ্রচপেটাঘাতোজাতঃ শ্রীচিৎসুখাচার্য্যস্য পরম প্রাচীন.................... সুধীভিরাকলনীয়ং”। আর এসম্বন্ধে অধিক

লেখার প্রয়োজন দেখিনা এখন পাঠকগণই বিবেচনা করুন "কাহার ভ্রম" ?

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদ-
মৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা-
ভুবিভাবুকাঃ।"

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

শ্রীসূক্তম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

—০:০:০—

আদিত্যবর্ণে তপসোধিজাতঃ,
বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ।
তস্য ফলানি তপসানুদন্তু
মায়ান্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ।৬

পদপাঠঃ। আদিত্যবর্ণে, তপসঃ, অধিজাতঃ, বনস্পতিঃ, তব, বৃক্ষঃ, অথ, বিল্বঃ। তস্য, ফলানি, তপসা, নুদন্তু, মায়ান্তরায়াঃ, চ, বাহ্যাঃ, অলক্ষ্মীঃ॥

অন্বয়ঃ। হে আদিত্যবর্ণে! তবতপসঃ (নিয়মাদ্ধেতোঃ তপশ্চর্য্যার্থং বা) বনস্পতিঃ বিল্বোবৃক্ষো হধিজাতঃ, অথ—তপসা তস্য (বিল্বস্য) ফলানি (জাতানি) তানি মায়াস্তরায়া বাহ্যাশ্চ অলক্ষ্মীর্নুদন্তু।

বঙ্গার্থ। হে তরুণার্কবদরুণবর্ণে লক্ষ্মি! তোমার তপোহেতুই বিল্ব বনস্পতি উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে ঐ বিল্ববৃক্ষে সুদৃশ্য বিল্বফল সকল উদ্ভূত হয়। তোমার করুণা-সম্ভূত তপঃ প্রভাব বলে ঐ শ্রীফলরাজি আমার অজ্ঞান-অন্তরিন্দ্রিয়সম্পৃক্ত পাপাদি এবং বাহ্যেন্দ্রিয়সংসৃষ্ট দারিদ্র্যাদি অলক্ষ্মী বিনাশ করুক।

মন্তব্য। এই ঋক্ শ্রীসূক্তের ষষ্ঠী এবং দ্বিতীয়বর্গের আদ্যা। এই মন্ত্রে মহালক্ষ্মীর অসামান্য মাহাত্ম্য, পক্ষান্তরে জগৎসৃষ্টির মূলরহস্য শ্রীদেবতার পাদপীঠে বিরাজিত এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে সাধক স্বীয় আভ্যন্তর ও বাহ্য অলক্ষ্মী দোষ বিনাশ-কামনা করিতেছেন। তেজস্বিতা দোষা-পনোদনের উৎকৃষ্ট উপকরণ। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে সাধক শ্রীদেবতার তেজঃশক্তি সম্পৎসূচক নামে সম্বোধন করিতেছেন। লক্ষ্মীদেবীর তপশ্চর্য্যার্থ তাঁহার কর হইতে বিল্ববৃক্ষ উৎপন্ন হয় এরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। বামনপুরাণে আছে—"বিল্বো-লক্ষ্যাঃকরেঽভবৎ" অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর হস্তে বিল্ববৃক্ষ আবির্ভূত হইল। লক্ষ্মীদেবী বিল্ব-বনে তপস্যা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। ভার্গবপুরাণে দৃষ্ট হয়—"বিল্বাটব্যাং মহালক্ষ্মীরূপাস্তে বিল্ব-নায়কম্"। মহালক্ষ্মী বিল্বাটবীতে বিল্বনায়ক দেবাদিদেবের উপাসনা করেন। কালিকা-পুরাণে এতদ্বিষয়ে উল্লিখিত আছে—"তনু-মধ্যা পুরা বালা নীবাতটমুপাশ্রিতা, বিল্বারণ্যে তপশ্চক্রে লক্ষ্মীর্লোকহিতার্থিনী"। অর্থাৎ পুরাকালে ক্ষীণমধ্যা বালা লক্ষ্মীদেবী নীবা নদীর তটদেশে বিল্বকাননে জগন্মঙ্গল কামনায় তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। বিল্ববৃক্ষকে যে বনস্পতি বলা হইয়াছে, তাহার কারণ বিল্বে পুষ্পোদ্গম নাই অথচ ফলোৎপত্তি আছে। আর্য্যশাস্ত্র সাক্ষ্য প্রদান

করিতেছেন "অপুষ্পাঃ, ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ"। বিল্বফল যে সর্ব্ববিধ অলক্ষ্মী-পরিহারসমর্থ, তাহাও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় বাক্যে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যথা, "বিল্বনাথপ্রিয়ায়াস্তু নারায়ণ্যাস্তপোবলাৎ। বিল্বারণ্যং ফলত্যত্র লোকানলক্ষ্মীনিবৃত্তয়ে"।

তাৎপর্য্য—লক্ষ্মীদেবীর তপোবলে লোকের অলক্ষ্মী নিবৃত্তির উদ্দেশে বিল্ববৃক্ষে ফল উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে বাহ্য এবং আন্তর উভয়বিধ অলক্ষ্মী বিনাশের কামনা করা হইতেছে। আন্তর-অলক্ষ্মী পাপ-প্রবৃত্তি, বাহ্য-অলক্ষ্মী রোগ-শোক-দারিদ্র্য-কলহাদি। প্রকৃত সৌন্দর্য্য-দেবতা, যথার্থ বিভূতির ঈশ্বরী যে পবিত্রতার মূর্ত্তি, তাহাতে আর সংশয় নাই, সুতরাং পবিত্রতার সেবায় সৌন্দর্য্যের আরাধনায়, ঐশ্বর্য্যের পূজায় অনন্যমনা মানব যে জগতে দোষস্পর্শ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ক্রমে পবিত্রতার আবির্ভাবে বাহ্যউৎকর্ষলাভে সামর্থ্যসম্পন্ন হইবেন, ইহা কল্পনারাজ্যের স্বপ্নময় তথ্য নয়, সত্যপক্ষপাতী শাস্ত্রের বিজয়দুন্দুভি ঘোষ। লক্ষ্মীর তপস্যার্থ বিল্বের বিকাশ যে এক পৌরাণিক সত্য, তাহা অদ্যাপি বিল্বের "শ্রীফল" নাম ঘোষণা করিতেছে। বিল্বফল প্রকৃতই শাস্ত্রদৃষ্টিতে পুণ্য পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যের আকর। পৌরাণিককবি ইহাকে (বিল্বফলকে) সৌভাগ্যদেবতার পুণ্যফল বা তপঃফলরূপে বর্ণনা করিয়া সূক্ষ্মসমালোচকের চক্ষে দোষপঙ্কস্পৃষ্ট রূপে দৃষ্ট হইবেন না।

এতৎ প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণীয় বিল্বমাহাত্ম্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, প্রসঙ্গের সুদীর্ঘতায় শ্রান্ত পাঠক কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। স্কন্দপুরাণে উল্লিখিত আছে, "শিবলিঙ্গার্চ্চনোদ্যোগী জগদ্রক্ষণদীক্ষিতঃ। মহাবিষ্ণুস্তপশ্চক্রে তস্যৈব সহচারিণী। মহালক্ষ্মীস্তপস্তেপে ভর্তৃসেবাপরায়ণা। তদা বিল্বতরুর্জাতো লক্ষ্মীদক্ষিণহস্ততঃ। তৎপত্রৈরর্চ্চয়ামাস মহাবিষ্ণুশ্চ শঙ্করম্। বিল্বপত্রার্চ্চিতস্তুষ্টো মহাদেবো দয়ানিধিঃ। সর্ব্বদেবোত্তমত্বং চ সর্ব্বব্যাপিত্বমেবচ, প্রদদৌ সর্ব্বপূজ্যত্বং সর্ব্বসিদ্ধিং চ বিষ্ণবে। শ্রীবৃক্ষইতি বিখ্যাতো বিল্বঃ সর্ব্বৈঃ প্রপূজিতঃ। ত্রিগুণৈস্ত্রিদলৈঃ পত্রৈস্ত্রিমূর্ত্তি প্রীতিদায়কঃ। ত্রয়ীময়োঽয়ং বিখ্যাতো নীতোদেবৈশ্চ নন্দনম্। কৈলাসেঽপিচ বৈকুণ্ঠেশ্বেতদ্বীপে সুরালয়ে, মন্দরাদিষু পুণ্যেষু ক্ষেত্রেষু সকলেষু চ, পূজ্যতে বিল্বতরুঃ শ্রীবৃক্ষাইতি নারদ! ফলানি শ্রীতপোযোগাদ্ যস্যালক্ষ্মীবিনাশনে, লক্ষ্মীপ্রাপ্তৌ পটীয়াংসি সেব্যন্তে পুণ্যশালিভিঃ"। ইত্যাদি।

শ্লোক সমূহের বঙ্গার্থ—জগদ্রক্ষাকার্য্যে দীক্ষিত মহাবিষ্ণু শিবলিঙ্গার্চ্চনে উদ্যোগী হইয়া তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার সহচারিণী মহালক্ষ্মীও তৎসেবাপরায়ণা হইয়া তপস্যায় নিরতা ছিলেন, সেই সময়ে লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ হস্ত হইতে বিল্ববৃক্ষ উৎভূত হইল। মহাবিষ্ণু সেই লক্ষ্মীকরসঞ্জাত বিল্ববৃক্ষের পত্রদ্বারা শঙ্করের অর্চ্চনা করিলেন, অর্চ্চিত দয়ানিধি মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে সর্ব্বদেবোত্তমত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বপূজার্হ, এবং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিলেন। সুরপূজিত এই বিল্ববৃক্ষ শ্রীবৃক্ষ নামে

বিখ্যাত। ত্রিগুণময় ত্রিদলদ্বারা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব এই ত্রিমূর্ত্তির প্রীতিকারক এবং ত্রিবেদময়, দেবতারা ইহাকে নন্দন কাননে লইয়া গেলেন। কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে, শ্বেতদ্বীপে ও সুরগৃহে এবং মন্দরাদি পুণ্যক্ষেত্রসমূহে এই পবিত্র বিল্বতরু শ্রীবৃক্ষ নামে পূজিত হয়। হই শ্রীবৃক্ষের ফলসকল লক্ষ্মীকৃপাপ্রসাদাৎ অলক্ষ্মীবিনাশে এবং লক্ষ্মীপ্রাপ্তিতে সুপটু বলিয়া পুণ্যশালি পুরুষগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। স্কন্দপুরাণীয় এই অংশ পাঠ করিলে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয় লক্ষ্মীসূক্তের ষষ্ঠিঋক্ যে তথ্য প্রকাশ করে, এই পুরাণাংশ তাহাই বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে। ঋক্‌পরিশিষ্টস্থ এই শ্রীসূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্র স্কন্দপুরাণীয় উপাখ্যানের মূল মনে করা যাইতে পারে। এই মন্ত্রকে যাঁহারা প্রক্ষিপ্ত মনে করেন, তাঁহাদের মতে অবশ্য স্কন্দপুরাণের গল্পই মূল, তদবলম্বনে শ্রীসূক্তে এই মন্ত্র প্রক্ষেপ করা হইয়াছে। আমি শেষোক্ত মতের উপর আস্থাবান্ নহি, প্রত্যুত ঐরূপ কপোলকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরোধী। কারণ শ্রীসূক্তের ঋক্‌সংখ্যা বহু প্রাচীনকাল হইতেই গণিত পরিসংখ্যাত হইয়া আসিতেছে, তাহার মাঝে ঢুকান অসম্ভব। "সৌভাগ্যসঞ্জীবনে" এই মন্ত্রের অসীম মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহার আভাস প্রদানপূর্ব্বক নিরস্ত হইব। সৌভাগ্যসঞ্জীবনে আছে দ্বিতীয়বর্গের প্রথম মন্ত্র মহাফলপ্রদ। ত্রিপত্র বিল্বপত্রদ্বারা লক্ষ্মীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া এই ঋক্ সহস্রবার জপ করিবে। ঘৃতযুক্ত বিল্বপত্রদ্বারা হোম করিবে। ব্রতধারণ পূর্ব্বক পক্ষ বল্ল আহার করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে "অলক্ষ্মীং পরিভূয়াপ্ত মহালক্ষ্মীং স্থিরাং লভেৎ" অর্থাৎ অলক্ষ্মী পরিহার পুরঃসর স্থির লক্ষ্মী লাভ করিবে। বিশ্বাসী অনুষ্ঠাতা সবেগে অগ্রসর হউন, লক্ষ্মীসূক্তের জপযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা হৃৎগত মালিন্য ও বহিস্থ অশান্তি বিদূরিত করুন্।

সপ্তম মন্ত্র ও প্রার্থনা বাক্য। এখানে সাধক লক্ষ্মীর পরিকরনিচয়ের শুভাগমন কামনা করিতেছেন। সৌভাগ্যসম্পদের প্রখ্যাত অংশগুলি তিনি একে একে চাহিতেছেন। সাধক মেঘমন্দ্রে গাহিতেছেন,

উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ।
প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্ত্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে ।৭

পদপাঠঃ। উপ-এতু, মাং, দেবসখঃ, কীর্ত্তিঃ, চ, মণিনা, সহ। প্রাদুর্ভূতঃ, অস্মি, রাষ্ট্রে অস্মিন্, কীর্ত্তিং, ঋদ্ধিং, দদাতু, মে।

অন্বয়ঃ। দেবসখঃ (কুবেরঃ) কীর্ত্তিঃ চ মণিনা সহ মাং উপেতু, অহং অস্মিন্‌রাষ্ট্রে প্রাদুর্ভূতোঽস্মি, মহ্যং কীর্ত্তিং (যশঃ) ঋদ্ধিংচ দদাতু।

বঙ্গার্থ। হে লক্ষ্মি! মহাদেবের সখা কুবের ও কীর্ত্তিদেবী চিন্তামণি নামক মহারত্ন অথবা কোশাধ্যক্ষ মণিভদ্রকে সঙ্গে লইয়া আমার গৃহে আগমন করুন্। এই জনপদে আবির্ভূত হইয়াছি। সেই কুবেরদেব (কীর্ত্তিদেবী ও মণিভদ্র) (তোমার অনুগ্রহে) আমাকে যশ এবং অতুল ধন সম্পত্তি প্রদানে পরিতুষ্ট করুন।

মন্তব্য ' ধনের অধীশ্বর মহামতি কুবের মহাদেবের সখা ইহা সর্ব্বতন্ত্র বিখ্যাত। এখানে 'দেব' শব্দে মহাদেবই প্রতিপাদ্য, সুতরাং 'দেবসখ' বলিতে ত্র্যম্বকসখা কুবেরকেই বুঝায়। আচার্য্য বলেন, "ভবায় দেবায় নমঃ" ইত্যাদৌ দেবশব্দো মহাদেবে রূঢ়." ভবায় দেবায় নমঃ ইত্যাদি স্থলে রূঢ়ী শক্তি বলে দেব শব্দ মহাদেবকেই বুঝায়। অতএব বাধা না থাকিলে অন্যত্রইবা এই ভাবের বৈপরীত্য সংঘটিত হইবে কেন। কীর্ত্তিশব্দে কীর্ত্ত্যভিমানিনী দেবতা বুঝাইতেছে। এই দেবতা দক্ষ দুহিতা এবং ধর্ম্মপত্নী। 'মণি' অর্থে কেহ 'চিন্তামণি' নামক রত্নভারপ্রসবশীল মহামণি বুঝিয়াছেন। আবার কোনও আচার্য্য কুবেরের কোশাধ্যক্ষ শ্রীমান্ মণিভদ্রকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদুভয়ের যে কোন পক্ষ গ্রহণ করিলেই সাধকের সানায় সিদ্ধির সমাগম সুলভ হয়। মনিভদ্রও ধনাধ্যক্ষের কোশাধ্যক্ষ; মহামণি স্বয়ং মহারত্ন অধিকন্তু রত্নভার-প্রসবক্ষম। যেদিক্ দিয়াই যাওয়া যাউক্, ধনরত্নের অনাবৃতমূর্ত্তি লক্ষ্মী উপাসকের করতলে লুণ্ঠিত হইবে।' লক্ষ্মীভক্তের গৃহে ঐশ্বর্য্যপতি কুবেরের আগমন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ঈশানসংহিতায় দেখিতে পাই "তস্মাদ্ধি ভক্তবাৎসল্যং শ্রীদেব্যা প্রকটীকৃতম্। অনুগৃহ্ণাতি যং যং শ্রীস্তং কুবেরোঽনুধাবতি"।

অর্থাৎ লক্ষ্মী যাহাকে অনুগ্রহ করেন, কুবের তাহার পশ্চাতে ধাবিত হন। কীর্ত্তি প্রভৃতি দেবীগণও লক্ষ্মীর অনুচরী কিঙ্করীর ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ গমন করেন, ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। ভার্গবসংহিতায় দৃষ্ট হয়, "কীর্ত্তির্মতির্দ্ধৃতিঃ পুষ্টিঃ সমৃদ্ধিস্তুষ্টিরেবচ, শ্রুতিঃ স্মৃতির্বলং মেধা শ্রদ্ধারোগ্যজয়াদিকাঃ। দেবতাশক্তয়ঃ সর্ব্বাস্তত্তদ্দেবাংশগা নৃপ! মহালক্ষ্মীমুপাসন্তে তস্যাঃ কিঙ্কর্য্য এব তাঃ।" কীর্ত্তি মতি, ধৃতি, পুষ্টি, সমৃদ্ধি, তুষ্টি, শ্রুতি, স্মৃতি, বল, মেধা, শ্রদ্ধা, আরোগ্য, জয় প্রভৃতি দেবশক্তি সমূহ মহালক্ষ্মীর কিঙ্করী। লক্ষ্মী পবিত্রতা বা শুদ্ধির অধিদেবী। বাঙ্মনঃ কায়শুদ্ধি সম্পন্ন হইলে, সর্ব্ববিধ ইহ-পরলোক-মঙ্গলময়ী শান্তির আবির্ভাব হইতে বিলম্ব হয় না। যে সমস্ত দেবশক্তির নাম ভার্গব সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই শ্রীর এক এক মূর্ত্তি। জয়, আরোগ্য, পুষ্টি, তুষ্টি, শ্রদ্ধা, সমৃদ্ধি সমস্তই শ্রীর ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ ব্যতীত বস্তন্তর নহে। এই মন্ত্রটীর আনুষ্ঠানিক উপযোগিতার কথা উপেক্ষা করা যায় না কাজেই উল্লেখ করিতে হইল। শ্রীরত্নকোশে আছে,—"অনুষ্টুভর্বং শ্রীসূক্তে সপ্তমীং প্রজপেদ্বুধঃ। দ্বাত্রিংশল্লক্ষপর্য্যাপ্তৌসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি নান্যথা। কুবেরাস্থাস্তস্যদেবাঃ প্রত্যক্ষাঃ স্যুর্ণসংশয়ঃ চিন্তামণ্যাদিরত্নানি নবাপি নিধয়স্তথা। বশে তস্য ভবিষ্যন্তি সিদ্ধমন্ত্রস্য যোগিনঃ। ভূতপ্রেতপিশাচাদি গ্রহপীড়ানিবারণম্। প্রযত্নতঃ প্রজাপেন্মন্ত্রং রাত্রিকালে বিশেষতঃ। দূর্ব্বার্ভিবিল্বপত্রৈশ্চ সকুশৈশ্চ . কুশেশয়ৈঃ। সহরিদ্রাক্ষতযবৈঃ তণ্ডুলৈশ্চ সমৌক্তিকৈঃ কুঙ্কুমৈরর্চ্চয়েদ্দেবীং প্রসূনৈশ্চ বিশেষতঃ। কেতকীকুন্দমন্দারৈঃ তুলসীদমনাদিভিঃ। লক্ষ্মীনাম্নাং সহস্রেণ শ্রীবীজসহিতেন চ।

শ্রীমন্ত্রং পূজয়েন্নিত্যং নিত্যকর্মাবিরোধতঃ। প্রজপেত্তুল্যগায়ত্রীং পুরশ্চরণদীক্ষিতঃ। ধূপয়েদ্গুরুধূপৈশ্চ ঘৃতদীপৈশ্চ ভাসয়েৎ। দ্রাক্ষাফলঞ্চ খর্জ্জুরং রম্ভাক্ষীরেক্ষুমধু চ। মধ্বাজ্যদাড়িমীচুতনারিকেলান্ সমর্পয়েৎ। হুত্বাপামার্গসমিধং ঘৃতাহুতিপুরঃসরাঃ। কটুম্ললবণাদীনিত ত্যক্তানিয়তভুগ্ গুণী। সার্দ্ধ-দ্বিবৎসরে সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ” উদ্ধৃত সংস্কৃতাংশের তাৎপর্য্য এই যে শ্রীসূক্তের সপ্তমী ঋক্, যাহা অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিতা, তাহার বত্রিশলক্ষ জপদ্বারা সিদ্ধি লাভ করা যায়, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। যে ব্যক্তি এই জপদ্বারা মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ করেন, কুবেরাদি দেবগণ তাঁহার প্রত্যক্ষ হন, চিন্তামণি প্রভৃতি মহারত্নগণ ও নব মহানিধি তাহার বশীভূত হয়। এই মন্ত্রবলে প্রেতপিশাচাদি দুরীভূত হয়। সংযতভাবে রাত্রিকালে এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, কুশ, কমলকুসুম, হরিদ্রা, অক্ষত (দধিমিশ্র আতপতণ্ডুল) যব, কুঙ্কুম, মৌক্তিক ও নানা কুসুমদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়, কেতকী, কুন্দ মন্দারাদি কুসুমদ্বারা বিল্বপত্রযোগে লক্ষ্মী-সহস্রনামপাঠ সহকারে লক্ষ্মীদেবীর জপ পূর্ব্বক প্রত্যহ নিত্যকর্ম্মের অবিরোধি শ্রীমন্ত্র পূজা করা কর্ত্তব্য। পুরশ্চরণদীক্ষা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রতুল্যসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিবে। যক্ষ ধূপদ্বারা গৃহ ধূপিত করিবে, ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিবে। দ্রাক্ষাফল, খেজুর, রম্ভা, ইক্ষু, মধু ঘৃত, দাড়িম, আম্র, নারিকেলাদি দেবীকে সমর্পণ করিবে। অপামার্গ (আপাঙ্ নামে খ্যাত) বৃক্ষের সমিধ্ ঘৃতাহুতি পূর্ব্বক হোম করিবে। কটু, অম্ল, লবণাদি ক্ষোভক-রস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়তাহারী ব্রত-পরায়ণ হইয়া আড়াইবৎসরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। হিন্দুর শাস্ত্রের অনুষ্ঠানিক অংশ এখন বিদায় পাইতে বসিয়াছে, যে কয়জন অঙ্গুলি-পর্ব্বগণনীয় অনুষ্ঠাতা আছেন, তাঁহাদের জন্যই এই বাগ্‌বিস্তর, আশাকরি শিক্ষিত সমাজ ইহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিলেও অসন্তুষ্টির নয়নে নিরীক্ষণ করিবেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী——ভারতী।

সমালোচনা।

‘আহ্নিক-কৃত্যম্” ও “পদাঙ্ক-দূতম্”

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত “আহ্নিক কৃত্যম্” ও “পদাঙ্কদূতম্” প্রাপ্ত হইয়া এবং পাঠ করিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। “আহ্নিক-কৃত্যম্” পুস্তকখানি অতি বিশুদ্ধ ও বৃহৎ-নিত্যকর্ম্মশিক্ষার পুস্তক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণেরই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান হইতে রাত্রিতে শয়ন পর্য্যন্ত যত কিছু নিত্যকর্ম্ম আছে, তৎসমুদায়ই ইহাতে দিয়াছেন। অধিকন্তু সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মও অনেক

সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রত্যেক মন্ত্রের সুগম ব্যাখ্যা ও সুন্দর অনুবাদ দিয়াছেন। ত্রিবেদীয়সন্ধ্যাপদ্ধতিতে যে সকল বৈদিক মন্ত্র আছে, সে গুলির বিশুদ্ধ পাঠ কেবল কবিরত্ন মহাশয়ের আহ্নিককৃত্য ভিন্ন আর অতি অল্প পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায়, মহিম্নস্তবের হরপক্ষে ও হরিপক্ষে যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহাও অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে। উহার অনুবাদও অতি উত্তম।

পুস্তকখানি যেমন বিশুদ্ধ, তেমনই সুলভ। উহা ৩ খণ্ডে প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। নিত্যকর্ম্মের পুস্তক অনেকই বাহির হইয়াছে; কিন্তু এরূপ বিশুদ্ধ, এরূপ ব্যাখ্যাদি সহিত ও (আকারানুসারে) এরূপ স্বল্পমূল্যের নিত্যকর্ম্ম পুস্তক এপর্য্যন্ত একখানিও বাহির হয় নাই। হিন্দুমাত্রেরই নিত্য-কর্ম্মপুস্তক অতি প্রয়োজনীয়। আমরা অনুরোধ করি, সকলে কবিরত্ন মহাশয়ের "আহ্নিক কৃত্য" দেখিয়া বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ বোধ সহকারে নিত্যকর্ম্ম শিখুন। এ পুস্তক হিন্দুমাত্রেরই আবশ্যক। "পদাঙ্কদূতম্" বঙ্গীয় কবির লিখিত কৃষ্ণকথাত্মক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। কবিরত্ন মহাশয় অন্বয়, টীকা, অনুবাদ ও ভাব ব্যাখ্যার সহিত তাহার একখানি নূতন সংস্করণ করিয়াছেন। ভাবব্যাখ্যায় তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ভাবুকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থের সম্পাদনে কেহই সেরূপ প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার কৃত ভাবব্যাখ্যা শুনিলে সকলেরই মন প্রাণ মোহিত হয়। ইহা বাঙ্গালী কবির রচিত বলিয়া বঙ্গবাসীর নিজস্ব, তাহার উপর ব্যাখ্যাকৌশলে রসভাবে পরিপূর্ণ; সুতরাং বঙ্গবাসিমাত্রেরই গৌরব ও আদরের সামগ্রী। বঙ্গবাসিমাত্রেকেই ইহার রসাস্বাদন করিতে আমরা অনুরোধ করি। পদাঙ্কদূত পূর্ব্বে টোলে পড়ান হইত, বহুদিন হইতে সে চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে অধ্যাপকমহাশয়েরা এই গ্রন্থখানির পুনঃ প্রচলন করেন, ইহা আমাদের সবিনয় প্রার্থনা। গ্রন্থের মূল্যও অতি অল্প—৶০ ছয় আনা মাত্র। কবিরত্ন মহাশয়ের অন্যান্য পুস্তকও আমরা দেখিয়াছি। তিনি যে পুস্তকে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এবং মূল্যও যথাসম্ভব স্বল্প করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার চণ্ডী (।৴০), সত্যনারায়ণ ও শুভচণীর কথা (৶১০), এবং রামলীলা (।০) প্রভৃতি পুস্তকও অতি আদরের সামগ্রী। তাঁহার সকল পুস্তকই কলিকাতা ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রারিতে পাওয়া যায়।

৩শ বর্ষ। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ। ৭ম ৮ম সংখ্যা।

১৮২৮, ১৩১৩।

গ্রাহকগণ!

☞ বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৮।

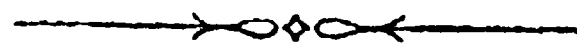
অগ্রিমবার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১৷৷০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০।

পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্ব স্ব গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

সামধ্বনি।



৩ ১ ২ ৩ ১। ২। ৩ ২
ভদ্রো নো অগ্নি রাহুতো ভদ্রা
৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২
রাতিঃ সুভগ ! ভদ্রো অধ্বরঃ।
৩ ২ ৩ ১। ২।
ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ৫ ॥*

(ঋ৬। ১। ৩ই। ৪)

[illegible]পাঠঃ। ভদ্রঃ। নঃ। অগ্নিঃ। আহুতঃ। ভদ্রা। রাতিঃ। সুভগ। ভদ্রঃ। অধ্বরঃ। ভদ্রা। উত। প্রশস্তয়ঃ।

একটি উহ গানের ১১। ১। ৫ম; অপরটি গেয়গানের ৩। ১। ৩৬। এই সামটির প্রকাশক গন্থা বা পকৃথ ঋষি এবং নাম "দৈবানীক" যথা

৪ ৩ ৫ ২ ৩ ৪ র
ভদ্রো ৪ নঃ। হোই। অগ্নি রা
৫ ৫ ৩ র ২র ১ ২ ১
হুতা ৬এ। ভদ্রারাতা ইঃ। সুভ-
২ ১ ৩ ৫
গাভা৩। দ্রো ২ ধ্বা ২৩৪রাঃ।
২ ১র ২ ১ ৪
ভদ্রাউ২৩ তা৩। প্রা২৩শাত।
২
স্তা৩৪৫ য়োঙহাই ॥

---

*কণ্ববংশীয় সোভরি ঋষি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। প্রয়োগ কিম্বা ভার্গব কাহারও২ মতে এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। ককুপ্ ইহার ছন্দ। দেবতা অগ্নি। ইহা আভিপ্লবিকাহ-গুলির উক্থ ক্রতুতে তৃতীয় সবনে প্রশাস্তার শস্ত্ররূপে ব্যবহার্য্য; এবং এতন্মূলক প্রগাথাটিও তৎস্থলে স্তোত্রিয়রূপে বিকল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতন্মূলক সামদ্বয়ের

অন্বয়ঃ,

(হবির্ভিঃ) আহুতঃ অগ্নিঃ নঃ ভদ্রঃ (ভবতু); হে সুভগ! ভদ্রা রাতিঃ (অস্মাকং ভবতু) ভদ্রঃ অধ্বরঃ (ভবতু) উত ভদ্রাঃ প্রশস্তয়ঃ (ভবন্তু)।

আহুতঃ—হবিঃ প্রদানে যাঁহার তর্পণ করা হইয়াছে; "হবির্ভিস্তর্পিতঃ"।

নঃ—আমাদিগের; "অস্মাকম্"।

ভদ্রঃ—"কল্যাণঃ"।

হে সুভগ—হে পরম ঐশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ; "শোভনধনাগ্নে"।

ভদ্রা—কল্যাণ ময়; "কল্যাণী"।

রাতিঃ—'দানং'।

অধ্বরঃ—যজ্ঞ; 'যাগঃ'।

ভদ্রাঃ—'কল্যাণাঃ'।

প্রশস্তয়ঃ—প্রশংসা বা স্তুতি বাক্য; "প্রশংসাঃ স্তুতয়ঃ"।

হে দেবদেব অগ্নে! আমরা অপনাকে হবিঃ-প্রদান উপলক্ষ করিয়া স্তব করিতেছি; আমরা যেন কল্যাণলাভে সমর্থ হই; হে শোভনৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ! আপনি আমাদিগকে কল্যাণময় আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। আমাদের যেন মঙ্গলময় যজ্ঞানুষ্ঠানে নির্ম্মলা অনুরক্তি জন্মে ও প্রশস্ত (বা প্রশংসাপূর্ণ বা প্রকৃষ্টকথনীয়) স্তুতিবাদে মনঃ ও প্রাণ পূর্ণ হয়।

১ ২ ৩ ১
য়জিষ্ঠং ত্বাববৃমহে দেবং
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১
দেবত্রা হোতারমমর্ত্ত্যম্।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্য য়জ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥৩*

(ঋ৬।১২৯।৩)

*ইহার ঋষ্যাদি ও ব্যবহার সমস্তই এতৎ-পূর্ব্ব মন্ত্রের অনুরূপ। এতন্মূলক সামত্রয়ের মধ্যে, একটি উহগানের (৮।১।৩);

পদপাঠঃ। যজিষ্ঠং। ত্বা। ববৃমহে। দেবং। দেবত্রা। হোতারং। অমর্ত্ত্যম্। অস্য। যজ্ঞস্য। সুক্রতুম্।

অন্বয়ঃ,

হে অগ্নে। যজিষ্ঠং, দেবত্রা দেবং, হোতারং, অমর্ত্ত্যম্, অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্, ত্বা (ত্বাং) ববৃমহে।

যজিষ্ঠং—অতিশয় যাগ নিরত; 'যষ্টৃতমম্'।

দেবত্রা—দেবগণের মধ্যে; 'দেবেষু মধ্যে'।

দেবং—দানাদিগুণযুক্ত; 'অতিশয়েন দানাদিগুণযুক্তম্'।

হোতারং—'দেবানাম্ আহ্বাতারম্'। দেবতাদিগকে আহ্বানকারী।

অমর্ত্ত্যং—যিনি মরণধর্ম্মবিবর্জ্জিত; 'অবিনাশিনম্'।

সুক্রতুম্—"প্রবর্ত্তমান যজ্ঞের সুন্দর ফলবিধাতা; "সুষ্ঠু কর্ত্তারম্"।

হে দেবদেব অগ্নে! আপনিই যজনীয়গণের মধ্যে একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ, আপনিই

অপরটিও ঐ গানেরই (১৮।১।৩), আর একটি গেয়গানের (৩।১।৩৭); এই শেষটির প্রকাশক গোতম ঋষি এবং নাম 'সাধ্য'। যথা—

৩ ৪ ২
য়া৫ জি। ষ্ঠং ত্বা৩ [illegible] ৩
৪ ৫ ১র১ র র র
বৃ ম হাই। দেবং দেবত্রা হোতা২৩
২ ১ ২ ১ ৭
রাম্। আমর্ত্তিয়ম্। আস্যয়াজ্ঞা২৩।
১ ৪ ২
স্যা২৩ সূত। ক্রা৩৪৫ তো৬
হাই।

দেবগণকে বহুবিধ বিভূতিদানে সম্বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন; মঙ্গলানুষ্ঠানে আপনিই দেবগণকে আহ্বান করেন; আপনিই মর্ত্ত্য-ধর্ম্মাতীত অবিনাশী শাশত পুরুষ; আপনিই নিত্য-নৈমিত্তিক (বা প্রবর্ত্তমান্) যাগযজ্ঞা-নুষ্ঠানে কল্যাণ প্রদান করেন। হে দেব-দেব! আমরা আপনাকেই ভজনা করি।

১ ২ ৩ ১ ২ ২ ৩
তদগ্নে। দ্যুম্নমাভর, য়ৎ সা-
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সাহ', হৃহসদনে কঞ্চিদত্রিণম্।
৩ ১ ২ ৩ক ২ ৪
মন্যুঞ্জনস্য দূঢ্যম্ ॥ ৭ ॥*

পদপাঠঃ—তৎ। অগ্নে। দ্যুম্নম্। আভর। য়ৎ। সাসাহা। আসদনে। কিঞ্চিৎ। অত্রিণম্। মন্যুং। জনস্য। দূঢ্যম্।

*ইহার ঋষ্যাদি পূর্ব্ববৎ; বিনিয়োগ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখা যায় না। এতন্মূলক সাম একটি মাত্র গেয়গানের ৩।১।১৮; এই সামটির প্রকাশক জমদগ্নি ঋষি এবং নাম "সংবর্গ" যথা—

৪ র র ৪
তদগ্নেদ্যু৫ম্নম্। আভরোবা।
২ ১র ২ ১ ২ ১
য়ত্ত্বাসা২৩হা। সদা২৩নাই। কঞ্চি
২ ১
দত্রা২৩ইণাম্। মান্যুঞ্জনস্যদূ২৩
১ ৫র ৫
হো। ঢা২৩৪য়াম্। এহিয়া৬হা।
৪
হো৫ই।ডা।

"দুঢ্যা"—"দূঢ্যম্"—ইতি পাঠৌ।

অন্বয়ঃ,—হে অগ্নে! তৎ দ্যুম্নম্ আভর; যৎ আসদনে কঞ্চিৎ অত্রিণম্ সাসাহা (তথা) দূঢ্যম্ জনস্য মন্যুং (চ) তৎ সাসাহা।

দ্যুম্নম্—'অন্নম্ যশোবা'।

আভর—'অস্মভ্যম্ আহর'।

আসদনে—'যজ্ঞগৃহে'।

কঞ্চিৎ—'বর্ত্তমানম্ কমপি'।

অত্রিণং—'অত্তারং রাক্ষসাদিকম্'।

সাসাহা—'অত্যর্থম্ অভিভব'।

দূঢ্যং—'দুর্দ্ধিয়ং পাপবুদ্ধিং শত্রুং'।

মন্যুং—'ক্রোধং চ'।

হে দেবদেব অগ্নে! আপনিই চির প্রসিদ্ধ অন্ন ও যশঃ প্রদান করিয়া থাকেন; যজ্ঞবিঘাতী অসুরগণ যজ্ঞগৃহে উপস্থিত হইলে যখন তাহারা আপনার দৈবীপ্রভাবে নিষ্ঠুর ভাবে পরাভূত হইয়া থাকে তখন আপনিই যে আমাদের পাপবুদ্ধি ও ক্রোধ নামে শত্রুদ্বয়কে অত্যন্ত অভিভূত করিবেন তাহাতে আর সংশয় কি?

শঙ্করসেবক
ভারতী শতানন্দ,—গিরিশগুহা—।

ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগ।

(প্রথম প্রস্তাব।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—০:০:০—

সপ্তম শ্লোকে আরও পরিষ্কার করিয়া শ্রীভগবান্ উপদেশ দিতেছেন—

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিত-চেতসাং ॥৭॥

অর্থাৎ "যাহারা (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) আমাতে (ঈশ্বরে) চিত্ত সমর্পণ করেন, আমি (ঈশ্বর) সেই সকল নিবেশিত-চেতা মহাত্মাকে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে সমুদ্ধৃত করিয়া থাকি।" সুতরাং বুঝাগেল, ঈশ্বরকে মুখ্যলক্ষ্য বিবেচনা করা উচিত,—ঈশ্বরে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য, এবং প্রকৃত ভক্তিসহকারে তাঁহার উপাসনা করিয়া, ভগবানের ভক্ত (প্রিয়) হইতে পারিলে, তবে এই মায়াময়, দুঃখময়, দুস্তর সংসারসমুদ্র হইতে মায়ামুগ্ধ জীব পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হয়, নতুবা অন্য গতি নাই। ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পিত হইলেই, আত্মাভিমান দূরীভূত হয় এবং আমিত্বের অহঙ্কার থাকে না। তখন মনুষ্য আপনাকে "তৃণাদপি লঘু" মনে করেন, এবং বিনয়ী, নম্র, আনন্দময়, সদাস্থির, প্রকৃতসাধক হইয়া উঠেন। তখন বোধহয় "আমি কিছুই নই, তিনিই (ঈশ্বর) সর্ব্বস্ব"। তখন মনে হয় O God thy will be done, তখন পারস্য কবি মোলানা সেখ সাদি মহাত্মার ন্যায় মনে হয়—

সোপর্দ্দম বো তো মায়ে খেস্‌রা।
তু দানী হেসাবে কমো বেশ্‌রা॥

অর্থাৎ হে ঈশ্বর! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, এবং তাহাই আমার কর্ত্তব্য ও জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই আত্মসমর্পণের কোন প্রকার ফলকামনার জন্য আমি অপেক্ষা করি না, আমার কর্ত্তব্যটি আমি করিয়াছি, ইহার কুফল সুফল তুমিই জান এবং তাহা তোমাতেই থাকুক। আমি আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সদাসুখী আছি। এইরূপ আত্মসমর্পণে মনোমধ্যে যে ভাব উপস্থিত হয়, তাহা ভক্ত ভিন্ন কেহই অনুভব করিতে পারেন না। ভক্তও তাহা ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। বাক্‌শক্তিবিহীন ব্যক্তি সুমিষ্ট দ্রব্য আহার করিয়া, তাহার মিষ্টতাআস্বাদ করিতে পারে এবং সেই মিষ্টতা জনিত তৃপ্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সে যেমন প্রকাশ্যে (বাক্যদ্বারা) তাহা অভিব্যক্ত করিতে পারে না, প্রকৃত ভক্ত তাহার অপার সুখজনিত মনোভাব বাক্যদ্বারা তেমনি প্রকাশ করিতে সক্ষম হন না। সেই মধুময় ভাব বর্ণনার অতীত। তখন যে ঐকান্তিক সুখদায়ক ভাবের উদয় হয়, তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া খস্‌রো নামক এক প্রসিদ্ধ পারস্যমহাকবি লিখিয়াছেন—

মন্ তো সুদম্ তু মন্ সুদী।
মন্ তন্ সুদম্ তু যাঁ সুদী॥
তা কস্‌নে গোয়েদ্ পশ্ অজীম্
মন্ দিগরম্ তু দিগ্‌রী॥

অর্থাৎ তখন ভক্ত ভাবেন "আমিই তুমি, তুমিই আমি"। তখন ভক্তাধিক ভক্ত, ঈশ্বরে এবং তাঁহাতে অভেদভাব দেখেন ও উপলব্ধি করেন। ইহাই "সোহং" বা "অহংব্রহ্ম" ভাব; এই ভাবে জীবাত্মার ও পরমাত্মার বিলীনভাব জন্মে। এই ভাব জন্মিলে যাহা হয়, ভগবান্ তাহা সুস্পষ্টভাবে উপদেশচ্ছলে অর্জ্জুনকে কহিতেছেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥৮॥

অর্থাৎ "আমাতে (ঈশ্বরে) স্থির মন

ও বুদ্ধি নিবেশ করেন, তিনি আমাতে নিঃসন্দেহ ঊর্দ্ধে অবস্থিত করিবেন।" এই শ্লোকের "ঊর্দ্ধ" শব্দটির ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। এই শব্দটির অর্থ করিয়া অনেকে অনেক প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশপণ্ডিত ও টীকাকার এই শ্লোকের অন্তর্গত "ঊর্দ্ধ" শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন, "ঊর্দ্ধ" শব্দার্থে 'মৃত্যুর পরে' এইরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রীমৎ ভগবৎগীতা-শাস্ত্রের কয়েক স্থানে ঊর্দ্ধশব্দ উল্লিখিত দেখা যায়; সেই সকল স্থানে ব্যবহৃত "ঊর্দ্ধ" শব্দ আলোচনা করিলে, ইহার অর্থ আরও পরিষ্কার হইতে পারে। মূল গীতা-শাস্ত্র খুলিয়া পাঠ করিলে পাঠক মহাশয়েরা দেখিতে পাইবেন, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে যে "ঊর্দ্ধ" শব্দ আছে তাহার অর্থ অনেকে স্বর্গলোক (দেবলোক) লিখিয়াছেন। গীতার ইংরাজি অনুবাদ-কেরাও To the regions above এই রূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যে "ঊর্দ্ধ" শব্দ আছে অনেকের বিবেচনায় তাহার অর্থ "চিরস্থায়ী" (High rooted); শঙ্করা-চার্য্যের মতেও ঐ অর্থ। বিখ্যাত বিচার-পতি ও পণ্ডিত ত্রিলঙ্গের ইংরাজী অনুবাদে Eternally rooted লেখা আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, দ্বাদশ অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে যে 'ঊর্দ্ধ' শব্দ আছে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থে এই বুঝায় যে, "ঈশ্বর কৃপায় ভক্তগণ ঐ অবস্থায় কণ্ঠের ঊর্দ্ধে এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রে মন স্থির করিতে সমর্থ হয়েন।" কিন্তু গীতার সংস্কৃতভাষার টীকাকারদিগের মধ্যে অনেকেরই মতে দ্বাদশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকান্তর্গত "ঊর্দ্ধ" শব্দের অর্থ ব্রহ্মলোক (স্বর্গলোক।) Kingdom of God). এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত, সাধকদিগের জন্য শ্রীভগবান্ দেব-লোক, ব্রহ্মলোক, ধ্রুবলোক প্রভৃতি বহু-লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। অধিকার ভেদে সাধকেরা (ভক্তেরা) স্বস্ব লোকে প্রবেশ করিয়া, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়েন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কর্ম্ম-ক্ষেত্র।

—•:○:•—

মন!

ভুলিওনা "কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাত্র এসংসার।"
প্রবাসীর মত সবে,
আসিয়াছে এই ভবে,
সাধিয়া আপন কার্য্য, যাইবে আবার;
পুরাইতে মনস্কাম,
নহে এই ভব-ধাম,
কর সেবা রাত্রি দিবা কর্ম্ম-শীলতার;
ভুলিওনা "কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাত্র এসংসার।"

ভুলিওনা "কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাত্র এসংসার";
জনমি ধরণী-তলে,
শৈশবে জননী-কোলে,
লালিত পালিত হয় স্নেহের আধার;
কিছু দিন গত হ'লে,
জ্ঞানাঙ্কুর উন্মেষিলে,

দেখিতে দেখিতে যায় সে সুখ-সন্তরে ;
ভুলিওনা "কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাত্র এসংসার"।

ভুলিওনা "কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাত্র এসংসার।"
যেখানেতে জীবচয়,
গুরুশাস্ত্রে শিক্ষাপায়,
পার্থিব জীবনে কিবা কর্ত্তব্য তাহার ;
শিক্ষাতে থাকিলে খাদ,
ঘটে দুঃখ পরমাদ ;
শিক্ষাঅনুসারে খুলে ভবিতব্য দ্বার ;
ভুলিওনা "কর্ম্ম ক্ষেত্র মাত্র এসংসার।"

ভুলিওনা "কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাত্র এসংসার।"
ধীরে ধীরে পায় পায়,
যৌবন-উদ্যানে যায়,
মানসিক বৃত্তিচয় কুসুম আকার ;
হ'লে তারা বিকশিত,
কর্ম্ম ক্ষেত্রে থাকে রত
মায়াঘোরে সুখশান্তি পায় নাক আর ;
ভুলিওনা "কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাত্র এসংসার।"

বিষম সংসার-ক্ষেত্র বিষম যৌবন।
কু-বৃত্তি সু-বৃত্তি এই,
মানসিক বৃত্তি দুই ;
বুঝিয়া করিতে হয় স্বকার্য্য সাধন,
বিষ-কুম্ভ-পয়ো-মুখ,
কু-বৃত্তি আপাতসুখ,
হৃদে মিথ্যা অঙ্গে মাত্র সত্য আবরণ ;
বিষম সংসার-ক্ষেত্র বিষম যৌবন।

বিষম সংসার-ক্ষেত্র বিষম যৌবন,
কু-বৃত্তি করিয়া জয়,
তাহার সহায়তায়,
সু-বৃত্তির প্রদর্শিত সু-পথে গমন ;
রাখিয়া সমাজধর্ম্ম,
করিলে কর্ত্তব্যকর্ম্ম,
মানবাত্মা মুক্তি পায় সংসার-বন্ধন ;
বিষম সংসার-ক্ষেত্র বিষম যৌবন।

বিষম সংসার-ক্ষেত্র বিষম যৌবন।
ভাবিওনা, চিত্তমম !
"আকাশ-কুসুম সম
লোকান্তর মিথ্যা, মাত্র প্রলাপ বচন ;"
ক্রমেতে যৌবন রবি,
লুকাইলে নিজ ছবি,
জরার তামসী নিশা দেয় দরশন।
বিষম সংসার-ক্ষেত্র বিষম যৌবন।

বিষম সংসার-ক্ষেত্র বিষম যৌবন।
যৌবন-অতীতে নরে,
পরত্রে প্রত্যয় করে,
অভিজ্ঞতা গুণে দেয় পারত্রিকে মন ;
জানে সে পরীক্ষা স্থান,
সম্মুখেতে বিদ্যমান,
অবিলম্বে হবে তথা করিতে গমন ;
বিষম সংসার-ক্ষেত্র বিষম যৌবন।

শুন মম ভ্রান্ত মন শুন অতঃপর ;
ছাড়িয়া সংসার মায়া,
ধরি 'আতিবাহি'-কায়া,*
জীবাত্মা ত্যজিয়া যায় এদেহ নশ্বর।

*সাংখ্যগণ বলিয়া থাকেন জীবের 'ষাটকৌষিক' বা 'আতিবাহিক' নামে আর একটি দেহ আছে। জীব মৃত্যুর পর সেই দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে।

যতনের দেহ হায়,
অযতনে পড়ে রয় ;
উড়িলে বিহঙ্গ কেবা আদরে পিঞ্জর ;
শুন মম ভ্রান্ত মন শুন অতঃপর।

শুন মম ভ্রান্ত মন শুন অতঃপর।
জীবাত্মা পরীক্ষা-জন্যে,
বিরাজিত মহাশূন্যে,
দুর্গম সুন্দর অতি আছয়ে নগর ;
জীবের পার্থিবকর্ম্ম,
সদসৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম.
বিচার ব্যবস্থা তথা আছয়ে সুন্দর ;
শুন মম ভ্রান্ত মন শুন অতঃপর।

শুন মম ভ্রান্ত মন শুন অতঃপর।
বিশ্বপতি বিধাতার,
আছে তথা চমৎকার,
"জ্যোতির্ম্ময় ন্যায়-দণ্ড" অতি তেজস্কর,
সে দণ্ডের তেজবল,
পাপীপক্ষে কালানল,
আলোকে পুলকে নাচে পুণ্যের অন্তর ;
শুন মম ভ্রান্ত মন শুন অতঃপর।

শুন মম ভ্রান্ত মন শুন অতঃপর।
মিথ্যা বা নীরস-ভাষী,
অসংযমী অবিশ্বাসী,
আত্ম-দ্রোহী পরহিতে বিরত যে নর,
অকর্ত্তব্যে সদা রত,
কর্ত্তব্যে সদা বিরত,
পাপী সেই প্রধানতঃ খ্যাত চরাচর ;
শুন মম ভ্রান্ত মন শুন অতঃপর।

বিষম পরীক্ষাস্থান ভয়ঙ্কর অতি।
ছাড়িয়া সংসার-স্নেহ,
পরিহরি জড়-দেহ,
সূক্ষ্মদেহ লয়ে জীব করে তথা গতি,
এবার পরীক্ষা কাণ্ড,
জ্যোতির্ম্ময় ন্যায় দণ্ড
সমীপে দাঁড়ায় জীব করিয়া প্রণতি ;
বিষম পরীক্ষাস্থান ভয়ঙ্কর অতি।

বিষম পরীক্ষাস্থান ভয়ঙ্কর অতি।
সে দণ্ডের তেজ হায়,
অসহ্য পাপীর কায়,
সহস্র বৃশ্চিকদলে দংশিলে যেমতি।
কৃত-পাপ-কর্ম্ম ফলে,
অসহ্য যাতনানলে,
হয় দগ্ধ দুষ্ট-মুগ্ধ-নর পাপমতি ;
বিষম পরীক্ষা স্থান ভয়ঙ্কর অতি।

বিষম পরীক্ষাস্থান ভয়ঙ্কর অতি।
পরীক্ষায় পাপী সব,
করে হাহাকার রব,
দুষ্কৃতির ফলে ভোগ নরক-দুর্গতি,
শেষে পাপী ক্ষমা চায়,
"যেন ভবে পুনরায়
না হয় এমন আর পাপ কর্ম্মে মতি।"
বিষম পরীক্ষাস্থান ভয়ঙ্কর অতি।

বিষম পরীক্ষাস্থান ভয়ঙ্কর অতি।
এইরূপে পাপাচারী,
পুনঃ আসে ভবে ফিরি ;
থাকিতে পাপের লেশ নাহি অব্যাহতি।

হইলে নিষ্কামধর্ম্মী,
সংযত, কর্ত্তব্য-কর্ম্মী,
যুচে চায় জ্বালাময় ভবের বসতি।
বিষম পরীক্ষাস্থান ভয়ঙ্কর অতি।

শ্রীদ্বিজবর বিশ্বাস
সাতক্ষীরা।

বিভূতি

অত্যুন্নত প্রাচীর-বলয়-মণ্ডিত সুরম্য-লঙ্কার দক্ষিণ দ্বারে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী লম্বকচ্ছধারী মহাবলশালী বানরসৈন্যগণ সুনীল তরঙ্গায়িত অম্বুরাশি অগ্রাহ্য করিয়া লঙ্কা-গমন-উপযোগী এক অপূর্ব্বসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহা এরূপ মহান্ ও সুবিস্তৃত যে ইচ্ছা করিলে লোকাভিরাম রামচন্দ্র তাঁহার সমুদয় কটক এককালে কয়েকদণ্ডমধ্যেই সুবর্ণভূমি ভারতপ্রান্ত হইতে প্রভূত বিষয়ানুশীল দশাননের লঙ্কাভূমে উপনীত করিতে পারেন। কপিসৈন্যগণ অলকাপ্রতিম লঙ্কাধ্বংস করিবার জন্য যেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সেনা-পতিগণের যেরূপ প্রশান্ত অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকী চেষ্টা, সংযতবল ও মন্ত্রগুপ্তি, এবং যেরূপ প্রবল আত্মনির্ভর ও সহতীসাধ্বীইচ্ছা দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে দশগ্রীব বা দশদিক-বিশ্রুত রক্ষকুলেন্দ্র রাবণকেও একান্ত বিচলিত করিয়াছে।

সত্যবটে লঙ্কেশ রাবণ মহাপাপী, সত্য-বটে কুবেরানুজ লঙ্কেশ ইন্দ্রিয়দাস, সত্যবটে ত্রিজটাতনয় রাক্ষসেন্দ্র সহোদরাস্নেহ-প্রণোদিত-প্রতিহিংসা-পরায়ণ, ভীরু ও পরস্ত্রী অপহরণ-অপরাধী—কিন্তু বিমানচারী পুষ্পক-বিহারী দেবেন্দ্রবিজয়ী রাক্ষসকুলপতির কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক, কি আধি-ভৌতিক—কোনরূপ বলই দরিদ্র নহে। বৈজয়ন্তীকল্প তাঁহার রাজ্যে নিত্যই বেদ-ধ্বনি হইয়া থাকে। তাঁহার ভয়ে দেবগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত। অধিককি দেবাধিপতি স্বয়ং তাঁহার মৌলিমুকুট রক্ষোরাজের পাদ-পীঠে স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা স্তুতিগান করিয়া থাকেন। লঙ্কার আধিভৌতিক ঐশ্বর্য্যের ত সীমা নাই। ইহার মণিমাণিক্যাদি রত্ন-ঐশ্বর্য্য, সৌধ প্রাসাদ, উপবন ও পুষ্পবীথিকা পথ ঘাট, সুবিস্তৃত প্রাচীর-পরিখা ও উত্তাল-তরঙ্গমালাকুলভীষণসমুদ্ররূপ কৃত্রিম ও স্বাভাবিকবলয়ানুকারিণী শোভা, অলকা ও নন্দনকেও তুচ্ছ করিত বলিয়া বোধ হয়। অহো! যাঁহার পুত্রপৌত্রাদি সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষে পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছিল তিনিও যে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন ইহা যে মহাপাপপরিণতি বা কর্ম্মফল-প্রেরণা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাপেরই এক পরিণাম অবশ্যম্ভাবীধ্বংস। স্থূল ও সূক্ষ্ম যেমন একই শক্তির কার্য্য ও কারণ ভাবে বিকাশ ও প্রস্বাপ (প্রসুপ্ত-ভাব) ভিন্ন আর কিছুই নহে তদ্রূপ একই পাপ সূক্ষ্ম বা কারণ রূপে প্রবেশ করিয়া ধ্বংসকালে স্থূলদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। তাহা না হইলে রাবণেরত ঐশ্বর্য্য ও শ্রীবৃদ্ধির সীমা ছিলনা; কিন্তু যে দিন হইতে তিনি পরমারাধ্যা সাধ্বীসতী সীতাদেবীর

অপহরণাপরাধে মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার সাধের লঙ্কাপুরী ধ্বংসপথবর্ত্তী হইয়াছে ও জ্বলন্তমূর্ত্তি জগজ্জননী সীতাদেবীর প্রবল অভিশাপবহ্নিতে একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে।

ইহাতে তত দুঃখ নাই। দিগ্বিজয়ী বীর বীরের ন্যায় বীরের হস্তেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ যে এক ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি—প্রবল অভিমান-ভরে যাঁহার মূর্ত্তি বিশেষরূপে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, যাঁহার গৃহদ্রোহিতার কথা মনে হইলে ধর্ম্ম-সংশয় উপস্থিত হয়—সেই বিভীষণমূর্ত্তি 'বিভীষণ'-চরিত্রই আলোচ্য। কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি এই জন্যই বিভীষণ নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। এই অদ্ভুতচরিত্র বিভীষণই স্বকুলধ্বংসে পতাকাস্বরূপ। যিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট অবমানিত হইয়া প্রবল অভিমানভরে ভ্রাতৃপ্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, সৌহার্দ্দ্যবন্ধন, কুলমর্য্যাদা প্রভৃতি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিয়াছেন ও আপনার গৃহছিদ্রগুলি শত্রুসম্মুখে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি যতই কেন ধর্ম্মের ভাণ করুন না কেন, তাঁহার মধ্যে যতই কেন উদারতা ও তেজস্বিতা থাকুক না কেন তাঁহার চরিত্র সন্দেহজনক ও ভয়ানক এবং ভীষণ হইতেও বিভীষণ।

পরমনীতিবিদ্ তত্ত্বজ্ঞ দশরথতনয় সত্যসন্ধ রামচন্দ্র এই অপূর্ব্বমূর্ত্তির আকার-ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া সন্দেহাকুলচিত্তে পরমজ্ঞানী হনুমানাদি মন্ত্রবেত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই যে অপূর্ব্বমূর্ত্তি রাক্ষসকুলোদ্ভূত বলিয়া আমাদিগকে পরিচয় দিতেছে এবং আমাদের বন্ধুত্ব ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, ইহা কি উহাঁর রাক্ষসী মায়া, না উনি যথার্থ সুহৃদ্?

হায়! আত্মসম্ভ্রম তুমি কোথায়? এসময়ে লজ্জা ঘৃণা আনিয়া, এসময়ে ভ্রাতৃপ্রেম আদি পূর্ব্বসম্পদ স্মরণ করাইয়া দিয়া তুমি বিভীষণ হৃদয়কে শতধা বৃশ্চিক-দংশন-যাতনা কেন প্রদান কর নাই? ভো ভো বিভীষণ! ঐ দেখিতেছ না সম্মুখে তোমার আদর্শ ও ভ্রাতৃপ্রেমের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি স্বরূপ তেজোমূর্ত্তি রামভদ্রানুজ বীর সৌমিত্রি। যিনি জ্বলন্ত ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ স্বরূপ, তিনি তোমাকে কিছুই শিক্ষা দিতে সমর্থ হইলেন না! যিনি তাঁহার অগ্রজ আর্য্য রামভদ্রের আজ্ঞাবহ সেবক, যিনি মূর্ত্তিমান্ আদর্শ-রূপে জগতকে ভ্রাতৃপ্রেম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তিনিই তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিতে তোমার মনঃপ্রাণ একবারও ঈষৎ কম্পিত হয় নাই! কি পরিতাপের বিষয়, তোমার আত্মসম্ভ্রম বোধ না থাকায়, তোমার মধ্যে অভিমানবহ্নি ধিকি ধিকি প্রজ্জ্বলিত থাকায় তোমার কুলশত্রু লোকাভিরাম রামচন্দ্রের সন্দেহ-দৃষ্টি অবাধে সহ্য করিতে পারিয়াছ, আত্ম-তত্ত্ব অনবগত থাকায় তোমার কুলশত্রুকে তোমার গৃহছিদ্রগুলি বলিয়া দিয়া তোমার কুলপ্রদীপসমূহ একে একে নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছ।

তুমি বলিবে কুলপতি রাক্ষসেন্দ্র মহাপাপমতি। রাজর্ষিজনকাত্মজা ও সূর্য্যবংশাবতংস রঘুকুলমণি রামভদ্রের সতীসাধ্বী রমণীকে যন্ত্রণা দিয়া ধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছেন। এসময়ে ধর্ম্মরক্ষা-আশায়

রাজাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। আর বিশেষ যখন আমি সৎপরামর্শ দিলাম তিনি গ্রহণ করিলেন না পরন্তু আমার যথেষ্ট অবমাননা করিলেন তখন রাজাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কিন্তু তোমার বুঝা উচিত ছিল যে এ সময়ে রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই সকলেই সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন। মন্ত্রণাবিদ্ অরবিন্দ ও বিরূপাক্ষ কত পরামর্শ দিয়াছেন। এবং তাঁহারাই যথার্থ মন্ত্রণাবিদের মত পরামর্শ দিয়াছেন। তুমিও সহোদরপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া না হয় কতই উপদেশ দিয়াছ। উপদেশ অগ্রাহ্য হইয়াছে বলিয়া, অবমানিত হইয়াছ বলিয়া তোমার অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু তুমিও ত মন্ত্রণাবিদের ন্যায় উপদেশদানে সমর্থ হও নাই। তোমার অগ্রজ দানবেন্দ্রবিজয়ী সুমহান্ ও অহংজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তমোমূর্ত্তিস্বরূপ এবং অলকাতুল্য এক অপূর্ব্ব পুরীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রবলপ্রতাপ দেবগণের হৃদয়ে একান্তই দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত করে; বিশেষ আমেরু-বিশ্রান্ত দারুণ সীতাপহরণ-অপরাধে তাঁহার যেরূপ চিত্তবিভ্রম ও অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি সেরূপ প্রয়োগকুশল ও নীতিবিদের ন্যায় উপদেশ দিতে সমর্থ হও নাই বলিয়াই তোমার সমস্ত নীতিকথা উপেক্ষিত, অবমানিত ও ভস্মাহুতির ন্যায় নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর এক কথা, তুমি যখন কোনরূপেই তোমার অগ্রজকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে না, তখন তুমি লোকাভিরাম রামচন্দ্রের সন্দেহাকুলচক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হইলে কেন? তোমার নিরপেক্ষ থাকাই উচিত ছিল। যদি তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইত, তোমার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত ছিল। তুমি লঙ্কার সুবেল নামক পরমরমণীয় পর্ব্বতে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া সাধ্বী রমণী সরমাকে লইয়া ব্রত, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান এ সমস্ত অভ্যাস করিলেনা কেন? লঙ্কাই যদি তোমার পক্ষে এতই বিষ বলিয়া বোধ হইত তাহা হইলে দেবাত্মা হিমালয়ে গমন করিলেনা কেন?* সেখানে সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-পথ শিক্ষা দিয়া তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। মহান্ তীর্থ সকল পর্য্যটন করিয়া তুমি কত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতে। যত বালখিল্যাদি যোগীগণ তোমাকে জ্ঞানের পথ বলিয়া দিয়া তোমার জীবন্মুক্তি-উপায় উন্মুক্ত

* কেহ কেহ বলেন যে বিভীষণ তাঁহার অগ্রজ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া কৈলাসে গমন করেন। "This dessertion to the enemy is somewhat abrupt, and is narrated with brevity not usual with Valmiki. In the Bengal recension the preceding speakers and speeches differ considerably from those given in the text which I follow. Vibhisan is kicked from his seat by Ravan and then, after telling his mother what has happened, he flies to Mount Kailasa, where he has an interview with Siva, and by his advice seeks Rama and the Vanar army.

(Griffiih's Ramayan—Bk VI canto XVII. P. 438).

করিতে সমর্থ হইতেন। হায়! হায়! বিভীষণ। রামায়ণে বাল্মীকির চরিত্রসমূহ-বর্ণনা কালে তুমি দীপ্তিমান্ গ্রহমণ্ডলী মধ্যে ভীষণ ধূমকেতুর ন্যায় রাক্ষসকুলে উদয় হইয়া না জানি কতকালই আপনার অপরিণামদর্শিতা ও কুলধ্বংসের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া থাকিবে!

আর ঐ যে কুমার দেখিতেছ—দেখিলেই যেন বোধ হয় মূর্ত্তিমান্ তেজের বিস্ফুলিঙ্গ স্বরূপ, যিনি রাম-ময়-প্রাণ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাঁহার হৃদয় রাম-প্রেমে কূলপ্লাবনকারিণী নদীর ন্যায় পরিপ্লুত হইয়া উঠে, তিনি কোন্ অপূর্ব্ব পবিত্র তেজোবলে হরশরাসনভঙ্গকারী, পরশুরাম-দর্পচূর্ণকারী, একাকী খরদূষণ-প্রমুখ চতুর্দ্দশসহস্ররাক্ষসবিধ্বংসকারী মহাপ্রভব রামচন্দ্রের সম্মুখে উপনীত হইয়াছেন বলিতে পার কি?—কৈ তিনিত কুলপরিত্যাগ করিয়া কাহারও ত শরণাপন্ন হন নাই। তিনি পরমরমণীয় রামমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে করিতে তারকব্রহ্ম রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বহু বানরসৈন্য নিপাত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন—কৈ তিনিত রক্ষকুলপতিকে অন্যায়মতি জানিয়া তাঁহাকেত পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। কীর্ত্তিবাস রামায়ণে চরিত্র-বর্ণনা কালে তাঁহার ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান বড়ই সুন্দর প্রতি-ফলিত করিয়াছেন। আবার যখন দেখি, তিনি তোমারই পুত্র তখন তোমার বিভীষণতরচরিত্রানুশীলনের ও কবির চরিত্র-বর্ণনায় নিপুণতার অপর কোন সিদ্ধতর হস্তের, আর কি প্রকৃষ্টরূপ দৃষ্টান্ত থাকিতে পারে ইহাই মনে হয়। ভো ভো বিভীষণ! তুমি যেমন কুল, সমাজ, ও রাজনীতিতে অপরিণামদর্শী তদ্রূপ যুদ্ধনীতিতেও অকুশল এবং কাপুরুষ; অথবা তোমার অল্পবুদ্ধি-প্রণোদিত এক প্রবল অভিমান আসিয়া তাহার ফল প্রদান-কালে তোমার সমস্ত নীতিজ্ঞান ভারতমহাসাগরোপরি সুনীলগগনতলে উড়াইয়া দিবে কেন?

যখন বিভীষণ তাঁহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া চারিজন অনুচরের সহিত রামচন্দ্রের শরণার্থী হইবার অভিলাষে আগমন করিতেছেন, তখন সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান, হনুমান্ প্রভৃতি মন্ত্রণাবিদ্‌গণ যাহা যাহা অনুমান করিতেছেন তাঁহাদের কথাগুলি একে একে উদ্ধৃত হইল। সেই সমস্ত কথা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে বহু বিবেচনার পর বিভীষণকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

"সোঽহং পরুষিতস্তেন দাসবচ্চাবমানিতঃ।
ত্যক্‌ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ রাঘবং শরণং গতঃ॥"

সুগ্রীব উবাচ—

"মন্ত্রে ব্যূহে নয়ে চারে যুক্তো ভবিতুমর্হসি।
বানরাণাঞ্চ ভদ্রন্তে পরেষাঞ্চ পরন্তপঃ॥
অন্তর্ধানগতা হ্যেতে রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
শূরাশ্চ নিকৃতিজ্ঞাশ্চ তেষাং জাতু ন বিশ্বসেৎ॥
প্রণিধীরাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য ভবেদয়ম্।
অনুপ্রবিশ্য সোঽস্মাসু ভেদং কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ॥
অথবা স্বয়মেবৈষ ছিদ্রমাসাদ্য বুদ্ধিমান্।
অনুপ্রবিশ্য বিশ্বস্তে কদাচিৎ প্রহরেদপি॥
মিত্রাদপি বলঞ্চৈব মৌলং ভৃত্যবলন্তথা।
সর্ব্বমেতদ্বলং গ্রাহ্যং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিষদ্বলম্॥
প্রকৃত্যা রাক্ষসো হ্যেষ ভ্রাতামিত্রস্য বৈ প্রভো।
আগতশ্চ রিপোঃ পক্ষাৎ কথমস্মিংশ্চ বিশ্বসে॥

রাবণস্যানুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতিশ্রুতঃ।
চতুর্ভিঃ সহ রক্ষোভির্ভবন্তং শরণং গতঃ॥
রাবণেন প্রণীতং হি তমবেহি বিভীষণম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর॥
রাক্ষসো জিহ্মযা বুধ্যা সন্দিষ্টোঽয়মিহাগতঃ।
প্রহর্তুং মায়য়াচ্ছন্নো বিশ্বস্তে ত্বয়ি চানঘ॥
বধ্যতামেব তীব্রেণ দণ্ডেন সচিবৈঃ সহ।
রাবণস্য নৃশংসস্য ভ্রাতা হ্যেষ বিভীষণঃ॥

অঙ্গদ উবাচ—

ইত্যুক্তে রাঘবায়াথ মতিমানঙ্গদোঽগ্রতঃ।
বিভীষণপরীক্ষার্থমুবাচ বচনং হরিঃ॥
শত্রোঃ সকাশাৎ সংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বথা তর্ক্য এবহি।
বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্ত্তব্যো বিভীষণঃ॥
ছাদয়িত্বাত্মভাবং হি চরন্তি শঠবুদ্ধয়ঃ।
প্রহরন্তি চ রন্ধ্রেষু সোঽনর্থঃ সুমহান্ ভবেৎ॥
অর্থানর্থৌ বিনিশ্চত্য ব্যবসায়ং ভজেদিহ।
গুণতঃ সংগ্রহং কুর্য্যাদ্দোষতস্তু বিসর্জ্জয়েৎ॥
যদি দোষো মহাংস্তস্মিংস্ত্যজ্যতামবিশঙ্কিতম্।
গুণান্ বাপি বহূন্ জ্ঞাত্বা সংগ্রহঃ ক্রিয়তে নৃপ॥

শরভ উবাচ—

"ক্ষিপ্রমস্মিন্নরব্যাঘ্র চারঃ প্রতিবিধীয়তাম্॥
প্রণিধায় হি চারেণ যথাবৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিনা।
পরীক্ষ্য চ ততঃ কার্য্যো যথা ন্যায়ং পরিগ্রহঃ॥"

জাম্ববানুবাচ—

জাম্ববাংস্ত্বথ সম্প্রেক্ষ্য শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিচক্ষণঃ।
বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস গুণবদ্দোষবর্জ্জিতম্॥
বদ্ধ বৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্বিভীষণঃ।
অদেশকালে সংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বথা শঙ্ক্যতাময়ম্॥

মৈন্দ উবাচ—

ততো মৈন্দস্তু সংপ্রেক্ষ্য নয়াপনয়কোবিদঃ।
বাক্যং বচনসম্পন্নো বভাষে হেতুমত্তরম্॥
অনুজো নাম তস্যৈষ রাবণস্য বিভীষণঃ।
পৃচ্ছ্যতাং মধুরেণায়ং শনৈর্নরপতীশ্বরঃ॥
ভাবমস্য তু বিজ্ঞায় তত্ত্বতস্ত্বং করিষ্যসি।
যদি দুষ্টো ন দুষ্টো বা বুদ্ধিপূর্ব্বং নরর্ষভ॥

হনুমান্ উবাচ—

অথ সংস্কারসম্পন্নো হনুমান্ সচিবোত্তমঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমর্থবন্মধুরং লঘু॥
ন ভবন্তং মতিশ্রেষ্ঠং সমর্থং বদতাং বরম্।
অতিশায়য়িতুং শক্তো বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্॥
ন বাদান্নাপি সংঘর্ষান্নাধিক্যান্ন চ কামতঃ।
বক্ষ্যামি বচনং রাজন্ যথার্থং রামগৌরবাৎ॥
অর্থানর্থনিমিত্তং হি যদুক্তং সচিবৈস্তব।
তত্র দোষং প্রপশ্যামি ক্রিয়া ন হ্যুপপদ্যতে॥
ঋতে নিয়োগাৎ সামর্থ্যমববোদ্ধুং ন শক্যতে।
সহসা বিনিয়োগো হি দোষবান্ প্রতিভাতি মে॥
চারপ্রণিহিতং যুক্তং যদুক্তং সচিবৈস্তব।
অর্থস্যাসম্ভবাত্তত্র কারণং নোপপদ্যতে॥
অদেশকালে সংপ্রাপ্তইত্যয়ং যদ্বিভীষণঃ।
বিবক্ষা চাত্র মেঽস্তীয়ং তাং বিবোধ যথামতি॥
স এষ দেশকালশ্চ ভবতীহ যথাতথা।
পুরুষাৎ পুরুষং প্রাপ্য তথা দোষগুণাবপি॥
দৌরাত্ম্যং রাবণে দৃষ্ট্বা বিক্রমঞ্চ তথাত্বয়ি।
যুক্তমাগমনং হ্যত্র সদৃশং তস্য বুদ্ধিতঃ॥
অজ্ঞাতরূপৈঃ পুরুষৈঃ স রাজন্ পৃচ্ছ্যতামিতি।
যদুক্তমত্র মে প্রেক্ষা কাচিদস্তি সমীক্ষিতা॥
পৃচ্ছ্যমানো বিশঙ্কেত সহসা বুদ্ধিমান্ বচঃ।
তত্র মিত্রং প্রদুষ্যেত মিথ্যাপৃষ্টং সুখাগতম্॥
অশক্যং সহসা রাজন্ ভাবো বোদ্ধুং পরস্য বৈ
অন্তরেণ স্বরৈর্ভিন্নৈর্নৈপুণ্যং পশ্যতাং ভৃশম্॥
ন ত্বস্য ব্রুবতো জাতু লক্ষ্যতে দুষ্টভাবতা।
প্রসন্নং বদনং চাপি তস্মান্মে নাস্তি সংশয়ঃ॥
আকারশ্ছাদ্যমানোঽপি ন শক্যো বিনিগূহি-
তুম্।
বলাদ্ধি বিবৃণোত্যেব ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্॥

দেশকালোপপন্নঞ্চ কার্য্যং কার্য্যবিদাম্বর।
বালিনঞ্চ হতং শ্রুত্বা সুগ্রীবঞ্চাভিষেচিতম্॥
উদ্যোগন্তব সংপ্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তঞ্চ রাবণম্।
বালিনঞ্চ হতং শ্রুত্বা সুগ্রীবঞ্চাভিষেচিতম্॥
রাজ্যং প্রার্থয়মানস্ত বুদ্ধিপূর্ব্বমিহাগতঃ।
এতাবত্তু পুরস্কৃত্য বিদ্যতে তস্য সংগ্রহঃ॥
যথাশক্তি ময়োক্তন্তু রাক্ষসস্যার্জ্জবং প্রতি।
প্রমাণং ত্বং হি সর্ব্বস্য শ্রুত্বা বুদ্ধিমতাম্বর॥

সুগ্রীব উবাচ—

সুদুষ্টো বাপ্যদুষ্টো বা কিমেষ রজনীচরঃ।
ঈদৃশং ব্যসনং প্রাপ্তং ভ্রাতরং যঃ পরিত্যজেৎ॥

লক্ষ্মণউবাচ

অনধীত্য চ শাস্ত্রাণি বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ন শক্যমীদৃশং বক্তুং যদুবাচ হরীশ্বরঃ॥
অস্তি সূক্ষ্মতরঙ্কিঞ্চিৎ যথা চ প্রতিভাতি মাম্।
প্রত্যক্ষং লৌকিকঞ্চাপি বর্ত্ততে সর্ব্বরাজসু॥
অমিত্রাস্তৎ কুলীনাশ্চ প্রাতিদেশ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
ব্যসনেষু প্রহর্ত্তারস্তস্মাদয়মিহাগতঃ॥
অপাপাস্তৎ কুলীনাশ্চ মানয়ন্তি স্বকান্‌হিতান্।
এষ প্রায়ো নরেন্দ্রাণাং শঙ্কনীয়স্তু শোভনঃ॥
যস্তু দোষতয়া প্রোক্তো হ্যাদানেঽবিরলস্তু চ।
তত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি যথাশাস্ত্রমিদং শৃণু॥
ন বয়ং তৎ কুলীনাশ্চ রাজ্যাকাঙ্ক্ষী চ রাক্ষসঃ।
পণ্ডিতা হি ভবিষ্যন্তি তস্মাদ্‌গ্রাহ্যো বিভীষণঃ॥
অব্যগ্রাশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ তে ভবিষ্যন্তি সঙ্গতাঃ।
প্রণাদশ্চ মহানেষোঽন্যোঽন্যস্য ভয়মাগতম্।
ইতি ভেদঙ্গমিষ্যন্তি তস্মাৎ প্রাপ্তো বিভীষণঃ॥
ন সর্ব্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ॥

(ক্রমশঃ)

কশ্চিৎ বিভীষণ-বিদ্বেষী।

তত্ত্বচিন্তা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

অহং নির্গুণ।

জড় বিচারে—বস্তু অভাবে যেমন আকাশ শূন্য, চৈতন্য বিচারেও সেইরূপ "আমিও" শূন্য। যেমন চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া জড়—সেইরূপ আমাকে বা "আমি"কে অবলম্বন করিয়া চৈতন্য।

"আমিতে" আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে—চৈতন্য অনুভূতি দ্বারা উহা ভোগ করে। "আমি" আনন্দ ভোগ করিনা।

"আমিতে" শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে—"আমি" শক্তির বশীভূত নহে। "আমি" শক্ত—শক্তির আধার।

"আমিতে" চৈতন্য প্রকাশ পাইয়াছে—"আমির" চৈতন্য দ্বারা দেখিবার প্রয়োজন নাই।

সুতরাং যাহাতে আনন্দ, শক্তি ও চৈতন্য প্রকাশভাবে পাইয়াছে—তাহাই "আমি" বা অহং। প্রকাশ আমি, সুতরাং আনন্দ, শক্তি ও চৈতন্য স্বরূপ। উহাদের যে যে গুণ আছে তৎ অতীত। "আমি" তৎ তৎ অনাদি বীজ বা কারণ স্বরূপ।

জ্বলন্ত অগ্নিতে রূপ দৃষ্ট হয়। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে সেইরূপ আর দৃষ্ট হয় না। নির্ব্বাণ অগ্নি আবার জ্বালিলে আবার সেইরূপ দেখা যায়। নির্ব্বাণ অগ্নিতে রূপ যেমন অদৃশ্য বা লীন থাকে,—অপ্রকাশ "আমিতে" আনন্দ, শক্তি ও চৈতন্য সেইরূপ অদৃশ্য বা লীন থাকে। জগতে "আমি" প্রকাশ, সুতরাং আনন্দ, শক্তি, চৈতন্য প্রকাশ আছে।

"আমি" প্রকাশ আছে—চৈতন্য দেখিতেছে, অর্থাৎ যে দেখিতেছে সেই চৈতন্য রূপী "আমি"।

"আমি" প্রকাশ আছে—শক্তি প্রমাণ করিতেছে, কারণ শক্তি ব্যতীত কাহারও অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। "আমিকে" যে প্রমাণ করিতেছে সেই শক্তিরূপী "আমি"।

"আমি" প্রকাশ আছে—আনন্দ ভোগ করিতেছে। যে ভোগ বলিতেছে সেইই আনন্দরূপী "আমি"। অর্থাৎ "আমি" "আমিকে" প্রমাণ করিতে শক্তি, দেখিতে চৈতন্য, ভোগ করিতে আনন্দ রূপ বা গুণ ধর্ম্ম ধরিয়াছে। অতএব "আমি" ইহাদের স্বরূপ ও ইহাদের লক্ষ্য।

ইহাদের দ্বিবিধ কার্য্য আছে। লক্ষ্য করা আর লক্ষ্য করান। শক্তির কার্য্য-হেতু বস্তু, আনন্দের কার্য্যহেতু ভোগ্য, চৈতন্যের কার্য্য হেতু বিচার্য্য প্রকাশ আছে। অবলম্বন স্বরূপ আমিতে থাকিয়া বিষয়রূপ আধারে স্ব স্ব কার্য্য প্রকাশ করিতেছে।

দেহ ভৌতিক—অর্থাৎ ভূতের গুণ (হ্রাস, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন) বিশিষ্ট, মন তত স্থূল বা তত ভৌতিক গুণ বিশিষ্ট না হউক—একবার সূক্ষ্ম বা একবারে ভৌতিক নহে—এমন নহে। আমি দেহ বা মন নহি। সুতরাং উহাদের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট নহি। অর্থাৎ উহাদের গুণের বশীভূত বা অধীন নহি। অর্থাৎ দেহ অগ্নিতে পুড়িলে, মন ভয়ে কাঁপিতে "আমি" অগ্নিতে পুড়িবে না, ভয়ে কাঁপিবেনা। অগ্নির দাহিকা শক্তি 'আমিকে' পুড়াইতে পারে না ভয়ে কাঁপাইবার শক্তি 'আমিকে' কাঁপাইতে পারে না। তাহা হইলে "আমি" গুণাতীত।

যদি আমি নির্গুণ তবে ভোগ কাহার? অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি ভোগ কাহার হয়।

"আমির"—সুখও নাই, দুঃখ নাই কারণ সুখ দুঃখাদি যাহাতে উদ্ভব হয় আমি তাহার অধীন নহে।

তত্রাচ (এই) "আমি" যে সুখ দুঃখাদি ভোগ তাহার কারণ?

আমার "আমি" আমার সুখদুঃখাদি ভোগ করে না। আমার "আমির" (আমি অর্থাৎ যাহার আমার বলিয়া বো[ধ] আছে সেই আমিই ভোগ করে। ইহার নাম অভিমান। অনুভূতিসত্তা আমি অনুভবকারীরূপে ভোগকে আশ্রয় দেন। অনুভব বোধ করিয়া অভিমান যেমন 'আমিতে' লয় হয়, সুখদুঃখাদিও তৎক্ষণাৎ আর অনুভূত হয় না। মৃতদেহে অস্ত্রাঘাত করিলে যেমন তৎপূর্ব্ব আধেয় আর বেদনা অনুভব করে না, 'আমিতে' ন্যস্ত অভিমান আত্মকৃত অনুভবে বিরত প্রযুক্ত সুখদুঃখাদি ভোগ করে না।

অহংই অহঙ্কার হয়েন।

কর্ম্মসূত্রে অহংই অহঙ্কার নামে পরিচিত। অহঙ্কারের যেমন কাজ করিবার শক্তি আছে, তেমনি স্থির থাকিবারও শক্তি আছে। যখন কার্য্যকারী তখন তিনি মন, যখন স্থির থাকিতে দেন তখন তিনি বুদ্ধি। অতএব তিনি কখন মন কখন বুদ্ধি। সাধারণতঃ সকল ব্যক্তির অবস্থা অহঙ্কার মনে। বুদ্ধিতে অহঙ্কার কেবল শান্তদিগের অবস্থা সম্ভব।

অস্থিরতা হইতে স্থিরতা-লাভ, ক্ষণানন্দ হইতে দীর্ঘ-আনন্দ লাভ, অথবা রূপান্তর হইতে স্বরূপ হওয়া, অহঙ্কারের মন হইতে বুদ্ধিতে বিশ্রাম মাত্র।

সৎস্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান—স্বরূপে প্রকাশ হইয়া বুদ্ধিরূপে দর্শন করেন। তখন বুদ্ধি দ্রষ্টা। এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মের কার্য্য নাই, লীলাও নাই।

নিষ্কাম অহং বুদ্ধি হইতে সকাম হয়েন। তখন তিনি মনরূপী, মনরূপী হইয়া বিষয় সৃষ্টি করেন। সৃষ্টবস্তু উপভোগার্থ ইন্দ্রিয়-রচনা। ইন্দ্রিয় সুখভোগী, সুতরাং পঞ্চভূত প্রকাশ।

অহং ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া যথাসম্ভব অবস্থায় মুক্ত, মুক্ত-বদ্ধ ও বদ্ধ হওয়ায় মনুষ্যে জীবরূপী হইয়াছেন।

যখন তিনি আপন বিষয়ে বদ্ধ, তখন তিনি মুক্ত নহেন, যখন বদ্ধ থাকিতে চাহেন তখন মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না, যখন মুক্ত হইতে চাহেন তখন উপযোগী বিষয় পরিবর্ত্তন ও গ্রহণ করেন। ঈদৃশ বাসনা মাত্রে তপস্যার উদয় হয়, পূর্ব্ব প্রকৃতি গিয়া নূতন ধরণ হয়। সেবক দেখিতে পায়—"অমুক কি ছিল কি হইল"।

এই পরিবর্ত্তনের নাম প্রকৃতিপরিবর্ত্তন, এই বিষয়-ত্যাগ-বৃত্তির নাম বৈরাগ্য, স্বরূপ স্মরণ রাখার নাম যোগ, এই যোগে জীব মুক্ত হয়।

ভাবিয়া দেখ কে কাহা হইতে মুক্ত হইবে। অহং আপনার কৃতবিষয় হইতে মুক্ত হইবে। তৎকৃত বিষয় কোথায় রহিবে?

অহং যে লয় না হইয়া কোথায় থাকিবে? তবে অহংএর আবার আবদ্ধতা বা মুক্ত হওয়া কি?

যে অবস্থায় অহং ইহা বুঝিবেনা তাহার নাম মোহ, যাহাতে বুঝিবে তাহার নাম জ্ঞান, যখন বুঝা আর না বুঝা, জানা আর না জানা থাকিবেনা তখন পূর্ব্বের স্বরূপসত্ত্ব লাভ করেন।

অহংকে না জানিয়া যখন জীব অহংকৃত বিষয়ের উপাসনা করে তখন সে বিষয়ী, যখন জানিয়া উপাসনা করেন তখন তাহার নাম বিরাগী।

না জানা হইতে জানা দূর অধিক ও অল্প। যতদিন না জানা থাকে ততদিন দূর অধিক, জানা হইলে সেই দূর অতি অল্প জ্ঞান হয়।

যাহাদিগের অধিক দূর বোধ হয় তাহাদিগের জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান। জ্ঞানীর জন্য অনুষ্ঠান নাই। জানা হইলেই জানিবার কার্য্য ফুরায়। তাহার পর স্বরূপ হইবার তপস্যা বাকি থাকে, তপস্যা পূর্ণ হইলেই মুক্তি লাভ হয়, অথবা মুক্তি লাভ হইলেই তপস্যার শেষ হয়।

এই অহংকে, ইহাই জানাইতে শাস্ত্র, ইহা জানিবার জন্য অনুষ্ঠান, ইহা জানার নাম জ্ঞান, এই অহং হওয়াকে মুক্তি কহে।

এই অহং জানত কল্পিত, অজানত বা কল্পনাতীত সমস্ত জগৎ-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত। এই অহং পঞ্চভূতপূর্ণ, এই অহং শরীর, দেহ, তুমি, আমি, তিনি পূর্ণ। এই অহং হইতে সৃষ্টি (উদয়) স্থিতি (বিকাশ) ও লয় (অবকাশ) হইতেছে।

এই অহং নিত্য, অনাদি, স্বরূপ, বিকার বা বিকল্পতা শূন্য। সমস্ত বিষয়ের বীজ স্বরূপ।

এই অহংকার দেহ নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, অথচ রূপ, গুণ আকার সমস্তই ইহা হইতেই উদয়, ইহাতেই স্থিতি, ইহাতেই লয় হয়।

এই অহংকার (কার্য্যশূন্য) ব্রহ্ম।

এই অহং (কারি শূন্য নহে—কায়াশূন্য) ঈশ্বর।

এই অহং (কার ও কায়া শূন্য নহে) জীব। (ক্রমশঃ)

শ্রীবামাচরণ বসু।

দক্ষযজ্ঞ রহস্য।

(প্রথম প্রস্তাব)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

পাঠক মহাশয়! এখনও দক্ষযজ্ঞের আরম্ভ হয় নাই। একাল পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়া আসিয়াছি, তাহা দক্ষযজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। দক্ষযজ্ঞের রহস্য বুঝিতে হইলে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলিকে সুন্দররূপে বুঝিতে হইবে, কারণ দক্ষযজ্ঞের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। অতঃপর দক্ষযজ্ঞের বিবরণে হস্তক্ষেপ করিব, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে উপরি-উক্ত ঘটনাবলীর আভ্যন্তরিক রহস্য এবং নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্খা করি। এপর্য্যন্ত যাহা কিছু বিবৃত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত নীতিগুলি বুঝিতে পারা যায়। ১ম। সামাজিক নিয়ম সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পালনীয় ২য়। সাংসারিক লোকের পক্ষে মানাপমানকে মহাপুরুষদিগের ন্যায় তুল্য জ্ঞান করা বড়ই কঠিন। ৩য়। মানব যত প্রকার সাংসরিক বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান ও শিক্ষায় সুদক্ষ হউক, যতপ্রকার ইহলৌকিক বহুদর্শীতায় পরিপূর্ণ হউক, কিন্তু মায়ার অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইতে কঠিনতর। এই মায়ার প্রবলপ্রভাবে সংসারী মানবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বসুধাতুল্য ধৈর্য্যও নষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য মহারাজা দক্ষ এত বড় বুদ্ধিমান, এতবড় বিবেকী এবং এতবড় বহুদর্শী পণ্ডিত হইয়াও শিবকে ভগবান বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে সক্ষম হইলেও তাঁহার অবমাননা করিতে বিমুখ হয়েন নাই। ৪র্থ। শিবচরিত্র বুঝিয়া উঠা অতীব দুঃসাধ্য; কেবল চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে দেবাদিদেব মহাদেবকে উন্মত্ত, প্রলাপ, নেশাখোর, বৃথাবাক্যব্যয়ী, বৃথাভ্রমণকারী, অলস, অকর্ম্মণ্য ও নীচসংসর্গপ্রিয় অপবিত্র জীব বলিয়া বোধ হয়। মায়াবিদ্ধ সামান্য জ্ঞানে ইহাই সাধারণের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু দিব্য চক্ষু (জ্ঞান চক্ষু) উন্মীলন করিয়া দর্শন করিলে শিবচরিত্র প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যায়। তখন শিবকে দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া জানিতে পারা যায়, তখন শিবকে আদর্শ জগদ্গুরু এবং

ভগবান্ বলিয়া দিব্যজ্ঞান জন্মে। ৫ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব ইঁহারা এক; যিনি ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু এবং যিনি বিষ্ণু তিনিই শিব। মূর্খেরা এই তিনকে ভিন্ন ভাবিয়া অপরাধ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক এই তিন এক। ভগবানের যে গুণে সৃষ্টিক্রিয়া হয় তাহাই ব্রহ্মা; যে গুণে পালনক্রিয়া হয় তাহাই বিষ্ণু এবং যে গুণে প্রলয়-(সংহার-) ক্রিয়া হয় তাহাই শিব। ইহাই হিন্দু ত্রিত্ববাদ (Trinity)। প্রকারান্তরে খৃষ্টানদিগের Father, Son এবং Holy Ghost, মুসলমান্দিগের আলিফ্, লাম্ ও মীম্ এবং বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ এই ত্রিত্ব। অগ্নি হইতে তাপ ও জ্যোতি যেমন একত্রে অবস্থান করে না এবং পরস্পরে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কীভূত, কিছুতেই উহাদের বিচ্ছিন্নতা সম্ভবপর নহে, তদ্বৎ সৃজনকারীগণ (অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) এক, এবং একেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম, উপাধি ও শক্তি। এইজন্য, পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন, সভাস্থলে শিব যখন নীরব ছিলেন, তখন ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও নীরবভাবে অবস্থান করিতে ছিলেন। ৬ষ্ঠ। অন্যায় অহঙ্কার এবং বৃথা দর্প কখনই পৃথিবী সহ্য করেন না। ভগবানের অন্য নাম "গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারী"। দক্ষের দমনজন্য ভগবানের অনুজ্ঞায় ও ইচ্ছায় ইতিপূর্ব্বেই ষড়যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীভগবান্ স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না, তিনি সদা সাক্ষী মাত্র। তিনি অবতাররূপে অথবা অন্য কোন উপায়ে "নিমিত্তমাত্র" স্থাপন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া লয়েন। একজন অতি পুরাতন ইংরাজি কবি লিখিয়াছিলেন,— He (God) makes man a medium and through him the God fulfils his mysteries and obtains his wishes. (ঈশ্বর মনুষ্যকে নিমিত্ত-মাত্র করিয়া, তদ্দ্বারা নিজ অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া লয়েন)। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে বুঝিতে পারি, অর্জ্জুন যখন আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির বধে কাতর হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং বহুসংখ্যক শত্রুসেনা দর্শন করিয়া, চিন্তিত ভাবে শ্রীমধুসূদনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান্ এই বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন যে, "হে অর্জ্জুন! তুমি যাহাদিগকে বধ করিতে সাহস করিতেছ না, অথবা যাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া কাতরতা প্রকাশ করিতেছ, আমি ইতিপূর্ব্বেই তাহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি; তুমি কেবল নিমিত্ত-মাত্র, (medium), তোমার হাত দিয়া তাহারা লৌকিকভাবে মৃত হইবে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত মরণ আমার দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে।"

"তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"।

(গীতা। ১১ অ ৩৩ শ্লোক)

দক্ষরাজার নিধন ইতিপূর্ব্বেই ভগবানের অনুজ্ঞা ও অভিলাষে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দক্ষ নিজের পাপের ফল নিজে ভোগ করিয়াছিল। তাহার প্রবর্ত্তিত যজ্ঞ তাহার নিধনের "নিমিত্ত-মাত্র"। ৭ম। শ্বশুর শ্বশুর

পিতৃস্থানীয়, সুতরাং গুরুজনমধ্যে গণ্য। শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ অবশ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইবার উপযুক্ত। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যাহারা গুরুজনকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের যশ, শ্রী ও পরমায়ু ক্ষয় হয়।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকঞ্চশিষমেব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বানি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)

এই জন্য শ্বশুরের কথায় কোপ প্রকাশ না করিয়া (জামাতা) শিব সভাস্থলে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। দক্ষ প্রস্থান করিলে পর শিবানুচর নন্দী দক্ষের বাক্যের যথোচিত উত্তর দান করিয়াছিলেন। ৮ম। যতক্ষণ দক্ষরাজা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন,ততক্ষণ পর্য্যন্ত নন্দী একটি মাত্র কথাও কহেন নাই, কারণ তাঁহার প্রভু (শিব) নীরব থাকায়, শিষ্য বা ছাত্রের অথবা দাসের কিম্বা কনিষ্ঠের মুখ হইতে কোন প্রকার বাক্য নিঃসৃত হওয়া অসামাজিক। ইহা প্রভুভক্তি ও প্রভুরানুগত্যের পরিচয়। ৯ম। সভাস্থল হইতে দক্ষরাজার প্রস্থানের পরে নন্দী যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই ;———পরমার্থ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকা সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যহীনতা। আত্মা দেহের ন্যায় মরণশীল নহে। যাহারা কামিনী ও কাঞ্চনের মায়ায় মুগ্ধ তাহারা পশুতুল্য। ১০ম। প্রভুভক্ত নন্দীর বক্তৃতার পরে সভাস্থলে ভৃগুমুনির বক্তৃতা অতীব আশ্চর্য্য রহস্যে পরিপূর্ণ। এই গুহ্য রহস্য অতীব জ্ঞানগর্ভ এবং ইহার উন্মেষণ অতীব প্রয়োজনীয়। পাঠকেরা দেখিবেন, ভৃগুর বক্তৃতার মর্ম্ম নন্দীর বক্তৃতার মর্ম্মের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত। নন্দীর বক্তৃতা যেমন শিবপ্রশংসায় পরিপূর্ণ, তেমনি ভৃগুর বক্তৃতা শিবনিন্দায় আদ্যন্ত পূর্ণ। ভৃগুমুনির বক্তৃতাটি আমি মূল ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম———

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥
নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়োজটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
বিশন্তু শিব-দীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্॥
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্যূয়ং পরিনিন্দথ।
সেতুং বিধারণং পুংসাংমতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ॥
এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থা সনাতনঃ।
যং পূর্ব্বেচানু সং তস্থুর্যৎ প্রমাণং জনার্দ্দনঃ॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং সতাং বর্ম্ম সনাতনম্॥
বিগর্হ্য যাত পাষণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্॥
(ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ)

পরম পূজনীয় শ্রীধরস্বামী মহোদয় এই মূল শ্লোকসমূহের এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—যে শিবব্রতধরাস্তে পাষণ্ডিনোভবন্তু। কিং চ, নষ্টশৌচা জটাভস্মাস্থিধারিণঃ শিবদীক্ষায়াং প্রবিশন্তু। কিংচ, যূয়ং বেদং ব্রাহ্মণাংশ্চ নিন্দথ। অতঃ পাষণ্ডং শ্রিতা ভবত। ইমং পূর্ব্বে ঋষয় আশ্রিতবন্তঃ। যস্মিন্ জনার্দ্দনো মূলম্। তং শুদ্ধং বেদং বিগর্হ্য পাষণ্ডং যাত। যত্র ভূতরাট্ দেবতা। ইত্যাদি। ভৃগুমুনির এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় কতকগুলি আশ্চর্য্য কথা আছে। তিনি কহিয়াছেন "যে ব্যক্তি শিবপ্রবর্ত্তিত পন্থার অনুসরণ করে, অথবা শিবব্রত ধারণ করে, কিম্বা শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি পাষণ্ড; তাহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়, এবং পবিত্রতা নষ্ট হয়। সে ব্যক্তি সুরা

ও আসবকেই আদর করে এবং তামোময় ভূতগণের অধিপতির প্রেতময় স্থানে নিধন প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি। এই টুকু পাঠ করিয়া, অত্যন্ত বিস্ময় ও বিষাদ সংকারে পাঠকেরা কহিতে পারেন, কি আশ্চর্য্য! মহর্ষি ভৃগুর মুখ হইতে কেমনে এমন অযৌক্তিক কথা নিঃসৃত হইল!! "শিব-প্রবর্ত্তিত পন্থানুসরণে মনুষ্যেরা পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়" ইহা কিরূপ কথা!! বাস্তবিক এই কথাগুলি ভৃগুমুনির উপদেশজনক বাক্য এবং বাস্তবিক এই বাক্যাবলীর অভ্যন্তরে অতীব গুহ্য ও জ্ঞানগর্ভ রহস্য আছে। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার আকাঙ্খা করি। মানবের পক্ষে দুইটি পথ পরিচিত, একের নাম প্রবৃত্তি-মার্গ, অপরটির নাম নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তির পথ আশু মনোরম হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে ইহা কুফলপ্রদায়ক। নিবৃত্তি-মার্গ প্রথমেও সুখদায়ক এবং পরিণামেও আনন্দবর্দ্ধক। প্রথমাবস্থায় দেশকাল-পাত্রভেদে নিবৃত্তির পথ ক্লেশকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইহা পরিণামে অত্যন্ত সুফলদায়ক, সুতরাং ইহাই মোক্ষলাভের সুপ্রসিদ্ধ বর্ত্ম এবং এই পথাবলম্বন করাই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তিমার্গে লোভ, কাম, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভোগ, বিলাস, এবং তজ্জন্য রোগ, শোক, ভয়, নানাবিধ বিপৎ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া মনুষ্য শুদ্ধচেতা, দিব্যচক্ষুষ্মান্, বিবেকী, ব্রহ্মজ্ঞানী, সুখ ও আনন্দপূর্ণ হইয়া পরিণামে দেহমুক্ত অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। নিবৃত্তিমার্গের লোকেরা শৌচাচার, চিত্তশুদ্ধি, সাধুতা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্ত্বগুণ প্রভৃতিকে অর্জ্জন করিয়া পুণ্যকর্ম্মী, তত্ত্বদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানী ও ভগবদ্‌ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। যে দেবতার পূজা বা উপাসনা করিলে, অথবা যে দেবতার শরণাগত লোকবৃন্দের সংসর্গে থাকিলে, প্রবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিতে মানবের অভিলাষ জন্মে, অতি সাবধানে সেই দেবতা-প্রবর্ত্তিত পথাবলম্বন করা উচিত। যে কোন দেবতাই হউক, দেবতামাত্রেই সদাশুদ্ধ, সদাপূজ্য এবং নিত্য উপাস্য। সুতরাং দেবতার উপাসনায় অনিষ্টের আশঙ্কা কেমনে সম্ভবপর? কিন্তু শ্রীভগবান্ অবতার, মহাপুরুষ, যোগী, ধর্ম্মপ্রণিধি, ভবিষ্যদ্বক্তা প্রভৃতির দ্বারা ধর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন; ঋষি, মুনি ও শাস্ত্রকর্ত্তাগণ জীবের কল্যাণ ও উদ্ধারের জন্য এবং লোকশিক্ষার হেতু শাশ্বত শাস্ত্রাবলীতে ঐ পথের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। মায়ামুগ্ধ মানবেরা শাস্ত্রার্থে দক্ষতা লাভে অসমর্থ হইয়া, নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ বিপথে পতিত হয়, এবং ইহলোক ও পরলোক নষ্ট করে। গীতায় ভগবান্ কহিয়াছেন, যে যাহাকে ভজনা করে, সে উপাস্যকেই অনুকরণ করে, সুতরাং উপাস্য দেবতার প্রদর্শিত পথ সে ব্যক্তি অনুধাবনা করিয়া থাকে। তান্ত্রিকেরা শিব, দুর্গা, কালী, ভৈরবী প্রভৃতির পূজা করিতে গিয়া প্রথমেই ভাবে,—তন্ত্রশাস্ত্রমতে শাক্তগণ মৎস্য, মাংস, কুক্কট, পলাণ্ডু, ডিম্ব প্রভৃতির ভক্ষণ, সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের পান এবং স্ত্রীসংসর্গ করিতে উপযুক্ত; কেহ কেহ

বলিয়া থাকে "আমরা এই সকলের ব্যবহার করিতে বাধ্য"। শাক্তের ধারণা এই যে, শক্তিপূজা আর প্রবৃত্তিমার্গ এক, সুতরাং এই পূজা কেবল ঐহিক কামনাসিদ্ধির উপায় এবং ভোগবিলাসের নিতান্ত সুবিধাজনক বিধি। প্রায়ই দেখা যায়, প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী সকাম লোকেরা স্বার্থপরতা-দুষ্ট কামনা-সিদ্ধির জন্য, মহাদেব বা দুর্গা কিম্বা কালী অথবা তদ্বৎ দেবদেবীকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়া, একেবারে এমনি ভ্রষ্টচেতা ও নষ্টচরিত্র হইয়া পড়ে যে,—মাদকদ্রব্যসেবন, ভোগবিলাস এবং ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা ভিন্ন জগতকে অথবা মানবজীবনকে আর কোন ভাবেই দেখে না। এইজন্য দেখিতে পাই, শিবব্রতাবলম্বন করিয়া, পরিণামে অনেকে উন্মাদ, দুশ্চিকিৎস্যরোগযুক্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট, হৃতসর্ব্বস্ব এবং নষ্টচরিত্র হইয়া তন্ত্রশাস্ত্রের ও শক্তিপূজার নামে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করে। দেবাদিদেব মহাদেবের অনুকরণ করিতে গিয়া বিপদে পতিত হইয়া যায়। ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না যে, জগদ্‌গুরু শিব বিষপান করিয়া মৃত হয়েন নাই, বরং "নীলকণ্ঠ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া নিজের ঈশত্ব, অমরত্ব ও অনাদিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ বিষপান করিয়া মরেন নাই, কাকুৎস্থমুনি জ্বলন্ত হুতাশনমধ্যে দ্বাদশবর্ষ কাল উপবেশন করিয়াও দগ্ধ হয়েন নাই, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যবনান্ন ভক্ষণ করিয়াও অশুদ্ধ হয়েন নাই এবং বিভূতিনাম্নী ঋষি-কন্যা অন্তরীক্ষে উড়িয়া গিয়া অযুতলক্ষ বজ্রাঘাতে ও ক্ষণকাল জন্য বেদনা বোধ করেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি তোমাতে তাহা সম্ভবপর? তুমি কি এই সকলের অনুকরণ করিতে পার? অধিকারভেদে পথ অবলম্বন করিতে হয়। বর্ত্তমান যুগে (কলিকালে) শিবতন্ত্রের প্রদর্শিত পথে অনেক বিঘ্ন এবং অনেক প্রকার কাঠিন্য দেখা যায়; অমাবস্যা রজনীতে শনিবারে মহাশ্মশান-ক্ষেত্রে একাকী গমন, শবের দেহে "আসন" করিয়া উপবেশন, ভৈরবীচক্রের মতে সাধন, তামসিক দ্রব্যের আহার, মাদক দ্রব্যের ব্যবহারকারীদিগের সহিত নিয়ত সংসর্গকরণ, উৎকট ক্রিয়ানুমোদিত পূজা ও উপাসনা ইত্যাদি দ্বারা মনুষ্যের অকল্যাণ হওয়া যতদূর সম্ভব, কল্যাণের ততটা সম্ভাবনা আদৌ দেখা যায় না। এই কারণে এই পথে প্রবৃত্তিরই অনেকে অনুসারী হইয়া থাকে, নিবৃত্তিকে অবলম্বন করিতে অভিলাষী হয় না। ক্রমে লোভ, কাম, ভোগ, বিলাস প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়; মদিরাপান ও স্ত্রীসম্ভোগে ঐকান্তিকী আসক্তি জন্মে; সুতরাং অধঃপতনেরই আশঙ্কা অধিক, প্রকৃত ভক্তি, জ্ঞান, সাধন বা পুণ্যময় কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রায়ই হয় না। যে সকল শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এবম্প্রকার লোকেরা প্রবৃত্ত হয়, তাহা তামসিক, স্বার্থ-পরতায় দুষ্ট এবং সম্পূর্ণ কাম্য। তদ্ব্যতীত, এবম্প্রকার লোকেরা শিব ও এবম্বিধ উপাসনার সুধা মর্ম্ম অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া, যদিচ্ছানুসারে বিপথে বিচরণ পূর্ব্বক ইতো-নষ্ট ততোভ্রষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য ভৃগুমুনি উপদেশচ্ছলে জ্ঞান ও ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া

নিবৃত্তিমার্গের গুরু বিষ্ণুকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অবলম্বা বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু শিবব্রত ও বিষ্ণুব্রত এতদুভয়ের উদ্দেশ্য যে এক, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। ভবব্রতের পন্থায় যে সকল বিপদ আছে, তাহাই তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন,এইজন্য শিবনিন্দায় (অর্থাৎ শিবানুচর-প্রদর্শিত পন্থার নিন্দায়) তিনি মুখ-ব্যাদান করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বৌদ্ধ দর্শন ও আত্মা।

আমরা "শূন্যবাদ" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে—'ঔপনিষদ পুরুষ' অর্থে "আত্ম."শব্দ বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু আত্মার যাহা অর্থ—আমাদের মোক্ষশাস্ত্রকারগণ করেন, তাহা বৌদ্ধদের অসম্মত নহে। বৌদ্ধেরা যাহাকে 'সক্কায়দিট্‌ঠি' নামক সংযোজন বা বন্ধন বলেন, তাহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, পুরুষতত্ত্ব বৌদ্ধশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বা আত্মার অভাব তাহাদের সম্মত। কিন্তু বস্তুত পক্ষে ইহা ভ্রান্তিমাত্র। আত্মা বা পুরুষশব্দ বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত না হইলেও ঠিক্ পুরুষের যাহা লক্ষণ—তাদৃশ পদার্থ (অসঙ্গত ধাতু) বৌদ্ধদেরও চরম গতি। কিন্তু যে 'আত্মাকে' তাঁহারা মিথ্যাদৃষ্টি বলেন, তাহার সহিত ঔপনিষদ পুরুষের কোনও সম্পর্ক নাই।

"মিলিন্দ পঞ্হ" নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ নাগসেন ভিক্ষুকে প্রশ্ন করিতেছেন—নাগসেন কে। শরীরের ধাতু এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও চিত্তাদি কি নাগসেন? তাহাতে নাগসেন উত্তর করিলেন যে—ইহার কোনটাই নাগসেন নহে। তখন রাজা বলিলেন, তবে ধর্ম্মিষ্ঠ নাগসেন মিথ্যাবাদী, কারণ তিনি এই সমস্তকে নাগসেন বলিয়া পরিচয় দেন।

এতদুত্তরে নাগসেন বলিলেন, মহারাজ! আপনি কিসে করিয়া এখানে আসিয়াছেন? রাজা বলিলেন 'রথে'। নাগসেন বলিলেন, কৈ রথ ত দেখিতেছি না, কেবল চক্র যূপ, দণ্ডনেমি ইত্যাদি দেখিতেছি; অতএব আপনি এতবড় রাজা হইয়া মিথ্যা কথা বলিলেন! তখন মিলিন্দ রাজা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন যে, চক্রদণ্ডাদি রথ নহে, কিন্তু উহার সমষ্টি রথ। তাহাতে নাগসেন বলিলেন যে, সেইরূপ শরীর-চিত্তাদি-সমষ্টিই নাগসেন, অন্য কিছু নহে।

এইরূপ দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, শরীরচিত্তাদি পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত 'আত্মা' আর বৌদ্ধশাস্ত্রে নাই। বস্তুত কিরূপ আত্মা বৌদ্ধশাস্ত্রে অস্বীকৃত, তাহা নিম্নোক্ত সক্কায়দিট্‌ঠির বিবরণ হইতে সম্যক্ বুঝা যাইবে।

"ধম্মসঙ্গনি" নামক অভিধর্ম্ম-গ্রন্থে আছে, "কতমা সক্কায়দিট্‌ঠি। ইধ অস্সুত বা পুথুজ্জনো বা অরিয়ানং অদস্সাবী অরিয়ধম্মস্স অকোবিদো অরিয়ধম্মে অবিনিতো ...... রূপং অত্ততো সমনুপস্সতি রূপবন্তং বা অত্তানং অত্তনি বা রূপং রূপস্মিং বা অত্তানং।

অত্তনি বা রূপং রূপস্মিং বা অত্তানং। বেদনং অত্ততো সমনুপস্সতি বেদনাবন্তং বা অত্তানং অত্তনি বা বেদনা বেদনায় বা অত্তানং। সঞ্ঞং অত্ততো সমনুপস্সতি সঞ্ঞাবন্তং বা অত্তানং অত্তনি বা সঞ্ঞং সঞ্ঞায় বা অত্তানং। সঙ্খারা অত্ততো সমনুপস্সতি সঙ্খারবন্তং বা অত্তানং অত্তপি বা সঙ্খারে সঙ্খারেসু বা অত্তানং। বিঞ্ঞাণং অত্ততো ... ... যা এব রূপা দিট্‌ঠি দিট্‌ঠিগতং দিট্‌ঠিগহনং দিট্‌ঠিকন্তারো, দিট্‌ঠি বিসূকয়িকং দিট্‌ঠিবিপ্‌ফন্দিতং, দিট্‌ঠিসঞ্ঞোজনং, গাহো, পটিট্‌ঠাহো, অভিনিবেসো, পরামাসো, কুমগগো, মিচ্ছাপথো, মিচ্ছত্তং, তিত্থায়তনং বিপরিয়েসগাহো। অয়ং বুচ্চতি সক্কায়দিট্‌ঠি।

নিক্‌খেপ কাণ্ডং।

(হংসাবতী পিটকের ১৫৭ পৃ)

অর্থ—তন্মধ্যে স্বৎকায়দৃষ্টি বা স্বকায়-দৃষ্টি কি? এই লোকে যে অশ্রুত পৃথগ্‌-জনেরা আর্য্যদের বুঝিতে পারে না, বা তাঁহাদের ধর্ম্ম জানে না, ও সেই ধর্ম্মে বিনীত নহে, তাহারা রূপকে বা ভৌতিক শরীরকে আত্মারূপে দেখে ও মনে জানে আত্মারই এই রূপ ও আত্মাতেই এই রূপ আছে ও রূপেতেই এই আত্মা আছে। এবং বেদনাকে (সুখ দুঃখ উপেক্ষা বোধ) আত্মারূপে দেখে, ও মনেকরে আত্মারই এই বেদনা ও আত্মাতেই এই বেদনা আছে ও বেদনাতেই আত্মা আছে। এবঞ্চ সংজ্ঞা (শব্দাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়জ প্রাথমিক জ্ঞান বা আলোচন-নামক জ্ঞান); সংস্কার সকল ও বিজ্ঞাণ (চিন্তিত বিশেষজ্ঞান) এই স্কন্ধত্রয়কে আত্মা রূপে দেখে, ও মনে জানে আত্মারই তাহারা ও আত্মাতেই তাহারা ও সেই সকলেই আত্মা আছে। এইরূপ যে দৃষ্টি (প্রতীতি), দৃষ্টিতে বিচরণ, দৃষ্টিগহন, দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টির ইন্দ্রজাল," দৃষ্টির বিস্ফন্দন বা সংঘর্ষ, দৃষ্টি-সংযোজন বা বন্ধন, আর যে সেই আত্ম-ভাবকে ধরা ও না ছাড়া, যে অভিনিবেশ ও সংস্পৃষ্টভাব, যে কুমার্গ, মিথ্যাপথ মিথ্যাত্ব, তীর্থায়তন (পন্থা বা ঘাট?) ও বিপর্য্যাস-গ্রাহ—তাহাই স্বৎকায়দৃষ্টি বা স্বকায়-দৃষ্টি * বলিয়া উক্ত হয়। এই স্বকায়-দৃষ্টি বৌদ্ধমতে প্রধান বন্ধন। ঔপনিষদ মতেও ঠিক তাহাই। মনবুদ্ধি-শরীরাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ অবিদ্যাই প্রধান বন্ধন। "মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি নাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রং" ইত্যাদি স্তোত্র বোধ হয় অনেকেই জানেন। ফলতঃ বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি-বিশেষকে "আত্মা" শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন, ঔপনিষদেরা তাহা করেন না। বৌদ্ধেরা বলেন, পঞ্চস্কন্ধ তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা নিরুদ্ধ হইলে নির্ব্বাণ হয় (বান বা তৃষ্ণার অভাব নির্ব্বাণ)। ঔপনিষদেরা বলেন, বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, শিবস্বরূপ আত্মায় স্থিতি হয়। নির্ব্বাণেও দুঃখের নিবৃত্তি, আত্মসংস্থাতেও দুঃখের নিবৃত্তি।

অতএব স্পষ্টই বুঝা গেল, বৌদ্ধেরা যাহাকে নির্ব্বাণ বা "অসঙ্খতধাতু" নাম দেন, ঔপনিষদেরা তাহাকেই "আত্মা" নাম দেন। বৌদ্ধেরা বলেন, পঞ্চস্কন্ধের চরম অবস্থা "শূন্য" (শূন্যবিষয়ে "শূন্যবাদ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

---

* সক্কায়দিট্‌ঠি শব্দের বুদ্ধ ঘোষ এই দ্বিবিধ অর্থ করেন।

ঔপনিষদেরা বলেন, চিত্তাদির চরম অবস্থা অব্যক্ত বা মায়াময়। 'শূন্য'ও অব্যক্ত ভিন্ন দিক্ হইতে ভিন্ন ভাষায় লক্ষিত হইলেও বস্তুত বড় ভিন্ন পদার্থ নহে।

বৌদ্ধেরা বলেন 'নিব্বাণম্ পরমং সুখং' কিন্তু এই পরম সুখের অনুভাবয়িতা কে? তাঁহারা বলেন,অর্হতেরা (অস্মদ্ভাষায় জীবন্মুক্তপুরুষেরা) তাহার অনুভাবয়িতা। তাঁহারা আরও বলেন, বেদনাস্কন্ধের পরিচ্ছিন্ন সুখ ও পরমসুখ সংপূর্ণ পৃথক্‌লক্ষণ; কারণ নির্ব্বাণ "অসঙ্খ্‌ত ধাতু"(ইহার বিষয় অগ্রে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পঞ্চস্কন্ধের শূন্যতা যখন নির্ব্বাণ, তখন পঞ্চস্কন্ধশূন্য পৃথক্ অর্হন্ কি বা কে হইবেন,—যিনি নির্ব্বাণসুখের অনুভাবয়িতা। অতএব নির্ব্বাণ-সুখকে স্বয়ংবোধস্বরূপ বলা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই! ঔপনিষদেরাও আত্মাকে স্বয়ংবোধ-রূপ ও শিব বা পরম মঙ্গলস্বরূপ বলেন।

"মিলিন্দপঞ্‌হ" গ্রন্থে নির্ব্বাণকে 'একন্তসুখং' বলা হইয়াছে, আর তাহাকে বিমুক্তিসুখ ও বলা হয়। যথা "বিমুত্তিসুখং পটিসংবেদি" (পুটিচ্চসমুপাদ) ফলকথা—নির্ব্বাণ অর্থে বান বা তৃষ্ণাশূন্যতা সর্ব্বশূন্যতা নহে।

"অভিধম্মত্থ সঙ্গহে" আছে "পদমচ্চুতমচ্চন্তমসঙ্খতমনুত্তরং। নিব্বাণমিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসয়ো॥" অর্থাৎ অচ্যুত, অত্যন্ত অসংস্কৃত, অনুত্তর পদকে বানমুক্ত মহর্ষিরা নির্ব্বাণ বলেন। এই লক্ষণে অচ্যুতাদি চারিটি প্রতিষেধার্থক পদ আছে বটে, কিন্তু পদ-শব্দ ভাবার্থক। আর নির্ব্বাণকে যে শূন্য, ও অনিমিত্ত ও অপ্রণিহিত বলা হয়, তাহারও অর্থ উক্ত হইতেছে। রাগদ্বেষ ও মোহের 'আরম্মণ' বা বিষয় এবং "সম্পযোগ" বা সাহচর্য্য ও সহভাব-(একুপ্পাদ, একনিরোধ) শূন্যতাহেতু নির্ব্বাণ শূন্য। আর রাগাদিপ্রণিধি-উদ্দেশ্যরহিতত্ব-হেতু অপ্রণিহিত। অথবা সংস্কার, সংস্কাররূপনিমিত্ত ও সংস্কাররূপ-প্রণিধি-রহিতত্ব-হেতু নির্ব্বাণ শূন্য, অনিমিত্ত ও অপ্রণিহিত। ইহা বিশুদ্ধিমার্গ-গ্রন্থে "ইন্দ্রিয়মচ্চনিদ্দেশ" পরিচ্ছেদে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে। অতএব নির্ব্বাণ রাগাদিশূন্য হইলেও 'পরম সুখং' 'একুন্তসুখ'' বা 'বিমুত্তি-সুখং' শূন্য নহে।

বৌদ্ধদের অভিধর্ম্ম-শাস্ত্রে নির্ব্বাণকে অসঙ্খতধাতু বলা হয়। অসঙ্খত বা অসংস্কৃত অর্থে ভাগশূন্য বা অসংযোজক অর্থাৎ যাহা বহুভাগের রাশি বা সমষ্টি স্বরূপ নহে। ধাতু * অর্থে মূলভাব। অট্‌ঠকথাকার বুদ্ধঘোষ ধাতুর ব্যাখ্যাকালে নিসত্ত ও নির্জীবত্ব পুনঃ ২ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

---

* বৌদ্ধদর্শনে ধাতুশব্দের অর্থ বিচার করিলে,তাহা শক্তির সমলক্ষণ হয়। তন্মতে ধাতু অষ্টাদশসংখ্যক। যথা চক্ষুধাতু চক্ষুবিজ্ঞান-ধাতু, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু ইত্যাদি। 'মনোবিঞ্ঞণধাতু সম্ফস্সজং' অর্থাৎ "মনোবিজ্ঞান বা মানসবিষয়ের বিজ্ঞানধাতুর সহিত সংস্পর্শজ জ্ঞান' ইত্যাদি বাক্য হইতে ধাতুপদার্থে—চক্ষু-আদির শক্তিরূপ বা অকল্পনীয় ভাবই লক্ষিত হয়। ইংরাজগণ ধাতুকে Element শব্দের দ্বারা অনুবাদ করেন। তাহাও বস্তুত শক্তির সমার্থক, কারণ দর্শনাদি ক্রিয়ার Element দর্শনাদিশক্তি ব্যতীত আর কি হইবে? বিভাবিণী-টীকাকার ধাতুর এইরূপ অর্থ করেন, যথা "অত্তনো সভাবং ধারেন্তীতি ধাতুয়ো অথবা যথা সম্ভবং অনেকপকারং সংসারদুঃখং বিদহন্তি" (সপ্তম পরিচ্ছেদ।)

নিসত্ত্ব অর্থে একেবারে নাই এরূপ নহে। কারণ, তাহা হইলে অভিধর্ম্মশাস্ত্রে "অসঙ্খত ধাতু"র এত বিবরণ দিবার কি প্রয়োজন ছিল? বলিলেই হইত, অসঙ্খত ধাতু নাই, অথবা অসৎ পদার্থের উল্লেখ না করিলেই হইত। বস্তুত "সত্ত্ব" অর্থে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে প্রতীত ভাব বা Phenomenon। তজ্জন্য পঞ্চস্কন্ধের বা প্রতীত ভাবের সমষ্টি-বিশেষের নাম বৌদ্ধশাস্ত্রে সত্ত্ব বা জীব। অতএব নিসত্ত্ব অর্থে প্রতীত-ভাবের ন্যায় সত্তাশূন্য। আর নির্জীব অর্থে জীবনশূন্য অথবা 'বেদগু' বা জ্ঞাতাশূন্য। চক্ষুরাদির শক্তিরূপ মূল-ভাবকে জীবনশূন্য (কারণ জীবনও Phenomenonর অন্তর্গত) বা বেদগুশূন্য বলিলে সাংখ্যের সহিত কিছুই বিরোধ হয় না, কারণ সাংখ্য-মতেও সমস্ত বিকার অচেতন অব্যক্তোপাদানক। আর অসঙ্খত ধাতুকে ও পরম সুখকেও জীবনশূন্য ও বেদগুশূন্য বলিলেও ক্ষতি নাই, কারণ তাহার আর স্বতন্ত্র বেদগু কে থাকিবে?

যাহা হউক, এই অসঙ্খত ধাতুকে অভিধর্ম্মে অনেক বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। তাহা 'অপ্পমাণা (অমেয়), পণীতা (সর্ব্বোত্তম), অহেতুক অনুপাদন; লোকুত্তরা, অনারম্মণ, অনাসব ইত্যাদি। এবম্বিধ 'পরমসুখই' বৌদ্ধদের চরম অবস্থা; কিন্তু ইহা যে আর্য্য মোক্ষমার্গগামীদের আত্মা

স্বভাব ধারণ করাও শক্তির কার্য্য; কারণ চক্ষুঃশক্তিই চক্ষুর স্বভাব ধারণ করিয়া রাখে, বলা যাইতে পারে। আর "ধাতু কুসলতা" অর্থে শক্তির উৎকর্ষ বলিয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়।

হইতে ভিন্ন লক্ষণ নহে, তাহা বিজ্ঞ পাঠকেরা স্পষ্টই বুঝিতেছেন।

বৌদ্ধেরা যে আত্মা ও লোক সম্বন্ধে বহুবিধ মিথ্যাদৃষ্টিকে নির্ব্বাণের অন্তরায় বলেন, তাহারা ঋষিদের কৈবল্যমার্গকে লক্ষ্য করে না, বা তাহার বিরোধী নহে। কিন্তু ঋষিদের মতেও তাহারা মোক্ষের বিরোধী। ভব-দৃষ্টি, বিভবদৃষ্টি, শাশ্বত-দৃষ্টি উচ্ছেদদৃষ্টি প্রভৃতি মিথ্যাদৃষ্টির উদাহরণ। দৃষ্টিশব্দের অর্থ 'দৃষ্টিগত দৃষ্টিকান্তার, দৃষ্টিগহন' প্রভৃতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ভবদৃষ্টি অর্থে "ভবিস্সতি অত্তা চ লোকো চ" অর্থাৎ আত্মা লোক পুনরায় উৎপন্ন * হইবে। বিভব-দৃষ্টি তাহার বিপরীত।

শাশ্বতদৃষ্টি নাম শুনিয়া অনেকে ভ্রান্ত হয়, তজ্জন্য আমরা "ব্রহ্মজালসূত্র" হইতে ইহার বিবরণ দিতেছি। পাঠক দেখিবেন, আত্মতত্ত্ব বা পুরুষতত্ত্বের সহিত বিরুদ্ধতা-বিষয়ে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্মজাল-সূত্রে শাশ্বত-দৃষ্টির যে বিবরণ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই:—(বুদ্ধদেব বলিতেছেন) হে ভিক্ষুগণ! কোন ২ শাশ্বতবাদী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আছেন, যাঁহারা আত্মা ও লোককে শাশ্বত বলেন। তাঁহারা কি গতির দ্বারা ও কি অবলম্বন করিয়া উহা

* কেহ ইহাতে মনে না করেন, বৌদ্ধ-মতে পুনর্জন্ম অস্বীকৃত। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ব্ব ২ জন্মের উদাহরণ দিয়া উপদেশ করিতেন। কিন্তু যাহারা কেবল আত্মার পুনর্ভব-তত্ত্বমাত্র জানিয়াই দৃষ্টিগহন দৃষ্টি-কান্তার আদিতে বিচরণ করে, তাহাদের নির্ব্বাণের আশা নাই, ইহাই অর্থ বুঝিতে হইবে।

বলেন ? তাঁহারা বীর্য্য, যোগ, অপ্রমাদ সম্যক্ মনসিকারের দ্বারা সমাধি লাভ করিয়া, সেই সমাধিবলে পরিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা, এক, দুই, দশ, শত, সহস্র, শত সহস্র বা ততোধিক পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারেন। তাঁহারা জানিতে পারেন যে, আমরা অমুক ২ নামে, এত এত কালে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহারা মনে করেন যে, এই লোক ও আত্মা শাশ্বত, কূটস্থ ঐশিকস্থায়ীরূপে স্থিত। কিন্তু এই সকল সত্বেরা সন্ধাবিত (বিপ্লুত) হয় এবং সংসারচ্যুতি ও উৎপাদ প্রাপ্ত হয়।

ইহাই শাশ্বতবাদ। ব্রহ্মজাল সূত্রে এই বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, চারি আরূপ্যায়তনানুপগদেবত্ব (যোগশাস্ত্রের মতে বিদেহলীন-দেবত্ব) পর্য্যন্তকে মিথ্যাদৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাতে সালোক্য সারূপ্য সার্ষ্টি আদি সগুণমুক্তির কৈবল্যাপেক্ষা হেয়তা মাত্র উক্ত হইল। কৈবল্যবাদী ঋষিগণও এইরূপ বলেন। পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র কৈবল্যকে সমস্ত লোকের অতীত অবস্থা বলেন। আরও বলেন যে, সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বরূপ ব্রহ্মলোকের পরম ঐশ্বর্য্যেও বিরাগবান্ হইলে তবে কৈবল্য হয়।

পরন্তু বৌদ্ধভাষায় যাহা 'আত্মা' আমাদের ভাষায় তাহা অনাত্মা। অভিধানের বৈপরীত্য থাকিলেও অভিধেয় পদার্থ এক। যেহেতু পঞ্চস্কন্ধময় উপাধিকে বৌদ্ধেরা 'আত্মা' নামে অভিহিত করেন, আর আর্যমতে তাহাই অনাত্মা। নির্ব্বাণের পরমসুখকে বৌদ্ধেরা আত্মা বলিতে অনিচ্ছুক। তৎপক্ষে বৌদ্ধদের এই যুক্তি দেখা যায় কি, ব্যবহারিক আত্মা ও নির্ব্বাণসুখ যে পৃথক্ তাহা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ঋষিরা ব্যবহারিক আত্মাকে অনাত্মা বলিয়া ঠিক তাহাই লক্ষ্য করান।

যদি ব্যবহারিক আত্মা (বৌদ্ধদের আত্মা) ও নির্ব্বাণ সুখ সম্পূর্ণ সম্বন্ধ শূন্য হয় তবে এই "আমি" কেন নির্ব্বাণের জন্য মহান্ প্রযত্ন করিবে এই প্রশ্নের উত্তর বৌদ্ধেরা যুক্তিযুক্ত ভাষায় দিবার চেষ্টা করেন না। নির্ব্বাণসুখের সহিত এই আমিত্বের কোন প্রকার সম্বন্ধানুভব না থাকিলে তদ্বিষয়ে এই আমিত্বের কষ্টসাধ্য প্রবৃত্তি হইতে পারে না। বস্তুত এই আমি বৈরাগ্যের দ্বারা স্বীয় অঙ্গচ্ছেদ করিতে ২ নির্ব্বাণ সুখে যাইয়া উপনীত হয়। তজ্জন্য ঋষিগণ নির্ব্বাণকে আমিত্বের প্রকৃত স্বরূপ ও ব্যবহারিক আমিত্বকে মিথ্যা বা অযথারূপ বলেন। "আমি নির্ব্বাণ পাইব" এই আশী, নির্ব্বাণলাভ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে অতএব এই আমিত্বকে নির্ব্বাণসুখের সহিত সম্বন্ধ শূন্য বলা যাইতে পারে না। বৌদ্ধদের ভাষা পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তাঁহারা বলেন "(তথাগতো) বিমুত্তি সুখং প্রটিসম্বেদি।" অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধান্তর্গত তথাগতের বিমুক্তিসুখ প্রতিসম্বেদ্য পদার্থ হইল। সাংখ্যেরাও বুদ্ধি ও পুরুষের প্রতিসম্বেদনসম্বন্ধ স্বীকার করেন।

সাংখ্যমতে এই ব্যবহারিক আত্মা ও বুদ্ধির ব্যক্ততার অবিকারীহেতু সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপপুরুষ। সাংখ্যেরা আরও বিচার করিয়া দেখান এই ব্যবহারিক আমিত্বের

মধ্যে যাহা মূলবোধ তাহা অবিকারী এবং আমিত্বগত সুখ ও দুঃখের তাহা মূল প্রকাশয়িতা। তজ্জন্য পুরুষ আত্মার আত্মা বা স্বরূপ-আত্মা নামে অভিহিত হন। তজ্জন্য নির্ব্বাণ—অভাবপ্রাপ্তি নহে, স্বরূপে স্থিতি। অর্থাৎ অন্য কথায় বর্ত্তমানের ন্যায় বুদ্ধিস্থ সুখদুঃখরূপ বিকারভাবকে প্রকাশ করা বন্ধন, আর বুদ্ধির নিরোধ বা অবিকারভাবকে বা বুদ্ধির শান্তিকে প্রকাশ করাই নির্ব্বাণ। দুঃখ অনিষ্ট, সুখ ইষ্ট, আর নির্ব্বাণ ইষ্টতার চরম সীমা সুতরাং ইহাকে আপেক্ষিক ইষ্টানিষ্ট শূন্য বা পরমেষ্ঠ বলা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই কি বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিবিশেষকে আত্মা নামে অভিহিত করেন, আর তাহার নিরোধ হইয়ে যে 'অনন্ত' অনুৎপন্ন অসংস্কৃতধাতু রূপ পরম সুখ থাকে তাহাকে অনাত্মা (পঞ্চস্কন্ধাতীত) নাম দেন। আর ঋষিরা সেই পঞ্চস্কন্ধসমষ্টিকে অনাত্মা বলেন এবং নির্ব্বাণের স্বয়ং বোধকে স্বরূপ-আত্মা বলেন। অতএব বৌদ্ধদের বলিতে হয় আত্মজ্ঞান রূপ ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া আত্মাতীত নির্ব্বাণ সুখ লাভ কর; ঋষিদের বলিতে হয়, অনাত্মজ্ঞানরূপভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া স্বরূপ-আত্মায় স্থিত হও। ফলতঃ একই বাচ্য-পদার্থের এই বাচক বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী সম্প্রদায়াভিমানিগণ তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপিও অনেকস্থূলদর্শী ব্যক্তিগণের ইহা বুদ্ধিমোহ উৎপাদন করে।

শ্রীহরিহরানন্দ।
কাপিলাশ্রম।

ব্রাত্য।

অধুনা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ও নবশাক সম্প্রদায় যথাক্রমে আপনাদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাত্য বৈশ্য বলিয়া মনে করিতেছেন। শাস্ত্রবিদ্‌গণও ইহঁাদিগকে নানা প্রকারে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে এদেশে এক্ষণে ক্ষত্রধর্ম্ম অর্থাৎ বলধর্ম্ম এবং বৈশ্যধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্ব সাধারণের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি পুনর্ব্বার প্রভাবশালী না হইলে আমাদের মঙ্গল নাই। তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে বীর্য্য বাণিজ্যকে পৃথক্ করিয়া, এমন কি, একটিকে অন্যটির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করিয়া তাঁহারা কেবল আপনাদিগের দারিদ্র্য সংঘটন করিয়াছেন মাত্র সুতরাং ইহার পরিহার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য যাঁহারা ব্রাত্য বলিয়া যথাক্রমে ক্ষত্রধর্ম্ম ও বৈশ্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত বলিয়া আপনাদিকে হীনপ্রভ মনে করিতেন এক্ষণে আর তাঁহারা তাহা করিতে চাহেন না। বরঞ্চ শাস্ত্রসঙ্গত প্রথাক্রমে কি প্রকারে এই ব্রাত্যদোষ পরিহার পূর্ব্বক স্ব স্ব বর্ণের কর্ত্তব্যসাধন করা যায়, তাহার জন্য তাঁহারা উপযুক্ত হইয়াছেন। এই সময়ে ব্রাত্য শব্দের মৌলিক অবস্থা সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলিলে বোধহয় অসাময়িক হইবে না।

অমুত্বারথো অনুমর্যো অর্ব্বন্নমু গাবোঽগ্রভগং ফনীনাম্।
অমুব্রাতাসস্তব সখ্যমীয়ুরমু দেবা মমিরে-বীর্য্যং তে॥

ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল ১৬৩ সূক্ত ৮ম ঋক্।

তব অনুরথ বলে গো মর্ত্ত্য চলে সকলে
শ্রী-সৌভাগ্য তব অনু করয়ে গমন।
তোমায় করি গমন সখ্য লভে ব্রাতগণ
দেবগণ তব বীর্য্য করেন কীর্ত্তন॥

বেদসংহিতা ২য়ভাগ (যন্ত্রস্থ)

উপরোক্ত ঋকে "ব্রাতাসঃ" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। উহা ব্রাতস্ শব্দের প্রথমার বহুবচনান্ত পদ। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ব্রতাসোব্রাতাঃ সঙ্ঘাত্মকা অন্যে অশ্বসমূহাঃ বস্বাদি দেবগণোধা"। সুতরাং সায়ণানুসারে দলবদ্ধ অন্য অশ্ব সমূহকে অথবা বসু আদি অপ্রধান দেবগণকে ব্রাত বলা হইয়াছে। পাঠক মনে রাখিবেন যে সূক্তের এই ঋকটি সে সূক্তটি সমুদয়ই অশ্বস্তুতি। সুতরাং "ব্রাতাসঃ" শব্দে প্রধান অশ্বের পশ্চাৎ ধাবিত অন্য অশ্বগণকে বুঝাইতেছে। এই ব্রাতশব্দের উত্তর ভাবার্থক প্রত্যয় যোগ দিয়া ব্রাত্যশব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। অতএব ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য বৈশ্য বলিলে বেদমন্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে অপ্রধান ক্ষত্রিয় ও অপ্রধান বৈশ্যমাত্র এই পর্য্যন্তই বুঝাইতে পারে এতদপেক্ষা কোন হীনতা উক্ত শব্দে ব্যঞ্জিত হয় না।

কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্যে দেখা যায় যে বেদ-অনধ্যায়ীকে ব্রাত্য বলা হইয়াছে। এমন কি যাঁহারা ৩।৪ পুরুষ বেদাধ্যয়নে বিরত, তাঁহাদের প্রতি এই সকল সাহিত্যে অতি নিদারুণ তিরস্কার প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অথ যস্য পিতা পিতামহা ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মসংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ। ১ম খণ্ড আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র, ৩২।৩৩ সূত্র।

অথ যস্য প্রপিতামহাদি নানুস্মর্য্যতেউপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ। ঐ ২ খণ্ড ৫।৬ সূত্র।

অর্থাৎ যাহার পিতা পিতামহের উপনয়ন হয় নাই তাহারা ব্রহ্মঘাতকসদৃশ; তাহাদের সহিত অভ্যাগমন, ভোজন ও বিবাহ বর্জ্জন করিবে।

যাহার প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতার উপনয়ন হয় নাই তাহারা শ্মশানসদৃশ; তাহাদিগের সহিত অভ্যাগমন, ভোজন ও বিবাহ বর্জ্জন করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও ব্রাত্যদিগকে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত বলা হইয়াছে। ফলে এই শাসনবাক্যগুলি হইতে বৌদ্ধযুগের গন্ধ আসিতেছে। বৌদ্ধযুগের শেষভাগে যখন বর্ণভেদকে প্রসারিত করিয়া পানাহারবর্জ্জিত জাতিভেদে পরিণত করা হইতেছিল। তখন বেদ-শিক্ষা পুনঃ প্রবলভাবে প্রচলিত করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ কঠোর শাসননীতি অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। কেননা উপনয়ন আর কিছুই নহে। বেদপাঠার্থীর আত্মসংস্কার। এই সংস্কারচ্যুত যাহারা অর্থাৎ বেদপাঠ যাহাদের জীবনের লক্ষ্য নহে, তাহারাই ব্রাত্য, আর্য্যসমাজে তাহাদের স্থান শ্রেষ্ঠ নহে।

দেশে যদি আবার নবজীবন সঞ্চারিত করার বাসনা হইয়া থাকে তবে দেশের লোককে, বিশ্ সম্প্রদায়কে আর ব্রাত্য বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এই নবজীবনসঞ্চারের প্রধান ঔষধিই হইতেছে দেশে বৈদিক ভাবের পুনরানয়ন। উপনয়নের

প্রথা বিস্তারিত না করিয়া, বেদ-শিক্ষা সাধারণে প্রচলিত না করিয়া, তৎকালিক উদ্যমপূর্ণ জীবনের আদর্শ উপস্থিত না করিয়া এবং ধর্ম্মতত্ত্বের জটিলত্বের স্থলে সরলত্ব উৎপাদিত না করিয়া, কি প্রকারে এই উদ্দেশ্য সফল হইবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। তবে যদি উপনয়ন-সংস্কারভিন্ন বেদ-শিক্ষা প্রচলিত করার উদ্দেশ্য হয়, তবে যাঁহারা বেদের নামে উপনয়নসূত্র ধারণ করেন, তাঁহাদেরই বা তাহা রাখিয়া প্রয়োজন কি? ফলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের একজাতিত্ব ও অভিন্নত্ব পুনঃস্থাপিত না করিয়া কোন জাতীয় কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে চলিবে না।

বঙ্গদেশের কায়স্থ ও নবশাখ সম্প্রদায়ের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যদি বুঝিয়া থাকেন যে এই দেশের ক্ষত্র-বৈশ্য সম্বন্ধে এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে এই ক্ষত্র-বৈশ্য সম্বন্ধে শিথিলতা উপস্থিত হইয়াই দেশের দুর্গতি উৎপাদন করিয়াছে, তবে যাহাতে অচিরকাল মধ্যে এই সম্বন্ধ পুনঃ দৃঢ়ীভূত করা যায় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কাহারই ত্রুটি করা কর্ত্তব্য হইবে না। ভ্রাতগণ যেমন প্রধান অশ্বের অনুধাবন করিয়া কার্ষ্ম* স্থলে উপস্থিত হইলেই তাহার সখ্য লাভ করিতে পারে, তাঁহারাও সেইরূপ বেগে গমন করিয়া লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারিলেই জাতীয়একত্ব দৃঢ়ীভূত করিয়া জাতীয়সখিত্বের দৃঢ়ভিত্তির উপরে নবজীবনের নূতন অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে আর শৈথিল্য উচিত নহে।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

* "কার্ষ্ম শব্দঃ কাষ্ঠবাচী" সায়ণ। ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখ। ঘোড়দৌড়ের সময় যে কাষ্ঠখণ্ডের নিকট পৌঁছিলে জয় হয়, তাহাকে কার্ষ্ম বলে।

শ্রীসূক্তম্।

এই মন্ত্রে সাধক লক্ষ্মীদেবীর নিকট অলক্ষ্মী অভূতি বিনাশ কামনা করিতেছেন। মন্ত্রটীতে অলক্ষ্মীর প্রতিকৃতি কৌশলে নিপুণহস্তে অঙ্কিত হইয়াছে।

ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং
নাশয়াম্যহম্।
অভূতিমসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাং নির্ণুদ মে
গৃহাৎ ৮ ॥

অন্বয়ঃ। ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং অহং নাশয়ামি। হে লক্ষ্মি! মম গৃহাৎ সর্ব্বাং অভূতিং অসমৃদ্ধিঞ্চ নির্ণুদ।

বঙ্গানুবাদ। ক্ষুতৃষ্ণাক্লিষ্টা জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীকে আমি বিনাশ করিব। হে লক্ষ্মি! আমার গৃহ হইতে অনৈশ্বর্য্য ও ভোগবৃদ্ধিরাহিত্য দূর কর।

তাৎপর্য্য। উপাসক ইষ্টদেবতা শ্রীর কৃপা প্রত্যাশায় অলক্ষ্মীবিনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন, অলক্ষ্মীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। অলক্ষ্মী ক্ষুৎপিপাসামলা— অর্থাৎ অনশন তৃষ্ণা মালিন্য প্রভৃতি অভাব অসংস্থাই অলক্ষ্মীর প্রতিকৃতি। অনাহার ক্লিষ্ট দুঃখবেগপিষ্ট বিপ্লুতচেষ্ট

ব্যক্তিগণ অলক্ষ্মীর ভীষণতা শোচনীয়তা পরিহর্ত্তব্যতা প্রমাণ করে। শুষ্ক কঠোর নিশ্চেষ্ট তৃষ্ণাক্লিষ্ট জীবন অলক্ষ্মীর আবাসস্থলী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সৌন্দর্য্য সুশৃঙ্খলতা শোভা সুরুচি সদ্বৃত্তি লক্ষ্মীর বিকাশ ও মালিন্য অপরিচ্ছন্নতা বিশৃঙ্খলতা নিঃশ্রীকতা, কুরুচি, অসদ্বৃত্তি অলক্ষ্মীর অবস্থান ক্ষেত্র। বৈদিক কবি অলক্ষ্মীমূর্ত্তিতে ক্ষুৎপিপাসাতুরতা ও মলদিগ্ধতা কল্পনা করিয়া নিজের মৌলিকত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অলক্ষ্মীর আর বিশেষণ 'জ্যেষ্ঠা'; প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় অলক্ষ্মীকে 'বড় মা' বলা হয়। জগতে তাঁহার আধিপত্য যেরূপ প্রসৃত, তাহাতে তিনি যে সৌন্দর্য্যদেবতার জ্যেষ্ঠা তাহাতে সংশয় নাই। অনেক রজনীই তিমিরময়ী; জ্যোৎস্নামালিকা বিভাবরীতেও মেঘের অসদ্ভাব থাকে না, সৌন্দর্য্য বড় সঙ্কীর্ণমার্গে উপভুক্ত হয়, সংসারের অধিকাংশ স্থানই সৌন্দর্য্যশশির সুশীতল কিরণে স্নাত হয় না। তাই অলক্ষ্মীর রাজ্য বিস্তৃত, তাই তিনি জ্যেষ্ঠা। অভূতিলাভে সংসার শ্মশান হয়, তজ্জন্য সাধক অভূতি আর অসমৃদ্ধির বিনাশ কামনা করিতেছেন। ক্ষয় অভাব অপূর্ণতার অন্তর্দ্ধান না হইলে সুখসুধাকরের চিরবাঞ্ছনীয় উদয় জননয়নমন রঞ্জন করে না। এই মন্ত্রটীর অশেষফলশ্রুতি শাস্ত্রে উক্ত আছে। শ্রীসূক্তের এই অষ্টমী ঋক্ সহস্রসংখ্যক জপ ও তৎসমসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিলে দুর্ভাগ্য দুর্গতর পরপারে গমন করা যায়।

শ্রীদেবতার লোকধাত্রী ধরিত্রীমূর্ত্তির বিষয় এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়াছি, শ্রীদেবতা বিশ্ববিভূতির উৎস। এই যে বৈচিত্রচিত্রময়ী পৃথিবী যিনি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আবার উষরক্ষেত্রে মরুময়ী কঠোরবন্ধুরা একধারে ভয়ঙ্করা মনোলোভা সর্ব্বদেব প্রতিমা-স্বরূপা ধারিণীশক্তির বিচিত্র বিকাশ ধরণী, ইনিও অনন্ত বিভূতিসাগরের একটী অল্পস্থানব্যাপী আবর্ত্ত। পাঠক দেখিবেন, ধরণীকে শ্রীস্বরূপে বর্ণনা করিয়া বৈদিক ঋষি কত মৌলিকতার পরিচয় দিলেন। মন্ত্রটী এই যথা,——

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।

অন্বয়ঃ। গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং সর্ব্বভূতানাং ঈশ্বরীং তাং শ্রিয়ং ইহ উপহ্বয়ে।

বঙ্গার্থ। যিনি গন্ধলক্ষণা পৃথিবীরূপা, যিনি দুর্দ্ধর্ষা, সর্ব্বকালফলশস্যাদিসম্পৎসমৃদ্ধা, পশুসম্পত্তিশালিনী এবং সকল প্রাণিজাতের ঈশ্বরী অর্থাৎ ধাত্রী বা অধিষ্ঠাত্রী, আধারভূতা সেই বিশ্বময়ী শ্রীদেবতাকে আহ্বান করি।

তাৎপর্য্য। শ্রী গন্ধদ্বারা, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অসাধারণ ক্ষিতিগুণ, ঐ গন্ধ যাহার দ্বার অর্থাৎ লক্ষণ বা পরিচায়ক তিনি গন্ধদ্বারা অর্থাৎ গন্ধগুণবতী পৃথিবীরূপা। যদিও ক্ষিতিতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই সর্ব্বগুণসমবায় আছে, তথাপি গন্ধদ্বারাই ক্ষিতির

পরিচয়। শব্দ আকাশের গুণ, স্পর্শবায়ুর, রূপ তেজোধর্ম্ম, রস জলীয় গুণ। এগুলি পঞ্চীকরণ প্রণালীতে (বেদান্তমতে) পৃথিবীতে আসিয়াছে। (সাংখ্যমতে পঞ্চীকরণ পরিষ্কৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই, তথাপি আকাশাদি পঞ্চভূতের পূর্ব্বপূর্ব্বটী পরপরটীর কারণরূপে শ্রুতিসিদ্ধ হওয়ায় কারণগুণের কার্য্যে সংক্রমণ-নিয়ম-হেতু পৃথিবীতে পঞ্চ গুণসমাগম যুক্তিসিদ্ধ হইলেও পৃথিবীর নিজের গুণ গন্ধ এবং উহা পার্থিবাংশোৎপন্ন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অসাধারণ বিষয়স্বরূপে অবধারিত হইয়াছে।) পৃথিবী অন্তিম ভূত গন্ধও অন্ত্যগুণ, সুতরাং গন্ধবতী পৃথিবীর কথা বলায় পাঞ্চভৌতিক জগতের ভূতভৌতিক ভাব কোনটী বাদ পড়ে নাই। সংক্ষেপে গন্ধদ্বারা বলাতেই ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মক সূক্ষ্ম স্থূল সমগ্র বিশ্বব্যাপার শ্রীদেবতারই প্রতিকৃতি বলা হইয়াছে।

তারপর শ্রীরূপা ধরণীকে দুরাধর্ষা:বলা হইতেছে, পৃথ্বীধরাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, "কেনাপি ধর্ষিতুং অশক্যাম্"। কেহই ধরিত্রীর ধর্ষণে সক্ষম নয়। এই জগতের কত শত মণিময়মুকুটশোভিত মস্তক কতবার উন্নত হইয়াছে, আবার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া রেণুকণায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ধরণীর তাহাতে কিছুই আসে যায় নাই। শত দুর্দ্দান্ত সহস্র দস্যু কোটি তস্কর ধরণীর রত্ন ভাণ্ডার লুণ্ঠন করুক, কিন্তু তাহা ধরণীর বক্ষেই বিদ্যমান থাকিবে, কেহই লইয়া যাইতে পারিবে না। ইহাই শ্রীর বিশেষত্ব, ইহারই নাম অক্ষয় ভাণ্ডার। এই প্রসঙ্গে একটী শ্লোক স্মৃতি পথে উদিত হইল, "কালঃ শরীরগোপ্তারং স্বীকর্ত্তারং বসুন্ধরা, দুশ্চরিত্রেব হসতি স্বামিনং সুতবৎসলম্।" শরীরের লালনপালনরক্ষণে অধিকতর অভিনিবিষ্ট দেহমমত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে কাল উপহাস করেন। পৃথিবীকে যিনি বীর্য্যশৌর্য্যদৃপ্ত হইয়া আপনার ভাবেন, বসুন্ধরা তাহাকে উপহাস করেন। অন্যজাতপুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহসম্পন্ন নির্ব্বোধ স্বামিকে সেইরূপ দুশ্চরিত্রা রমণী উপহাস করেন। দেহমমতাভিনী বুঝেন না, এই যত্নরক্ষিত শরীরও কালের কবলগত, ইহা তাঁহার বিন্দুমাত্র আয়ত্তাধীন নয়। তাই কালের কবলগতবস্তুর প্রতি বৃথাপ্রীতিদর্শনে কাল উপহাস করেন। যিনি ধরণীকে স্বীয় সম্পত্তি মনে করেন, তিনি ভাবিতে বিস্মৃত হন, যে তাঁহার ন্যায় কতকোটী নরকীট ধরণীর বক্ষে উৎপন্ন উৎসন্ন হইতেছে। তাই বৃথা মমতাভিমানীকে ধরণী উপহাস করেন। মুগ্ধস্বামী বুঝেন না, এই প্রাণপ্রিয় পুত্র তাঁহার প্রণয়িণীর গর্ভসম্ভূত হইলেও গূঢ়জারই তাহার পিতা, তাই পরোৎপন্নে আত্মীয়ত্ববিশ্বাসী সম্মুগ্ধস্বামীকে চতুরা জারিণী উপহাস করেন। বস্তুতই ধরণী চিরদিন দুরাধর্ষা। কেহ ইহাকে ভোগ করিতে পারেন না। নিজেই কালকর্ত্তৃক ভুক্ত হন।

শ্রী নিত্যপুষ্টা, যাহা কিছু উচ্চাবচ ভক্ষ্য ভোজ্যাদি জগতে আছে, সে সমস্তই তাহার পোষণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। কি শস্যক্ষেত্র, কি ফলভারাবনত তরুরাজী, যাহা যেখানেই থাকুক না কেন, সকলেরই দ্বারা ধরণী নিত্যপুষ্টা।

শ্রী করীষিণী। পৃথ্বী শ্রীরূপা, সুতরাং পশুশরীরনিঃসৃত করীষসমূহ দ্বারা সূচিত পশুসম্পত্তি ধরণীরই ধন। করীষ শব্দের অর্থ—শুষ্ক গোময়। পৃথিবী শুষ্ক গোময়বতী অর্থাৎ অগণ্যপশুমতী। পশুসম্পদের শীর্ষস্থানীয় সামগ্রী। বৈদিক ঋষিরা যে পশুলাভের জন্য যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা চির প্রসিদ্ধ। পশুমত্তা বিশেষ ঐশ্বর্য্যস্বরূপে গণ্য হইত। কালের কুটিলগতিতে দেশে পশুভাবের প্রাবল্য হওয়ায় গবাদিপশু সম্পত্তি-স্বরূপে গৃহীত হইতেছে না। দেশ হইতে সাত্ত্বিকতাবর্দ্ধক দুগ্ধ নবনীত ঘৃতাদি আহার্য্য অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। গোরক্ষণ যে আর্য্যের প্রধান ধর্ম্ম, তাহার আর কার্য্যে পরিচয় পাওয়া যায় না। পশুসম্পৎ সাত্ত্বিক দেবভাবের অনুকূল, আবার পশুভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী। পশুসম্পত্তিতে ধরণী যদি দরিদ্রা না হন, তাহা যে প্রকৃত শ্রীর বিকাশপরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? করীষসমূহের কথা বলায়—ইন্ধন-ধনের কথাও বুঝা যায়। করীষ রন্ধনকার্য্যের প্রধান সাধন, সুতরাং জগদ্ব্যাপারের জীবসমৃদ্ধির অন্যতর উপায়-স্বরূপ। অতএব উহা যে বিশ্ববিভূতির পরিচয়যোগ্য বিকাশ তাহা বলা যাইতে পারে।

শ্রী সর্ব্বভূতেশ্বরী, যাবদীয় জীবজালের আবাস স্থান সাক্ষাৎ মাতৃরূপা অধিষ্ঠাত্রিভূতা চরাচরাত্মিকা ধরণী যে সর্বৈশ্বর্য্যের মূলাধার তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। জগতে যাহা ঐশ্বর্য্যের সূচক বা সাধন সে সমস্ত সামগ্রীই ধরিত্রীর কুক্ষিতে সঞ্চিত আছে। ভাগ্যবান্ ভূত ধাত্রীর কৃপায় তাহার কতকগুলির সহিত পরিচিত হইলেই সংসারে তাহার ঐশ্বর্য্যখ্যাতি প্রচারিত হয়। সাধক বলিতেছেন সেই বিশ্বরূপালক্ষ্মীদেবীকে আমি এখানে আহ্বান করি। যদিও শ্রী সর্ব্বব্যাপিনী, তথাপি তাহার বিশেষ বিকাশের কামনা সাধককে মুখরিত করিয়াছে। বৈখানস্ বিদ্যায় ঐ মন্ত্রজপের ফলে ধনধান্যাদি লাভ হয় এরূপ উল্লেখ আছে। ঐ মন্ত্রটী মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত লিঙ্গ প্রমাণানুসারে গন্ধদ্বারা স্নাপন ও গন্ধদানাদিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরোহিত মহাশয়েরা এই মন্ত্রটী জানেন, অতঃপর তাঁহারা অবগত হউন, এই মন্ত্র ঋক্ পরিশিষ্টস্থ শ্রীসূক্তের নবম।

অতঃপর দশম মন্ত্রে শ্রীদেবতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সাধক প্রার্থনা করিতেছেন যে তিনি যেন কীর্ত্তি সৌভাগ্য ধনধান্যাদি লাভ করেন।

মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি।
পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ ॥১০

অন্বয়ঃ। হে শ্রী! মনসঃ কামং বাচঃ সত্যং পশূনাং অন্নস্য চ রূপং বয়মশীমহি (লভেমহীত্যর্থঃ) কিঞ্চ ময়ি শ্রীঃ যশঃ শ্রয়তাম্।

বঙ্গার্থ। হে লক্ষ্মি! আমরা যেন (তোমার কৃপায়) মনের অভীষ্ট, বাক্যের সত্যতা, পশুগণের রূপ অর্থাৎ দধি-ক্ষীর-ঘৃতাদি এবং ভোজ্যভক্ষ্যলেহ্যপেয়াদিবিধ

চতুর্দ্দশ অন্ন লাভ করিতে পারি। কীর্ত্তি ও সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্য (তোমার উপাসক) আমাকে আশ্রয় করুক্।

তাৎপর্য্য। 'শ্রীদেবতার উপাসক স্বীয় ইষ্টদেবতার নিকট মনোভিলাষ পূরণ প্রার্থনা করিতেছেন. বাক্সত্যতারূপ বিভূতি চাহিতেছেন। গবাদি সম্পত্তি ও অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন। শোভা কীর্ত্তির আশ্রয় স্থান হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা অলৌকিক নহে। উপাসক উপাসনা দ্বারা উপাস্যসারূপ্যও লাভ করিতে পারেন। যাদৃশ দেবতার উপাসনা করা যায় তাদৃশ শক্তি ভাব ক্রমে ক্রমে সাধকের অন্তরক্ষেত্রে আধিপত্য লাভ করে, অবিচ্ছিন্ন চিন্তায় ক্রমে ঐ ভাব ও শক্তি সমূহ সাধকের এক আপন হইয়া যায় যে ঐ সমস্ত ভাব সাধকের নিজস্বরূপে নির্দ্ধারিত হয়। ভাবসংক্রমণ, ভাবশুদ্ধি ও ভাবস্থৈর্য্যই উপাসনাতত্ত্বের মূলরহস্য. সুতরাং "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এ তথ্যের সন্দিগ্ধতা নাই। উপাসকের উপাস্যের ভাবও শক্তির সংক্রমণ নূতন কথা নহে সুতরাং তদ্দেবতার প্রসঙ্গভূমি বা বিশেষবিকাশস্থলসমূহের সহিত সাধকের সম্বন্ধ সংস্থাপন অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। প্রত্যুত সত্য তথ্য। এই মন্ত্রটীর মাহাত্ম্য. অসীম। মন্ত্রকল্পার্ণবে উক্ত আছে শ্রীসূক্তের দশমমন্ত্র অষ্টলক্ষপরিমিত জপ করিলে সাধক শ্রীদেবতার সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকৃতার্থ হন, পরমপ্রেমনীরধিজলে নিমজ্জিত হন, পরমশক্তিতরুর সুশীতল ছায়াতলে উপবেশন করিয়া সংসারতাপদগ্ধবিদগ্ধতপ্তপ্রাণ শীতল করিতে পারেন। দুঃখদুর্দ্দিন কঠোর নীরস কষাঘাতে আর তখন তাহার পৃষ্ঠকর্কশতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন না। (ক্রমশঃ)

শ্রী———ভারতী

জন্মভূমির বন্দনা।

বন্দি মাতঃ জন্মভূমি, পুণ্য স্নেহময়ী তুমি,
স্বর্গের উপরে তব স্থান;
দেব-আত্মা হিমাচল, অনন্ত সিন্ধুর জল,
শিরে ধরে তোমার কল্যাণ।
জননী জঠর হ'তে, যখনি মা এ জগতে,
করিলাম জনম গ্রহণ;
কত স্নেহ ভরে, আপন বক্ষের পরে,
আমারে মা করিলে ধারণ।
অবধি তুমি মোরে, রাখিয়াছ সমাদরে,
অন্নজলে পালিছ সদাই;
তোমার উদার বুকে, আছি মা পরম সুখে,
তোমার সমান কেহ নাই।
কে শোধিবে তব ধার? পুনঃ কত অত্যাচার!
সর্ব্বংসহা সহ মা সকল;
না লও পুত্রের দোষ, কভু নাহি কর রোষ,
মমতায় নিয়ত বিহ্বল!
গঙ্গা যমুনার জল, তব স্নেহ নিরমল,
স্রোতোরূপে সিন্ধু পানে ধায়;
তোমার প্রকৃতিছবি, রাঙ্গা শশী, রুচি রবি,
সুশোভিত দিব্য সুষমায়।
প্রভাতে পাখীরা সব, করি কল'রব,
গায় তব বিজয়সঙ্গীত';
সন্ধ্যার সুবর্ণ রাগে, তোমারি মহিমা জাগে,
করে নিত্য মানসমোহিত।
কাননে কুসুমরাশি, প্রকাশে তোমার হাসি,
ধ্যান করে নীরব যামিনী;
সমীরণ থাকি' থাকি,' তোমার সৌরভমাখি,
গেয়ে যায় উদাস রাগিণী।
তব নাম করি গান, লভে মনঃ প্রাণ,
তব দয়া কে করিবে সীমা?
চিরতরে যেন মাগো, আমার হৃদয়ে জাগো,
জন্মভূমি মঙ্গল প্রতিমা।

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ। ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

বেদস্তুতি।

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরস্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াঽনিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো, বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা-ভবতশ্চকিতাঃ॥

পদপাঠঃ—ত্বম্। অকরণঃ। স্বরাট্। অখিলকারকশক্তিধরঃ। তব। বলিম্। উদ্বহন্তি। সমদন্তি। অজয়াঃ। অনিমিষাঃ। বর্ষভুজঃ। অখিলপতেঃ। ইব। বিশ্বসৃজঃ। বিদধতি। যত্র। যে। তু। অধিকৃতাঃ। ভবতঃ। চকিতা।

অন্বয়ঃ—ত্বম্ অকরণঃ স্বরাট্ অখিলকারকশক্তিধরঃ; অজয়াঃ অনিমিষাঃ বিশ্বসৃজঃ, বর্ষভুজঃ অখিলপতেঃ ইব তব বলিম্ উদ্বহন্তি সমদন্তি চ, যত্র যে তু অধিকৃতা ভবতঃ চকিতাঃ (সন্তঃ) তে তৎ বিদধতি॥

অকরণঃ—করণসম্বন্ধরহিতঃ।

অখিলকারকশক্তিধরঃ—সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয় শক্তির যিনি প্রবর্ত্তক; "অখিলানাং প্রাণিনাং যানি কারকাণি ইন্দ্রিয়াণি তেষাং ধারয়তি প্রবর্ত্তয়তীতি তথা।"

স্বরাট্—যাঁহাকে প্রকাশ করিতে অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তুর আবশ্যক হয় না; "স্বেনৈব রাজসে দীপ্যসে—ন হি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানশক্তেরিন্দ্রিয়াপেক্ষা।"

অজয়াঃ—'অবিদ্যয়া সহিতাস্তয়া বৃতাঃ';

অনিমিষাঃ—দেবতাগণ; "দেবাইন্দ্রাদয়ঃ"।

বিশ্বসৃজঃ—ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ; "ব্রহ্মাদয়োঽপি"।

যেমন কিঙ্করগণ সস্ত্রীক হইয়া তাহাদের প্রভুকে সেবা করে, তেমনি দেবতাগণ মায়াযুক্ত হইয়া আপনাকে সেবা করেন— "যথা সস্ত্রীকা এব কিঙ্করাঃ স্বামিনং সেবন্তে তথা অবিদ্যাযুক্তা দেবাদয়স্ত্বাম্"।

বর্ষভুজঃ—খণ্ডমণ্ডলপতিগণ; "খণ্ডমণ্ডলপতয়ঃ"।

অখিলক্ষিতিপতেঃ—মহামণ্ডলেশ্বরের; 'মহামণ্ডলেশ্বরস্য'।

বলিম্—নিজের প্রজাকর্ত্তৃক প্রদত্ত উপহার; 'স্বপ্রজাদত্তম্ বলিম্'।

ভবতঃ চকিতাঃ—আপনার ভয়ে, 'ত্বত্তঃ ভীতাঃ সন্তঃ'।

যত্র যে তু অধিকৃতাঃ তে তৎবিদধতি—যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত তিনি তাহা সম্পন্ন করেন; "যস্মিন্ কর্ম্মনি যে নিযুক্তাঃ তে তৎ কুর্ব্বন্তি"।

"অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" "স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্য বেত্তা" "তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণং" প্রভৃতি শ্রুতি মূর্ত্তিমতী হইয়া পুনরায় ভগবান্ বাসুদেবকে স্তব করিতেছেন—

হে দেবদেব! আপনি অখিলসত্ত্বনিকেতন ভগবান্ বাসুদেব; আপনার সেব্যত্ব—আপনাকে সমস্ত জীবেরই সেবা করা উচিত এইরূপ ভাব—জগতে চিরপ্রসিদ্ধ হইলেও আপনি করণসম্বন্ধরহিত এবং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধও আপনাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে জীবগণও স্বতুল্য হইতে পারিত। তজ্জন্য সেব্যসেবকত্ব এইরূপ একটি আশঙ্কাও পরিহার করিয়া পূর্ব্বোক্ত দিব্যমূর্ত্তি শ্রুত্যধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ স্তব করিতেছেন। "যাঁহার হস্ত নাই অথচ যিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ, যাঁহার চরণ না থাকিলেও যিনি গতিশীল, যিনি শ্রোত্র না থাকিলেও শুনিতে পান এবং চক্ষু অভাবেও যাঁহার দর্শনের কোন প্রতিবন্ধক জন্মে না তিনিই বাসুদেব"। "যিনি জানিবার যাহা কিছু তাহা সমস্ত জানেন অথচ যাঁহাকে জানিবার কিছুই নাই তিনিই পরম পুরুষ।" "আপনিই সর্ব্বাগ্র ও অনাদি, পুরাণপুরুষ ও সর্ব্বপ্রাচীন।" * আপনি অখিলকারকশক্তিধর, অর্থাৎ হৃষীকেশ;

---

* কিরূপে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসকল মূর্ত্তিমতী হইয়া বাসুদেবের স্তব করেন, সাধকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। যাঁহারা সগুণ বা সবিকল্প ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন তাঁহাদের সম্মুখে একটি ভাব থাকে। ভাব ও মূর্ত্তিতে কোনএক অবস্থায় পার্থক্য নাই। ভাব সকল তখন তাহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। দিব্য বা ভগবদ্ভাব হইতে যে মূর্ত্তি উদ্ভূত হয় তাহা তৈজস পরমাণু হইতে উৎপন্ন। সেই সমস্ত দেবমূর্ত্তি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ শরীরই গ্রহণ করিতে পারেন। সাধকগণ যখন উক্ত ত্রিবিধভাবের কোন এক ভাব লইয়া বাসুদেবে ধ্যানপরায়ণ হন, অথবা সংযম (ধ্যানধারণাসমাধির একত্র সমাবেশ) অভ্যাস করেন তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে মনঃ প্রাণবায়ুর ক্রিয়া বশতঃ অতিশয় তেজোপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। যখন মনঃ এইরূপে আলোকময় হইয়া উঠে অর্থাৎ মনের রাজসিক তামসিক ভাব সাত্ত্বিক গুণের নিকট অভিভূত থাকে তখন তিনি যে ভাবে ধ্যান অভ্যাস করেন সেই মূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ করেন। তজ্জন্য কেহ বা "অপাণি পাদো জবন গ্রহীতা"..."স বেত্তি বেদ্যং..." 'তমাহুরগ্র্যং...' ইত্যাদি শ্রুতির স্মরণ

কেননা আপনি নিখিল প্রাণিবর্গের সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই প্রবর্ত্তক। এখানে কারক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়গণ। "হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং ঈশঃ নিয়ামকঃ"—শঙ্করঃ। আপনি যে অখিলকারকশক্তিধর তাহার কারণ আপনি স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ); সেইজন্য স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানশক্তির আপনাতে কোনরূপ ইন্দ্রিয়াপেক্ষা নাই। যেমন কিঙ্করগণ সস্ত্রীক হইয়া তাহাদের স্বামীকে সেবা করিয়া থাকে, যেমন খণ্ডমণ্ডলেশ্বর নৃপতিগণ মহামণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীকে ভজনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইন্দ্রাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত মায়াচ্ছন্ন দেবগণ আপনারই সেবা করিয়া থাকেন। আপনারই ভয়ে যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তিনি সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন। বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব অধিকারে থাকিয়া আপনারই আদেশ প্রতিপালন করেন। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" শ্রুতিঃ।

শ্লোকের ভাবার্থ—যিনি অনিন্দ্রিয় হইয়া সকল-কারণ-শক্তিধৃক্, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বসেব্যদেব তাঁহাকেই আমরা প্রণাম করি।

"অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেব সর্ব্বকারণশক্তিধৃক্।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বসেব্যং নমামি তম্॥
(শ্রীধরঃ)

করিয়া ও তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রত্যক্ষমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সুখী হন। এই জন্য শ্রুতি চিরনিত্য ও সাধক হৃদয়েই তাঁহাদের সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো,
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ।
নহি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেৎ, বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ॥

পদপাঠঃ,

স্থিরচরজাতয়ঃ। স্যুঃ। অজয়া। উত্থনিমিত্তযুজঃ। বিহর। উদীক্ষয়া। যদি। পরস্য। বিমুক্ত। ততঃ। ন। হি। পরমস্য। কশ্চিদ্। অপরঃ। ন। পরশ্চ। বিয়তঃ। ইব। অপদস্য। তব। শূন্যতুলাং। দধতঃ।

অন্বয়ঃ,

হে বিমুক্ত! যদি ততঃ পরস্য তব অজয়া উদীক্ষয়া বিহর তদা উত্থনিমিত্তযুজঃ স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুঃ; হি বিয়তঃ ইব শূন্যতুলাং দধতঃ অপদস্য পরমস্য তব কশ্চিৎ অপরঃ পরো বা ন ভবেৎ।

হে বিমুক্ত—হে নিত্যমুক্ত।

ততঃ পরস্য—যিনি জাত সমস্ত পদার্থ হইতে দূরে বর্ত্তমান ও সঙ্গরহিত; 'দূরে বর্ত্তমানস্য অসঙ্গস্য।

তব অজয়া—আপনার মায়াকর্ত্তৃক 'তব মায়য়া'।

উদীক্ষয়া—ঈক্ষণমাত্রে, "ঈক্ষণলেশেন"।

বিহরঃ—'বিহারঃ'; ক্রীড়া।

উত্থনিমিত্তযুজঃ—নিমিত্ত বা কর্ম্মযুক্ত লিঙ্গশরীর সকল আবির্ভূত হয়। "উত্থানি উত্থিতানি আবির্ভূতানি নিমিত্তানি কর্ম্মাণি তদ্যুক্তানি লিঙ্গশরীরাণি বা তৈর্যুক্তাঃ"।

স্থিরতরজাতয়ঃ—কর্ম্মশীল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবসকল, "স্থিরাশ্চ চরাশ্চ জাতয়ো জ্যাত্যা লিঙ্গিতা দেহা যেষাং তে জীবাঃ"

স্যুঃ—হইয়া থাকে; "ভবেয়ুঃ"।

বিয়তঃইব—আকাশের ন্যায় সমদর্শী।

শূন্যতুল্যাং দধতঃ—শূন্যসাম্যধারণকারী, "শূন্য-সাম্যং ভজতঃ"।

অপদস্য—বাক্য ও মনের অগোচর, "ন পদ্যতে ইতি অপদস্তস্য, বাঙমনসয়োরগোচরস্য"।

অপরঃ—আপনার, "স্বীয়ঃ"।

পরঃ—"অস্বীয়ঃ"।

ন ভবেৎ—ন সম্ভবেৎ।

তাৎপর্য্যার্থঃ—"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বএব আত্মনঃ ব্যুচ্চরন্তি"; ইত্যাদি শ্রুতি এই শ্লোকে ভগবান্ বাসুদেবকে স্তব করিতেছেন; অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ সকল উৎপন্ন হয় সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত ব্যষ্টি-প্রাণ,—পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক লোক, ব্রহ্মাদি সমস্ত দেব, ও সকল প্রাণিবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি করণ-প্রবর্ত্তক ঈশ্বর; তজ্জন্য করণ পরতন্ত্র মানবগণ আপনারই সেবা করিয়া থাকে। কেবল ইহাই কারণ নহে; আপনি মূল কারণ; আপনা হইতে সকল হইয়াছে বলিয়াও মানবগণ পরতন্ত্র; হে নিত্যমুক্ত মহাযোগিন্! সঙ্গরহিত হইয়াও আপনি যখন আমার সহিত ঈক্ষণমাত্রে ক্রীড়া করেন, তখন এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জাতি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আপনি পরম করুণাময়, ও আকাশ সদৃশ সমদর্শী, ও শূন্যসদৃশ অবাঙ্মনসোগোচর; শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত"; সুতরাং আপনাতে আত্মীয়পর এইরূপ ভেদাভেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

শ্লোকের ভাবার্থঃ—

"ত্বদীক্ষণবশক্ষোভমায়াবোধিতকর্ম্মভিঃ।
জাতান্ সংসরতঃ খিন্নান্ নৃহরে পাহি নঃ পিতঃ॥"

(শ্রীধরঃ)

কস্যচিৎ ভক্তিকামিনঃ
আত্রেয়ী কুটীর—

ধর্ম্ম ও স্বদেশভক্তি।

(প্রথম প্রস্তাব)

বঙ্গাঙ্গবিভাগে স্বদেশভক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষব্যাপী ও সুদূর শ্বেতদ্বীপে বিষম আন্দোলন চলিয়াছে। কথাটিও গুরুতর ও চিন্তার বিষয়। এই গুরুতর বিষয়ে কি শ্বেতদ্বীপে কি জম্বুদ্বীপে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই মন দিয়া সমষ্টি জীবশক্তির কল্যাণসাধনে তৎপর হউন ইহাই প্রার্থনা।

স্বদেশভক্তি বা স্বদেশপ্রীতি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আত্মার নিয়মিত স্বাধীন বা স্বতন্ত্রভাব হইতে স্বদেশভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। উহা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়াই নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নির ন্যায়

পরাধীনতার আবরণেও ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। ঋষিকণ্ঠোচ্চারিত সামধ্বনি প্রমাণ করে।

"অগ্নে! রক্ষা, ণো অংহসঃ প্রতিস্ম দেব! রীষতঃ। তপিষ্ঠৈ রজরোদহ।

হে তেজোমূর্ত্তি অগ্নে! আপনি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। হে দেব! হে অজর! আপনি আপনার অতি-তাপকারী তেজঃসমূহে আমাদিগের হিংসক জনগণকে বশীভূত করুন।

স্বদেশভক্তির বীজ দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে হইলে ইহার সহিত ধর্ম্মের কতদূর সম্বন্ধ তাহাই মুখ্যরূপে বিচার আবশ্যক। এখন যদি ভারতবাসী আর্য্যসন্তানমাত্রেই স্বদেশভক্তির সহিত ধর্ম্মের কতদূর সম্বন্ধ ইহা না বুঝিয়া বঙ্গাঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্য করিয়া সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠেন তাহাহইলেই বিষমবিপদের সম্ভাবনা। স্বদেশভক্তির বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত করিতে হইলে ক্রমপন্থা অবলম্বনকরিতে হয়। অধিকারভেদানুসারে অগ্রসর হইতে হয়। আজ যদি আমরা একলম্ফে উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিবার প্রয়াস করিও স্বদেশভক্ত সিংহের পার্শ্বে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আমাদের অনেক সময় নির্ব্বুদ্ধিতা-ব্যঞ্জক ও বাতুলতা মাত্র হইবে। কেননা তৎপূর্ব্বে তিনটি প্রশ্ন মনে উঠিয়া থাকে ও আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। হে বঙ্গাঙ্গ-বিভাগসংক্লিষ্ট বুদ্ধি! তুমি তোমার স্বদেশভক্তিকে এতদূর সম্পূর্ণ বিবেচনা কর কি, যে যাহার জন্য তুমি প্রাণ দিতে পার? তুমি কি স্বদেশভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তোমার অন্যান্য সমস্ত প্রিয় পরিজনবর্গের প্রাণ উৎসর্গ করিতে পার? হে বঙ্গাঙ্গ-বিভাগ-সংক্ষুব্ধ বুদ্ধি! তুমি তোমার স্বদেশের জন্য সমস্ত পরিবারের সহিত অনাহারে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া আত্ম-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পার কি?

যিনি এই তিনটি প্রশ্নপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—যাঁহার বুদ্ধি স্বদেশভক্তিকে উচ্চতম আদর্শে স্থাপন করিয়া ভগবৎভাবের অনুকূল পূজা করিতে সমর্থ তিনিই যেন জন বুল এবং অন্যান্য স্বাধীন ও শিক্ষিত জাতির পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করেন।

স্বদেশভক্তির বীজ আত্মজ্ঞানী-হৃদয়েই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আত্মপদার্থে প্রেম, স্বাধীন-প্রবৃত্তি ও স্বদেশপ্রীতি ইহারা একই পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি আত্মপদার্থের উৎকর্ষের জন্য যতোধিক পরিমাণে যত্ন ও অভ্যাস করেন তিনি ততোধিক পরিমাণে স্বদেশপ্রেমিক ও স্বাধীনপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হইতে পারেন।

Here says a scholar :—

"Do you wish to be a patriot? Tune yourself in love with your country and the people. Feel your unity with them. Let not even the shadow of your present personality be the their glass partition between you and your people. Be a genuine spiritual soldier laying down your personal life in the interests of the land. Abnegating the little ego and having

thus become the whole of the country, feel any thing your country will feel with you. March, your country will follow. Feel health, your people will be healthy, your strength will begin to palsate in their nerves. Let me feel I am of India—the whole of India. The land of India is my own body. The Comorin is my feet, the Himalays my head. From my hair flows the Ganges, from my head come the Brahmaputra and the Indus. The Vindhyachalas are girt round my loins. The Coromandel is my right and the Malabar my left leg. I am the whole of India, and its east and west are my arms, and I spread them in a straight line to embrace humanity. I am universal in my love. Ah! such is the posture of my body. It is standing and gazing at infinite space; but my inner spirit is the soul of all. When I walk, I feel it is India walking, when I speak I feel it is India speaking. When I breathe, I feel it is India breathing. I am India, I am Sankara I am Shiva. This is the highest realisation of patriotism and this is Practical Vedanta."

সেই জন্যই বলিতেছি স্বদেশভক্তি লাভ করিতে হইলে স্বদেশবাসীকে ভাল বাসা চাই। আমরা দিশি কাপড় পড়িতে চাই তাঁতিদের ভাল বাসি কৈ? আমরা নানারূপ স্বদেশজাত শিল্প ভাল বাসিতে চাই শিল্পীদের ভালবাসি কৈ? যে দিন হইতে ইংরাজি শিক্ষার মোহমন্ত্রগুণে আমরা নিজেকে বাবু করিতে শিখিয়াছি—শিক্ষায় অশিক্ষা গুণে যখন আমরা আমাদিগকে সভ্য ভাবিতে শিখিয়াছি, যেদিন হইতে স্বদেশবাসীর প্রতি ইতর বোধে অথবা ইংরাজি-শিক্ষা-বিবর্জ্জিত বোধে ঘৃণাবিদ্বেষভাবের বীজ আমাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদের দেশীয় শিল্পের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। সেইদিন হইতেই বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার অল্পে অল্পে আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে আমরা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া এরূপ অলস, অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের এখন আর নিজের পায় দাঁড়াইয়া থাকিবার সামর্থ্য দেখিতেছি না।

পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে বলিতে গেলে, জাতি-নির্ব্বিশেষে ত্রিশবৎসর পূর্ব্বেও আব্রাহ্মণ চণ্ডালের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ছিল। ব্রাহ্মণগণ প্রতিবেশী শূদ্রদিগকে আত্মীয়তা সূত্রে, 'দাদা' 'খুড়া' প্রভৃতি সম্বোধন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তখন একটি লোকের বিপদ উপস্থিত হইলে পল্লীবাসী সকলেই কেমন সাড়া দিত। একজনের বাড়ীতে কোন বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান বা ক্রিয়া-কাণ্ড উপস্থিত হইলে সকলে আসিয়া কেমন সাহায্য করিত। যে কোন এক মহৎ অনুষ্ঠানে সকলেই একপ্রাণে যোগ দিত। যে পবিত্রস্থানে কোন একপ্রান্তে আঘাত হইলে তাহা দেশের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া পড়ে, দেশের সকল অধিবাসীই সমভাবে তাহা অনুভব করে সেই স্থানই স্বদেশভক্তির বসতি স্থান।

স্বদেশভক্তি অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে বসতি করে। বহুবিধ সদ্গুণ জীবের মধ্যে বিকশিত হইলেই স্বদেশভক্তি আপনা-আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলির সহিত স্বদেশভক্তির বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

১। ধর্ম্মে বা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান থাকিলে আমাদের হৃদয়ে স্বদেশভক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে।

২। জগদীশ্বরে প্রভুত উপাসনা প্রয়োজন। উপাসনা না থাকিলে আমাদের হৃদয়ে ঐকান্তিকতা জন্মিতে পারেনা ও স্বদেশভক্তির বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

৩। অলসতার সহিত স্বদেশভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। নিরর্থক বা কর্ম্মশূন্য জীবনত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে ও জাতীয় জড়তা ত্যাগের জন্য মহান্ চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। স্বদেশভক্তি লাভ করিতে হইলে প্রাণের ভয়ও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মরিতে ত হইবেই। 'খাবি-খাওয়া'-মৃত্যু অপেক্ষা উৎসাহপূর্ণভাবের মধ্যে প্রাণত্যাগ ইহা অপেক্ষা স্পৃহনীয় মৃত্যু কি হইতে পারে?

৫। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য ঈশ্বরচিন্তাকালে স্বদেশভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবনী সকল সময়েই যেন আদর্শরূপে মনে হয়। উৎসাহ-বহ্নি দীপ্যমান তেজোবর্ণ ধারণ করিয়া শত-ছিন্ন সমস্ত সন্ধান ও অব্যর্থ-লক্ষ্য ধানুষ্কের সমস্ত চাতুরী ব্যর্থ করিয়াছিল, ইহা ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ন চরিত্রে প্রতীচ্য সন্দেহবাদী পণ্ডিতেরাও নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

৬। স্বদেশবাসীকে ভাল বাসিতে হইবে। উপাধিভেদে একই আত্মা সকল অন্তঃকরণে বসতি করে, ইহা বেদান্ত, শাস্ত্র ও গুরু বাক্যের নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ যেন হীনবর্ণ শূদ্রকে ঘৃণা না করেন। শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিলে তোমার পবিত্র সংসর্গ হইতে তাহাকে একেবারে বঞ্চিত হইতে হইবে। বর্ত্তমান আকারে যেরূপ জাতিভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহা কোনরূপ জাতীয়সংস্কারের ও স্বদেশভক্তিলাভের মহাবিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। কেননা একই পরিবারস্থ একটি কৃতবিদ্য উচ্চমনা জ্যেষ্ঠ তাহার কনিষ্ঠ অল্পজ্ঞ হীনবর্ণ বা হীনতেজা ভাইটিকে যদি ভাল না বাসেন, তাহাহইলে আর সে পরিবারের মঙ্গল কোথায়?

৭। যে দেশের স্বাধীনতা নাই সে দেশে জাতিভেদ স্ব স্ব স্বভাবের বৈষম্য হেতু প্রভূত অমঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। আজ ভারতের তদ্রূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের জাতিভেদ এখন জাত্যাভিমানেরই উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

৮। সকলে জাত্যাভিমান ত্যাগ করিবেন। যখন ভারতে স্বাধীনতা নাই তখন সে দেশে জাতিভেদ মিথ্যা। তজ্জন্য নূতন করিয়া শিক্ষিত আর্য্য সন্তানগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। স্ব স্ব প্রকৃতি ও অধিকার গুরুর নিকট অবগত হইয়া কেহবা বৈশ্যবৃত্তি

অবলম্বন করিবেন; কেহবা ক্ষত্রিয় আচার-সম্পন্ন হইবেন; ও কেহবা ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বন করিবেন; এ সমস্ত লক্ষণের উপযুক্ত পরিমাণ যাঁহাতে নাই তিনিই শূদ্রাভিমান প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহার যেরূপ আচার, যিনি যেরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তিনিই ব্রাহ্মণাদি তদ্রূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবেন। জাতিবিচারের, স্বাধীন বা ধর্ম্ম-ভাববর্জ্জিত ভারতবর্ষে কোনই অর্থ বা প্রয়োজন নাই।

৯। 'বয়কট' ও স্বদেশভক্তিতে অল্পই সম্বন্ধ আছে। স্বদেশভক্তিকে যিনি বয়কটের সহিত মিশাইতে চাহেন বা তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন তিনি স্বদেশ-ভক্তির গূঢ় ও মূল রসাস্বাদনে বোধহয় বঞ্চিত আছেন। অলস ও জড়ভাব ত্যাগ করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য আমরা কার্য্যপরায়ণ না হইলে আমরা স্বদেশভক্তি জিনিষটা কি তাহা ভাল বুঝিতে পারি না।

১০। আমাদের অভাব আমরা নিজে নিজেই মিটাইতে চেষ্টা করিব। স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার করিবার যদি আমাদের আন্তরিকই প্রয়োজন হইয়া থাকে, আর যদি প্রাণে যথার্থই লাগিয়া থাকে তাহাহইলে আমরা ঘরে ঘরে যে সমস্ত শিল্পশ্রমে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটিতে পারে সেগুলি মিটাইতে চেষ্টা করিব। হৈ চৈ করিলে কার্য্য হয় না। তুমি কার্য্য কর অপরেও তোমার দেখাদেখি কার্য্য করিতে শিখিবে। তুমি নাহয় বেশী বোঝ অপরে না হয় তোমার অপেক্ষা কিছু কম বোঝে। সকলেরই কার্য্যকরা প্রয়োজন।

১১। কালধর্ম্মে রাজশক্তির অত্যাচার বশতঃ প্রজাশক্তি সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে ও প্রজাশক্তি কখন কখন রাজশক্তিকে এরূপ অযথা অতিক্রম করে যে তাহা অত্যন্ত ভীষণ ব্যাপারে পরিণত হয়। এ বিষয়ে অতীত ইতিহাস তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এ উভয় অবস্থাই অতি ভীষণ। এ দ্বিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই দেশে তখন শান্তি সুখ বিরাজ করে ও তখন সেই দেশেই স্বদেশভক্তির গূঢ় ও মূল রহস্য অবগত হওয়া যায়। এতৎ সম্বন্ধে মহাভারতে বনপর্ব্বে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সীমা লইয়া বহুনীতি উপদিষ্ট হইয়াছে।

১২। দেশে শিক্ষার বিস্তার চাই। যাহাতে লোকের নিজের অবস্থায় কর্ত্তব্য-বোধ জন্মে তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচলক্ষ গ্রাম আছে। এই পাঁচলক্ষ গ্রামের মধ্যে চারিলক্ষ গ্রামে কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। অথচ সেই সমস্ত গ্রামবাসী অন্যান্য প্রজার ন্যায় করভাবে পীড়িত। শিক্ষাই মানুষকে 'আত্ম-তত্ব' ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয়; যে দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই অশিক্ষিত, সে দেশে জ্ঞানের আলোকই বা কোথায়? আর নৈতিক সাহসই বা কোথায়? মানুষকে বিশেষতঃ অধম ও অধঃপতিত জাতিকে যদি বুঝাইয়া না দেওয়া হয় "তুমি ব্রহ্ম-সন্তান, তুমি দাস নও, তুমি আত্মবিকাশের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই (উপযুক্ত হইলে) তোমারই ন্যায্য উপভোগের

জন্য সজ্জিত রহিয়াছে,—ন্যায়, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, জ্ঞান ইহারাই বিশ্ব-বিধাতার রাজ্য শাসন করিতেছে”—তাহাহইলে তুমি যে অন্ধকারে ছিলে সেই অন্ধকারে তোমাকেই থাকিতে হইবে ; এবং এইরূপ শিক্ষা না পাইলে তোমাকে চিরকাল পদদলিত এবং প্রভুর সামান্য অনুগ্রহকণালাভাশায় চিরকাল উৎকণ্ঠনেত্রে কাতরভাবে প্রভু ভক্ত কুকুরের ন্যায় মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে ও নিজের ঘৃণিত অবস্থাতেই পরিতুষ্ট থাকিতে হইবে।

৩। স্বদেশভক্তি জিনিষটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে স্ব, দেশ, ও ভক্তি এই তিনটি জিনিষ পৃথকভাবে ভাল করিয়া বুঝা উচিত। পূর্ব্বে ‘স্ব’ জিনিষটা কি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। ‘স্ব’ শব্দের অর্থ ‘আপনার’ বা ‘আত্মার’। ‘স্ব’ ও ‘আত্ম’-পদার্থে কোনরূপ পার্থক্য নাই। এই ‘স্ব’ এর উন্নতি আমাদের সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রয়োজন। এই ‘স্ব’ জিনিষটা সম্বন্ধে ভাল করিয়া বোঝা না থাকায় শুধু ‘স্বদেশ-ভক্তি’ কেন,কোন প্রকার ভক্তিই মানবমনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেনা। এই ‘স্ব’কে চেনা আর মহর্ষিদিগের উপদিষ্ট ‘আত্মতত্ত্ব’ অবগত হওয়া একই কথা। এই ‘স্ব’ পদার্থ ভালরূপে জানা না থাকায় আর্য্যস্থানবাসী হতভাগ্য হিন্দুগণ “উদ্‌যোগিনম্ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী” এই শাস্ত্রবাণী ভুলিয়া গিয়া ঘোরতররূপে অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। ‘স্ব’কে জানা না থাকাতেই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে একই পুরুষকার পরজন্মে অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়া কর্ম্মফল-প্রেমধার হেতু হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এই ‘স্ব’-কে জানা না থাকাতেই স্বর্গ-কর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমে আর্য্য হিন্দুগণ আত্মসম্ভ্রম-বোধ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। স্বাধীন-প্রবৃত্তি ও পরতন্ত্রার মধ্যে স্বর্গ নরকের ন্যায় যে একটি মহান্‌ভেদ আছে তাহা আর তাঁহারা আত্ম-সম্ভ্রম বোধের অভাব বশতঃ কোন প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না। অধুনা জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে দেশের অগ্রণী লোকেই শ্ববৃত্তি রাজসেবাকে বড়ই আদরের চক্ষে নিরীক্ষণ [illegible]তেছেন। এই সমস্ত পরকীয় রাজসেবক-[illegible]ধিকাংশ স্থলে স্বদেশেরই শত্রুস্বরূপ হ[illegible] তাঁহাদের পরম আত্মীয় স্বদেশভ্রাতা-দিগকেই বিধিমতে নির্য্যাতন করিতেছেন। এই সমস্ত আত্মঘাতী রাজসেবকগণের মধ্যে কেহ কেহ বৃত্তিমোহে নানাবিধ কারণে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে বহুবিধ অন্যায় অত্যাচার তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া হইয়া যাইলেও তাঁহাদের একটি কথা বলিবারও শক্তি নাই। এই ‘রাজসেবার’ মনোমুগ্ধকর লোভত্যাগ করিয়া সকলে যাহাতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারেন সেইরূপ চেষ্টা করিবেন। শাস্ত্রকৃদ্গণ জীবনোপায়ে পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্যকে প্রশংসনীয় বৃত্তি মধ্যে অনুমোদন করেন। শ্ববৃত্তি বা রাজসেবা অপেক্ষাকৃত হীনবৃত্তি। কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন হওয়াতে আত্মঘাতী রাজসেবকদিগের দল এতই বর্দ্ধিত হইয়াছে যে দেশে স্বাধীন প্রবৃত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যাহাতে গবাদি পশুসম্পত্তি রক্ষা পায়, যাহাতে কৃষির সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হয়, দেশে যাহাতে শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় ও দেশে যাহাতে আত্মঘাতী

স্ব(হৃ)দ্ভক্তদিগের সংখ্যা কম হয় তাহা করিতে হইবে।

দৈহিক স্বাস্থ্য ও বলের সহিত আধ্যাত্মিক শক্তি-বিকাশের একটি গূঢ়সম্বন্ধ আছে। কোন সময়ে উদ্দালক ঋষি তাঁহার সন্তান শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন "অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো পিবতো বিচ্ছেৎস্যেত ইতি।

স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজুংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি।

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাৎতেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাত্তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশান। অথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি স হাশাথ হৈনমুপসসাদ তং হ যৎকিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্ব্বং হ প্রতিপেদে"।

শ্বেতকেতু পনর দিবস উপবাসের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহাকে শ্রুতিমন্ত্র আবৃত্তি করিতে আদেশ করিলেন। শ্বেতকেতুর কিছুই স্মরণ হইল না। তখন শ্বেতকেতু বুঝিতে পারিলেন এই মনঃ ও প্রাণ অন্নময়। তদ্দৃষ্টান্তে বলা যাইতে পারে যে, অন্নাভাবে আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক বা মানসিকশক্তি প্রসুপ্ত থাকে। অধুনা আমাদের দেশের দশকোটী লোক অর্থাৎ সমুদায় ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ লোক একবেলা মাত্র আহার করিয়া অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। সমস্ত পৃথিবীতে একশত বৎসর যে লোক মরে নাই অধুনা ভারতে পঞ্চবিংশবর্ষ মধ্যে উনিশ কুড়িবার দুর্ভিক্ষে তাহার অধিকাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইবে আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক বল ও আধ্যাত্মিক তেজের বড়ই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর্য্যঋষিগণ জগতের গুরু হইলেও সমষ্টি ধর্ম্মশক্তি আমাদের মধ্য হইতে কমিয়া গিয়াছে। রোগাদিবিক্ষিপ্তচিত্ত, হীনমানসশক্তি ব্যক্তি কিরূপে বহু আয়াসসাধ্য ধর্ম্মসাধন ও তদনুশীলনে রত হইবে! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্বদেশভক্তি বুঝিতে গেলে তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি প্রয়োজন। ১ম স্ব, ২য় দেশ, ও ৩য় ভক্তি। 'স্ব' বলিতে গেলে আত্ম পদার্থকেই বুঝায়। সুতরাং স্বদেশভক্তি বুঝিতে হইলে আত্মপদার্থ কি তাহা বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। আত্মা সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল ভূমানন্দই প্রত্যগ্ আত্মার স্বভাব, আত্মা শাশ্বত ও চিরনিত্য, আত্মাকে কেহ ধ্বংস বা নিহত করিতে পারে না, আত্মাকে কেহ কোন প্রকারে বিকৃত করিতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি—আত্মার ধর্ম্ম। স্বদেশভক্তির মধ্যেও আত্মার এই ব্যাপকত্ব, আনন্দময়তা, নিত্যতা ও অবিনাশী ভাব বর্ত্তমান আছে বুঝিতে হইবে।

২৷ দেশ সম্বন্ধে বলিতে গেলে, দেশের প্রকৃতি, মানবসমাজ বা সামাজিক

ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ, সাধারণশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও কলাবিদ্যার উন্নতি, চরিত্রবল বা সংযম এই সমস্ত বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া উল্লেখ করাই প্রয়োজন।

আমাদের দেশে আমাদের রাজা নাই বলিয়া কেহ আর শাস্ত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিতে ভয় করে না। শিক্ষার অভাবে ও কুসংস্কারের প্রভাবে সামাজিক আচার পদ্ধতি হতশ্রী ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজকে বড়ই দুর্ব্বল করিতেছে। অনুপযুক্ত বয়সে বিবাহ হওয়াতে আমাদের দেশের যুবকদিগের মধ্যে উদ্যমশীলতা কমিয়া যাইতেছে। জীবন সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য না হইলে মানুষের শিক্ষা হয় না। কিন্তু যাহাদের অকৃতকার্য্যতার সঙ্গে দশটা সন্তান সন্ততিও বিষম বিপদে পতিত হয় তাহাদের উদ্যম কোথা হইতে আসিবে।

যে সার্ব্বজনীন কল্যাণের উপর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত সে মূল উদ্দেশ্য অধুনা লোপ পাইয়াছে। জাতিভেদ এখন জাত্যাভিমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ বলেন, জাতিভেদের গুণকর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠা উঠিয়া গিয়া, উহা এখন 'ছুঁৎমার্গের' উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (বিবেকানন্দ)। যাহাহউক বর্ত্তমান জাতিভেদ বড়ই উন্নতির প্রতিবন্ধক। যাঁহারা বলেন 'সমুদ্রযাত্রা নিষেধ', সমুদ্র যাত্রা করিলে জাতি যাইবে তাঁহারা দেশের একরূপ পরম শত্রু। কেননা শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যতিরেকে আমাদের দেশে শ্রীবৃদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। শিল্প, বিজ্ঞান ও বহুবিধ কলাবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা যাইতে হইবে। যে দেশের স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে সভায় আলোচনা করিয়াছেন, বড় বড় পণ্ডিতদিগের বিচারে যে দেশের স্ত্রীলোকেরা মধ্যস্থা হইয়াছেন সেই দেশের স্ত্রীলোকেরা ও শিক্ষাভাবে বহুবিধ কুসংস্কারাপন্না থাকিয়া দিন যাপন করিতেছেন। তাঁহারা না জানেন নিজেদের ছেলেদের সুস্থ রাখিতে না জানেন শিক্ষা দিতে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যতদিন শিক্ষার বিস্তার না হয় ততদিন আমাদের উন্নতি নাই। অধিকাংশ মহাপুরুষদিগের চরিত্রে, মাতারই শিক্ষা ও প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, প্রভূত পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াথাকে। বিদ্যাসাগর ম্যাটসিনি, ওয়াসিংটন, ও নেপোলিয়ন সকলেরই মাতা, ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

সরকার বাহাদুর ইচ্ছা করিলেই আমাদের দেশের লোককে কুড়ি বৎসরের মধ্যেই শিক্ষিত করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষার হার দেখিলে তাহা দুরাশা বলিয়াই বোধহয়। কেননা আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য জনপ্রতি একপয়সা ও নিম্ন শিক্ষার জন্য এক আনার কম ব্যয় হইয়া থাকে। আর ১৯০৪—৫ সালে বিলাতী গভর্ণমেণ্টে রাজকোষ হইতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে জনপ্রতি প্রায় ৭ শিলিঙ (৫।০) ও আয়র্লণ্ডে ৬ শিলিঙ ৫ পেন্স (প্রায় ৫৲ টাকা) ব্যয় হইয়াছে। ইহার উপর স্থানীয় কর অন্যান্য ভাণ্ডার হইতে যথেষ্ট সাহায্য আছে।

শিল্প, বিজ্ঞান, ও কলা-বিদ্যার উন্নতি আমাদের দেশে একান্তই প্রয়োজন। ভারতীয় শিল্প ইংরেজ বণিক অধর্ম্মাচরণ করিয়া উঠাইয়া দিয়াছেন এবং এ দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটী টাকা শোষণ করিতেছেন। সরকারীগণনানুসারে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় মোটে দুই পৌণ্ড; কিন্তু তাহাকে উহার পনরভাগ করস্বরূপে দিতে হয়। আর প্রত্যেক ইংরাজের বার্ষিক আয় ত্রিশ পৌণ্ড হইলেও তাহাকে শতকরা আটভাগ মাত্র কর দিতে হয়। এই দুই কারণেই ভারতবাসীকে সর্ব্বস্বান্ত ও রক্তহীন করিয়াছে। এই জন্যই দিনের পর দিন প্রায় দশ-কোটী ভারতবাসী অর্দ্ধাশনে জীবনপাত করে এবং দৈব কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিকূল হইলে পঙ্গপালের ন্যায় তাহারা মৃত্যুকবলে পতিত হয়।

স্বদেশভক্তির দ্বিতীয় পদ 'দেশ'-সম্বন্ধে সামান্যভাবে বিবেচনা করিতে গেলেও 'দেশের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধেই বিবেচনা করিতে হয়। তাহা হইলে উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী কাহাকে বলে, আলোচনা করা যাউক।

এ সম্বন্ধে Mill বলেন –

"The most important point of excellence which any form of Government can possess is to promote the virtue and intelligence of the people themselves."

"All Government which aims at being good is an organization of some part of the good qualities existing in the individual members of the community, for the conduct of its collective affairs."

"We have now, therefore, obtained a foundation for a twofold division of the merit which any set of political institutions can possess. It consists partly in the degree in which they promote the general mental advancement of the community, including under that phrase advancement in intellect, in virtue, and in practical activity and efficiency; and partly of the degree of perfection with which they organise the moral, intellectual, and active worth already existing, so as to operate with greatest effect on public affairs." (Representative Government.)

মিল যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—যে শাসন প্রণালী জন সাধারণের মানসিক, নৈতিক, ও কার্য্যকরীশক্তি সমূহকে বিকশিত করে ও যে শাসন প্রণালী ঐ সকল শক্তিকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনে রত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী। এখন যদি দেখা যায় কোনও দেশের শাসনপ্রণালীতে তদ্দেশবাসী প্রজাদিগের মোটেই কোন হাত নাই—তাহারা কেবল কর প্রদান করে, কিন্তু তাহাদের ব্যয়সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিবার শক্তি নাই—যদি দেখা যায় তাহারা দিনদিন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে, উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রের অভাবে তাহাদিগের মানসিক শক্তি বিকশিত হইতে পারিতেছে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিকবল অন্তর্হিত হইতেছে, যদি দেখা

যায় সে দেশের উচ্চতর রাজকার্য্য সমস্তই বৈদেশিকদিগের একচেটিয়া, জন সাধারণ স্বদেশভারবাহী গর্দ্দভমাত্র,তবে বলিতে হইবে মিলের আদর্শানুসারে এইরূপ শাসন প্রণালী নিতান্ত দোষযুক্ত। বস্তুতঃ প্রাচীন হিন্দু-আদর্শ কিম্বা উন্নততর ইউরোপীয় জ্ঞান যাহাদ্বারা বিচার করি না কেন এক্ষণে এ দেশে যে শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে তাহার সপক্ষে বলিবার রাজপুরুষগণের স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

রাজশক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে Spencer বলেন যে,

"Every man has freedom to do all that he wills provided he infringes not the equal freedom of any other man." (Social Statics. p 54.)

When we agreed that it was the essential function of the State to protect—to administer the law of equal freedom—to maintain men's rights ; we virtually assigned to it the duty, not only of shielding each citizen from the trespasses of his neighbours, but of defending in common with community at large, against foreign aggresions"—do p 115.

সমাজস্থ নরনারীগণের একটি নৈসর্গিক অধিকার এই যে তাহারা প্রত্যেকে অপরের স্বাধীনতায় হস্তার্পণ না করিয়া ইচ্ছানুরূপ আপনাদিগের শক্তির ব্যবহার করিতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি স্বত্ব আছে। সে যাহাতে সত্বগুলি অব্যাহতভাবে ভোগ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাই রাজশক্তির বা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন দ্বারা দেশে শান্তিরক্ষা এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে নিরাপদরাখা ইত্যাদি এই সমস্ত এই কর্ত্তব্যেরই অন্তর্গত।

দেশের শাসন প্রণালী উল্লেখ করিয়া ইংরাজের দোষ ও অভাব সম্বন্ধে কোন্ অহংকারে Spencer, Digby, এবং Naoroji যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Even down to our own day kindred iniquities are continued. Down to our own day, too, are continued the grievous salt monopoly and the pitiless taxation which wrings from the poor ryots nearly half the produce of the soil. Down to our own day continues the cunning despotism which uses native soldiers to maintain and extend native subjection." (Social Statics P. 194.)

এখনও পূর্ব্বের ন্যায় অন্যায়-আচরণ চলিতেছে। এখনও ভারবহ লবণের একচেটিয়া রহিয়াছে এবং নির্দ্দয়রূপে প্রজাগণের নিকট হইতে ভূমির প্রায় অর্দ্ধেক-শস্য কররূপে গৃহীত হইতেছে। এখনও এই ধূর্ত্ত যথেচ্ছাচারতন্ত্র ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারতবাসীকে পরাধীন করিয়া রাখিতেছে ও নূতন নূতন প্রদেশ জয় করিতেছে।

ইংরেজের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী ভয়ানক কুফল প্রসব করিতেছে। যে সকল

কুকীর্ত্তির জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর কুফল তাহা অপেক্ষাও ভীষণ। সেই কুফল হচ্চে:—

It is the alien rule of India in its present form! it is the economic drain of India's resources; it is the subordination of the interests of the sons of the soil to the interests of the foreigners; it is the consideration always of England before India." (Digby's Prosperous British India P. 638.)

অর্থাৎ সেই কুফল আর কিছুই নহে—বর্ত্তমান আকারের বৈদেশিক শাসন হইতে যাহা প্রসূত হইতে পারে তাহাই। উহা ভারতের শোষণ, বৈদেশিকদিগের স্বার্থের নিকট ভারতবাসীর প্রায় সমস্ত স্বার্থের বলিদান, ভারতের কথা ভাবিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কথাভাবা। ইহাতে যে দশা হওয়া সম্ভব তাহাই দিন দিন সুস্পষ্ট হইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ পারসী পণ্ডিত দাদাভাই নাবোরোজিও বলেন:—

"The existing system of British Rule is an un-British, debasing, destructive, despotic and impoverishing Rule."

বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনপ্রণালী ব্রিটিশ-গৌরবের অনুপযুক্ত, অবনতিজনক, সর্ব্বনাশী, দারিদ্র্যোৎপাদক ও যথেচ্ছাচারী।

ভারতশাসন ও বৈদেশিক শাসন সম্বন্ধে ইংরাজ পণ্ডিতদিগের মত এই—

"To govern a country under responsibility to the people of that country, and to Govern one country under responsibility to the people of another, are two very different things. What makes the excellence of the first is that freedom is preferable to despotism but the last is despotism." (Mill)

"অর্থাৎ ইংলণ্ড শাসনের জন্য ইংরাজদিগের নিকট জবাবদিহী থাকা আর ভারতশাসনের জন্য ইংলণ্ডের নিকট জবাবদিহী থাকা স্বতন্ত্র বস্তু। প্রথমটির অর্থ প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা; দ্বিতীয়টির অর্থ ভারতের পূর্ণ পরাধীনতা। মোটকথা, ভারত-গভর্ণমেণ্ট যদি পার্লিয়ামেণ্টের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করেন, ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদি দিবারাত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতের মঙ্গলামঙ্গল পর্য্যালোচনা করেন তাহাহইলেও ভারতবাসীর দুঃখ দূর হইবে না। তাহাতে বরং ভারতের ভাগ্যে কেবল এক লাট কর্জ্জনের স্থলে লক্ষলাট কর্জ্জন লাভ হইবে। ইহার কারণ মিল নিজেই বলিতেছেন,—

"It is always under great difficulties and very imperfectly, that a country can be governed by foreignes. Foreigners do not feel with the people."

"বৈদেশিক শাসন সর্ব্বদাই অতি দুরূহ ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ; বৈদেশিকেরা কখন প্রজাসাধারণের সহিত একহৃদয় হইতে পারে না।" পুনশ্চ—

The Government of a people by itself has a meannig, and a reality; but such a thing as

Government of one people by another, does not and can not exist. One people may keep another as a warren or preserve for its own use, a place to make money in a human cattle-farm to be worked for the profit of its own inhabitants. But if the good of the governed is the properi- busness of a Government, it is utterly impossible that a people should directly attend to it."

(Repr. Government, Mill)

"একজাতি আপনাদিগের শাসনকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা সম্ভবপর; কিন্তু একজাতি অপরজাতিকে শাসন করিতেছে, ইহা কখনও হইতে পারে না। এক জাতি অপর জাতিকে আপনাদিগের স্বার্থের জন্ম ব্যবহার করিতে পারে; অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র বা গোশালারূপে আপনাদিগের লাভের জন্ম তাহাদিগকে লইয়া ব্যবসায় চালাইতে পারে। কিন্তু প্রজাগণের হিতসাধন যদি রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা নিশ্চিৎ যে একটি সমপ্রজাতি কখনও সাক্ষাৎ ভাবে তাহাতে মনোযোগী হইতে পারে না।"

দেশের সম্বন্ধে আর দুই একটী কথাও আলোচনার বিষয়।

ইংরাজদিগের রাজনীতির মূলসূত্র হইতেছে No Representation and no taxation অর্থাৎ কেবল প্রজা সাধারণের প্রতিনিধিগণ ব্যতীত আর কেহ কর ধার্য্য করিতে পারেননা, প্রজাদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজার করস্থাপনের অধিকার নাই। ইংলণ্ডে প্রজাসাধারণের অমতে রাজস্বের এক কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না। প্রজাদিগের মতবিরুদ্ধ কোন কার্য্য হইলে প্রজাগণ রাজার আয়ের পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন?

উহা ইংলণ্ডের অবস্থা। আর হতভাগ্য ভারতে, পরাধীন ভারতে বড় লাটের মন্ত্রিসভায় রাজস্বের আয়ব্যয়ের হিসাবকথা উত্থাপিত হইলে পরাধীন ভারতবাসীর স্বদেশবিতাড়িত সদস্যগণের কেবল সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান ব্যতীত, রাজস্ব শত অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মে ব্যয়িত হইলেও প্রতীকারাদির কোনরূপ শক্তি নাই। প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া যে কর আদায় হয় তাহা যুদ্ধাদিকার্য্যে কতই অজস্র ব্যয় হইতেছে অথচ আমাদের শিক্ষাদি অত্যাবশ্যক কর্ম্মে সেরূপ অর্থ ব্যয় হইতেছে না। ইংরেজগণ প্রয়োজনবশতঃই হউক আর বিনাপ্রয়োজনেও হউক যেখানে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত হউন না কেন ভারতবাসীকে তাহার ব্যয় বহন করিতে হইবে। পারস্যের শাহ বিলাতে ভোজ খাইবেন তাহার খরচটাও ভারতবাসীকে দিতে হইবে এ দেশে যে সমস্ত মহাপ্রভু গোরাসৈন্য আসিবেন তাহাদের সংগ্রহ ও শিক্ষার ব্যয় ভারতবাসীকে দিতে হইবে। ইংলণ্ডে উপনিবেশ বাসীদিগের আফিস-ব্যয় তাহাও এই দরিদ্র ভারতবাসীকে যোগাইতে হইবে। হতভাগ্য ভারতবাসী আরও কত স্মরণ করিবে

তোমরা মৃত না জীবিত? তোমাদের স্ব ও দেশ বলিবার কিছুই নাইত, তোমরা যে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত আরও ইংরাজ

ভারতবাসীকে কোনরূপ মানসিক শক্তি বিকাশের সুযোগ দেন নাই। ভারতবাসীর উচ্চশিক্ষার পথ সঙ্কীর্ণ; সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্ম্মে তাহাদিগের প্রবেশাধিকার নাই। ও তাহাদিকে নিরস্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা দিন দিন নির্বীর্য্য ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

এখন ভক্তিসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া ও উহার সহিত স্ব ও দেশের সম্বন্ধ দেখাইয়া দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পরানুরক্তিকেই ভক্তি কহে। উহা যখন শ্রেষ্ঠ অধিকার গ্রহণ করে তখন উহা অহৈতুকী নামে অভিহিত হয়। স্ব এর বা দেশের মত শ্রেষ্ঠতম অধিকার বা বিষয়ে আমাদের সর্ব্বাগ্রে পরানুরাগ চাই। স্ব এর প্রতি পরানুরাগ হইতেই দেশের প্রতি পরানুরাগ আপনিই আসিয়া পড়ে। স্ব ও দেশের প্রতি অনুরাগ হইতেই মনুষ্যসমাজ, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, আত্মা, মোক্ষ সমস্ত বিষয়েই অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। স্বকে ভজনা করা বা স্বএর উন্নতি সাধনে পরম যত্নবান্ হওয়া, দেশকে সেবা করা বা দেশে স্বাধীন ভাব বজায় থাকিয়া সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভে যত্নপর হইবার জন্য চেষ্টা করাকেই স্বদেশভক্তি বলে। স্বও দেশ অর্থাৎ যাহা লইয়া মানব সমাজ তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নামই স্বদেশানুরাগ বা স্বদেশভক্তি। স্বও দেশের প্রতি ভক্তি সকল জীবেরই সাধারণ। এমন কি ইহা পশু পক্ষী ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। যিনি ধর্ম্ম-তত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, যিনি স্বও দেশের মধ্যে যে এক প্রকৃষ্ট ও রহস্যময় গূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পরিয়াছেন, তিনিই যথার্থ স্বদেশানুরাগী। এই স্বদেশানুরাগীর স্বদেশানুরাগ স্ব ও দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই; আহারও নাই নিদ্রাও নাই; ইঁহার বিশ্রামও নাই বিরামও নাই। এইরূপ প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিই স্ব ও দেশকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া স্বদেশ সেবায় রত হয়েন। আজ কয়েক বৎসর হইল অসুরদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া যখন দেবগণ দেবাত্মা হিমাচলে এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ও ধর্ম্ম-কর্ম্মক্ষেত্র ভারতের হিতকল্পে পবিত্র হোমকুণ্ডে সামধ্বনি সহকারে হবিঃ প্রদান করিতে থাকেন, সেই সময়ে পবিত্র স্বদেশানুরাগ প্রবল শক্তি সম্পন্ন হইয়া কতকগুলি সাধুহৃদয়ে ক্রীড়া করিতে ও শক্তি উদ্বোধিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সমস্ত মহাত্মাগণ ভারতের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রকৃত স্বদেশানুরাগের বীজ সঞ্চার করিতে থাকুন ইহাই প্রার্থনা আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক আহূত এই পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে স্ব ও দেশের নিকট সমস্তই উৎসর্গ দিতে হয়। ধন রত্ন যশৈশ্বর্য্য, স্ত্রী পুত্রাদি সমস্ত প্রিয়জন ও নিজের প্রাণ স্ব ও দেশের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট উপহার ও উৎসর্গ বা বলি। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেষভাগে নিদ্রা ত্যাগের পর শরীর ও মনঃ পবিত্র করিয়া শ্রুতিমন্ত্র আলোচনা করিতে হয় ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য গুরূপদিষ্ট উপায় ও প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনঃস্থৈর্য্য অভ্যাস

করিতে হয়। কাহাকেও বা নিদ্রাদি ত্যাগ করিয়া স্ব ও দেশের কল্যাণ চিন্তায় সর্ব্বদাই অবধান থাকিতে হয়। পরে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কৃত্য সম্পন্ন করিয়া যিনি যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত, তাঁহাকে সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়। সকলকেই মন্ত্রগুপ্ত হইতে হয়। যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অহিংসা, শৌচ, সন্তোষ, ঈশ্বরপ্রণিধান, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ব্যায়াম, সৎকথার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির অনুষ্ঠান থাকে তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে হয়। এই সমস্ত সদ্গুণই ভক্তিকে পরিপুষ্ট করে জানিয়া ঐ সমস্ত সদ্গুণই স্ব ও দেশের অনুরাগীদিগের সাধন ও জপ-মালা। সুতরাং স্বদেশভক্তি বলিতে গেলে, স্ব ও দেশের প্রতি উৎকৃষ্ট অনুরাগ দেখাইতে হইলে সর্ব্বপ্রকার সন্নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুশাসন গুলি মানিয়া চলিতে হয়। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম ও স্বদেশভক্তিতে পার্থক্য কোথায়?

কশ্চিৎস্বদেশধর্ম্মানুরাগী—

জননী ও জন্মভূমি।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ভারতবাসী যতদিন পর্য্যন্ত একথার মর্ম্মাবধারণে সক্ষম ছিলেন ততদিন তাঁহাদিগের সুখশান্তি, তাঁহাদিগের গৌরব, তাঁহাদিগের মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ ছিল। জগতে যত প্রাচীন জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উল্লিখিত মন্ত্রের ঐকান্তিক সাধনা [illegible] কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আর যে কোন জাতির অধঃপতন হইয়াছে [illegible] যেক্রমে উহার প্রকৃত মর্ম্মাবধারণে অ[illegible] প্রযুক্তই বিকৃতভাবে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাস একথা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে।

বর্ত্তমানকালে ইউরোপের উন্নতি দর্শনে অনেকে বিস্মিত হইয়া থাকেন। কিন্তু যদি তাঁহারা ইউরোপের উন্নতির মূলসূত্র পর্য্যালোচনা করেন তবে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে ইউরোপীয়েরা জননী ও জন্মভূমির প্রকৃত মর্ম্মাবধারণে সক্ষমতা প্রযুক্ত আপনাদিগের জাতি অর্থাৎ জন্মগত স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন তাই তাঁহারা আজ জগতে একাধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে জননী জন্মভূমি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহাই বিচার করিতে হইবে। গীতা বলিতেছেন "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" [illegible] ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর [illegible] করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতিই যে [illegible] জননী, ইহা দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হই[illegible] ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ [illegible] বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটি [illegible] প্রধান অঙ্গ। এই আটটী অঙ্গ হই[illegible] জাগতিক সমস্ত পদার্থ, সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতিই মনুষ্যের জননী। তাই যেরূপ [illegible] বিশিষ্টা জননীর গর্ভে জন্ম [illegible] সেইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। [illegible] নিমিত্ত ঋষিপুত্র রক্ষকুলপতি রাবণ মহাসাধক

ও মহাতপস্বী হইলেও কেবল রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণপ্রযুক্ত রাক্ষসপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। স্থানভেদে প্রকৃতি বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন, অথবা প্রকৃতির বিভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণানুসারেই স্থানের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই স্থানভেদে মনুষ্য-প্রকৃতি মধ্যে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং জননী ও জন্মভূমি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে একই পদার্থ। অতএব যে ব্যক্তি আপনার জন্মগত প্রকৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননী অথবা জন্মভূমির সেবা করিতে ইচ্ছা করে তাহার মাতৃসেবা অথবা স্বদেশসেবা কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

ইউরোপীয়েরা ইউরোপের যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, ইউরোপ ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন দেশে গমন অথবা বহুদিন সেই স্থানে বাস করিলেও তাঁহারা কখনই তাঁহাদিগের জননী ও জন্মভূমির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। কি ধর্ম্ম, কি আচার ব্যবহার, কি পোষাক পরিচ্ছদ, কি ভাষা সকল বিষয়ে তাঁহারা স্ব স্ব জাতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করেন, প্রাণান্তেও তাহা পরিত্যাগ করেন না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে জাতীয়চরিত্ররক্ষার প্রতি ইউরোপীয়-দিগের কিরূপ আগ্রহ, কিরূপ যত্ন, কিরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; এবং এই জাতীয়চরিত্ররক্ষা করিবার গুণেই ইউরোপ ক্ষুদ্র এবং আধুনিক হইলেও জগতে একাধিপত্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

অতএব যে সকল জাতি আপনাদিগের জন্মগত, প্রকৃতিগত অর্থাৎ জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-রক্ষায় সমর্থ হন, তাঁহারাই প্রকৃত শক্তিশালী, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সুতরাং যে সকল জাতি জাতীয়চরিত্র অল্লাধিক পরিমাণে পরিত্যাগ করে, জাতিগত-স্বাতন্ত্র্যরক্ষাশীল ইউরোপও অল্লাধিক আয়াসেই সেই সকল জাতির উপর অল্লাধিক পরিমাণে শাসনদণ্ড পরিচালনে সমর্থ হন। কারণ জাতীয়দৌর্ব্বল্য উপস্থিত না হইলে কোনও জাতি প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভারতবাসীর প্রাচীন স্বাধীনচিত্ত আর্য্যগণের ন্যায় বুদ্ধিমান, সাহসী, জ্ঞানবান জাতি জগতে আর দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু আজ ভারতবাসী একমাত্র জাতীয়-স্বাতন্ত্র্য-রক্ষায় অক্ষমতা প্রযুক্ত পশুজাতি অপেক্ষাও অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এই নিমিত্তই ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ" অর্থাৎ স্বধর্ম্ম অথবা প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিতে গিয়া মৃত্যুও শ্রেয়স্কর কিন্তু পরধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাহার ফল বড়ই ভীষণ।

অনুকরণপ্রিয়তা পরধর্ম্মগ্রহণস্পৃহার অভিব্যক্তি। মুসলমানদিগের ভারত বিজয়ের পর হইতেই ভারতবাসী ক্রমেই জাতীয়চরিত্র পরিত্যাগ এবং মুসলমান-দিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি এমন কি ভাষা পরিচ্ছদের অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ভারতবাসী যতই জাতীয়তা হারাইতে লাগিলেন ততই মুসলমানগণ তাঁহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। এমন কি ভারতবাসী এরূপ যবনাচার সম্পন্ন হইয়া পড়িলেন যে পবিত্র সংস্কৃতভাষার সহিত আরব ও

পারস্যদেশীয় যাবনিক ভাষা মিশ্রিত করিয়া সেই শঙ্করভাষাকে উর্দ্দু নাম ধারণ করাইয়া ভারতসন্তানগণ, প্রাচীন আর্য্যভাষার নিতান্ত পক্ষপাতী হইলেও সেই ভাষা শিক্ষা এবং ম্লেচ্ছসংস্পর্শ ও সংস্রব বড়ই গৌরবজনক মনে করিতে লাগিলেন। যদি সেই সময় সমস্ত ভারতবাসী পারসিকদিগের ন্যায় একেবারে যবন হইয়া যাইত, তবে বর্ত্তমান ভারতবাসীর কোন কষ্টই হইত না, কারণ যবনদিগের জাতীয়তাই তাহাদিগের জাতীয়তায় পরিণত হইয়া সকলের মধ্যে একতার বন্ধন সংস্থাপিত করিত, কিন্তু তাহা হইলনা; জাতীয়চরিত্ররক্ষায় অক্ষম সুতরাং পরাধীন দুর্ব্বলচিত্ত ভারতসন্তানগণ আপনার জাতীয় চরিত্রের মধ্যে যাবনিক আচার ব্যবহার প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথমে আচার-শাঙ্কর্য্য, তাহার পর ভাষা-শাঙ্কর্য্য এবং পরিশেষে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল বর্ণ-শাঙ্কর্য্য, পবিত্র ঋষিবংশের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বর্ণ-শাঙ্কর্য্য বৃদ্ধির সহিত ভারতবাসীর সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং সামাজিক শিথিলতার প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবাসী জাতীয় চরিত্ররক্ষায় একেবারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে।

শরীরে প্রচুর পরিমাণ সামর্থ্য থাকিলেই তাহাকে প্রকৃত শক্তিশালী বলা যায় না। কারণ আত্মশক্তির পরিচালনে অক্ষমব্যক্তির শক্তি, প্রায়ই অপরব্যক্তির কার্য্য সাধনের সহায়ক হইয়া থাকে। হস্তীর শরীরে প্রচুর সামর্থ্য আছে কিন্তু তাহার সামর্থ্য মনুষ্যের কার্য্যে নিয়োজিত হয়, মুসলমানেরা ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিবার প্রাক্কালে, ভারতবাসী একেবারে শারীরিক শক্তিবিহীন হইয়া পড়ে নাই। তাহাহইলে পাঁচশত বৎসর কাল কখনই রাজপুতগণ মুসলমানদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতেন না এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বংশের সন্তান লইয়া সিপাহীসেনা প্রস্তুত করিতেন না। অতএব শারীরিক সামর্থ্য বা যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেই তাহাকে প্রকৃতশক্তি বলে না। পক্ষান্তরে প্রচুর শক্তিশালী যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ যে কোন জাতি স্বজাতীয় চরিত্রপরিরক্ষায় অক্ষম হইলেই তাহার শক্তি ও যুদ্ধবিদ্যা,—অপর কোন স্বাধীনচিত্ত চরিত্রবান জাতির উন্নতির সহায়তাপক্ষে এবং সেই উন্নতজাতির সহায়তার ব্যপদেশে, তাহার স্বজাতির এবং অপরাপর বহু নিরীহ জাতির ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে।

ভারতবাসী চরিত্ররক্ষায় অক্ষম হইয়া প্রকৃতশক্তিহীন হইয়া পড়ায়, বেদবিক্রয়ী ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে জার্ম্মানীর পণ্ডিত মোক্ষমূলর ভারতবাসীর অস্ত্রে ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়দিগের সাহায্যেই ইংরাজরাজ ভারতের একাধিপত্য সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং ভারতবাসীর পরিশ্রমেই ভারতের রাজকার্য্য পরিচালন পূর্ব্বক আপনাদিগের গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন, ভারতবাসী এখনও দুর্ব্বল হয় নাই, কখনও যে দুর্ব্বল হইবে তাহাও

বোধ হয় না। তাহাহইলে এই নিত্য দুর্ভিক্ষের দিনেও ভারতবর্ষের দুইলক্ষ দেশীয় সৈনিক ইংরাজের রাজ্যরক্ষা করিতে পারিত না। ভারতবর্ষীয় পুলিশ, ভারতবর্ষীয় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট মুনসেফ ইংরাজের রাজকার্য্য চালাইতে পারিত না। কেবল জাতীয় চরিত্ররক্ষায় নিতান্ত অক্ষমতা প্রযুক্ত তাহারা প্রকৃত জননী ও জন্মভূমিকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাই তাহাদিগের নিজের এবং তাহাদিগের দ্বারা ভারতবাসীরই সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। যদি জাতীয় ভাবারিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় অনুকরণে বিজাতীয় রীতি-অনুসরণে জাতীয় মহাসমিতি এবং স্বদেশী আন্দোলন পরিচালিত হয় তবে সেই বিদেশী-ভাব-মিশ্রিত আমাদের জাতীয়মহাসমিতি ও স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা ভারতবর্ষের কল্যাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অকল্যাণই সাধিত হইবে ইহাই মনে হয়।

একমাত্র জননীও জন্মভূমির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করায় ভারতবাসীর, প্রচুর বলবীর্য্য থাকিলেও সাহসহীন। কারণ অকৃতজ্ঞের বাহুতে প্রচুর সামর্থ্য থাকিলেও তাহার হৃদয় সাহসহীন হইয়া থাকে। প্রচুর বলশালী তস্করকে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু "চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহার দুষ্কর্ম্মই তাহাকে দূরে অপসারিত করে। অতএব যতদিন ভারতবাসী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ-জনিত তদনুকূল প্রকৃতিরক্ষায় উদাসীন থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদিগের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার হইবে না, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইবে না। নিজস্বরক্ষায় উদাসীন পরস্ব-প্রত্যাশীকে, যেরূপ নিজস্ব ও পরস্ব উভয় পদার্থেই বঞ্চিত হইতে হয়, ভারতবাসীর অধুনা সেই অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে। এখনও যদি তাঁহাদিগের চৈতন্য সঞ্চার না হয় তবে ভারতবাসীর ভাবী দুর্দ্দশা আরও কত অধিক হইবে তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

-০:০:০—

মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি ? এই মহা-প্রশ্ন যখন মানবের অন্তঃকরণে উপস্থিত হয় তখন মানবমন ইহার সুগভীর তত্ত্বে বাণিজ্য-সম্ভার-পূর্ণ তরণীর ন্যায় অজ্ঞানকুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সন্দেহরূপ অসীমচিন্তাসমাকুল এক মহা-সাগরে দোলায়মান হইতে থাকে। চিন্তা করিতে করিতে জীব যখন পরিশেষে ভগবানের কৃপায় সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপে যে একটি মহান্ আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সেই আশ্রকেই জীবের বেদান্তপ্রতিপাদ্য মহাপন্থা কহে।

এই বেদান্তপ্রতিপাদ্য উৎকৃষ্টতম পন্থাবলম্বন করিয়া যখন মানববুদ্ধি শনৈঃশনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে তখন মানবজীবনের উদ্দেশ্য-অনুসন্ধান একেবারে চিন্তার শেষ সীমায় গিয়া দাড়ায়। সেই রমণীয় স্থান চিন্তা এবং জ্ঞানাতীত। ফলতঃ আবার এই জ্ঞান ও চিন্তা সেই স্থানেই তদ্‌গত্।

এই মহাপ্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিতে গেলে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে মানববুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ অথবা নিরীশ্বরবাদের তর্ক উপস্থিত হয়। জগতেও

নানা সম্প্রদায়ের লোকে এই প্রশ্নের নানা-রূপ মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা ঈশ্বর-অবিশ্বাসী ব্যক্তির যুক্তিপূর্ণ মীমাংসার বিন্দু-মাত্র উল্লেখ করিতে চাহি না। মহাভারতে বনপর্ব্বাধ্যায়ে "নহুষরূপী সর্প সংবাদে" সর্প দ্বারা ভীম আবদ্ধ হইলে ভ্রাতৃখেদকাতর মতিমান যুধিষ্ঠির সর্পের প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বলিয়াছিলেন যে "আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার অগ্রে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে—আপনি আস্তিক না নাস্তিক অগ্রে এই কথা বলুন, তবে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর করিব"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে যিনি অস্তিত্বে অবিশ্বাসী তিনি মনুষ্য সমাজের বহির্ভূত।

দ্বৈতবাদীরা কেহ কেহ বলেন যে স্বর্গ-লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই মীমাংসা নির্দ্দোষ নহে। কেননা যাঁহাদের মতে "ভয়" সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা মানবের সঙ্গে সঙ্গে থাকে তাঁহারা যে অনেক সময়ে শঙ্কিত থাকেন ইহা স্বীকার করিতে হয়।

আর অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে অমিশ্র, স্থায়ী, নিরবচ্ছিন্ন সুখই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠলক্ষ্য। অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বলাভ অথবা ব্রহ্মবিচার দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলেই নির্ব্বাণমুক্তি বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করা যায়। এই ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান অতীব দুরূহ ব্যাপার; সুতরাং মানব জীবনের উদ্দেশ্যও অতীব মহান্। কোন এক সময় দেবর্ষি নারদ চারিবেদ, ভারত, পুরাণ, ভাগবত, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি পরিজ্ঞাত হইয়া পরমব্রহ্মের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবার আশায় সাতিশয় ব্যাকুল হৃদয়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ সনৎ-কুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাভাগ ব্রহ্মের স্বরূপ কি?" তখন মহর্ষি সনৎ-কুমার কহিলেন

"যো ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখংত্বেব নিভেদিনি"।

যাহা অদ্বিতীয় এবং অপরিচ্ছিন্ন তাহাই সুখ বা ব্রহ্ম স্বরূপ। কিন্তু এই সুখ স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন, পরিচ্ছিন্ন বস্তু হওয়া চাই। স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট নামরূপাদি বিকারজাত—পদার্থ সুখস্বরূপ নহে। সুতরাং এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই সুখ স্বরূপ। তখন আবার দেবর্ষি নারদ কহিলেন "ভূমার স্বরূপ না জানিতে পারিলে কেমন করিয়া যে তাহাই একমাত্র অনন্ত সুখস্বরূপ ইহা বুঝিতে পারিব"। উত্তরে সনৎকুমার কহিলেন,

"যত্র হি নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্য-দ্বিজানাতি স ভূমা।"

অর্থাৎ যাহা জানিয়া অন্য দৃশ্য কেহ দর্শন করে না অন্য শ্রোতব্য শ্রবণ করে না এবং অন্য জ্ঞাতব্য জানে না তাহাই ভূমা শব্দের একমাত্র প্রতিপাদ্য। ছান্দোগ্য উপ-নিষদে উল্লেখ আছে যে, আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন,

কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।

অর্থাৎ কাহাকে জানিলে সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আচার্য্য উত্তর করিলেন এই জগতে "পরা ও অপরা" নামে দুইটি বিদ্যা আছে—উভয়ই পরিজ্ঞাত হওয়া লোকের একান্ত কর্ত্তব্য। পরা অর্থে

পরমাত্মবিদ্যা,আর অপরা অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন ও তৎকালোচিত বিদ্যাকে বুঝিতে হয়। এই উভয় বিদ্যাই একান্ত পরিজ্ঞেয়। যে জ্ঞানের দ্বারা অক্ষর পরম বিজ্ঞান লাভ হয় তাহাকে পণ্ডিতেরা পরাশক্তি বা পরা-বিদ্যা বলিয়া থাকেন। আর বেদ, বেদাঙ্গ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতির শিক্ষাদ্বারায় যে জ্ঞান হয় তাহাকেই অপরা বিদ্যা কহে। এই অপরা বিদ্যায় মানবকে সংসার দেখায় এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষা দেয়। পরাবিদ্যার মোক্ষমার্গ লইয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করা যায়। সুতরাং পরাবিদ্যার গুণে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দলাভ করাই মানব জীবনের পরমউদ্দেশ্য।

এখন দেখা উচিত যে এই ব্রহ্মানন্দ-লাভ করিতে হইলে কিরূপ উপায়ে বা কিরূপ শিক্ষায় তাহা লাভ করা যাইতে পারে। প্রথ-মতঃ অপরাবিদ্যার অঙ্গবিশেষের সাহায্যে উপাসনা দ্বারা পরাবিদ্যামূলকপথের একটি একটি করিয়া স্তর ধরিয়া উঠিতে হয়। এই প্রকার উপাসনার চারিপ্রকার প্রথা, অধিকারী ভেদে শাস্ত্রেও কথিত আছে যথা বিরাট-উপাসনা, কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ-উপাসনা, কারণব্রহ্ম বা সগুণ ঈশ্বর-উপা-সনা, নিগুণব্রহ্ম-উপাসনা এই চারি মতের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকে বলেন যে সগুণ আর নির্গুণ উপাসনা দ্বারা চিত্তে একাগ্রতা সাধন হয়। এই একাগ্রতা সাধিত হইলে জীবের আত্মজ্ঞানশিক্ষা বিদ্যুৎ প্রভাবৎ সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই স্থানেই "সোহংব্রহ্ম" বা "অহংব্রহ্ম" জ্ঞান উপস্থিত হয়। এই উদ্দেশ্য মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। নির্গুণ সাধনা দ্বারা যখন চিত্তের একাগ্রতা উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয় তখন "তত্ত্ব-মসি" মহাবাক্যের তত্ত্বজ্ঞান আপনা হইতে আবির্ভূত হয়।

নিরোধলাভাতে পুংসোহন্তরবাঙ্গংবস্তু শিষ্যতি। পুনঃপুনর্ব্বাসিতেঽস্মিন্ বাক্যাৰ্থে জায়তে তত্ত্বধী॥ (পঞ্চদশী)

কিন্তু অগ্রে সগুণ বা কারণব্রহ্মের উপা-সনা দ্বারা মানবজীবনের চরম উন্নতি পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পরিশেষে সকামতা পরিত্যাগ করতঃ নিষ্কামভাবে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় রত হইয়া বা আত্মজ্ঞানের উৎ-কর্ষতা প্রাপ্তে মহাসুখ লাভ করিতে হয়। যাঁহারা ভুত ও ভৌতিক পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করেন তাঁহারা বিরাট উপাসক। যাঁহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইত্যা-দিকে ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করেন তাঁহারা হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্মের উপাসক। আর যাঁহারা মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যকে উপাসনা করেন তাঁহারা কারণব্রহ্মের উপাসক বলিয়া কথিত। আর যাঁহারা মায়া উপহিত ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহারাই নির্গুণ উপাসক। বিরাট এবং হিরণ্যগর্ভ উপাসনা সকাম। আরাধনা বাহ্য; ওতত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে শেষে অন্তরায়। নিষ্কাম উপাসনাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত উপায়। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ বড় কঠিন। বেদান্তসারে উল্লেখ আছে।

যে সকল ব্যক্তি ইহকালে কাম্য কিম্বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম এবং

সগুণব্রহ্মবিষয়কব্যাপাররূপ উপাসনা প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপকে বিনষ্ট করিয়া মনের পরিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছেন ও যে ব্যক্তি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মলাভের অধিকারী। যে সকল সাধক সকাম কার্য্যের প্রতিপোষকতা দ্বারা ঈশ্বর-প্রাপ্তি আশা করিয়া নিষ্কাম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া পরিপুষ্ট অবস্থায় নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য পরিত্যাগ করত শ্রবন মনন নিদিধ্যাসন ও মহাবাক্য বিচার করত তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে পারেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ।

এ দিকে আবার পণ্ডিতগণ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতিকে ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন বলিয়া থাকেন—তাহা হইলেও তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিচার জন্ম নামাদি সাধনের সহিত শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞানের জন্ম কর্ম্ম ও উপাসনাদি—শ্রবণাদির বিরোধী বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

তাহা হইলে এখন দেখা যায় যে ব্রহ্ম প্রাপ্তির দুইটি সুবৃহৎ পথ আছে। একটি হইতে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা—আর অপরটি হইতে ব্রহ্মবিচার—এই দুই মহাপথের পথিককে একই লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতে হইবে। তবে কেহ অগ্রবর্ত্তী কেহ পশ্চাদ্-গামী। যে সকল সাধক অস্থিরচিত্ত এবং মন্দবুদ্ধিশালী অর্থাৎ—অথবা তার্কিক এবং সন্দেহশালী বিচারানভিজ্ঞ তাঁহারাই নির্গুণের আরাধনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করেন। আর যাঁহারা কোনরূপ ব্যাকুল চিত্ত অথবা উক্তরূপ কোন প্রতিবন্ধকের অধীন নহেন তাহারাই তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের বিচার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। বিচারের অভাবেও উপাসনার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সুতরাং ব্রহ্মবিচারেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে

এখন কথা হইতেছে যে আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পর্য্যন্ত দুঃখের নিবৃত্তি না হয় সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মের উক্তরূপ বিচার করিতে হয়। একবার আত্মজ্ঞানরূপ মহাসূর্য্যের উদয় হইলে আর দুঃখরূপ অন্ধকার থাকিতে পারে না। সেই সময় সব শান্ত হইয়া—"তরতিশোকমাত্মবিৎ" হইয়া দাড়ায়। সেই সময় জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" হয়। তখনই মানব জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায় তখনই জীবের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাজ্ঞান প্রতিভাত হয়।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

পতঞ্জলির কালনির্ণয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত

—০:০:০—

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পতঞ্জলির সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হীনপ্রভ হইতে লাগিল এবং যখন শাক্যমুনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিতে লাগিলেন তখন ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ, আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি নিতান্তই হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল।

সেই সময়ে প্রায় দুইসহস্র মনীষী ভিক্ষু ভারতে বিচরণ করিতেন। বৌদ্ধ 'মহাযান সূত্রে' 'সুখাবতী-ব্যূহে' উক্ত আছে যে তখন সহস্রাধিক সার্দ্ধত্রিশত জ্ঞানবৃদ্ধ ভিক্ষু ভারতে বিদ্যমান ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই যে পরিবর্ত্তন অর্থাৎ প্রবল ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পতন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান—ইহা এক দিনে সম্পন্ন হয় নাই। এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে অতি অল্প করিয়া ধরিতে গেলেও অন্ততঃ যে তিন শত বৎসর লাগিয়া ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গৌতমবুদ্ধ ও তাঁহার অনুমনা বৌদ্ধভিক্ষুগণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গণনানুসারে ৫৭০ খৃঃ পূঃ কালে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ যদি স্বীকার করা যায় তাহাহইলে পতঞ্জলি ৮৭০ খৃঃ পূর্ব্বে অর্থাৎ অনুমান নবম কি দশম শতাব্দীর মধ্যেই জীবিত ছিলেন বলিতে হইবে। আবার যদি ভাষার ক্রমপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় তাহাহইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে পতঞ্জলি আরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

পতঞ্জলি নবম কি দশম শতাব্দীর কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক;—আমাদের এই যুক্তির অনুকূলে প্রভূত প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রাচীন চীনদিগের ইতিহাস পাঠে জানা যাইতে পারে যে শাক্যমুনির 'নির্ব্বাণ' খৃঃ পূঃ ৯৭০ অব্দে * ঘটিয়া থাকে। সুতরাং উপরি উক্ত মতানুসারে হীনযান পন্থীদিগের কথিত ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি—এই প্রকার কথার কোন মূল্য নাই। হীনযান পন্থীরা যে আরও বলিয়া থাকেন যে 'মহাবংশ' খৃষ্টাব্দের ৪৫৯ বৎসরে লিখিত হয়—মহাযানপন্থীরা একথাতেও কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। প্রত্যুত শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা চীনদিগের সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে ও চীনদিগের কালনির্ণায়ক ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা অবগত হওয়া যায় যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শাক্যমুনির নির্ব্বাণ প্রাপ্তির কালনির্ণয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার কোন মৌলিকতা নাই ও তাহা প্রগল্‌ভ ও অলীক উক্তিই বলিয়া বিশ্বাস হয়। 'পতঞ্জলির কালনির্ণায়ক' প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল তাহার মধ্যে স্থূলতঃ এই দুইটি কথা সকলেরই সিদ্ধান্ত স্বরূপে মনে করিয়া রাখা উচিত।

(১) মহর্ষি পতঞ্জলি যিনি যোগসূত্রের প্রণেতা তিনিই অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির 'মহাভাষ্য' প্রণেতা। দ্বিতীয়তঃ মহর্ষি পতঞ্জলি খৃঃ পূঃ নবম কি দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে জীবিত ছিলেন।

উপসংহার।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচ্যজগতের সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রণেতাদিগের কালনির্ণয়-সম্বন্ধে যেরূপ পন্থা অবলম্বন করেন তাহা অসম্পূর্ণ ও তাহা নিতান্ত একদেশদর্শী। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ

* কাহারও মতে ৯৪৯ খৃঃ পূর্ব্বে;—Dr. E. J. Eitel's Sauskrit-chinese Dictionary—a hand book of Chinese Budhism P 139 (Hongkong, 1888) and Beal's catena of Chinese Scriptures, P 116 Note

করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ দেশের সংস্কৃতসাহিত্যে, কি দর্শনশাস্ত্রে কি ধর্ম্মশাস্ত্রে কি ব্যাকরণাদিতে তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান প্রয়োজনানুরূপ না থাকায় তাঁহারা যে অনেকে বহু স্থলে সুত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকরেরও এই মত। নিম্নে তাহার কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া হইল।

Just imagine Dr. Otho Bohtlingk, 'while incapable of understanding even the easy rules of Panini, and much less those of Katyayana and still making use of them in the understanding of classical texts. The errors in his department of dictionary are so numerous and of so peculiar a kind—yet on the whole so thoroughly in accordance with the specimens I have adduced from his commentary that it will fill every serious Sanskritist with dismay, when he calculates the mischievous influences which they must exercise on the study of sanskrit Philology' ("Panini and his place in sanskrit Literature"—By Tho. Goldstucker p 254).

(2) Dr. Roth writing his Worterbuch (Sanskrit Dictionary), which is described by Goldstucker (Panini, p 251) in this way : "I will merely here state that I know of no work which has come before the public with such unmeasured pretension of scholar-ship and critical ingenuity as this Worterbuch, and which has, at the same time, laid itself open to such serious reproaches of the profoundest grammatical ignorance"—explains Vedic words, and has courage to pass sweeping condemnation on all those gigantic labors of the Hindu mind (e. g Sayanacharya's Bhashya), while ignorant of all but the merest fraction of them.'

(3) Professor Kuhn, who is said to be 'no proficient in Sanskrit' was asked to give his opinion of the Worterbuch, and of course praised the work very highly. Prof. Weber rushes into the stage at once, and warmly defends it against every one. A detailed criticism on the 'vain labors' of these Saturnalia of Sanskrit Philology will be found in Goldstucker's Panini, his place in Sanskrit Literature pp 241-268.

(4) Prof. Weber himself acknowledges, although not in the plainest language, that he had, while lecturing on Indian Literature, made only a superficial study of Mahabhashya. (Indian Literature, p 224, note).

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের প্রথমতঃ,সংস্কৃত-ভাষা, দর্শন, বিজ্ঞান আদি সম্বন্ধে যে জ্ঞান নিতান্ত অল্প তাহা উপরি-বর্ণিত উক্তি হইতে প্রমাণিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ কোন গ্রন্থের কালনির্ণায়ক ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের দেশের মনীষী পণ্ডিতগণ ও শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহারা গ্রাহ্যমধ্যে গণনা করেন না। অধিকাংশ সময়ে তাঁহারা

তাঁহাদের সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ কোন একটি ঐতিহাসিক তথ্য কিম্বা তাহার কালনির্ণয় সম্বন্ধে যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, নূতন কোনরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাই তাঁহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এমন কি ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যখন কোন বিষয়ের ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, সময়-নির্ণয়সম্বন্ধে যে সন্দিগ্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন সেই সমস্ত সন্দিগ্ধতাও পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

এই সমস্ত পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণকে কখন কখন ইহাও বলিতে শুনা গিয়াছে যে বেদে যে সমস্ত স্থলে দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ উক্তি দেখা যায় তাহা পরবর্ত্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে দার্শনিক আলোচনাপূর্ণ কোন গ্রন্থ বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কিম্বা খ্রীষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে মনুষ্যজাতি মনুষ্য সমাজে পরিচিত হইয়াছে ইহা পঞ্চ সহস্র বৎসরের অধিক হইবে না এবং যাহা কিছু সভ্যতা-বল, দর্শন-বল, বিজ্ঞান-বল, সমস্তই খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ কি সপ্ত শতাব্দীকালের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের চতুর্থ যুক্তি-রীতি এই যে তাঁহাদের মতে গৌতমবুদ্ধই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্বেও যে বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম ও আর্হত-দর্শন বর্ত্তমান ছিল ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ, জৈন কিম্বা আর্হত দর্শনকে আধুনিক বলিয়া অসঙ্গত ও উপহাস দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসবশতঃ গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুদিগের অনেক দার্শনিক গ্রন্থ, তাহাতে বৌদ্ধদর্শনের উল্লেখ থাকিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া Mr. Weber বলেন যে ব্যাস খৃষ্টের জন্মগ্রহণের পরে পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহার ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন। কি অদ্ভুত গবেষণা!!!

'ব্যাস দর্শন পুরাণাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেন,' 'বাচস্পতি মিশ্র বহু দর্শন শাস্ত্রের টীকা প্রণয়ন করেন,' 'পতঞ্জলি যোগসূত্র ও মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন'—ইত্যাদি উক্তির বহু কিম্বদন্তী প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায় সেই সমস্ত উক্তির মধ্যে বহু সত্যতা থাকিলেও, একই পণ্ডিত বহু দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন ও তৎসম্বন্ধে পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। এইজন্য তাঁহারা দুইজন বাদরায়ণ [ব্যাস] দুইজন পতঞ্জলি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে এবং তদনুকূলে অভিনব যুক্তি প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত জ্ঞান ও ধারণা সম্বন্ধে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে জর্ম্মণি ও অন্যান্যদেশীয় সংস্কৃতাভিজ্ঞ অধ্যাপকগণ অতি অল্প পরিমাণেই সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত

করিতে পারিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানের অল্পতা ও গভীর আলোচনার অভাব বশতঃ সংস্কৃত পুরাণ দর্শন কোনরূপে ভাষান্তরিত করেন। তাঁহারা না পারেন বুঝিতে,— 'মীমাংসা সূত্রের উপর শবরস্বামীর ভাষ্য,' না পারেন 'ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্য,' না পারেন 'গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি,' কিম্বা না পারেন বুঝিতে 'উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থাবলী'। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেরূপ ভাবে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন তাহা দ্বারা তাঁহাদিগের কতকগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের কিম্বা সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের পুস্তকের নামের সহিত মাত্র পরিচয় হয়। আর এতদ্দেশে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগকে কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন অধ্যাপকের নিকটে থাকিয়া শিক্ষা করিতে হয় ও অধ্যাপক গুরু পরম্পরায় যে সমস্ত অমূল্য প্রাচীন ইতিহাসতত্ত্ব অবগত থাকেন সেই সমস্ত আবার শিষ্যবর্গকে উপদেশ দেন। গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত এই সমস্ত অমূল্য ইতিহাসতত্ত্বের উপর অনাস্থা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নূতন কোন কল্পনার পরিপোষণে মত দেওয়া বা সেইদিকে পক্ষপাত প্রদর্শন কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

পরিশেষে সিদ্ধান্ত স্বরূপে এই প্রবন্ধে স্থিরীকৃত হইতেছে যে 'যোগসূত্র' প্রণেতা ও 'মহাভাষ্য' প্রণেতা পতঞ্জলি একই ব্যক্তি। এবং এই মহর্ষি পতঞ্জলি খৃষ্টের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে নবম কি দশম শতাব্দীতে কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে জীবিত ছিলেন।

সমাপ্ত

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

একদেশদর্শীর ভ্রম।

গত আশ্বিনমাসের হিন্দু পত্রিকায় শ্রীযুত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় "কাহার ভ্রম" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রীমৎ ভাগবতের মহা পুরাণত্বস্থাপন ও দেবী ভাগবতকে পুরাণ হইতে বহিষ্করণ। তৎবিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। পাঠক বর্গের মধ্যে আমিও একজন। আমি ঐ প্রবন্ধের অনেকগুলি উক্তি দোষযুক্ত মনে করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। আমি প্রথমে তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধকে চার অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের কথা বলিব, এবং পরিশেষে উভয়মতের নিজজ্ঞানানুসারে সমাধানের চেষ্টা করিব।

১। তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রথম কথা "শ্রীমৎ ভাগবত পাঠে জানিতে পাই বেদবিভাগ ও মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও বেদব্যাসের আত্মপ্রসাদ না হওয়ায় দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে পরিশেষে তিনি শ্রীমৎভাগবত প্রণয়ন করেন"। এইস্থানে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ২ কথা বাদ দিয়া লিখিয়াছেন, যেগুলি তাঁহার বিপক্ষের কথা ইহাতে তাহাই নাই, আমরা তাহাই দেখাইতেছি। "বেদবিভাগ ও পঞ্চম বেদ স্বরূপ ইতিহাস পুরাণ সকল সঙ্কলন এবং স্ত্রীশূদ্র নিন্দিত-ব্রাহ্মণদিগের জন্য মহাভারত রচনা করিয়াও মনে তৃপ্তি না হওয়ায় শেষে তিনি

নারদের কথামত হরিকথামৃতরূপে ভাগবত রচনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। [শ্রীমৎভাগবত ১ম স্কন্ধ ৪-৬ অধ্যায় বঙ্গবাসী সংস্করণ দেখ] এইক্ষণ ভাগবতের নিজকথাতেই বুঝা যায় পুরাণ সমূহ শেষ করিয়া পরে তিনি ভাগবত রচনা করিয়াছেন, এরূপ স্থলে ৫ম মহাপুরাণ কাহারমতে ৮ম মহাপুরাণ ভাগবত রচিত হইবার পর শেষ পুরাণ [পঞ্চম মহাপুরাণ ভাগবত ভিন্ন] শ্রীমৎভাগবত রচিত হইয়াছে। আর দেখাইতেছি মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

"অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহণমিতি॥"

ইহাদ্বারাও পুরাণের পর ভারত, ভারতের পর শ্রীমৎভাগবত হইতেছে, তাহাহইলে এখানি উপপুরাণ মধ্যে গণ্য হয়। আমরা উপপুরাণের তালিকামধ্যে দেখিতে পাই একখানি ভাগবত আছে যথা "আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃ পরং। পরাশরোক্তং প্রবরং তথাভাগবতাহ্বয়মিত্যাদি।" এইক্ষণ ভাগবতের নিজের কথা দ্বারা আর একটু বুঝাইতে চেষ্টা করিব। দ্বাদশস্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ৯-২২ শ্লোকে মহাপুরাণ লক্ষণ প্রস্তাবে পুরাণের দশবিধ লক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সকল প্রধান ২ পুরাণ মতে মহাপুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কেবল শ্রীমৎভাগবতকার ও আধুনিক পরিবর্ত্তিতসংস্করণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারই মহাপুরাণের দশবিধ লক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাদ্বারাও বিষ্ণুভাগবতের নব্যত্বই প্রমাণ হয়। অমরসিংহ প্রভৃতি অভিধানকারগণও পুরাণের পঞ্চলক্ষণই বলিয়াছেন, তাহাহইলে আমরা বুঝিতে পারিতেছি অমরসিংহের সময়েও পুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্তই ছিল তাহার পরে রচিত পুরাণগুলি দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। আবার এই শ্রীমৎভাগবতই যে পঞ্চম মহাপুরাণ তাহা ভাগবতকার কোনস্থলেই নির্দ্দেশ করেন নাই, বরং তিনি পুরাণগণনার প্রস্তাবকালে একস্থানে ভাগবতকে পঞ্চম ও অন্যস্থানে সেই ভাগবতকেই ৮ম পুরাণ বলিয়া গোলে বাধাইয়াছেন। অন্যান্য সকল মহাপুরাণেই নিজ পুরাণকে মহা পুরাণমধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

স্মৃতিসংগ্রহকার রঘুনন্দন শ্রীমৎভাগবতের ২১৪টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়াই যে বিষ্ণুভাগবতকে মহাপুরাণ মধ্যে গণ্য করা যায় তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ নাই। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে দেবীভাগবতেরও শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং আধুনিক সংগ্রহকর্ত্তা পণ্ডিতদেরও মত ও বচন যথেষ্টই দেখ। তিনি যত প্রামাণ্য গ্রন্থ, পাইয়াছেন প্রায় তৎসমুদায়েরই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন অর্ব্বাচীন কোন ভেদ রাখেন নাই। বিষ্ণুভাগবত যে বহুদিবসহইতে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে তাহাপরে সমাধান প্রস্তাবে দেখাইব।

৩। তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন "দেবী ভাগবত মহাপুরাণ হইতে বাধা কি।" আমরা সামান্য অনুসন্ধানেই মৎস্যপুরাণের শ্লোক দেখিতে পাইতেছি যথা,

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তৎভাগবতমিষ্যতে।"

পুরাণান্তরের বচন যথা "গ্রন্থোঽষ্টা দশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্দসম্মিতঃ হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা যত্রবৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যাচ সমারম্ভ স্তং বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন এই সমস্ত কথাই শ্রীমৎভাগবতে আছে, কিন্তু দেবীভাগবতে ইহার কিছুমাত্র নাই। তিনি মৎস্যপুরাণের যে শ্লোক তুলিয়াছেন তাহারপরেও যে আর একটী শ্লোক আছে তাহাবোধহয় দেখেন নাই, আমরা উভয় শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তৎভাগবতমুচ্যতে॥১ সারস্বতস্য কল্পস্যমধ্যে যেস্যুর্নরামরাঃ। তৎবৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তৎ ভাগবতমুচ্যতে॥২ ইত্যাদি॥" যেস্থানে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া বিস্তারিত ভাবে ধর্ম্মবর্ণনা করা হইয়াছে, এবং বৃত্রাসুরবধ যেস্থানে বর্ণনা হইয়াছে তাহাকেই ভাগবত বলে ১ সারস্বতকল্পের মধ্যে যে সকল নর ও অমর তাহাদের বৃত্তান্ত যাহাতে আছে তাহাকেই ভাগবত বলে। আমরা প্রথমেই দেবীভাগবতে ত্রিপাদ গায়ত্রী পাইতেছি তহোর প্রথম শ্লোক যথা। "ওঁ সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চধীমহি। বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ॥" এবং একাদশ ও দ্বাদশস্কন্ধে বিস্তারিত ভাবে গায়ত্রী বিধানাদি কথিত হইয়াছে (বোম্বে সংস্করণ দেবী ভাগবত দেখ) শ্রীমৎভাগবতের প্রথম শ্লোকে "সত্যংপরংধীমহি" মাত্র আছে, একটী ধীমহি মাত্র শব্দ ভিন্ন আর কোথাও কিছু নাই এবং যে শ্লোকে ধীমহিশব্দ আছে তাহাও গায়ত্রী ছন্দ নহে। পাঠক দেখিবেন শ্রীমৎভাগবতে কিরূপ গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ধর্ম্মবর্ণনা করা হইয়াছে। ধর্ম্মবর্ণনা সম্বন্ধে উভয় ভাগবতেই প্রচুর কথা পাওয়া যায় বটে। বৃত্রাসুরবধও দেবী ভাগবতে অতিবিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা দেবী কর্তৃক বৃত্রবধ, মৎস্য পুরাণের ২৮ অধ্যায়ে তাহাও আছে। শ্রীমৎভাগবতেও তাহার কোন অভাব নাই তাহা ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধ। কিন্তু মৎস্য পুরাণের আর একটী শ্লোকের বিষয় কিছু মাত্র শ্রীমৎভাগবতে নাই তাহার সমুদায় বিষয়ই দেবী ভাগবতে দেখা যায়; তাহা সারস্বতকল্পের বৃত্তান্ত। সারস্বতকল্প কাহাকে বলে তাহাই অগ্রে আলোচনা করিব, স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে লিখিত আছে "সারস্বতস্য দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনস্যচ।" অর্থাৎ ফাল্গুনের শুক্লদ্বাদশীতে সারস্বতকল্পের আবির্ভাব হইয়াছে। মহাশিবপুরাণের বচনে দেখিতে পাই, "ব্রহ্মণা-সংস্তুতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে। মহাবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্ববিদ্যাধিদেবতা। দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনস্যৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপ॥ ইত্যাদি।" আবার হেমাদ্রিবলেন "সরস্বত্যাঃ কল্পো গৌরীকল্প এব।" এই সমুদায় প্রমাণ দ্বারা আমরা সারস্বতকল্পে মহামায়ার কথাই পাইতেছি, দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেবী ভাগবতই যে সারস্বতকল্পাশ্রিত মহাপুরাণ তৎপ্রতি আর কোন সন্দেহই থাকে না। বিষ্ণু-ভাগবত কিন্তু পাদ্মকল্পকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছে "পাদ্মং কল্পমথো শৃণু"।

ইত্যাদি বচন দ্বারা নিজ মুখেই বিষ্ণু ভাগবতকে পদ্মকল্পোশ্রিত পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পাদ্মকল্প ও সারস্বতকল্পের ব্যাখ্যাদি শ্লোক মৎসপুরাণের শেষ অধ্যায়ে ও পদ্মপুরাণের কল্পাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। এইক্ষণ পুরাণান্তরের বচনের আলোচনা করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কি পাওয়া যায়। হয়গ্রীবের ব্রহ্মবিদ্যা-লাভ বৃত্রবধ, এবং গায়ত্রী অধিকার করিয়া যাহা আরম্ভ তাহাই ভাগবত। শেষোক্ত দুই বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। বিষ্ণু ভাগবতে হয়গ্রীবের বিষয় আংশিক নামোল্লেখ মাত্র দেখা যায় (৫ম। ৮।১) ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির কথা কিছুমাত্র পাওয়া যায় না. দেবী ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে হয়গ্রীবের ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী মহামায়ার তপস্যাদির বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা দেখিতেছি, ইহাদ্বারাও দেবী ভাগবতই মহাপুরাণ হইতেছে। এইস্থলে কাহারও আপত্তি হইতে পারে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে ব্রহ্মবিষয়ক মাত্র অর্থাৎ বিষ্ণু মাত্রই গ্রহণ করিব। তাহারও সমাধান করা যাইতেছে। নারদীয় পুরাণে আমরা পাইতেছি "মন্ত্রাঃ পুংদেবতা প্রোক্তা বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ" ইত্যাদি। ইহাদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী মহামায়ারই কথন হইয়াছে। দেবী ভাগবতের ১ম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে জানা যায় এই দেবী ভাগবতই মহাপুরাণ, ইহাতে অষ্টাদশ সহস্রশ্লোক ও দ্বাদশস্কন্ধ আছে ইত্যাদি। আবার আদিত্য পুরাণের বচনেও দেখা যায় "ততোভাগবতং প্রোক্তং ভাগদ্বয়বিভূষিতং।" দেবীভাগবতেই ভাগদ্বয় পরিলক্ষিত হয়, যথা ৬ষ্ঠ স্কন্ধে শেষশ্লোক "পূর্ব্বার্দ্ধোয়ং পুরাণস্য কথিত স্তবসুব্রত।" বিষ্ণু ভাগবতের দশমস্কন্ধে পূর্ব্বাঙ্গ উত্তরাঙ্গ আছে বটে কিন্তু তাহা সমগ্রপুরাণের ভাগদ্বয় নহে, দশম স্কন্ধের ভাগদ্বয় মাত্র। তর্কবাগীশ মহাশয় পদ্মপুরাণের একটী বচনও দেখাইয়াছেন তাহা এই "অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু" ইত্যাদি। এইস্থলে শুকপ্রোক্তং দেখিয়া বিষ্ণু ভাগবতের অকাট্য প্রমাণ মনে করিয়াছেন, শুকায় পক্ষিণে প্রোক্তং শুকপ্রোক্তং অর্থ দ্বারা দেবী ভাগবতকেই বুঝা যায়। দেবী ভাগবতে শুকপক্ষীর ভাগবত শ্রবণের কথাই আছে। মিতাক্ষরার টীকাকার প্রসিদ্ধ বালম্ভট্ট শ্রীমদ্ভাগবতকে এককালে পুরাণ হইতেই বহিষ্কৃত করিয়াছেন

৪। তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন চিৎসুখাচার্য্য ভাগবতের একখানি টীকা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তিনি কোন টীকা প্রণয়ন করেন নাই, পুরাণার্ণব নামে একখানি [সমুদায় পুরাণমন্থন করিয়া] পুরাণ সংগ্রহ লিখিয়াছেন। পুরাণান্তরের দোহাই দিয়া যে হয় গ্রীবের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক বচন তোলা হইয়াছে তাহা পুরাণার্ণবেই পাওয়া যায়। আমার বোধহয় ভাগবতের গোস্বামী টীকাকারগণ চিৎসুখাচার্য্যের পুরাণার্ণবের কথাই ভাগবতের টীকা বলিয়া ধরিয়া বোপদেবের ভাগবতপ্রণয়ন প্রবাদের একটা মারাত্মক প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যতগুলি ভাগবতের টীকা হইয়াছে তাহাতে চিৎসুখের কোন নাম নাই। [বিশ্বকোষে ভাগবত টীকার কথা দেখ] দেবগিরিরাজ

হেমাদ্রি ও নিবন্ধ এবং টীকাকার হেমাদ্রি অভিন্ন কিনা তৎসম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বহু মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। এরূপস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের সম্বন্ধ প্রামাণ্যজনক নহে। বোপদেব মুক্তাফল নামে যে ভাগবতের তাৎপর্য্যার্থ জ্ঞাপক একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা যে স্বকৃত ভাগবতের টীকা নহে তাহা কে বলিল, ঐরূপ স্বকৃত গ্রন্থের টীকা প্রণয়নের ভুরি ২ প্রমাণ পাওয়া যায়। বোপদেবের ভাগবত প্রণয়নের প্রবাদ যে অমূলক তাহাই বা কি করিয়া বলি, "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষে তৎকৃত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় তদ্বারাও ভাগবত প্রণয়নের কথা বুঝা যায়। "যস্যব্যাকরণে বরেণ্যঘটনা স্ফীতা প্রবন্ধাদশ, প্রখ্যাতা নববৈদ্যকেপি তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোদ্ভুতঃ। সাহিত্যে ত্রয়এব ভাগবততত্ত্বোক্তৌত্রয়, স্তস্যাগুর্ব্ব্যন্তর্ব্বাণি শিরোমণেরিহগুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ॥" শ্রীধরস্বামীর নিজ কথা দ্বারাই বুঝা যায় তাঁহার সময়েও ঐ প্রবাদ ছিল, তৎপূর্ব্বেও যে ছিল না তাহাই বা কে বলিল। ব্যাকরণকর্ত্তা বোপদেব ভিন্ন অন্য কোন বোপদেব দ্বারাও ত প্রণয়ন হওয়া অসম্ভব নহে প্রবাদ যখন চলিয়া আসিতেছে এই সমুদায় আলোচনা করিলে "কাহার ভ্রম" তাহা সহজেই অনুমেয়। এ স্থলে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন, তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন "আমরা কোন দেববিদ্বেষ বুঝি না কাহারও দেববিদ্বেষের কথা শুনিয়া গলাগলি ছাড়িয়া দলাদলি করিতেও ভালবাসিনা ইত্যাদি" কিন্তু তিনি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

সমাধান।

৫। বাস্তবিকই কি বিষ্ণুভাগবত মহাপুরাণ নহে আর দেবীভাগবতই মহাপুরাণ এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এ বিষয়ে বিশ্বকোষের পুরাণ শব্দে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা রহিয়াছে, দেবী ভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠও বহু আলোচনা করিয়াছেন সুধীগণ তদ্দর্শনেই বুঝিতে পারিবেন। বিষ্ণুপুরাণের ৩।৬।১৬—২১ শ্লোক কয়টী দেখিলে বুঝিতে পারাযায় বেদব্যাস প্রথমে নানাখ্যানযুক্ত একখানি মাত্র পুরাণ সংহিতাই রচনা করিয়া তাঁহার বিখ্যাতশিষ্য রোমহর্ষণকে দেন, রোমহর্ষণের ছয় শিষ্য; তন্মধ্যে প্রধান তিন শিষ্য তিন খানি মহাপুরাণ রচনা করেন। বরাহ পুরাণেও আমরা ঐ কথাই পাই, ইহাদ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথমে পুরাণ বিভাগ ছিলনা ব্যাসদেবও সমুদায় পুরাণ রচনা করেন নাই, ব্যাসদেবের পরে তাহার শিষ্য প্রশিষ্যেরাই ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশখানি মহাপুরাণ রচনা করেন। বস্তুতঃ যিনি পুরাণগুলি অন্ততঃ একবারও পাঠ করিয়াছেন তিনি কখনই বলিবেন না যাঁহার হাতের রচনা মহাভারত তাঁহারই রচনা এই পুরাণ সমূহ। আবার প্রত্যেক পুরাণ দেখিলেও একজনের রচনা বা একসময়ের রচনা বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণগুলির ভাষা যেরূপ সরল ওজস্বী ও মধ্যে মধ্যে গাম্ভীর্য্যশালী তাহা ভাগবতাদি পুরাণে লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ বিষ্ণুভাগবতের রচনা অনেক স্থানেই কঠিন, অলঙ্কৃত, বিবিধছন্দোবিশিষ্ট, সুগভীর

চিন্তাপ্রসূত। এই শ্রীমৎভাগবত নানা আখ্যানযুক্ত একখানি বৈষ্ণবীয় দার্শনিক গ্রন্থ। গীতায় বেদব্যাস যে অপূর্ব্বমত প্রকাশ করিয়াছেন, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতগণ যে দার্শনিকমত স্বীকার করেন বৈদান্তিক-মতের সহিত সেই সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই শ্রীমৎভাগবতের সৃষ্টি। বাস্তবিক দার্শনিক জগতে শ্রীমৎভাগবতের যাদৃশ আদর; ও এমনটি বুঝি আর কোথাও নাই। ভাগবতকার নিজেই লিখিয়াছেন "সর্ব্ব-বেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাৎ রতিঃ ক্বচিৎ॥" ২স্কন্দ ১৩। ১৫ ইত্যাদি। এই জন্যই বলিয়াছি শ্রীমৎভাগবত বহু সামান্য গ্রন্থ ও অধ্যাত্মবাদী বৈষ্ণবদিগের পরমাদরের বস্তু। নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির মতে বিষ্ণুভাগবত-কেই মহাপুরাণ বলা যায়, এরূপ হইবার কারণ সম্প্রদায় ভেদে কোন কোন পুরাণ-কার বিষ্ণুভাগবতকে মহাপুরাণ, আবার কোন কোন পুরাণকার দেবী ভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়াছেন। বাস্তবিক পূর্ব্বে একখানি মাত্রই ভাগবত ছিল যাহাকে ৫ম মহাপুরাণ বলা হইত। এবং তাহার আঠার হাজার শ্লোক ও দ্বাদশ স্কন্ধ ছিল, কালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবসময়ে ঐ পুরাণ খানির অংশ নষ্ট হইতে ছিল, শেষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবনতির সময়ে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি কালে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মত পরিপুষ্ট করিয়া ৫ম ভাগবতের যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহারই মালমশল্লা লইয়া দুইখানি স্বতন্ত্র পুরাণ রচিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় উভয় গ্রন্থেই আঠার হাজার শ্লোক ও দ্বাদশ স্কন্ধ আছে। দেবীভাগবতের পূর্ব্বার্দ্ধ আলোচনা করিলে তাহা বহু প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উত্তরার্দ্ধ আলোচনা করিলে তাহাতে বহু অর্ব্বাচীন কথার সমাবেশ দেখা যায়। বিষ্ণুভাগবতে কোথাও রাধার কথা উল্লেখ নাই এমন কি নামটি পর্য্যন্তও নাই। কিন্তু দেবীভাগবতের পরার্দ্ধে রাধার উপাসনার বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে দেবীভাগবতের ঐ অংশ বিষ্ণুভাগবতেরও পরে রচিত হইয়া দেবীভাগবতে স্থান পাইয়াছে। বিষ্ণুভাগবতের সময় পর্য্যন্তও রাধার উপাসনা প্রচলিত হয় নাই, হইলে বিষ্ণুভাগবতে তাহার কোন না কোন নিদর্শন থাকিত। ভাগবত রচনার সময় পর্য্যন্ত রাধা-নাম্নীয় কোন দেবতার অস্তিত্বই ছিল না। ব্যাসদেবও মহাভারতে রাধার কোন নাম-টীও করেন নাই, পরবর্ত্তিসংস্করণ ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে তাহার উপাসনা দেখা যায়। এইরূপ বহু অর্ব্বাচীন কথার স্থান দেবী-ভাগবতে পাইয়াছে। সেই জন্যই আমরা বলি মূল ৫ম ভাগবতের কোন কোন অংশ বিষ্ণুভাগবতে এবং কোন অংশ দেবীভাগ-বতে স্থান পাইয়া এবং স্ব স্ব মত প্রকাশক কতকগুলি কথা লইয়া দুইখানি স্বতন্ত্র পুরাণ সৃষ্টি হইয়াছে। বাস্তবিক পুরাতন ৫ম ভাগবত বলিয়া যাহা ছিল তাহা এই-ক্ষণ আর নাই। এইরূপ যে কেবল ভাগ-বতের ভাগ্যেই হইয়াছে তাহাও নহে, অন্যান্য পুরাণ সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন ও অনেক নষ্ট হইয়াছে তাহাও তৎপুরাণ-দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। সাবেক পঞ্চ মহাপুরাণের অধিকাংশই যে দেবী ভাগবতে আছে তাহাও একরূপ বুঝা যায়, এইজন্যই দেবী ভাগবতকেই পণ্ডিত মণ্ডলী মহাপুরাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসি-তেছেন ও বিষ্ণুভাগবতকে আধুনিক কবি-রচিত বলিয়া আসিতেছেন। এইক্ষণ সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় পাঠকবর্গের উপর বিচারভার অর্পণ করিলাম ইতি।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

পাবনা।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। পৌষ ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

তত্ত্বচিন্তা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সৎ স্বরূপ অহং-এ চৈতন্য শক্তি বাসনা লীন আছে বলা হইয়াছে। তখন শক্তির কার্য্য দেখা যায় না, বাসনারও কার্য্য দেখা যায় না। শক্তিও নিষ্ক্রিয়, বাসনাও নিষ্ক্রিয়। অহংএর বাসনা-চালনে শক্তি প্রবুদ্ধ হইলে বাসনাও চঞ্চল হয়, শক্তিও চঞ্চল হয়। চঞ্চল বাসনার নাম ইচ্ছা, ইহা কার্য্যের পূর্ব্বেই উদয় হয়। চঞ্চলশক্তি কার্য্যে প্রকাশ বা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর হইবার সময় অহং বাসনা ও শক্তি বাসনা করেন। বাসনা ও শক্তি ত্রিগুণে অর্থাৎ অহং-এর ত্রিভাবে নিজের হিত হইতেছে। অহং যখন যেরূপধারী যে ভাবধারী, বাসনাও তদ্রূপ হয়, যখন যে ভাবে কার্য্য করেন শক্তিও সেই ভাবাপন্ন হয়। প্রলয়কালে বিপরীত বুদ্ধি বাক্য এইজন্য প্রকৃত বাক্য। অহং প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনভাবে থাকেন; ঐ তিনভাবের নাম ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজ, তম। এক ভাব হইতে অপরভাবে থাকা, আসা যাওয়া অহংএর সাধ্য। একটী কার্য্য করিয়া 'বেন' বলিতেছেন, উহাতে ভুল দেখিতেছেন, আবার সেই ভুল শোধরাইতেছেন। সত্ত্বভাবে শান্ত, রজভাবে উদ্দিপ্ত, আবার তমভাবে অবসন্ন হইতেছেন। এই ত্রিভাবে থাকিতে তিনি কখন মনরূপী হয়েন। [অহং বুদ্ধিরূপে বা মনরূপে নির্লিপ্ত] মনরূপে তিনি বুদ্ধিরূপী নহেন, বুদ্ধিরূপে মনরূপীও নহেন। যখন যে রূপে তিনি প্রকাশ তখন সেইরূপী।

অহং বুদ্ধিরূপে সূক্ষ্মদর্শী, মনরূপে স্থূলদর্শী, অর্থাৎ যেরূপে থাকিয়া সূক্ষ্ম দর্শন করেন তাহার নাম বুদ্ধি, যেরূপে থাকিয়া

স্থূল দর্শন করেন তাহার নাম মন। মন স্থূলের ভোক্তা, বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট, বুদ্ধি সূক্ষ্মের ভোক্তা, মনদ্বারা দৃষ্ট নহে। মনরূপী অহং বুদ্ধিরূপী হইতে পারেন ও হয়েন, আবার বুদ্ধিরূপী অহং মনরূপী অহং হইতে পারেন ও হয়েন। ইহার দৃষ্টান্ত সমাধি ও তৎ পূর্ব্ব ও পর অবস্থা। সমাধির পূর্ব্বে অহং মনরূপী, সমাধিতে অহং বুদ্ধিরূপী, আবার সমাধির অন্তে মনরূপী হয়েন। লীলাহেতু অহং, সত্ব-রজ-তম-ভাবাপন্ন ও মনরূপী হয়েন। এই লীলাহেতু জগৎ ব্রহ্মাণ্ড।

মনরূপী অহং বুদ্ধিরূপী হইবার জন্য তপস্যা করেন অর্থাৎ বার বার বা নিয়ত বুদ্ধিরূপী ভাবকে উপলব্ধি করেন। করিতে করিতে বুদ্ধিরূপী হইয়া যান। তাঁহার পদে পদে অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনাবলিতে বুদ্ধিরূপা প্রতিভা-পাত হয়। ঐ প্রতিভার ভোগ জন্মে, ঐ ভোগ হইতেই বুদ্ধিরূপী অহং-এর প্রতিমা উদয় হয়। মনকে বুদ্ধি বলিয়া এবং বুদ্ধিকে মন বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে। সংশয় মাত্রই মনের কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। আর, মনকে বুদ্ধির স্থানে বসাইতে নাই, বুদ্ধিকে মনের ইচ্ছাতে বসাইলে ক্ষতি হয় না, কেননা স্থূল-দর্শন পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম-দর্শন ঘটিবে। উদ্ধত হইয়া একটী কাজ করিতে যাইতেছ একটু স্থির হইয়া ভাবিলেই সেই কার্য্যের পরিণাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতে পারে, পরিণাম-দর্শনে হয়ত উহা হইতে ক্ষান্ত হও। মনের উদ্ধত প্রকৃতি বশতঃ মনুষ্য কুকার্য্যে লিপ্ত হইতেছিল, বুদ্ধির দ্বারা তাহাইইতে পরিত্রাণ পাইল। এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভে বিশেষতঃ। স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে সুতরাং মনরূপী অহংকে বুদ্ধিরূপী হইতে হয়। সুষুপ্তিতে মন বুদ্ধির শরণাগত হয়, অর্থাৎ অহং মনরূপ ছাড়িয়া বুদ্ধিরূপ ধারণ করেন। বুদ্ধিরূপ ধারণ করিয়া স্বরূপ দর্শন করেন। এইজন্য আমরা সুষুপ্তির জন্য লালায়িত। সুষুপ্তি-অন্তে যেন নূতন হইয়াছি মনে হয়। শ্রান্ততনু বিশ্রাম করিতে পাইয়াছে বলিয়া নহে, কেননা জাগিয়া থাকিলেও শ্রান্ততনু বিশ্রামলাভ করিতে পারিত, চঞ্চল মন স্থির [কার্য্যকারী ছিল না] বলিয়া সতেজত্ব বোধ হয়। মন ও বুদ্ধির সন্ধিভাবে অহং স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইই দেখিতে পারেন। যে মনুষ্য এই শান্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তিনি ধন্য-তিনি সুধু আর মনরূপী হইতে চাহেন না। উত্তর উত্তর বুদ্ধিরূপী হইতে চাহেন। এইরূপে ঋষিত্ব লাভ করিতে পারেন।

জীবনমুক্তদিগের এইরূপ দুইদিকে দেখা অভ্যস্ত। তাঁহারা মনরূপে কার্য্য করিয়াও নির্লিপ্ত থাকেন। সমাধিতে সন্ধি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিরূপী অহং স্বরূপ দর্শন করেন ও উহাতে লয় হয়েন। তখন তাঁহার দুদিক বা একদিক দেখা কিছুই থাকে না, তখন তিনি স্বয়ং-স্বরূপ "সৎ" হয়েন।

মনোময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানময়কোষস্থ অহং (বুদ্ধিরূপী) মনোময়কোষে আসিয়া মনরূপী হইতে প্রয়াস করেন না—বাসনা মাত্রই মনরূপী হইতে পারেন—ইহাকে অবতরণ

বলে। কিন্তু মনময় কোষস্থ অহং (মনরূপী) বিজ্ঞানময় কোষে গিয়া বুদ্ধিরূপী হইতে প্রয়াসী হয়েন, শুধু বাসনা মাত্র হইতে পারেন না। ইহাকে "উন্নয়ন (উত্থান) কহে।

মন্দ কাজ করা সহজ, অর্থাৎ হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ করা সহজ। কিন্তু হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ পরিত্যাগ করা সহজ নহে। সুতরাং অবতরণে প্রয়াস প্রয়োজন নহে।

সত্ত্ব রজ ও তম ত্রিগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। সত্ত্বে তম ভাব, অথবা তমতে সত্ত্ব ভাব না থাকুক, রজ কর্ত্তৃক সত্ত্বে তম ও তমতে সত্ত্ব ভাব বিলুপ্ত প্রতীয়মান হয়। সত্ত্ব তমকে বা তম সত্ত্বকে নাশ করে না। অহং মন হইতে বুদ্ধিতে আসিলে অহং-এর তম ভাব সত্ত্বে পরিণত হয়। আবার অহং বুদ্ধি হইতে মনে আসিলে অহং-এর সত্ত্ব-ভাব পরিবর্ত্তে তম ভাব উদয় হয়। কেননা বুদ্ধির অন্তর্দ্দিকে মহত্তত্ব ও বহির্দ্দিকে অহং-তত্ত্ব।

বাসনাযুক্ত শক্তি ত্রিগুণের ধর্ম্ম হেতু সাত্ত্বিক, তামসিক ও রাজসিক কার্য্যকারিণী অথবা শক্তিযুক্ত বাসনা ত্রিগুণের ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যে প্রসবিণী। অর্থাৎ বাসনা যুক্ত শক্তি সত্ত্বগুণে তামসিক কার্য্য করে না। আবার তমগুণে সাত্ত্বিক কার্য্য করে না। ইহার নাম গুণধর্ম্ম। সহজ কথায় যাহার যে ভাব তাহার তাহাই ধর্ম্ম। যদ্বারা তাহা প্রকাশ তাহার তাহাই ধর্ম্ম। অথবা যে যাহা ধরিয়া আছে তাহার তাহাই ধর্ম্ম।

আকাশের একটি ধর্ম্ম—অপ্রতিবোধক।
বায়ুর—সংক্রামক।
অগ্নির—দহন করা।
জলের—নীচু দিকে গমন।
মৃত্তিকার—গন্ধ নাশ করা।
শব্দের—কর্ণ কুহরে প্রবেশ করা।
কর্ণের—শব্দ অনুভব করা।
স্পর্শের—ত্বকে অনুভূত হওয়া।
ত্বকের—স্পর্শ অনুভব করা।
রূপের—নেত্র আকর্ষণ করা।
নেত্রের—রূপ দর্শন করা।
রসের—জিহ্বায় অনুভূত হওয়া।
জিহ্বার—রস অনুভব করা।
ইত্যাদি।

তাহার পর মানসিক কতকগুলি দৃষ্টান্ত। বাসনার একটি ধর্ম্ম, বৃত্তি উদ্দীপন করা।
বৃত্তির—শক্তি সংগ্রহ করা।
শক্তির—কার্য্যে প্রবৃত্ত করা।
কার্য্যের— { আসক্তি উদয় করা। / অনুরাগ করা। }

মোহ তামসিক। মোহগ্রস্তের অথবা মূর্চ্ছাগত জনের কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। কেননা তখন সেই জন তামসিক ভাবাপন্ন। মানসিক সম্বন্ধে দেখ—তামসিক বাসনা সাত্ত্বিক বৃত্তি উদ্দীপন করে না। তামসিক বৃত্তি শক্তি সংগ্রহে অক্ষম হয়। তামসিক শক্তি সৎকার্য্যে ব্রতী করে না। তামসিক কার্য্য মনুষ্যকে উন্নতি পথে লইয়া যায় না।

শক্তি ত্রিবিধ। স্থিতি শক্তি, উদয় শক্তি, (সৃষ্টি শক্তি) লয় শক্তি।

স্থিতি শক্তি—যে শক্তিতে শক্তি বর্ত্তমান।

উদয় শক্তি—যে শক্তিতে সৃষ্টি হয়, উদয় হয় বা প্রকাশ পায়।

লয় শক্তি—যে শক্তিতে রূপান্তর, হ্রাস বা লয় হয়।

স্থিতি শক্তি অন্ত-কার্য্যকারী নহে, উহা শক্তিতে সংভাবে বিদ্যমান।

উদয় ও লয় শক্তিই কার্য্যকারী।

উদয় শক্তিতে সূক্ষ্ম বৃহৎ হয় এবং লয় শক্তিতে বৃহৎ সূক্ষ্ম হয়।

এই ত্রিবিধ শক্তির একীভূতা প্রকৃতিকে আত্মাশক্তি কহে। যে চৈতন্য সহবাসে আত্মাশক্তি প্রসবিনী তাহার নাম ঈশ্বর, এই অর্থে ঈশ্বর মায়া, অথবা পুরুষ প্রকৃতি। এই ঈশ্বর মায়া একীভূতই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থাৎ বড়, এত বড় যে ধারণা করা যায় না। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের যে বিরাটরূপ ও ভাব ধারনা করিতে পারেন নাই তাহার নাম ব্রহ্মভাব। কাল সাধারণতঃ তিন-ভাগে বিভক্ত। [১] ভূত [অতীত, যাহা ছিল, আর নাই] [২] ভবিষ্যৎ [ভাবী, যাহা ছিল না-হয় নাই হইবে] [৩] বর্ত্তমান [উপস্থিত, যাহা ছিল না, হইবে না, আছে]

ভূত একবার বর্ত্তমান ছিল, ভবিষ্যৎ একবার বর্ত্তমান হইবে যে ধারণায় কাল বিভক্ত উহা সঙ্কীর্ণ। গতকল্য, আগামী কল্য আর অদ্য-এই তিনে যে প্রভেদ বোধ উহা সংস্কারজ। কালের আদি ও অন্ত বোধাতীত। কাল অনাদি ও অনন্ত বলিলে অসত্য বলা হয় না। যাহা অনাদি ও অনন্ত তাহার বিভাগ হয় না। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের ত্রিভাগ সূর্য্য দিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। গতকল্য উদয় হইতে অস্ত সূর্য্য পর্য্যন্ত একদিন [সূর্য্য প্রকাশভাগ দিবা, অপর ভাগ রাত্রি]। এই একদিন, তাহারপর একদিন, তাহার পর একদিন, তাহারপর একদিন, এই তিন দিনের মধ্য দিনকে বর্ত্তমান ধরিবে, সেই দিনে প্রথম দিন ভূত, পরদিন ভবিষ্যৎ হয়। এইদিন হইতে মাস, মাস হইতে বর্ষ, বর্ষ হইতে যুগ ইত্যাদি।

যে সময় গিয়াছে (কোথায় ?—কালে মিশিয়াছে; আর যে সময় আসিবে (কোথা হইতে ?—কালের গর্ভ হইতে), তাহা কাল ব্যতীত কিছুই নহে। সুতরাং কাল নিত্য; ভূতে, ভবিষ্যতে ও বর্ত্তমানে নিত্য; তথাপি যে বিভাগ করা হয় উহার তাৎপর্য্য না করিলে ঘটনার কাল বুঝান যায় না।

"কাল-স্রোত" কথাটী প্রকৃত নহে, কেননা যাহাকে অনাদি অনন্ত ভাবিবে তাহাতে বর্ত্তমান ভাব আরোপ করা যায় না। তথাপি সংস্কার বশতঃ ঐরূপ বুঝ ও বুঝাও। যিনি সংস্কার হইতে মুক্ত তাঁহার পক্ষে না ভূত, না ভবিষ্যৎ, শুধু বর্ত্তমান, তিনি কালের নিত্যতা দেখেন। ভূত ও ভবিষ্যৎ ধারণা দূর না হইলে নিত্যতা বোধ হয় না। সচরাচর নিত্য বলিয়া যাহা প্রয়োগ হয় উহা নিত্যতা" বোধ হইতে হয় না, কেননা "নিত্য" বোধে "ছেদের" বোধ থাকে না।" সাধ্যরস "নিত্য"তে ছেদের বোধ থাকে।

যখন হইতে অহং বা ব্রহ্ম তখন হইতেই কাল কল্পিত হয়, অহং বোধ হইতেই

কালের বিভাগ। কাল ব্রহ্ম বলিয়া উক্তি আছে।

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম-অণ্ড, ব্রহ্ম-গোলক।

দূর হইতে সমুদয় বৃহৎ বস্তুর আকার গোল দেখায়। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সমুদয়ই গোল দেখায়। অন্তর্চক্ষুর দৃষ্টিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও গোল দেখায়। ঋষিরা অনন্তের-অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে আভাস দেখিয়াছেন, তাহা হইতেই উহাকে অন্ধকার বলিয়াছেন। সেই গোলকব্যাপ্ত ব্রহ্ম, ইহা দেখিয়া উহার নাম ব্রহ্মাণ্ড দিয়াছেন। কেহ বা অতি বৃহৎ বলিয়া উহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলিয়াছেন।

জগৎ অর্থ "হইয়া যায় যাহা"। যাহাহয় তাহাই রয় (যত অল্পক্ষণ হউক না) এই, তাহা যায়। অতএব যাহার উদয় স্থিতি লয় আছে তাহাই জগৎ। কেহ বলেন সেই সমুদয় বস্তু লইয়া যেস্থান তাহাই জগৎ। এই অর্থে সাধারণতঃ "জগৎ" কথা প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু সেস্থান ও যাইতে পারে অতএব "হইয়া যায় যাহা" বাক্যই প্রকৃত। স্থান বুঝাইলে আর একটী দোষ পড়ে। কেননা জগৎ চাক্ষুষ এবং অচাক্ষুষ। মাত্র ভৌতিক স্থূল বস্তু লইয়া চাক্ষুষ জগৎ। চাক্ষুষ জগৎ জড়, অচাক্ষুষ জগৎ জড় নহে, উহা চৈতন্যময়। এই চৈতন্যময় জগতের স্থান কোথায় ?

চাক্ষুষ জগতের বস্তু জল, মাটী, অগ্নি, শব্দ রূপ রসাদি। অচাক্ষুষ জগতের বস্তু চিন্তা, কল্পনা, ধারণাদি। চাক্ষুষ জগতের সীমা আছে, অচাক্ষুষ জগতের সীমা নিরূপণ কঠিন। মহৎতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব।—

অহংতত্ত্বে থাকিয়া যিনি মহৎতত্ত্ব কি জানিতে চাহেন তাঁহার প্রতি গুরু উপদেশ (১) মন ও বুদ্ধিকে পৃথক করিয়াছেন, অর্থাৎ মন বুদ্ধি নহে এবং বুদ্ধি মন নহে ইহা উপলব্ধি কর।

ইহা সহজ। একটু স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় মন ও বুদ্ধি এক নহে। আর একটী উপায়; সময় সময় কোন কাজ করিতে ইতস্ততঃ কর। একবার তোমার মনে হয় "করি", আবার মনে হয় "না, করিব না"। এইরূপ দুই তিনবার রুচি বা বিরক্তি অন্তে হয় 'কর', নয় 'কর না'। ভাবিয়া দেখ, ঐরূপ বিচার কালে তোমারই মধ্যে যেন কে একজন করিতে বলে, অপর একজন করিতে মানা করে, তুমি যেন ঐ দুইজন হইতে পৃথক থাক। একটু স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে জন সৎকর্ম্মে সম্মতি দেয় কে অর্থাৎ কর্ম্মে সম্মতি দেয় না করিতেও পরামর্শ দেয় না। আবার, যে অসৎকর্ম্ম করিতে উৎসাহ দেয় সে সৎকর্ম্মের পরামর্শ দেয় না। সৎকর্ম্মে যে পরামর্শ দেয় সেই "বুদ্ধি", অপর "মন"। মন ও বুদ্ধিকে পৃথক করিয়া—

(২) মনেকর তুমি বুদ্ধির অনুগত হইয়াছ। বুদ্ধিকে এখন একটা পাত্র বা স্থান কল্পনা কর। মনেকর তুমি ঐ বুদ্ধির মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া একদিকে চাহিয়া দেখিতেছ—[ক] মন বৃত্তিবশ হইয়া কতকগুলি ইন্দ্রিয়কে কার্য্য করাইতেছে।

[খ] মনের কার্য্য ভূমি সম্মুখে বিস্তীর্ণ জগৎ।

[গ] বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়ের দিকে চাহিয়া আছে।

[ঘ] তুমি সমস্ত কার্য্যের ভোগ করিতেছ। ইহাই অহংতত্ত্ব।

[৩] মনে কর তুমি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলে। দেখিতেছ—মন, ইন্দ্রিয় বা উহাদের কার্য্য এবং ঐ কার্য্যক্ষেত্র কিছুই নাই। বুদ্ধি চাহিয়া আছে সত্য কিন্তু কাহার দিকে, দেখিতে পাইতেছো না। বুদ্ধিরসে ভাব নাই। বুদ্ধি শান্ত, বৃত্তিসহ শান্ত। বিপরীত দিকে মন যেমন ধ্যস্ত বুদ্ধি সেরূপ নহে। তোমার সে ভোগ নাই অথচ তুমি অপূর্ব্বতা উপভোগ করিতেছ। এই যাহা দেখিতছ] উহাই মহৎতত্ত্বের আভাস।

অহংতত্ত্ব-বিষয় ত্যাগ না করিয়া অথবা বিষয়ত্যাগী হইয়া বুদ্ধিতে না উপস্থিত হইলে মহৎতত্ত্বের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

অহংতত্ত্ব ও তত্ত্ব, মহৎতত্ত্বও তত্ত্ব, তবে অহংতত্ত্বে যে বিষয় আছে, মহৎতত্ত্বে, সে বিষয় নাই। অহংতত্ত্বে স্থূল বিষয়—মহৎতত্ত্বে সূক্ষ্ম বিষয়। অহংতত্ত্বের ভাষা ভাসা, মহৎতত্ত্বের ভাষা মগ্নকারী। অহংতত্ত্ব ভাষা বাহ্য ব্যাপার লইয়া, মহৎতত্ত্ব ভাষা আভ্যন্তরিক লইয়া। অহংতত্ত্বে অহং বহির্ম্মুখী, মহৎতত্ত্বে অহং অন্তর্ম্মুখী। বহির্ম্মুখী থাকিয়া অন্তর্ম্মুখী হইতে হইলে মুখ ফিরাইতে হয়। বহির্ম্মুখী অহং মনরূপী, অন্তর্ম্মুখী অহং বুদ্ধিরূপী। অহংতত্ত্ব লইয়া আমরা অভ্যস্ত—সুতরাং মহৎতত্ত্ব আমাদের দুঃসাধ্য বোধহয়। অন্তর্মুখ ও বহির্ম্মুখ—দুইভাব উল্লেখ আছে॥ আকাশ হইতে প্রকাশ দিকে থাকাকে অন্তর্ম্মুখ থাকা বলে, আকাশ হইতে অবকাশ দিকে থাকাকে বহির্ম্মুখ থাকা বলে। যে জীবনমুক্ত অন্তর্ম্মুখ ও বহির্ম্মুখ দুই দেখিতে পান তিনি আকাশে থাকেন।

বিষয় থাকিবে না অথচ থাকাকে আকাশে থাকা বলে। বিষয় হইতে নির্লিপ্ত থাকাকে অভিমান শূন্য থাকা বলে। অভিমান শূন্য না হইলে বিষয় হইতে মুক্ত থাকা যায় না। বিষয় মুক্ত হইয়া আকাশে থাকিলেই প্রকাশ দেখা যায়। প্রকাশ দেখিতে ২ শুদ্ধ প্রকাশ দেখা অভ্যাস হইলে কেবল প্রকাশ হইয়াই থাকে। ইহাই ঈশ্বরভাব। ইহার অন্তর্গত সমস্ত জগৎ। ইহার অতীত ব্রহ্মভাব।

বহির্ম্মুখে থাকিয়াই বিষয় কর্ম্ম করি—অন্তর্ম্মুখ হইলেই সে কর্ম্ম থাকে না। তখন কি থাকে আকাশস্থিত হইয়া দেখিতে হয়, বলিতে গেলে বিষয় দিয়া বলিতে হইবে। বিষয়াতীত বিষয় বিষয় দিয়া বলাই ভুল। সুতরাং গুরুরা আর বলেন না।

যিনি অন্তর্ম্মুখ থাকিয়া প্রকাশ দেখেন বা প্রকাশ থাকেন, তিনিই বহির্ম্মুখ হইয়াই প্রকাশ দেখিতে পান না। বা প্রকাশ হইতে পারেন না। ইহা বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়, ইহা মায়া হেতু, ইহা, অর্থাৎ হয় বোধ হইলে আর মায়া বলি না। সংক্ষেপতঃ দুই মুখে থাকিতে পারিলে না, আশ্চর্য্য না, মায়া বলিয়া বোধহয়, তখন সহজ বা সত্য বোধহয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দুই মুখে থাকিতে হইলে থাকাকে থাকা অভ্যাস করিতে হয়। যাঁহারা আকাশে থাকেন তাঁহারা ইচ্ছায় আকাশে আসিয়া কার্য্য করেন, কিন্তু বিষয় তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। তাঁহারা ইচ্ছায় ক্ষুৎ, পিপাসা রোগাদি অনুভব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন। কারণ উক্ত অনুভূতি বিষয়জনিত

বলিয়া তাঁহারা বিষয়াতীত থাকিয়া উহা ভোগ করেন না। ইচ্ছা হইলে বিষয়ী হইয়া উহা ভোগ করেন। তথাপি উহা বিষয়লিপ্ত ব্যক্তির ভোগের মত নহে। ইঁহাদের মৃত্যু ইচ্ছাধীন—আধার পরিবর্ত্তন মাত্র। এ মৃত্যু যন্ত্রণা বিশিষ্ট বা মোহ জনিত নহে। ইঁহারা চৈতন্যেমানেন। চৈতন্য মরাকে মরা বলে না। ইহারাই কাশী প্রাপ্ত হয়েন।

বাসনা ও ইচ্ছা এক নহে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশদরূপে বলা হয় নাই বলিয়া পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছি।

বাসনা অনাদি, ইহার উদয় অপূর্ব্ব। ইহা স্বরূপ ব্রহ্মের রূপক ভাবের একটী গুণ। প্রকৃতি প্রসবিনী হইয়াও প্রকৃতির অন্তর্গত। কেহ বলেন, মহৎতত্ব হইতে অহংতত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার উদয়। কেহ বলেন, ব্রহ্ম [স্বরূপ] হইতে "পুরুষ প্রকৃতি" প্রকাশের পূর্ব্বে ইহার উদয়। অহংতত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া মহৎতত্ব প্রকাশ মাত্র ইহার লয় হয়।

অতৃপ্ত, অহংকার [চঞ্চল প্রকৃতি অহংকার] বহু রমন সংস্কার হেতু অতৃপ্তি প্রদায়ক বস্তু সমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুখকরী বস্তু নির্ব্বাচনই ভাবী বাসনার কারণ। এই নব বাসনা নূতন বোধ হেতুক উহা আদি বাসনাই, গুণান্তরে নূতন বলিয়া বোধ হয়। বাসনা ব্যতীত যে অহংয়ের বহু রমন হইতে পারে না তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, সুতরাং ভাবি বাসনার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু আদৌ বাসনার উদয় কেবল অহংতত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যতীত আর কি বলা যাইবে। বিশেষতঃ যখন মহতত্ব স্পর্শমাত্র বাসনাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের বহু বাসনা আছে বলিয়া কি রূপে রূপান্তর বাসনার উদয় হইতে না দেওয়া যাইতে পারে তাহা বলিবার জন্য ভাবী বাসনার উদয়হেতু নির্দ্দেশ করিলাম। যদি নব বাসনা উদয় না হয়, তাহা হইলে উপস্থিত কর্ম্মক্ষয়ে নির্ব্বাসনা হইতে পারা যায়। নির্ব্বাসনার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি অভাবে সংস্কার ও ক্ষয় হইতে পারে, সংস্কার ক্ষয় হইলে আবয়িক অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকে না। ইহাই সাধারণ যুক্তি।

প্রকৃতি। যিনি প্রকৃষ্ট রূপে কৃতি।
প্র—প্রকাশ বা উদয় ভাব।
কৃ—কর্ম্ম ও স্থিতিভাব।
তি—লয় ভাব।

অর্থাৎ সত্ব, রজ, তম ভাব লইয়া প্রকৃতি। যখন কোন ভাব থাকে না তখন প্রকৃতিও থাকে না। প্রকৃতির ক্রোড়স্থ থাকিয়া অহংয়ের বিকাশ ও প্রকাশ, প্রকৃতি এড়াইলে অহং স্বয়ং সৎভাব বা স্বরূপ হয়েন।

স্বরূপ ব্রহ্মের সৎ ভাবে প্রকৃতি নাই। চিৎ ভাব হইতে প্রকৃতির উদয়, আনন্দ ভাবে প্রকৃতির প্রকাশ। অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ-ইহাতে প্রকৃতির কার্য্য নাই। ব্রহ্ম চিৎ স্বরূপ—ইহাতে ব্রহ্মের বিকাশ আছে সুতরাং কার্য্য আছে। অতএব প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ—ইহাতে ব্রহ্মের প্রকাশ, সুতরাং কার্য্য ও পূর্ণ, অতএব প্রকৃতির পূর্ণ কার্য্য।

প্রকৃতি পৃথক কেহই নহেন, ব্রহ্মের স্বভাব অর্থাৎ যে ভাবে ব্রহ্ম বিকাশ ও প্রকাশ আছেন তাহাই প্রকৃতি বা প্রকৃতিত্ব। কার্য্য সূত্রে ব্রহ্মই প্রকৃতি।

উল্লিখিত আছে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব প্রকৃতি হইতে উদ্ভব অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি স্থিতি লয়। সৃষ্টি হইতে লয় পর্য্যন্ত প্রকৃতির ক্রিয়া, প্রকৃতির অধিকার। সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা, পালন কর্ত্তা বিষ্ণু ও লয় কর্ত্তা শিব এই হেতুই প্রকৃতি জাত, প্রকৃতির অধিকার। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভাবাপন্ন ব্রহ্মই স্থির প্রকৃতি ভাবাপন্ন, সেই প্রকৃতি ভাবাতীত হইলেই আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব থাকেন না, স্বরূপ ব্রহ্ম হয়েন।

"পুরুষ প্রকৃতি" কথার উল্লেখ আছে। সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী প্রকৃতি কর্ত্তৃক ব্রহ্মের বিকাশ ও প্রকাশ। এই বিকাশ ও প্রকাশ অবস্থায় ব্রহ্মা প্রকৃতির অন্তরস্থিত —অর্থাৎ সৎ স্বরূপে প্রকৃতির মধ্যে আছেন। সেই জন্য কথিত আছে যে প্রকৃতি রূপ পুরীতে যিনি শয়ন করেন তিনিই পুরুষ। পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম বিকাশ ও প্রকাশ ভাবে অবশ্যই প্রকৃতিবাসী।

পুরুষের প্রকাশ নাই, প্রকৃতি কর্ত্তৃক তাঁহার প্রকাশ, অথবা প্রকাশ হইবার জন্য প্রকৃতির গর্ভস্থ অর্থাৎ অন্তরস্থিত। প্রকৃতি ছাড়িয়া পুরুষ থাকিতে পারেন, তখন তিনি সৎ স্বরূপ। পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতির উদয় বা স্থিতি অসম্ভব। প্রকাশ জগতে অর্থাৎ প্রকৃতি রচিত জগতে পুরুষ প্রকৃতি ছাড়া নহেন, প্রকৃতিও পুরুষ ছাড়া নহেন।

এই সিদ্ধান্ত ধরিয়া বৈষ্ণব বলেন রাধা ব্যতীত কৃষ্ণ নহেন, রাধাকে না ধরিয়া কৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। রাধাশক্তি-রুই শক্ত। শক্ত ছাড়িয়া শক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নহে। শক্তিকে শক্ত আপনাতে লীন রাখিতে পারেন, কেননা তিনি সৎ, স্বয়ং স্বরূপ। শক্তি অবলম্বন করিয়া শক্তকে লাভ করিতে লাভ করিতে হয় ইহা শাক্তরাও স্বীকার করেন, কেননা শক্তিরূপিণী দেবীদিগের নাম করণে বুঝা যায় যে তাঁহারা এক একটী শক্তি পৃথক গুণ ও পৃথক ভাবাবলম্বিনী। ব্রহ্মভাব প্রকাশকারী কাহারও নাম নাই। শাক্তেরা এই শক্তির উপাসনা করিয়া শক্তি লাভে শক্তকে লাভ করিবার উপযুক্ত হয়েন।

"পুরুষ প্রকৃতি" অর্থের অপভ্রংশতা রমণীকে প্রকৃতি ভাবিয়া আপনাকে পুরুষ কল্পনায় প্রতীয়মান। রমণী প্রসবিনী বলিয়া উহাকে "প্রকৃতি" নাম দেওয়া যতটুক সঙ্গত, সেই রমণীর গর্ভে আপনি জন্ম গ্রহণ করে, বলিয়া আপনাকে "পুরুষ" মনে করা ততটুকু সঙ্গত নহে। অবশ্য রমণীতে প্রকৃতির একটা গুণ লক্ষিত হয়, রমণীকে "প্রকৃতির ছায়া" বলিতে পারা যায়। কিন্তু "পুরুষ" যেরূপ "প্রকৃতির" গর্ভস্থ। পুরুষ (মনুষ্য) রমণীর সেরূপ গর্ভস্থ হইতে পারে না। দেহধারী পুরুষ দেহধারী রমণী উভয়ই হয় পুরুষ নয় প্রকৃতি। কেননা ব্রহ্মই পুরুষ ও রমণী হইয়াছেন ভাবিলে উভয়ই পুরুষ, আবার উভয়েই ব্রহ্ম (পুরুষ) আছেন অথচ উভয়ই প্রকৃতি দত্ত দেহধারী বলিলে উভয়ই প্রকৃতি। প্রকৃত ব্রহ্ম, প্রকৃতির অধিকারে থাকা পর্য্যন্ত কেহই "পুরুষ" নহেন, কেননা তাহা হইলে যে পুরুষ সৎ স্বয়ং স্বরূপ ভাব, তিনি প্রকৃতির অধিকারে থাকিবেন কেন, থাকিলে তাঁহাকে "সৎ" বলিবে কেন।

আর এক কথা—রমণী ও পুরুষে কায়িক বিভিন্নতা, সংস্কার বা কার্য্য বশতঃ কতক মানসিক বিভিন্নতা, উহা অচির। এই কায়িক আবরণ চ্যুত হইলে উভয়ই ত "অমৃতময় পুরুষ" হয়েন। যতক্ষণ আবরণ ত্যাগ না হইতেছে ততক্ষণ রমণীও যাহা, পুরুষও তাহাই। প্রকৃতি বদ্ধ পুরুষ রমণী "পুরুষ প্রকৃতি" নহে, প্রকৃতি মুক্ত পুরুষ রমণী উভয়ই "পুরুষ" ব্রহ্ম।

সনাতন মথুরায় গিয়া স্ত্রীলোকের মুখ দেখিবেন না সতবার করিয়া বলিয়াছিলেন। মিরাবাই সংবাদ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "পুরুষ এক ব্যতিত নাই, আপনি আবার কোন্ পুরুষ যে স্ত্রীলোকের মুখ দেখিবেন না।"

মিরাবাই ভাবিয়াছিলেন দেহধারী মাত্রই প্রকৃতিস্থ, তিনি নিজে যাহা একজন পুরুষ মানুষও তাহাই। ভেদাভেদ বোধ গন্ধে সনাতন পুরুষ নহেন।

আত্মভাব সমাপ্ত।

শ্রীবামাচরণ বসু।

দক্ষযজ্ঞ রহস্য।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বিশ্বস্রষ্টাগণের যজ্ঞ সভা হইতে দক্ষ মহারাজা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পৃথিবীর সমুদয় পর্ব্বত তাঁহার সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল এবং জগতের সর্ব্বোচ্চ গিরি (হিমালয়) মধ্যে তাঁহার আবাস ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই হিমগিরির একাংশ (কৈলাস) তিনি তাঁহার জামাতা মহাদেবকে দান করিয়াছিলেন। হিমালয়ের যে বিভাগ এক্ষণে সিমলা শৈল নামে আখ্যাত তাহার এক দেশ ইংরাজি ভাষায় বর্ত্তমান কালে Dagshai Hills (ডক্‌ষাই পর্ব্বত) নামে প্রখ্যাত। ডক্‌ষা শব্দ দক্ষ শব্দের রূপান্তর। হিমালয়ের প্রাচীন পাহাড়ী লোকেরাও অদ্যাপি উহাকে ডক্‌ষা পাহাড় কহিয়া থাকে। শ্রীমৎ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্দে, হিমালয় মধ্যে দক্ষ রাজার রাজ্য ও রাজধানীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই হিমগিরিতে যক্ষ রাজারও রাজ্য এবং রাজধানী ছিল; শ্রীভাগবতের উপরি উক্ত স্কন্দে তাহার প্রমাণ আছে। যক্ষ গিরির রাজধানী এক্ষণে Jako Hills (যেকো পর্ব্বত) নামে ইংরাজিতে খ্যাত। যেকো শব্দ যক্ষ শব্দের অপভ্রংশ। যাহা-হউক, দক্ষ রাজা মহাদেবকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বৃহস্পতি যজ্ঞ নামক এক বিরাট যজ্ঞারম্ভ করিলেন। অত্যন্ত গর্ব্বিত দক্ষ রাজা মোহান্ধ হইয়া দেবতা-দিগকে উপেক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমুদয় প্রজাপতি হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠতম বিবেচনা করিয়া কাহারও সম্মান রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। ধ্বংসের পূর্ব্বে মানবের যেরূপ বিকৃত বুদ্ধি, বিকৃত মতি ও নষ্টগতি হইয়া থাকে, দক্ষেরও তাহাই হইল। আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি সকাম ও স্বার্থপরতা পূর্ণ কার্য্য সমূহে মনোনিবেশ করিলেন; অত্যন্ত বৈষয়িক ব্যাপার পরায়ণ হইয়া রিপু সমূহের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক নষ্টবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভি জায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
(গীতা)

যাহাহউক, পরিব্রাজক প্রবর নারদ মুনিকে আহ্বাণ করিয়া দক্ষরাজা কহিলেন "হে মহর্ষে! হে মহানুভব! আমি বৃহস্পতি যজ্ঞ নামে সুপরিচিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের যাবতীয় প্রধান প্রধান পুরুষকে আমার যজ্ঞস্থলে আগমন জন্য নিমন্ত্রণ করুন কিন্তু দেখিবেন যেন আমার জামাতা শিব এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না হয়।" নারদ তাহাই করিলেন; বিদ্বেষী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ দক্ষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু মুনিবর মনে মনে ভাবিলেন "যিনি স্বয়ং যোগীশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর সেই দেবাদিদেব মহাদেব যখন এই যজ্ঞে আমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রিত হইলেন না, তখন নিশ্চয়ই ইহা শিববিহীন যজ্ঞ নামে পণ্য হইবে সুতরাং পরিণামে একটা প্রকৃষ্ট প্রমাদের সম্ভাবনা দেখা যায়।" যাহাহউক ক্রমে দক্ষকন্যা সতী ও মহাদেবের কর্ণকুহরে এই যজ্ঞ সমাচার প্রবেশ করিল, কিন্তু সতী তাঁহার পিতৃভবণে বিরাট যজ্ঞের কথা শ্রবণ করিয়া জন্মভূমি ও পিতৃগৃহ দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত অধীরা হইয়া পড়িলেন। মহাদেব অনেক শান্তনা বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু সতী তাহা শুনিলেন না। অবশেষে শিব কহিলেন "হে শোভনে! তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গী ও সহধর্ম্মিনী ইহা তোমার মুখে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয় তাহাহইলে স্বামীর (আমার) অপমানকে স্ত্রীর (তোমার) অপমান বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। বিশেষতঃ বিনানিমন্ত্রণে কেমনে তুমি ঐ যজ্ঞে যাইতে পার? তোমার সমুদয় আত্মীয়, কুটুম্ব এবং ভগিণিগণ ভর্ত্তাসহ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, কিন্তু তোমার ও আমার নিমন্ত্রণ হয় নাই। দক্ষরাজা ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন। বিনানিমন্ত্রণে বন্ধুর বাটীতে যাওয়া অবৈধ নহে, কিন্তু বন্ধু যদি অবন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন তাহাহইলে সেস্থানেও যাইবার বিধি নাই। শ্বশুর প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত যজ্ঞে বিনানিমন্ত্রণে গমনকরা একেবারেই অধমত্বের ও নির্লজ্জতার পরিচায়ক।" এবম্প্রকার উপদেশ বাক্যেও সতী স্থিরভাব ধারণ করিতে পারিলেন না অবশেষে অত্যন্ত ক্রোধ ও কাতরতা প্রকাশ করিয়া পিতৃস্নেহ বশতঃ অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সতীদেবী পিতৃগৃহে (দক্ষালয়ে) গমন করিলেন। পাঠাকেরা বুঝিয়া লইবেন, যিনি স্বয়ং চৈতন্যের চৈতন্য, প্রাণ ও বুদ্ধির খণি, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অধিষ্ঠাত্রী, সেই ভগবতী-সতীর আবার অস্থিরতা, চঞ্চলতা ও বালসুলভ দোষ কেমনে জন্মিতে পারে? কিন্তু সতীদেবী ভগবতী হইয়াও এক্ষণে নারীরূপে এক রহস্যময়ী লীলায় নিযুক্তা, সুতরাং এস্থলে স্ত্রীচরিত্র দেখাইয়া বুঝাইতেছেন, রমণীগণ স্বভাবতঃ অস্থিরা এবং অবলা।

ভারতবর্ষীয়া রমণীগণ বিশেষতঃ হিন্দুললনা-গণ পিতৃগৃহ যাইবার একবার সুবিধা পাইলে তাহা কোন মতেই পরিহার করিতে প্রস্তুত হয় না। ইঁহারা আদর্শারূপে পতিপরায়ণা হইয়াও পিতৃদেব, জন্মভূমি ও পিত্রালয়কে ভুলিতে পারেন না। যাহাহউক, সতীকে দক্ষালয়ে গমন করিতে দেখিয়া শিব কহিলেন—

"যদি ব্রজিষ্যস্যতিহায় মদ্বচো ভদ্রং ভবত্যা
ন ততো ভবিষ্যতি।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাত্ পরাভবো যদা স
সদ্যো মরণায় কল্পতে॥"

অর্থাৎ হে ভদ্রে! আমার কথা না শুনিয়া যদি তুমি গমন কর তাহাহইলে তোমার কল্যাণ হইবে না। মানী ব্যক্তির অপমান সত্য মরণের সমতুল্য জানিও। "উপরিউক্ত শ্লোকান্তর্গত" অকল্যান হইবে শব্দদ্বয়ের অর্থ দ্বারা বুঝাগেল, সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব পূর্ব্বেই জানিতেন, যজ্ঞক্ষেত্রে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইবে এবং ভগবতী সতী তনুত্যাগ করিয়া এক অপূর্ব্বলীলা সম্পাদন করিবেন। সতীরও কি তাহা অজ্ঞাত ছিল? না। প্রকৃত কথা এই, ইচ্ছাপূর্ব্বক লোক-শিক্ষার জন্য ইঁহারা মানবের ন্যায় সমুদয় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জীবের উদ্ধার জন্য ভগবান রামচন্দ্র রূপে কতকষ্ট স্বীকার এবং কতলীলাই না করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি ভগবানে ক্লেশারোপ সম্ভবপর? ইহা যেমন লীলাচ্ছলে ঐ সমুদয় ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

যাহাহউক, সতীকে দক্ষালয়ে প্রয়াণ করিতে প্রবৃত্তা দেখিয়া শিবানুচরগণ যথা-বিধি বাহণ, ভৃত্য, দ্রব্য প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে দিয়া নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে করিতে তাঁহাকে পিত্রালয়ে পৌছাইয়া দিলেন। যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভগবতী দেখিলেন, ব্রাহ্মণেরা বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক নানাবিধ ক্রিয়ার প্রবৃত্ত হইয়াছেন; পশু-বলি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইতেছে এবং অসংখ্য প্রকার দ্রব্যে ও বহুপ্রকার পুষ্প, তরু, লতা প্রভৃতির শোভায় যজ্ঞস্থল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই সকল দর্শন করিয়া সতী আনন্দানুভব করিলেন বটে কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার সেই আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল; সতীর জনক মহারাজা দক্ষ তাঁহার আগমনে একটি মাত্রও স্নেহসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কন্যার আদর বা অভ্যর্থনা করিলেন না। সতীর মাতা ও ভগিনীগণ তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে নিযুক্ত না হইয়া নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র অলঙ্কার ও আসনাদি প্রদান করিলেন কিন্তু সতী তাহা গ্রহণ করিলেন না। ক্রমে ক্রমে অনু-সন্ধান দ্বারা ভগবতী জানিতে পারিলেন, তাঁহার পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক শিবের ও সতীর অবমাননা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং ইহাও অনুমতি করিয়াছেন যে, শিবকে যেন কোন মতেই যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া সম্মান করা না হয়। ইত্যবসরে এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া শিবানুচরগণ দক্ষের বিনাশ ও যজ্ঞের ধ্বংস সাধন জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে জানিয়া সতীদেবী তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন এবং দক্ষের দেহের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া যাহা করিতে লাগিলেন,

তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ——— "হে পিতঃ! সমগ্র সংসারের যিনি শ্রেষ্ঠতম, যিনি সর্ব্বদা অবিরোধী, যাহার নিকট প্রিয়তা ও অপ্রিয়তা সমতুল্য, যিনি স্বয়ং পরমাত্মা, আপনি সেই পরমেশ্বরের বৈরী হইয়া তাঁহার নিন্দা করিতেছেন। অধম ব্যক্তি-গণ গুণরাশিকে দোষরাশি বলিয়া বিবেচনা করে। আপনি এই জড় দেহকেই বোধহয় আত্মা বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। যাহাহউক পরনিন্দা অসাধুর কর্ম্ম, এইরূপ অসাধুরা সমুচিত ফল প্রাপ্ত হয়। যাঁহার দ্বিঅক্ষর সমাযুক্ত পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া মনুষ্যগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়, যাঁহার শাসন নিয়ম অলঙ্ঘ্য, যিনি পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, হে পিতঃ আপনি সেই কল্যাণকারী শিবের বৈরীতা করিয়া অশিবের (অকল্যাণের) উৎপাদন করিতেছেন।" কন্যার মুখ হইতে দক্ষ এবম্প্রকার বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র উত্তর না দেওয়ায়, সতী পুনরপি যাহা করিতে লাগিলেন তাহা যেমন করুণ রসে পূর্ণ তেমনি শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ। আমি মূল ভাগবত হইতে ভগবতীর বাক্তৃতার এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কর্ণৌপিধায় নিরয়াদ্যদকল্প ঈশেধর্ম্মো-
বিতর্য্যসৃণিভিনৃভিরস্য মানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চে
জ্জিহ্বাম সূনপি ততো বিসৃজেৎ স্বধর্ম্মঃ॥
অতস্তোবোৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়ি-
ষ্যে শিতিকন্ঠ গর্হিণঃ।
জগধস্ত মোহাদ্বিবিশুদ্ধিমংধসো জুগু-
প্সিতস্তৎ হরণং প্রচক্ষতে॥
ন বেদ বাদানমুবর্ত্ততে মতিঃ স্ব এব
লোকেরমতো মহামুনেঃ।
যথা গতির্দেবমনুষ্যয়োঃ পৃথক স্ব এব
ধর্ম্মে ন পরং ক্ষিপেৎস্থিতঃ॥
কর্ম্ম প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তমযতং বেদে বিবি-
চোভয় লিঙ্গমাশ্রিতম।
বিরোধি তদ্যৌগপদৈককর্ত্তরি দ্বয়ং তথা
ব্রহ্মণি কর্ম্ম নচ্ছতি॥
মাবপদব্যং পিতরস্মদাস্থিতা যা অজ্ঞ-
শালাস্থ ন ধূমবৎর্ম্মভিঃ।
তদন্নতৃপ্তৈর সুভৃদ্ভিরোড়িতা অব্যক্ত
লিঙ্গা অবধূত সেবিতাঃ॥
নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো দেহো-
দ্ভবে নালমলং কুজন্মনা।
ব্রীড়া মমাভূত কুজন প্রসঙ্গতস্তজ্জন্ম ধিক
যো মহতা মবদ্যাকৃৎ॥
গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান বৃষধ্বজো দাক্ষা-
য়নী ত্যাহ যদা সুদুর্ম্মনাঃ।
ব্যপেত নর্ম্মস্মিত মাশু তদাহং ব্যুৎস্রক্ষ
এতৎ কুণপং ত্বদং গজম॥
ইত্যাদি। (ভাগবত)

অনুবাদ—ধর্ম্মরক্ষক স্বামীর নিন্দা শ্রবণ করিয়া স্ত্রী যদি নিন্দাকর্ত্তাকে মারিতে বা স্বয়ং মরিতে না পারে তাহাহইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করা সেই স্ত্রীর পক্ষে কর্ত্তব্য। যদি সামর্থ্য থাকে তাহাহইলে সেই নিন্দাকারী অসৎব্যক্তির জিহ্বাচ্ছেদন করা উচিত। ইহাতে সাধ্বী স্ত্রীর পাতিব্রত্য ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা হয়, অতএব হে পিতঃ! আমি আমার এই দেহ আর ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ ইহা তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আপনি নীলকণ্ঠের নিন্দা করিয়াছেন। হে পিতঃ! (মায়ামুগ্ধ) মানবের ধনসম্পত্তি সংসারিক বিষয়েই আবদ্ধ থাকে, কিন্তু আমাদিগের (ভগবানের) ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা-মাত্রেই সমুৎপন্ন হয়, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিরাও এবম্প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে "আমি (দক্ষ) ধনী" এবং "শিব নির্ধন" তোমার এতাদৃশ অভিমান জন্মিবে কেন? হে পিতঃ! হে ব্রহ্মণ! আমার এই দেহে আর প্রয়োজন নাই, ইহার উৎপত্তি অতি মন্দ। আপনি মন্দ ব্যক্তি, আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকাতে আমিও লজ্জিতা হইতেছি। অতএব মহতের অপ্রিয়কারী ব্যক্তি হইতে যে জন্ম, ধিক সে জন্মে! ভগবান শঙ্কর যখনই আমাকে দক্ষনন্দিনী বলিয়া সম্বোধন করেন তখনই আমার স্মরণ হয় যে, আপনার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে। সেইহেতু আমার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠে, অতএব আমি তোমার দেহ হইতে সমদ্ভূত মৃতদেহের ন্যায় এইদেহ পরিত্যাগ করিব। পণ্ডিতেরা কহেন যদি মোহ বশতঃ কোন অশুচি দ্রব্য ভোজন করা যায় তাহাহইলে তাহা বমন করিলেই পুনরায় শুদ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু যাহারা মহতের নিন্দা কর্ণকুহরে মধ্যে প্রবিষ্ট করায় তাহাদের অশুদ্ধতা কিছুতেই দুরীভূত হয় না। এরূপ নিন্দাকারী ও নিন্দা-শ্রবণকারী উভয়েই প্রবৃত্তিমার্গের লোক (সুতরাং দুষ্ট), কিন্তু ঈশ্বরের (শিবের) যতই নিন্দা হউক, তিনি নিষ্ক্রিয় এবং নিন্দার অতীত সুতরাং তাঁহাতে কিছুই স্পর্শ হয় না।

পিতা দক্ষকে দক্ষকন্যা এইরূপ সম্বোধন করিয়া উত্তরাস্যে যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পট্টবস্ত্রে সমস্ত শরীর আচ্ছাদন করিয়া প্রাণ ও আপন বায়ুকে নিরোধ করিলেন। তদনন্তর উদান বায়ুর সহিত ঐ দুই বায়ুকে নাভিচক্র হইতে অল্পে অল্প হৃদয়ে আনিয়া বুদ্ধির সহিত স্থাপন করিলেন, তৎপরে কণ্ঠমার্গ দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর সতীদেবী জগৎগুরু স্বামীর শ্রীচরণ পঙ্কজ চিন্তা করিতে করিতে এবং সমগ্র প্রকৃতিতে কেবল সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে, দেহাভ্যন্তরস্থিত অনল ও অনিলকে রুদ্ধ করিয়া, সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার বদন মণ্ডলে অপূর্ব্ব ঈষৎহাস্য বিরাজ করিতে এবং সমস্ত দেহ অত্যাশ্চর্য্য ব্রহ্ম-তেজে অতুলনীয় শোভা ধারণ করিয়া দর্শকদিগের মনোমধ্যে অদ্ভুতভাবের উৎপাদন করিতে লাগিল। যজ্ঞক্ষেত্রে সমবেত ঋষিগণ কহিতে লাগিলেন "নিষ্ঠুর ও ব্রহ্মঘাতী দক্ষরাজা নিশ্চয়ই ইহলোকে অযশ ও পরলোকে নরকভোগ করিবে। অপমানিতা কন্যার মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যে পিতা তজ্জন্য দুঃখ বা সহানুভূতি বোধ না করে তাহার কখনই কল্যাণ হইতে পারে না।" যাহাহউক, লীলাময়ী দক্ষকন্যা (ভগবতী) প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ তিনি যে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রাগত পুরুষপুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন। পাঠক মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে ভগবতীর সমাধি অবস্থায় যে বিবৃতি দিয়াছি তাহাতে বুঝিতে পারিবেন এবম্প্রকার নাম "ইচ্ছামৃত্যু" অথবা

"যোগসমাধি" সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষেরা এইরূপে ইচ্ছা করিলে পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া দিতে পারেন।

সতীর তনুত্যাগ হইলে পর তাঁহার দেহের ৫১ অংশ পৃথিবীর ৫১ স্থানে পতিত হইয়াছিল; যে যে স্থানে উহা পতিত হইয়াছিল তাহা এক একটি পীঠ নামে প্রখ্যাত; এই সকল পীঠস্থান হিন্দুর তীর্থ মধ্যে গণ্য; কিন্তু মূল শ্রীমদ্ভাগবতের এই পীঠের উল্লেখ অথবা সতীর দেহের অংশ পতন প্রভৃতি কথার উল্লেখ নাই। না থাকুক, ইহা অকাট্য সত্য সুতরাং এ সম্বন্ধে তর্কোত্থাপন অগ্রাহ্য ও অনাবশ্যক। গোলাপ কুসুম শুষ্ক হইয়া গেলেও যেমন তাহার সুগন্ধ তিরোহিত হয় না, মহত্তচেতা মানবের মৃত্যু হইলেও যেমন তাঁহাদের বাক্য, ও কীর্ত্তি সমূহ তাঁহাদের মরণান্তেও পরবর্ত্তী জনগণের কল্যাণ সাধন করে অথবা মাতঙ্গগণ মৃত হইলেও যেমন তাহাদের দন্ত, অস্থি, চর্ম্ম প্রভৃতি বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া বহুবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সতীভগবতীর প্রাণান্তে তাঁহার পবিত্র শরীর (ঐশ্বরিক দেহ) তেমনি মায়ামুগ্ধ মানবের শিক্ষা, দীক্ষা, উদ্ধার ও কল্যাণ কামনায় পৃথিবীর নানাস্থানে পতিত হইয়া নানাশ্রেণীর লোকের পরমোপকার সাধন করিয়াছে এবং করিতে থাকিবে। ইহাই মহতের জীবনের বিশেষত্ব। সুদূর, চীন, সিংহল, হিংলাজ প্রভৃতি দেশেও পীঠস্থান আছে, তথাকার লোকদিগের মধ্যে পীঠস্থানের প্রভাবে বহুপ্রকারে প্রকৃষ্ট কল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

যাহাহউক, সতীর মৃত্যু শ্রবণ করিয়া কৈলাসপতি মহাদেব অতীব ক্রোধে সুদীর্ঘ জটার একাংশ ছিন্ন করিলেন, সেই ছিন্ন জটা হইতে কপালমালী বীরভদ্র নামক মহাবীর্য্যশালী এক মহাবীরের উৎপত্তি হইল। শিব স্বয়ং ভগবান, তিনি সর্ব্বতেজের তেজস্বরূপ। তিনি সর্ব্বশক্তিমান—Nothing is impossible with God—ভগবানের পক্ষে কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে। যিনি Omnipotent (All powerful) সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে যে কোন কারণে যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম এবং যে কোন জীব বা পদার্থের উৎপাদন করিতে সমর্থ; ইহা যদি স্বীকার না কর, তাহাহইলে ঈশ্বরকে Omnipotent সর্ব্ব শক্তিমান কহিবার তোমার অধিকার কোথায় থাকে? যদি সর্ব্বশক্তিমানত্ব গুণ হইতে ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র কর তাহাহইলে তোমার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস বা কল্পনা নিতান্ত ভ্রম পূর্ণ। যাহাহউক, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস ও দক্ষের নাশজন্য সেনাসহ বীরভদ্র প্রেরিত হইলেন এবং এই মহাবীর সেনাধিপতি পদে বরিত হইয়া শিবের (ভগবানের) কৃপায় অতুলনীয় বল প্রাপ্ত হইলেন। এইবারে আরও বুঝাগেল, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশে অচেতন হইতে চেতনের জন্ম হইতে পারে, কারণ তিনিই সর্ব্বপদার্থ ও সর্ব্বজীবের প্রাণ এবং চৈতন্য, আরও বুঝা গেল, ভগবানের কৃপায় যে বীর্য্য, সাহস, উদ্দীপনা ও বল হয় তাহা একেবারে অজেয়। বীরভদ্রের তাহাই হইয়াছিল।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

যাহাহউক, শিবানুচরগণ বীরভদ্রের উপদেশ ও অনুজ্ঞা অনুসারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইল। যজ্ঞস্থলে বহুসংখ্যক প্রাণী নিহত হইয়া গেল এবং যজ্ঞের সমুদয় অট্টালিকা, মূল্যবান দ্রব্য ও বেদী, কুণ্ড, যূপস্থল প্রভৃতি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। বীরাধিকবীর সেনাপতি বীরভদ্র দক্ষরাজার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক দক্ষিণাগ্নিতে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক যজ্ঞধ্বংস করিয়া কৈলাসধামে প্রস্থান করিলেন। দক্ষরাজানুষ্ঠিত বৃহতী সভা এবং বিরাট যজ্ঞের চিহ্নমাত্র রহিল না।

কিয়দ্দিবস মধ্যে ঋত্বিক ও দেবতাগণ ভয় ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মাসমীপে গমন পূর্ব্বক সমুদায় ঘটনা আমুল নিবেদন করিলেন এবং দক্ষসৈন্যের অপমান, পরাজয় ও বহুবিধ পুরুষের দেহশূল, পট্টিশ, নিস্ত্রিংশ, গদা, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হওয়ার কথা বিবৃত করিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পূর্ব্বেই জানিতেন যে, দক্ষযজ্ঞে এই সকল ভয়াবহ ঘটনা ঘটিবে তজ্জন্য তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন নাই। যাহাহউক, সমাগতদিগকে শান্তনা করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন "তোমরা প্রলয়কর্ত্তা মহাদেবের যথেষ্ট অপমান করিয়াছ এবং তোমাদেরই দোষে তাঁহার পত্নী তনুত্যাগ করিয়াছেন। অতএব শিবকে প্রসন্ন করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর দেখি না। শিবকে শান্ত করিতে না পারিলে শান্তি ও সুখের আশা নাই।

অনন্তর কমলযোনি পিতামহ দেবগণকে এই সকল কথা কহিয়া তাঁহাদিগকে এবং পিতৃ ও লোকপালদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবাদিদেব ভগবান শঙ্করের প্রিয় নিবাস কৈলাস পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। সেই মনোমোহন ও চিরপবিত্র গিরিধামে যাহা দৃষ্ট হইল তাহাতে সকলে মহানন্দ উপভোগ করিলেন। মধুময় শ্রীমদ্ভাগবতে কৈলাসের যে টুকু বর্ণনা পাঠ করা যায় এস্থলে সেই সুখপাঠ্য বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এই সুরম্যস্থানে বহুবিধ ঔষধি, তপস্বী, মন্ত্রবিৎ ও যোগসিদ্ধ দেবগণ বাস পবিত্রতা শতসহস্র গুণে বর্দ্ধিত করিতেছেন। কিন্নর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নিরন্তর চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া কৈলাসধামের রমনীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন।

বহুবিধ গৈরিকাদি ধাতুরাগে রঞ্জিত নানাবিধ দ্রুম লতা-গুল্ম সমাচ্ছাদিত, বিবিধ পশুগণে সমাকীর্ণ ও ধাতুময় শৃঙ্গরাজি, শত-শত সুনির্ম্মল প্রস্রবণ এবং অসংখ্য কন্দর প্রিয়তমের সহিত ক্রীড়াসক্ত সিদ্ধকামিনীদিগের অনুরাগ উৎপাদন করিতেছে। কদম্ব কুসুমগন্ধে আনন্দিত ময়ূরগণের কেকারবে, বহুল পুষ্পমদান্ধ মধুপগণের ঝঙ্কারে, কোকিলকুলের সুমিষ্টস্বরে এবং অন্যান্য বহুবিধ বিহঙ্গের নিনাদে সেইস্থান সদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষশাখা বায়ুবলে চালিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে, বোধহয়, যেন কৈলাসপর্ব্বত হস্ত উত্তোলন করিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা পক্ষীদিগকে আহ্বান করিতেছে। মাতঙ্গগণ

ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইছেছে, বোধ হয়, যেন অচলরাজও চলিয়া বেড়াইতেছে। নির্ঝর-সকলের নিরন্তর ঝর ঝর শব্দ শ্রবণে, বোধ হয়, যেন কৈলাস পর্ব্বত কথা কহিতেছে। মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, তাল, শাল, কোবিদার, অর্জ্জুন, চুত, কদম্ব, নীপ, পুন্নাগ, চম্পক, পারুল, অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরুবক, স্বর্ণবর্ণ শত-পত্র, নীর, রেণুক, জাতি, কুটজ, মল্লিকা, মাধবী, পনস, উড়ম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, ভিঙ্গ, ভূর্জ্জ, ওষধি, পুগ, রাজপুগ, জম্বু, খর্জ্জুর, আম্র তরু, পিয়াল, মধুক, ইঙ্গুদ, বেণু বংশ ইত্যাদি বহুবিধ বৃক্ষসকল চতুর্দ্দিকে শোভা বিস্তার করিতেছে। সরসী সকলে বহুল জলচর পক্ষী সকল কুমুদ, কহ্লার (শ্বেতোৎপল) এবং শতত্রের শোভা দর্শনে শব্দ করিতেছে। মৃগ, শাখামৃগ, বরাহ, সিংহ, হস্তী, ভল্লুক, শলাক, গবয় (গোতুল্য পশুবিশেষ), ব্যাঘ্র, রুরু (মৃগ-বিশেষ), মহিষ, কর্ণ, উর্ণ, একপদ, অশ্বমুখ, বৃক এবং কস্তুরীমৃগ ইত্যাদি বিবিধ পশু সকল তথায় বিচরণ করিতেছে। ভবানীর স্নান জন্য পুণ্যতোয়া ভাগরথী ঐ পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। দেবগণ দেবদেব কৈলাসনাথের এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী ভূধর সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতে তাহারা মনোহারিণী অলকানাম্নী কুবেরপুরী ও সৌগন্ধিক বন সন্দর্শন করিলেন। সৌগন্ধিক পদ্ম ঐ সৌগন্ধিক বনেই উৎপন্ন হয়।

নন্দা ও অলকনাম্নী দুইনদী ঐ পুরীর পুরোভাগে প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীহরির চরণকমলের পরাগ সংযোগে ঐ দুই নদীই অতি পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছে। দেব-মহিলাগণ, স্ব স্ব অধিষ্ঠান হইতে অবরোহণ করিয়া ঐ নদীজলে ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং অনুরাগ বশতঃ স্ব স্ব প্রিয়তমের গাত্রে জলসেক করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের স্নান সময়ে গাত্রভ্রষ্ট কুমকুমাদির সংযোগে ঐ নদীজল পীতবর্ণ হয়, সুতরাং হস্তীগণ হস্তিগণ পিপাসা না থাকিলেও ঐ জল পান করে এবং হস্তিনীদিগকে পান করায়। অলকাপুরীর বিলাসিনী সকল স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত বিমানে আরোহণ করিয়া বিচরণ করেন, সুতরাং তৎকালে গগনমণ্ডল তড়িম্মালামণ্ডিত মেঘাবলীযুক্ত বলিয়া অতি সুন্দর প্রতীয়মান হয়। সৌগন্ধিক বনও দেখিতে অতিশয় মনোহর। তাহাতে আবার অভিলাষিত বরপ্রদ বৃক্ষ সকল বহুবিধ পুষ্প, ফল ও পত্রে বিভূষিত হইয়া দর্শকের মনোহরণ করিতেছে। কোকিল ও অন্যান্য বিহঙ্গকুলের সুমধুর কলরবে ভ্রমর-ঝঙ্কার অধিকতর সুশ্রাব্য হইতেছে। বন্য মাতঙ্গগণ হরিচন্দন-বৃক্ষে গাত্রঘর্ষণ করিতেছে এবং পবনদেব তৎসংযোগে সুবাসিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। সেই সুগন্ধি শীতল বায়ুর সংযোগে তত্রত্য কামিনীদিগের চিত্ত মুহুর্ম্মুহুঃ বিকৃত হইতেছে। বনমধ্যে যে সকল বাপী বিরাজিত রহিয়াছে, তাহাদের সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্য-মণি বিনির্ম্মিত এবং তাহাতে প্রফুল্ল পদ্ম-শ্রেণী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, কিন্নরগণ এ সকল জলাশয়ে নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া থাকে।

দেবগণ পূর্ব্বোক্ত অলকাপুরী অতিক্রম করিয়া সৌগন্ধিক-বনশোভা সন্দর্শন করতঃ এমন আনন্দিত ও চমৎকৃত হইলেন যে তাঁহারা এক বাক্যে কহিতে লাগিলেন "ধন্য এই পবিত্রস্থান! ধন্য এই চিরানন্দময় স্থানের অধিবাসীবৃন্দ!! যাঁহারা এই মনোরম, সদাশুদ্ধ ও আনন্দপরিপূর্ণ স্বর্গধামে স্থান প্রাপ্ত হয়েন তাঁহারা শতাধিক ধন্য।" *

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

আনন্দ।

—০—

বজ্র-গম্ভীর স্বরে শ্রুতি ঘোষণা করিতেছেন—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন্। সংসার যাত্রায়—মনুষ্যের ভয় পদে পদে, ধনী বা দরিদ্র, রাজা বা প্রজা, বালক বা বৃদ্ধ, নর বা নারী, কেহই ভয়ের হস্ত হইতে ত্রাণ পান না। সর্ব্বংভুবি ভয়ান্বিতম্, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। জগতে সকল বস্তুই ভয়ান্বিত, কেবল বৈরাগ্যে ভয় নাই।

ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিলে কোন ভয় থাকে না, বৈরাগ্যেও কোন ভয় থাকে না। এই উভয়বিধ বাক্যে কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্মানন্দও বৈরাগ্য একই পদার্থের বিভিন্ন নাম। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে যেমন ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, তেমনি বৈরাগ্য জন্মে। অজ্ঞান হইতেই আমাদের আসক্তি জন্মে। ধনে আশক্তি জন্মিলে, তাহা ক্ষয়ের ভীতি উপস্থিত হয়। কর্ত্তব্যজ্ঞানে ধন সঞ্চয় করিলে ধনের প্রতি আসক্তি জন্মে না। উহা নষ্ট হইবে বলিয়া ভয়ও জন্মে না। আসক্তি নষ্ট করিতে পারিলেই ব্রহ্মানন্দ জন্মে।

কর্ত্তব্যজ্ঞানে সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং বৈরাগ্য হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান উপভোগ করা যায়।

আমরা দুর্ব্বল চিত্ত, সর্ব্বদাই আমরা শোকে দুঃখে অভিভূত থাকি। পূর্ব্ব-কৃত কার্য্য সমূহ ছায়ার ন্যায় আমাদিগের অনুগমন করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই, আমরা আমাদিগের সঞ্চিত কর্ম্মের অধিকারের ধ্বংশ সাধন করিয়া স্বারাজ্যের অধিকার স্থাপন করিতে পারি।

প্রাত্যহ যখন সবিতৃদেব পূর্ব্বগগনে উদিত হয়েন, তখন সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয়ের একটি সুযোগ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ইচ্ছা করিলে প্রতি সূর্য্যোদয়েই আমরা—এক একটি নব জীবন লাভ করিতে পারি। পূর্ব্ব পাপ তাপ সমূহ বিস্মৃতির গর্ভে পাতিত করিয়া নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, নব বলে বলীয়ান হইয়া, আমরা প্রত্যহই আমাদিগের স্ব স্ব কর্ত্তব্য আসক্তি—বিরহিত হইয়া কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে সম্পাদন করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারি। গতস্য শোচনা নাস্তি। পূর্ব্বদিন শত শত অবৈধ কার্য্য করিয়াছিলাম, তজ্জন্য অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। পূর্ব্বদিন যে সমুদয়

* আগামীবারে সমাপ্য।—লেখক।

ক্ষত হইতে রুধির প্রবাহিত হইতেছিল, নিদ্রাদেবীর শান্তিময় স্পর্শে সে সমুদয় ক্ষত আর নাই।

গতস্য শোচনা নাস্তি। অতীত পাপ, অতীত তাপ, অতীত ভ্রম, অতীত প্রমাদ বিস্মৃতির গর্ভে প্রোথিত কর। যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার আর উপায় কি?

কিন্তু অদ্য এখনও আমার আত্মস্বাধীন, পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ যেন আর আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে।

ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে পূর্ব্বগগণের দিক একবার নেত্রপাত কর। অরুণ কিরণে গগণ কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! এ সময় সর্ব্বত্রই শান্তি—কি বাহ্য জগতে, কি অন্তর্জগতে। পূর্ব্বদিনের নানাবিধ প্রাকৃতিক উৎপাত সূর্য্যোদয়েই অন্তর্হিত হইয়াছে। বাহ্য জগতে যেরূপ নূতন সৃষ্টি, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ সূর্য্যোদয়ের সহিত নূতন একটি সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব পাপ তাপ এখন অন্তর্হিত, তাহাদিগকে আর আসিতে দিব না। নবসূর্য্য নব-আকাশ, নবপৃথিবী, নবদেহ, নবমন লইয়া আমি আমার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। হে জীব! আর ভয় নাই। ঐ শুন পশু-পক্ষী বৃক্ষ-লতা, নদী-পর্ব্বত, সমুদ্র-সরোবর, সকলেই এ সময় আনন্দ ধ্বনি করিতেছে। তুমিও পাপভার, দুঃখভার ফেলিয়া দিয়া উহাদের সহিত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর। হে জীব আশ্বস্ত হও, দুশ্চিন্তা পরিহার কর, বিগত দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া যাও, হৃদয় মন নূতন বলে বলীয়ান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর। হে জীব তোমার ক্ষুদ্রত্ব বিস্মৃত হও। বিশ্ব নিয়ন্তা অসীম ভূমার সহিত তোমার একত্ব অনুভব কর, দুঃখ বা ভয় তোমার নিকট কখনও উপস্থিত হইবে না। ঐ শুন প্রকৃতি চারিদিক হইতে ঘোষণা করিতেছে যে "তুমি অমৃতের পুত্র"। ঐ শুন স্বর্গ হইতে দেবতারা সমস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, "তুমি অমৃতের পুত্র"। একবার বাহ্য জগৎ হইতে চক্ষু উঠাইয়া অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কর্ণদ্বারা একবার অন্তর্জগতের ধ্বনি শ্রবণ কর, তাহাহইলে দেখিতে পাইবে এবং শুনিতে পাইবে এবং বুঝিতে পারিবে যে তুমি একটি ক্লিষ্ট বা ভীত দেহ নও, তুমি অমৃতের সন্তান। এই পবিত্র মুহূর্ত্তে সবিতৃ মধ্যবর্ত্তী সেই হিরন্ময় পুরুষের একবার ধ্যান কর। এবং অন্তরে এবং বাহিরে বল ওঁ ভূ র্ভুবস্ব তৎসবিতু র্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়োয়োনো প্রচোদয়াৎ, অমনি বুঝিবে যে তুমি পৃথিবীর একটি ক্লিষ্টভীত জীব নহে, তুমি অমৃতের পুত্র, স্বর্গের দেবতা।

জগতে আমরা ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু অভ্যন্তরস্থ সার পদার্থের প্রতি একেবারেই দৃষ্টিপাত করি না। তুমি হিন্দুই হও, মুসলমানই হও, আর খ্রীষ্টিয়ানই হও, বা বৌদ্ধই হও, যদি সত্য প্রেম শান্তি এবং জ্ঞান তোমাতে পরিদৃষ্ট না হয় তাহাহইলে তুমি বুঝিবে যে তুমি ঈশ্বর হইতে বহুদূরে। তুমি ধনী হইতে পার, পণ্ডিত হইতে পার, কিন্তু মনে রাখিও, যদি তুমি জীবনে আনন্দ উপভোগ করিতে না পার, যদি সর্ব্বদাই তুমি ভীত, দুঃখিত বা চিন্তিত থাক তাহাহইলে তুমি ঈশ্বর হইতে বহুদূরে। ঈশ্বরই প্রেম, ঈশ্বরই শান্তি, ঈশ্বরই সত্য এবং যে পর্য্যন্ত তুমি

তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত ধন, জন বা গৌরব, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা কিছুতেই তোমাকে শান্তি দিতে পারিবে না; সে পর্য্যন্ত তুমি ক্রীটভীত জীব মাত্র থাকিবে। তাহাকে আল্লাই বল, ব্রহ্মই বল, জিহোভাই বল, মসজিদেই যাও, মন্দিরেই যাও বা গির্জ্জায় যাও এবং সাম্প্রদায়িক নিয়ম সমুদায় যতই প্রতিপালন কর, যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে তাহাকে অনুভব করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে না। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ রহিয়াছে। দৈনিক জীবনের সহিত ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। ইহকালের সহিত ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। যাহাদিগের দৈনিক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই তাহাদিগের ধর্ম্ম কেবল নাম মাত্র। সুখে বা দুঃখে যাহারা আনন্দ অনুভব করিতে না পারে, তাহারা ঈশ্বর হইতে বহুদূরে। আনন্দই ধর্ম্ম জীবনের পরিচায়ক, বাক্যে ব্যবহারে আকৃতিতেই এই আনন্দ পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। যেখানে আনন্দ সেই খানেই ব্রহ্মজ্ঞান। বহুকাল পরে শিষ্য গুরুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যকে দেখিবা মাত্র গুরু বলিলেন তোমাকে ব্রহ্মবিদের ন্যায় দেখাইতেছে। গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখান নাই অথচ শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে। কোথা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আসিল? প্রকৃতির সংস্পর্শে। চক্ষু কর্ণ রুদ্ধ করিও না প্রকৃতির রূপমাধুরী দর্শন কর, প্রকৃতির বীণাঝঙ্কার শ্রবণ কর, দেখিবে আকাশের প্রত্যেক নক্ষত্র, পৃথিবীর প্রত্যেক পুষ্প তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবে। হে জীব, সূর্য্যোদয়ে এবং সূর্য্যাস্তে ভক্তিভাবে সবিতৃদেবের আরাধনা কর। হৃদয়ে তৎকালীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অঙ্কিত কর, দেখিবে তুমি এই জড়জগৎ হইতে ক্রমে উৰ্দ্ধদিকে আরোহণ করিয়া অধ্যাত্ম জগতে যাইতেছ। বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া কত মধুর তান ছাড়িতেছে তোমার হৃদয়ে আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যাইতেছে। তুমি আনন্দে ভাসমান হইয়া অমৃতরাজ্যে চলিয়া যাইতেছ, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, গন্ধবহ তাহাদের সুগন্ধের সহিত নাসিকাদ্বার দিয়া তোমার হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানে আমোদিত করিতেছে। চন্দ্রমাও নক্ষত্রাবলী প্রত্যেক কিরণের সহিত তোমার হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত করিতেছে। কি নীলনভোমণ্ডল, কি নীল জলধি, কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র নিচয়, কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অম্বুবিম্ব সকলেই তোমার ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষক। একবার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর, কি নগর, কি প্রান্তর, কি নদী, কি পর্ব্বত, কি সাগর, কি সরোবর, কি রাজপ্রসাদ কি দরিদ্রকুটির, কোনস্থানেই ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষকের অভাব নাই। এক একটি বৃক্ষপত্র মাত্র চিন্তা করিলে যে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায়, তাহাহইতে জীব কেন বঞ্চিত থাকে। হে জীব কান্দিও না, চক্ষু মুছিয়া ফেল। ঐ শশ্মানে যে প্রিয়তমকে ভস্ম করিয়া আসিলে উহা শুক্তিকামাত্র। উহার অভ্যন্তরস্থ মুক্তা বহির্গত হইয়াছে। শুক্তিকা কিছুই নহে, তুমি মুক্তাভ্রমে উহার জন্য এত কান্দিতেছ। হে জীব তুমি কি

দেহমাত্র না তুমি আত্মা। যতক্ষণ তুমি তোমাকে দেহমাত্র জ্ঞান কর, ততক্ষণ তোমার শোক ও পরিতাপ। তুমি দেহ নহ, তুমি আত্মা, আর তোমার সহিত তুমি অসীমাত্মার একত্ব অনুভব করিতে পারিলে জাগতিক কোন দুঃখই তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

যে দিকে যাও সেইদিকে দুঃখ, ব্যাধি দারিদ্র মৃত্যু সর্ব্বদাই জীবকে ভীত ও ক্লিষ্ট করিয়া রাখিতেছে। মানব তাহাদিগের নিবারণের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, কিন্তু বৃক্ষের মূলে জলশেচন না করিয়া কেবল পত্রাদিতে জলসেচন করিলে যে ফল হয়, মানবেরও সেই ফল হইতেছে। তুমি রোগাক্রান্ত, কিন্তু তোমার রোগ কোথায়, শরীরে না মনে? মনে রোগ না হইলে কখনও শরীরে রোগ হইতে পারে। শরীরে জ্বর হইবার পূর্ব্বে মনে জ্বর চাই। স্বাস্থ্যের মূল আধার কোথায়? জগতের সর্ব্বমঙ্গলের আধার এক, সেই আধারের সহিত যেই বিচ্ছিন্ন হইলে অমনি রোগ শোকে দারিদ্র তোমাকে আক্রমণ করিল।

আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে সর্ব্বমঙ্গলের মূলাধার বিশ্বনিয়ন্তার সহিত তোমার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। বল, স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা সকলেরই আধার এক। সেই আধারের সহিত একত্ব সংস্থাপিত করিতে পারিলেই তুমি সর্ব্ববিষয়েরই অধিকারী হইতে পার নতুবৎ নহে। তুমি যদি দুর্ব্বল, ভীত বা ক্লিষ্ট হও এবং তোমার জীবন যদি তোমার নিকট দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয় তাহা-হইলে এই পবিত্র মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞাকর নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য করিবে না। প্রতিজ্ঞাকর নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য করিবে না। প্রতিজ্ঞাকর যে জগতের মঙ্গলার্থে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করিবে বাহ্যজগৎ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহ টানিয়া লও, হৃদয় প্রাণ অসীমাত্মার দিকে ফেলিয়া দাও তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে যে তুমি দেহ নহে তুমি আত্মা। আত্মা কি কখনও রোগশোকগ্রস্ত হইতে পারে? শরীর ও মনকে অসীমাত্মস্রোতে ভাসাইয়া দাও, দেখিবে তোমার দেহ মন দুই পবিত্র হইয়াছে। মানুষ যেমনটি হইতে ইচ্ছা করে তেমনটি হয়। পশুত্ব, ও দেবত্ব উভয়েই আয়াত্তাধীন। "সোহহম্" সর্ব্বদা ধ্যান কর, ব্যবহারিক জগতের কোন কার্য্যের দ্বারাই তোমাকে বিচলিত করিতে দিও না।

তুমি তোমার দেহের অধীশ্বর। দেহ তোমার অধীশ্বর নহে। ব্যবহারিক জগৎ তোমার অধীন, তুমি ব্যবহারিক জগতের অধীন নহে। তুমি স্বরাট, মোহান্ধ হইয়া তুমি তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া নিরানন্দে কালযাপন করিতেছ, এবং পদে পদে ভীত ক্লিষ্ট হইতেছ। একবার ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ কর, ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব কর, তোমার দুঃখ কষ্ট থাকিবেনা, কিছুই তোমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"।

আমিত্বের প্রসার।

সংসারে দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর লোক বিশ্বকে মঙ্গলময়, অপর শ্রেণীর লোক উহাকে অমঙ্গলময় দৃষ্টি করিয়া থাকেন। একশ্রেণীকে মঙ্গল বাদী ও অপর শ্রেণীকে অমঙ্গলবাদী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

মঙ্গল-বাদ অমঙ্গল-বাদের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও উভয় বাদের মধ্যে সত্য নিহিত রহিয়াছে। যিনি বিশ্ব মঙ্গলময় দেখিতে কৃতসঙ্কল্প, তিনি উহাকে মঙ্গলময়, অন্যপক্ষে যিনি উহাকে অমঙ্গলময় দেখিতে ইচ্ছুক, তিনি উহাকে অমঙ্গলময়ই দেখিয়া থাকেন।

আমিত্বের সঙ্কোচ হেতু বিশ্ব অমঙ্গলময় এবং উহার প্রসার হেতু মঙ্গলময় হয়।

আমিত্বের সঙ্কোচ বা প্রসার মানবের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিশ্ব যে আমার পক্ষে মঙ্গলময় বা অমঙ্গলময় হইবে, তাহা আমার ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে।

আমি চক্ষুদ্বয় মুদিত করিলাম, কিছুই দেখিতে পাই না। চক্ষু উন্মিলন করিলাম, অন্ধকার অন্তর্হিত হইল। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইয়া কি বলিতে পারি? "বিধাতঃ তোমার কি অবিচার, আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না"।

জগতে যে অমঙ্গল নাই তাহা নহে, কিন্তু উহা আমাদের সৃষ্টি। আমরা চক্ষু মুদিত করিয়া আমিত্ব সঙ্কুচিত করিয়া—অমঙ্গল ভোগ করি এবং অকারণে বিধাতার নিন্দা করি যাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, আমিত্বের প্রসার হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বত্র মঙ্গলই দেখিয়া থাকেন। যে স্থান নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময়, তাহাকেই আমরা স্বর্গ এবং যে স্থান নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলময় তাহাকেই আমরা নরক বলিয়া থাকি। স্বর্গ ও নরক, দুই আমার হস্তে। আমি ইচ্ছা করিলে স্বর্গ বা নরক রূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে পরি।

তুমি বা আমি আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে স্বর্গ বা নরক সৃজন করিতেছি। স্বর্গ বা নরক, শান্তি বা অশান্তি, মঙ্গল বা অমঙ্গল ইহাদের মধ্যে আমরা যেটি চাই, সেইটিই পাইতে পারি।

বিশ্বের মূল মন্ত্র দ্বারা স্বীয় স্বীয় জীবন নিয়মিত করিতে পারিলেই, আমিত্বের প্রসার হয়, সর্ব্বত্র কুশল পরিদৃষ্ট হয়। বিশ্বের মূল মন্ত্রের সহিত স্বীয় স্বীয় জীবনের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত না করিতে পারিলেই, আমরা অমঙ্গলভাগী হইয়া সর্ব্বত্র অমঙ্গল পরিদর্শন করি।

সূর্য্যকিরণে জগৎ আলোকিত, কিন্তু আমি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া সূর্য্যালোক হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া—চিরকালই অন্ধকারে থাকিয়া যাইতে পারি। সূর্য্য আছেন, তিনি আলোক দিতেছেন, কাহারও সেই আলোক হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না, দ্বার খুলিলেই আলোক পাইব, মনেরমধ্যে এইরূপ স্থির ধারণা থাকিলে, দ্বার খুলিবার প্রবৃত্তি হয়, এবং তৎপর ঐ প্রবৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিয়া দ্বার খুলিয়া সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সৌর জগতের কেন্দ্রে সূর্য্য থাকিয়া সমস্ত গ্রহাদির উপর আধিপত্য করিতেছেন, কিন্তু এই বিশ্বের কেন্দ্রে যে এক অসীম শক্তিসম্পন্ন পুরুষ রহিয়াছেন, যাহার আদেশে অনন্ত সূর্য্য অনন্ত সৌর জগতে আধিপত্য করিতেছে, আমরা কি সেই অসীম পুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি? যে অসীম শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ভূমি, জল, অগ্নি অন্তরীক্ষ বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদিতে বাস করিতেছেন, ভূমি, জল, অগ্নি অন্তরীক্ষাদি যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ভূমি জলাদি যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, যিনি জলাদির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই অন্তর্যামি, অমৃত পুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা কি কোন প্রযত্ন করিয়া থাকি। (১)

(ক্রমশঃ)

জাতক বা বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত।

খৃষ্ট ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমার তিথিতে ভগবান গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। * এই ঘটনার তিনমাস পরে রাজা অজাতশত্রুর শাসন সময়ে মগধের রাজধানী রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহা সমীপে বুদ্ধ শিষ্য মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় ৫০০ অর্হৎ (পূজনীয় পুরুষ) উপস্থিত ছিলেন। আনন্দ, উপালি ও মহাকাশ্যপ বুদ্ধবচন সমূহ আবৃত্তি করেন। ইহারপর কালাশোকের (৪৪৩) ও ধর্ম্মাশোকের (২৫১) রাজত্বকালে ধর্ম্মাশোকের মীমাংসার্থ আরও দুইটি সভায় অধিবেশন হয়।

বুদ্ধবচন তিন ভাগে বিভক্ত—বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম। এই তিনটিকে পিটক বলে। বিনয় পিটক ভিক্ষুগণের বাহ্য ও সামাজিক আচার ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত, পাপখ্যাপন ও বিবাদমীমাংসা প্রণালী আদি লিখিত আছে। সূত্র পিটকে বুদ্ধদেব যে যে স্থানে যে সমস্ত ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সেই সকল স্থানের উল্লেখ ও সেই সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অভিধর্ম্ম পিটকে, মনস্তত্ব, জগতের কার্য্যকারণ, জীবের ভিন্ন ২ অবস্থা জীবের স্বভাবাদি সংগৃহীত হইয়াছে। কথিত আছে উপালি, আনন্দ ও মহাকাশ্যপ যথাক্রমে বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্মের আবৃত্তি করিয়াছিলেন। †

সূত্রপিটক পাঁচভাগে বিভক্ত। দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, ও ক্ষুদ্রকনিকায়। ক্ষুদ্র ২ সূত্র সূত্র আছে বলিয়া পঞ্চম নিকায়ের নাম

(১) যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী নবেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ। বৃহদারণ্যক শ্রুতি।

* নানাবিধ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া আধুনিক প্রত্নবিদ স্থির করিয়াছেন যে খৃঃ পূর্ব্ব ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন।

† অনেকে বলেন যে অভিধর্ম্ম পিটক, বিনয় ও সূত্রপিটকের বহুদিন পরে সংগৃহীত হইয়াছে।

ক্ষুদ্র নিকায় হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র নিকায়ে খুদ্দক, ধর্ম্মপদ, উদান, ইতিবৃত্তক, সুত্ত-নিপাত জাতক আদি ৫ খানি পুস্তক আছে। অদ্য আমরা জাতক সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

বুদ্ধদেব যখন কোন উপদেশ দিতেন তখন তিনি, উপমা দৃষ্টান্ত গল্পাদি দ্বারা সেই উপদেশ সাধারণের অনায়াস বোধ্য করিয়া দিতেন। লিখিত আছে যে তাহার অনেকগুলি বুদ্ধের নিজেরই পূর্ব্ব ২ জীবন বৃত্তান্ত। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে গৌতম সিদ্ধার্থ পূর্ব্ব জন্মে কত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষমা, অধিষ্ঠান (দৃঢ় সংকল্প) সত্য, মৈত্রী ও উপেক্ষা এই যে দশপারমিতার অনুষ্ঠান ও আচরণ করিয়াছিলেন তাহা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই সুবিপুল জাতকগ্রন্থে বুদ্ধের ৫৫০ টি পূর্ব্ব জীবনী লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বাবিংশ নিপাতে বা খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমখণ্ডে ১৪০টি জাতক আছে ও প্রতি জাতকে একটি করিয়া শ্লোক আছে। দ্বিতীয়খণ্ডে ১০০ জাতক ও প্রতিজাতকে দুইটি করিয়া শ্লোক আছে এইরূপে এক বিংশতি খণ্ডে কেবল পাঁচটি মাত্র জাতক ও প্রত্যেক জাতকে ৮০টি করিয়া শ্লোক আছে এবং দ্বাবিংশখণ্ডে ১০টি জাতক ও পূর্ব্বখণ্ড অপেক্ষা অধিকতর শ্লোকে এই সকল জাতক পূর্ণ হইয়াছে। প্রতি জাতকের পূর্ব্বে কোন একটি ঘটনা অনুক্রমণিকা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বুদ্ধদেব ঐ ঘটনা অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান ছলে জাতকগল্প বলিতেন এইরূপ লিখিত আছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্মপদ, সুত্ত-নিপাত, জাতকাদিগ্রন্থ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের অল্পদিনের মধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছিল। সাঞ্চি অমরাবতী, ভরহুত * স্তূপে এই সকল জাতক দৃশ্য খোদিত হইয়াছিল। খোদিত কালের বহুপূর্ব্বে যে গল্পগুলি প্রচলিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুত্তপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ে জাতকের নাম উল্লিখিত আছে। পুরাতন বিনয় পিটকেও জাতক গল্প বর্ণিত আছে। খৃঃ ৪০০ অব্দে ফা হিয়ান নামক চৈন পরিব্রাজক সিংহল দ্বীপের অভয়গিরিতে বোধিসত্ত্বের (যিনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যত্নশীল বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে শাক্যমুনি এই পদবীতে আখ্যাত হইয়াছেন) ৫০০ শত খোদিত জাতকমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে। সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক, সুমঙ্গল বিলাসিনী আদি গ্রন্থেও জাতকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

খৃষ্ট পূর্ব্বে ৫৪৩ অব্দে প্রথম বোধিসঙ্গম জাতকগল্প বর্ত্তমান ছিল বটে কিন্তু কেহ কেহ বলেন পরবর্ত্তি সময়ে অনেক নূতন গল্প রচিত হইয়া জাতকগ্রন্থের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। পালিভাষা বিৎ পাশ্চত্যদেশীয় কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে "জাতকগল্পগুলি যে পুরাতন এবং সাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধদেব সেই সকল গল্প ব্যবহার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু

* মেজর কানিংহাম দক্ষিণভারতের ভরুৎ নামস্থানে এই স্তূপ আবিষ্কার করেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজা অশোকের রাজত্বকালে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অনেকগুলি গল্প তৎকালে প্রচলিত ছিল এবং পরবর্ত্তী ভিক্ষুগণও অনেক নূতন গল্প রচনা করিয়াছেন। সেই গল্প গুলি যে বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত তাহা নহে। পরবর্ত্তী অনুরাগীগণ কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবকে ঐ সকল নীতিপূর্ণ গল্পের নায়ক বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রতি জাতকে যে শ্লোক আছে তাহাতে বুদ্ধ যে ঐ গল্পের নায়ক তাহার কোন উল্লেখ নাই। গদ্যে লিখিত বিস্তৃত গল্পেই উহার উল্লেখ আছে। জাতক গল্পে যে সকল শ্লোক আছে উহাই পুরাতন; যেমন "নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ" এই ক্ষুদ্র সাংখ্যসূত্রেই পিঙ্গলার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ ঐ সকল শ্লোকেই জাতকগল্প বুঝা যাইত এবং ঐ শ্লোকগুলি মুখে ২ চলিয়া আসিতেছিল। পরবর্ত্তী ভাষ্যেকেরা শ্লোকের গল্পগুলি বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।" এমত সত্ত্বেও জাতক গল্প যে বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল তাহা খণ্ডিত হইতেছে না।

এই জাতক গ্রন্থই যে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও পাশ্চত্য ঈশপস্ ফেবেলের মূল প্রস্রবণ তাহা পাশ্চ্যাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার পর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতেই যে গল্পগুলি রূপান্তরিত হইয়া পাশ্চাত্য দেশে পরিগৃহীত হইয়াছে তদ্বিষয়ে Prof Rhys Davids আদি পাশ্চত্য মনীষীবর্গ নিজ ২ পুস্তকে বহু প্রমাণ দিয়াছেন। আমাদের দেশের পালিভাষা বিশারদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ মহোদয় 'বুদ্ধদেব' নামক স্বীয় পুস্তকে এই বিষয়ে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন*

শ্রীমণ্য ফলসূত্রে লিখিত আছে যে এই অন্ধকারাবৃত সংসারে বহুদিন পরে মধ্যে ২ এক একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়া থাকে] এই সংসার যে অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্ম তাহা তিনি প্রত্যক্ষরূপে অবগত হন। সাধারণ মানবের মুখের মাথার মত বুঝা নহে। তিনি ইহা পূর্ণরূপে বুঝিয়া এই সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ করেন ও সেই উপায় অবগত হইয়া সেই মার্গে সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হন। পরে করুণা হেতু অপরের নিকট তন্ন তন্ন রূপে সেই ধর্ম্ম প্রচার করেন, স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করেন, বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন ও লোকের হৃদয়ে সেই ধর্ম্ম দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেন। চক্ষুষ্মানগণ সেই ধর্ম্ম (সম্যক্ তত্ত্ব) অবগত হইয়াও সেই মহিমাময় বুদ্ধের বিমল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মুক্তি পথে অগ্রসর হন। ভগবান শাক্য সিংহের (গৌতম বুদ্ধের) পূর্ব্বেও অনেক বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং ভবিষ্যতে আরও কত বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিবেন। অধুনা যে কাল অতিবাহিত হইতেছে বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই সময়কে মহাভদ্র কল্প বলে। এক কল্পের পর আর এক কল্প আসে।*

---

* ডেনমার্কের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফস্‌বোল মূল পালি জাতক টীকাদি সহ সম্পাদন করিয়াছেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাউএল সাহেব অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে উহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পঞ্চ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন।

* "ভিক্ষুগণ! যদি কোন ব্যক্তি এক যোজন দীর্ঘ, এক যোজন প্রস্থ ও এক যোজন উচ্চ, সর্ব্বপ্রকার ছিদ্র গহ্বরাদি বিহীন একটি পর্ব্বত শতবৎসর অন্তরে

বর্ত্তমান কল্পে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ ও শাক্যমুনি (গৌতমবুদ্ধ) অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অনাদি ও অনন্ত সংসারে ইঁহাদের পূর্ব্বে কত বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও পরে করিবেন তাহার ইয়ত্তা করা মানবের সাধ্যাতীত।

বহুকাল পূর্ব্বে এক সময়ে এক ব্যক্তি পৃথিবীতে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় কাল যাপন করিতেন। তাঁহার একমাত্র বিধবা মাতা ছিলেন। এক সময়ে তিনি অর্থোপার্জ্জন-আশায় সমুদ্র পারবর্ত্তী অপর কোন দেশে যাইবার জন্য নাবিকদিগকে বলিলেন "ভাই তোমাদিগকে এই কয়েকটি মুদ্রা দিতেছি তাহা লইয়া আমাকে ও আমার বৃদ্ধা মাতাকে জলযানে করিয়া পর পারবর্ত্তী দেশে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। নাবিকগণ তাঁহার কথানুযায়ী তাঁহাদিগকে জলযানে উঠাইয়া লইয়া গমন করিতে লাগিল; কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতে ঘোর ঝটিকায় সেই অর্ণবযান জলমগ্ন হইল। সেই অকূল পাথারে বিপদগ্রস্থ হইলেও, ভীত না হইয়া এবং নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কিসে বৃদ্ধা মাতাকে রক্ষা করিতে পারিবেন তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমুদ্র সন্তরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রকার দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা দেখিয়া সেই কল্পের ব্রহ্মা ‡ তাঁহাকে বুদ্ধত্বে মনোনীত করিলেন। ভাবিলেন এই ব্যক্তিই বুদ্ধত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারী। এই ব্যক্তিই পরে শাক্যসিংহ বা গৌতম বুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

তৎপরে কত কাল অতীত হইয়া গেল। কত বুদ্ধের আবির্ভাব হইল। তিনি ধীরে ধীরে আপনার কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৃষ্ণাঙ্কর-বুদ্ধের নিকট তিনি অনিশ্চিত আশ্বাসও পাইলেন। কিন্তু দীপাঙ্কর বুদ্ধের নিকট তিনি নিয়ত বিবরণ (ধ্রুব আশ্বাস) পাইলেন যে, কাল ক্রমে তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। এই সময়ে তিনি সুমেধ-ব্রাহ্মণ রূপে অমর নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। সৎকর্ম্ম প্রভাবে অষ্টবিষয় লাভ হইলে বুদ্ধত্বের আশা করা যায়; সেই অষ্ট এই—

১। মানব দেহ। ২। পুরুষ শরীর। ৩। কায়মনোবাক্য শুদ্ধি। ৪। শাস্ত্রজ্ঞতা। ৫। প্রব্রজ্যা। ৬। ধর্ম্মে শ্রদ্ধা। ৭। দৃঢ় সংকল্প। ৮। বীর্য্য বা উৎসাহ।

এই অষ্টগুণ যুক্ত সুমেধ-ব্রাহ্মণকে দীপাঙ্কর-বুদ্ধ বলিলেন যে, তুমি দশ পারমিতা সিদ্ধ হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিবে। সেই দশ পারমিতা এই:—

১। দান। ২। শীল (অহিংসাদি; কায়মনোবাক্যের সংযম) ৩। নৈষ্কম্য

রেশমীবস্ত্রে এক একবার ঘর্ষণ করে, তাহা হইলে একটি কল্পের শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঐ পর্ব্বত ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় হইয়া যাইবে। (সমুক্ত নিকায় ১৫।৫)"। কল্পের সময়-পরিমাণ প্রায় অপরিমেয়।

‡ জীবগণই নিজের সদাচরণ, ধ্যানাদি প্রভাবে ব্রহ্মারূপে কোন ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মলোকে বিরাজ করেন।

অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ (২।৬,১০)

(ত্যাগ বা প্রব্রজ্যা) ৪। প্রজ্ঞা (ধীশক্তি বিচারশক্তি) ৫। বীর্য্য (নির্ভীকতা বা উৎসাহ) ৬। ক্ষমা (বা ধৈর্য্য) ৭। সত্য (ও সরলতা) ৮। অধিষ্ঠান (অবিচলিত সংকল্প) ৯। মৈত্রী ১০। উপেক্ষা।

তৎপরে কত কাল অতীত হইয়া গেল। এই সময় মধ্যে বোধিসত্ব (ভাবী বুদ্ধ, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছেন) কতবার সন্ন্যাসী, রাজা, রাজমন্ত্রী, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, যুবরাজ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, অন্ত্যজ, সিংহ, মৃগ, হস্তী, হংস, ভৃত্যাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতকে কেবল ৫৫০টি জন্ম বিবরণ আছে। কিন্তু তিনি কতবার যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলা দুরূহ। তিনি প্রতি জন্মেই কোন না কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। জাতকগ্রন্থ ব্যতীত ক্ষুদ্রক-নিকায়ের অন্তর্গত চরিয়াপিটকেও এই সকল পারমিতানুষ্ঠানের বিষয় লিখিত আছে।

তিনি অকিত্তি ব্রাহ্মণ, সংখ ব্রাহ্মণ, মহারাজ ধনঞ্জয়, নিমি রাজা, বেস্‌সন্তর রাজা শিবিরাজা প্রভৃতি জন্মে দান পারমিতার অনুষ্ঠান করেন কিন্তু শশক জন্মে যখন নিজ শরীর ও জীবন দান করেন তখন দানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সীলব হস্তী, চম্পেয় সর্পরাজ, রাজা ভূরিদত্ত রাজকুমার অলীনসত্তু আদিরূপে শীলের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু সংখপালজাতকে ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাঁহাকে অস্ত্র দ্বারা খণ্ড ২ করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও তিনি শত্রুগণের উপর ক্রুদ্ধ হন নাই। তাহাদিগকে প্রশান্ত চিত্তে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কুমার সোমনস্‌স, কুমার হট্‌ঠিপাল পণ্ডিত অয়োঘর প্রভৃতি জন্মে নৈষ্ক্রম্যের আচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু চুল্ল সুতসোম জন্মে প্রব্রজ্যার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তিনি প্রাপ্ত রাজ্যকে নিষ্ঠীবন ত্যাগের ন্যায় পরিবর্জ্জন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ বিদুর, মহাগোবিন্দ-আদিজন্মে প্রজ্ঞা সাধন করিয়া সেনকপণ্ডিত-জন্মে উহার বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়া ছিলেন। ভীষণ বিপদে দিকহারা না হইয়া মহাজনক জন্মে বীর্য্যের ও সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ছিলেন। ক্ষান্তিবাদ-জন্মে কাশীরাজের বারংবার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া, রাজাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। মহাসুতসোম জন্মে সত্যপালনের জন্য একশত যোদ্ধাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া তিনি নিজ প্রাণ প্রদান করেন। মুগপক্‌খ জন্মে তিনি অধিষ্ঠান (দৃঢ় সংকল্প) পারমিতার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একরাজ জন্মে ও সোমহংস জন্মে যথাক্রমে মৈত্রী ও উপেক্ষা (সর্ব্বাবস্থায় সমভাবের) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপে পারমিতা সমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তিনি বেস্‌সন্তর জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা বেস্সন্তর জন্মে তিনি স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য সমস্তই দান করিয়াছিলেন। তাঁহার কুশল কার্য্য ও পুণ্যের প্রভাবে দেবতাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বেস্সন্তর বলিয়াছিলেন যে, "আমার সেই দান শক্তি প্রভাবে সুখদুঃখানুভববিহীনা ধরাও কম্পিত হইয়া উঠিল। পৃথিবীস্থ তরুরাজি

প্রভৃতি কাঁপিতে লাগিল। সেই মুনিজন-বাঞ্ছিত পদের আশায় আমি সর্ব্বস্ব দান করিলাম। সেই মহামূল্য রত্নের নিকট এ সবই তুচ্ছ।" দেহান্তের পর রাজা বেস্মন্তর তুষিত স্বর্গে * গমন করেন। ইনিই পরে তুষিত স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া মহামায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি এই জন্মে গৌতম সিদ্ধার্থ নামে অভিহিত হন ও পরে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সম্যক্ মার্গের, নিষ্কাম কর্ম্মের সম্যক্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাণ লাভের পন্থা ও বিবেক, বৈরাগ, মৈত্রী ও করুণার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন।

পরম পদ লাভের জন্য, আত্মপর হিতের জন্য, তিনি জন্মে জন্মে কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, ধর্ম্মের জন্য কতবার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সেই মুনি ঋষি-দেবগণ-বাঞ্ছিত শান্তিময় বুদ্ধপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মুখেও বলিতেন 'আত্মপর-হিত-কার্য্যম্' নিজ জীবনেও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ মহান্, তাঁহার সাধু চরিত্র ও সেইরূপ মহৎ। তিনি বিবেক, বৈরাগ্য, করুণা, ধৈর্য্য, প্রশান্ত ও গম্ভীর ভাবের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শান্তিমার্গ লাভের উপায় প্রচার করিয়া 'জরা-মরণ-বিঘাতী-ভিষগ্বর' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

* বৌদ্ধ শাস্ত্রের চতুর্থ দেবলোক। যোগ দর্শনের ৩। ২৬ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যেও ইহার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ দর্শনের ভুবন বিবরণের সহিত যোগ ভাষ্যের ভুবন-বিবরণের বিশেষ পার্থক্য নাই।

এক্ষণে পাঠকগণের জন্য আমরা জাতক গ্রন্থের প্রথম গল্পটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

অপণ্ণক জাতক—(প্রথম সংখ্যা)

অনুক্রমণিকা—ভগবান বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তী-নগরে জেতবন বিহারে বাস করিতেছিলেন সেই সময়ে 'সত্যের' আশ্রয়গ্রহণ সম্বন্ধে এই গল্প দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন। কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল? অনাথ পিণ্ডের * পঞ্চশত বন্ধুকেই লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ এই উপদেশ দিয়াছিলেন।

একদিন ধনাধ্যক্ষ অনাথ পিণ্ডিক তাঁহার পঞ্চশত বন্ধু সহ ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য জেতবন বিহারে গমন করিয়াছিলেন। তথায় ভিক্ষুসংঘে ঘৃত মধু বস্ত্রাদি দান করিয়া ভগবানের নিকট যাইয়া অভিবাদন পুরঃসর তাঁহার চরণে পুষ্পোপহার প্রদান করিয়া, তিনি বন্ধুগণের সহিত ভগবানের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সকলেই এক দৃষ্টে ভগবানের প্রসন্ন গম্ভীর পূর্ণচন্দ্রোপম জ্যোতির্ম্ময় মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

* অনাথ পিণ্ডিক বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে একজন। ইঁহার অপর নাম সুদত্ত। ইনি দানে মুক্ত হস্ত ছিলেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে অনাথ পিণ্ডিক এই নাম দিয়াছিল। বুদ্ধের জন্য ইনি আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি জেতবন বিহার ক্রয় ও ভিক্ষুসংঘে এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অন্ন বস্ত্র ঔষধাদি প্রদান জন্য বহুকোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

তৎপরে সম্যক্ সম্বুদ্ধ কেশরীর ন্যায় গম্ভীর অথচ মধুর স্বরে সম্যক্ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই স্বর যাহার কর্ণে প্রবেশ করিল তাহারই প্রাণে যেন অমৃত রস সিঞ্চন করিল। হৃদয়ের তন্ত্রী সকল যেন বাজিয়া উঠিল; সকলের মনঃ প্রাণ শান্তি-আপ্লুত ও প্রশান্ত হইয়া গেল।

অনাথ পিণ্ডের বন্ধু অনেক স্থানে অনেক উপদেশ শুনিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ চিত্ত-শান্তিকর, অমৃতময়, উপদেশ কখন শুনেন নাই। তাঁহারা সকলেই তাঁহার শরণ লইল সকলেই বলিল :—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

সংঘং শরণং গচ্ছামি।

সেই দিন হইতে তাঁহারা প্রতিদিনই পুষ্পাদি উপহার লইয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণার্থ অনাথ পিণ্ডিকের সহিত বিহারে গমন করিতেন। তাঁহারা দানশীল ও উপোসথ আদি নিয়ম সকল পালন করিতে লাগিলেন।*

তৎপরে ভগবান লোকনাথ বুদ্ধ পুনরায় রাজগহে (রাজগৃহ নগরে) চলিয়া গেলেন। তিনি যাইবার পর অনাথপিণ্ডের সেই বন্ধুগণ বুদ্ধের উপদেশ ও মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিজ ২ পূর্ব্বমতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার আট নয় মাস পরে বুদ্ধদেব যখন পুনরায় জেতবনে প্রত্যাগমন করিলেন তখন অনাথপিণ্ডের সহিত তাঁহার সেই পূর্ব্ব বন্ধুগন ভগবানের সন্দর্শনে জেত-বনে গমন করিল। অনাথপিণ্ডিক ভগ-বান্ তথাগতকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার বন্ধুগণের ব্যাপার ভগবান্‌কে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন গম্ভীর সুমিষ্ট স্বরে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি তোমাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন যে— তোমরা ত্রিশরণ + ত্যাগ করিয়া সৎ মার্গ

* ১। জীব হিংসা হইতে বিরত থাকা; ২। পরদ্রব্য গ্রহণ না করা; ৩। অসত্য বাক্য না বলা ৪। ব্যভিচার না করা। ৫। মাদক দ্রব্য সেবন না করা।

এই পাঁচটিকে পঞ্চ শীল বলে।

৬। একাহার (দিবা দ্বিপ্রহারের পূর্ব্বে একবার তৎপরে রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন না করা) ৭। নৃত্য, গীত, উৎসব, ক্রীড়া প্রভৃতি চিত্তলঘুকর প্রমাদ জনক কর্ম্মে বিরত থাকা। ৮। সুগন্ধ দ্রব্যাদি সেবন ও পুষ্পমাল্যাদি ধারণ না করা ও ভূমি শয্যায় শয়ন করা (উচ্চাসন ও মহাসন হইতে বিরত থাকা) এই তিনটি ও পূর্ব্বোক্ত পাঁচটিকে অষ্টশীল বলে।

উপোসথ—হিন্দুগণ যেরূপ একাদশী আদি তিথিতে উপবাস করেন (খাদ্যাদি হইতে বিরত থাকেন) বৌদ্ধ গৃহস্থগণও সেইরূপ অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে উপবাস করেন বা খাদ্যাদি ও অসৎবৃত্তি হইতে বিরত থাকেন। ভিক্ষুগণের পক্ষে যাবজ্জীবন দশশীল পালন করা নিয়ম। গৃহস্থগণ উপো-সথ দিনে অষ্টশীল পূর্ণাঙ্গের সহিত পালন করিয়া থাকেন। রাত্রি জাগরণ করিয়া অনিত্যাদি ভাবনা করিতে হয়।

+ "আমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত সংসার পারোত্তীর্ণ বুদ্ধকে, আদি-মধ্য-অন্ত-মধুর, স্বর্গ মোক্ষপ্রদ ধর্ম্মকে, ও সম্যক্ ধর্ম্মগামী ও মার্গসিদ্ধ পূজনীয় ভিক্ষু সংঘকে আমার পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিতেছি" - ইহাকে ত্রিশরণ বলে।

হইতে বিমুখ হইয়াছ, একথা কি সত্য।" তাঁহারা সত্য গোপনে অসমর্থ হইয়া উহা যে সত্য তাহা স্বীকার করিলেন।

তচ্ছ্রবণে ভগবান বলিলেন, শ্রাবকগণ! অনেক দিন পরে সংসারে এক একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। নিম্নস্থ নিরয় লোক হইতে সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি বুদ্ধের সমতুল্য; তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া ত দূরের কথা। তোমরা ত্রিরত্ন ত্যাগে, সত্যের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করিতেছ। এই বলিয়া এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।—

বহু বে সরণং যন্তি পব্বতানি বনানি চ।
আরাম রুক্‌খ চেত্যানি মনুস্স ভয়-
তজ্জিতা ॥১৮০॥
নেতং খো সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমম্।
নেতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি ॥১৮৯॥
যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো।
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপঞ্ঞায় পস্-
সতি ॥ ৯০ ॥
দুক্‌খ দুক্‌খসমুপ্পাদম্ দুক্‌খস্স চ অতিক্কমম্।
অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্‌খূপ সমগামি-
নম্ ॥ ৯১ ॥
এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমম্।
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি ॥১৯২॥
(ধম্মপদ)।

বনপর্ব্বত, আরাম, বৃক্ষ, চৈত্য প্রভৃতি বহু স্থানে মনুষ্যেরা ভীত হইয়া শরণ লয় কিন্তু এই সকল শরণ নিরাপদ বা উত্তম নহে এবং এই সকল শরণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে না।

যিনি বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সংঘের শরণ লইয়াছেন, তিনি চারি আর্য্য সত্য—

১। দুঃখ, ২। দুঃখের উৎপত্তি, ৩। দুঃখ অতিক্রম ৪। ও দুঃখের উপশমকারী আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ—সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা দর্শন করেন। এই সকলের শরণ লওয়া নিরাপদ ও উত্তম এবং ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ধর্ম্মপদ, বুদ্ধবর্গ ১০—১৪)

এই গাথা পাঠ করিয়া বলিলেন যে যাঁহারা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই সত্য মার্গে চলেন তাঁহাদিগকে দুঃখকর ও মোহজনক জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ ভাবনা*

* ত্রিরত্নভাবনা—(১)বুদ্ধানুস্মৃতি—মনে মনে বুদ্ধের নবগুণ ভাবনা করিতে হয়;—'সেই ভগবানের এইরূপ পুণ্যময়ী কীর্ত্তি-কথা অভ্যুদগত হইয়াছে:—সেই ভগবান্ তথাগত (চারি আর্য্যসত্যজ্ঞ), অর্হৎ (ভুবনত্রের পূজ্য, যে হেতু তিনি রাগ দ্বেষাদিহীন), সম্যক্ সম্বুদ্ধ (চারি মহাসত্য স্বীয় বীর্য্য ও সাধন বলে জ্ঞাত), বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বিবিধ রূপধারণ, পরচিত্তজ্ঞান, তৃষ্ণাক্ষয় করিবার জ্ঞানাদি অষ্টবিধ বিদ্যা ও ইন্দ্রিয় সংযম, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা আদি পঞ্চদশ গুণ সম্পন্ন), সুগত (নির্ব্বাণ গত), লোকবিদ্ (ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব লোকের বিষয় যিনি জানেন), অনুত্তর, পুরুষদম্যসারথী (দীক্ষাযোগ্য মনুষ্যগণকে যিনি নির্ব্বাণ পথে লইয়া যান), এবং তিনি দেবতা ও মনুষ্যের শাস্তা।

(২) ধর্ম্মানুস্মৃতি—ধর্ম্মের ছয় গুণ ভাবনা—ভগবান কর্ত্তৃক সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত, সন্দিষ্টিক (যাহা ইহলোকে প্রত্যক্ষে ফল প্রদান করে), অকালিক (ধর্ম্মপালন কোন বিশেষ কালাকালের উপর অপেক্ষা করে না),

হইতে মার্গচতুষ্টয় ও মার্গফল চতুষ্টয় * লাভ হয়। পূর্ব্বকালে লোকে সত্য দর্শন না করিয়া, ভ্রম সিদ্ধান্তের বশীভূত হইয়া কান্তারে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা প্রজ্ঞা প্রভাবে সত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই মরুভূমি হইতেই সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া ভগবান স্তব্ধ হইলেন।

তখন অনাথপিণ্ডিক করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন ভগবন্! বর্ত্তমানের ঘটনাই আমরা জানি কিন্তু অতীত কালের ঘটনা আমাদের জ্ঞানে অপ্রকাশিত। এতদ্বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন। তচ্ছ্রবণে ভগবান বলিলেন "তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর"। এই বলিয়া তিনি একটি অতীত ঘটনার উল্লেখ করিলেন।

এক সময়ে বারাণসীনগরীতে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন। সেই সময়ে বোধিসত্ব (যিনি পরে বুদ্ধ হন) এক বণিকের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি পশ্চিম দেশে শকটাদি

আহ্বানিক (যে ধর্ম্ম 'আমাকে একবার দেখিয়া যাও একবার আমার মতে বলিয়া যাও বলিয়া সাদরে আহ্বান করে), ঔপনায়িক (যে ধর্ম্ম মুক্ত পুরুষ বা বুদ্ধের স্বরূপ), এবং যে ধর্ম্ম বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্বয়ং জ্ঞাতব্য।

(৩ সংঘানুস্মৃতি—সংঘের নয় গুণ ভাবনা—ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের শিষ্য সংঘ সুপ্রতিপন্ন (সুপথে উপনীত), ঋজুপ্রতিপন্ন (সরল পথে উপনীত), ন্যায়প্রতিপন্ন (ন্যায় মার্গে স্থিত), সাম্য-প্রতিপন্ন, আহ্বানীয়, পুনর্নিমন্ত্রণযোগ্য, দক্ষিণীয় (দান যোগ্য), অঞ্জলিকরণীয় (যোড়হাতে নমস্কার যোগ্য), প্রকৃষ্ট পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ; (যে হেতু চারি যুগ্ম—স্রোতাপত্তিমার্গ ও স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগমন মার্গ ও সকৃদাগমন ফল অনাগমন মার্গ ও অনাগমন ফল, এবং অর্হৎমার্গ ও অর্হৎমার্গফল এই অষ্টবিধ (মার্গস্থ ও ফলস্থ) পুরুষ এই সংঘে বর্ত্তমান)।

* বৌদ্ধ শাস্ত্রে চারিটি মার্গের নাম স্রোতাপত্তি, সকৃদাগমন, অনাগমন ও অর্হত্বম্। আর চারিটি মার্গ ফলের নাম স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগমনফল ইত্যাদি। এই স্রোতাপত্তি মার্গে যিনি প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহাকে আরও সাতবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার নাম স্রোতাপন্ন। সকৃদাগমীকে আর একবার জন্ম লইতে হয়। অনাগমীকে আর পৃথিবীতে আসিতে হয় না। আর অর্হৎ এই জীবনেই মুক্ত। স্রোতাপত্তি মার্গে চলিতে চলিতে উহাতে সিদ্ধ হইয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ হয়। অন্য তিনটির সম্বন্ধেও সেইরূপ।

জীব দশবিধ শৃঙ্খলে বদ্ধ। ১। সৎকায়-দৃষ্টি (বোধ্য বা দৃশ্য যত প্রকার পদার্থ আছে, সেই বোধ্য পদার্থকে আত্মা মনে করা) ২। বিচিকিৎসা (কার্য্য কারণ নাই ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই মনে করা) ৩। শীলব্রত (কর্ম্মকাণ্ডেই মুক্তি মনে করা) ৪। কাম ৫। প্রতিঘ (দ্বেষ) ৬। রূপরাগ (ইহলোকে ও রূপে আসক্তি) ৭। অরূপ-রাগ (পরলোক, স্বর্গ ও ভবিষ্যতে যেন থাকি এইরূপ আসক্তি) ৮। মান ৯। ঔদ্ধত্য ১০। অবিদ্যা।

যিনি প্রথম তিনটির শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছেন তিনিই স্রোতাপন্ন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলগুলি হইতে মুক্ত হইয়া যখন দশটি শৃঙ্খলই ছিন্ন হইয়া যায় তখনই তিনি অর্হত্ব পদবীতে আরূঢ় হন।

সহ বাণিজ্য করিতে যাইতেন। সেই সময়ে কাশীতে আরও একজন স্থূলবুদ্ধি বণিক বাস করিত।

ঘটনাক্রমে বোধিসত্ত্ব ও সেই মূর্খ যুবক বণিক একই সময়ে বাণিজ্যযাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন যে যদি এই বণিক বরাবর আমার সহিত গমন করে তাহা হইলে একবারে এত লোকের জন্য কাষ্ঠ জল ও পশুদিগের জন্য তৃণাদি সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। হয় আমার নতুবা তাহার—একজনেরই অগ্রে যাওয়া ভাল। এই ভাবিয়া তিনি সেই বণিকের নিকট গমন করিয়া বলিলেন যে দুজনের একত্রে যাওয়া উচিত নহে, তুমি বা আমি, কে অগ্রে যাইবে, এ বিষয়ে তোমার যাহা মত, তাহা বল। তাহা শুনিয়া সেই যুবক বণিক বিবেচনা করিল যে প্রথমে যাওয়াতে অনেক সুবিধা; কারণ, পথের সমস্ত শস্য তৃণাদি আমরাই অগ্রে লইতে পারিব। প্রথমে গমন করিলে নির্ম্মল ও অপর কর্ত্তৃক অদূষিত পানীয় প্রাপ্ত হইব। আরও, আমিই অগ্রে যাইয়া স্বেচ্ছাতম মূল্য ধার্য্য করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিব। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন যে আমিই প্রথমে যাইব।

তাহা শুনিয়া আবার বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন যে শেষে যাওয়াই সুবিধা-জনক। যাহারা প্রথমে গমন করে তাহা-দিগকে বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া (উচ্চ নীচ স্থান সমভাব করিয়া) পথ পরিষ্কার করিতে হয়। তাহাদের পশুগণকে পুরাতন তৃণাদি খাইতে হয়। যাহারা পরে গমন করে তাহারা পূর্ব্বপ্রস্তুত পরিষ্কৃত পথে গমন করে ও নবতৃণ শাকাদি প্রাপ্ত হয়। যে স্থানে জলের অভাব হয় তথায় পূর্ব্বগামী-দিগকে নূতন কূপাদি খনন করিতে হয় কিন্তু যাহারা পরে গমন করে তাহাদিগকে আর জলের জন্য কোন ক্লেশ পাইতে হয় না। দ্রব্যাদি লইয়া দর দস্তুর করা বড়ই ক্লেশকর; পরে গমন করিলে আমাকে সেই পীড়াজনক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইবে না। পূর্ব্বনির্দ্ধারিত মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিব। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, সেই ভাল আমিই পরে যাইব।

তাহা শুনিয়া সেই যুবক বণিক আপনার পাঁচশত শকট সজ্জিত করিয়া লোকজনাদি সহ নগর হইতে বহির্গত হইল। যাইতে যাইতে তাহারা ষষ্টিযোজন ব্যাপী এক মরুভূমির নিকট উপস্থিত হইল। ঐ মরু-ভূমিতে কোন জলাশয় ছিলনা। তথায় এক রাক্ষস বাস করিত। সম্মুখে মরুভূমি দেখিয়া সেই বণিক বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভ সকল জলে পূর্ণ করিয়া লইল। যখন তাহারা মরুভূমির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সেই নরমাংসভোজী নীচ ব্যক্তি ভাবিল যে প্রবঞ্চনা করিয়া ইহাদিগের পানীয় নিক্ষেপ করাইতে হইবে। তৎপরে যখন তাহারা পিপাসাতুর হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তখন উহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বধ করিয়া ভোজন করিব। এই ভাবিয়া মায়া বিস্তার পূর্ব্বক একরথে আরোহণ পূর্ব্বক দশ বার জন সঙ্গী সহ সিক্তবস্ত্র

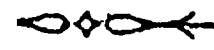
আর্দ্রকেশে মৃণাল চর্বণ করিতে করিতে বণিকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তৎপরে সেই শকট সমূহ নিকটস্থ হইলে সেই নরমাংসাশী ব্যক্তি বণিককে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক আপনি কোথায় গমন করিতেছেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তদুত্তরে সেই বণিক বলিল যে আমরা কাশী হইতে আসিতেছি এবং বাণিজ্যার্থ পশ্চিমদেশে যাইতেছি। তৎপরে সেই রাক্ষসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনার বস্ত্রাদি সিক্ত, কেশ আর্দ্র ও আপনাকে মৃণাল ভক্ষণ করিতে দেখিতেছি। শুনিয়াছিলাম এখানে জলের অভাব। পথে কি বৃষ্টি হইয়াছিল অথবা এখানে কোন কমল-পূর্ণ সরোবর আছে? নতুবা কোন্ স্থান হইতে এই সকল মৃণাল সংগ্রহ করিলেন? ইহা শুনিয়া সেই রাক্ষস বলিয়া উঠিল, আপনি কি বলিতেছেন? সম্মুখেই একটা বন আছে, সেখানে কমল-পূর্ণ একটি বৃহৎ জলাশয় আছে; আর সেই স্থানে বৃষ্টি হইতেছে। তৎপরে সেই পাঁচশত জলকুম্ভ দেখিয়া বলিল যে ইহাতে কি আছে? তদুত্তরে বণিক বলিল ইহা জলে পূর্ণ। তাহা শুনিয়া সেই রাক্ষস বলিল জল আনিয়া খুব ভালই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর বৃথা ক্লেশ পূর্বক বহিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে বৃথা পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করা মাত্র। কারণ সম্মুখেই জলাশয়। এই বলিয়া সেই নরভোজী চলিয়া গেল। ঐ মূর্খ যুবক এরূপ বিচার বিহীন ছিল যে সেই ভদ্রবেশধারী ও মিষ্টভাষী নরভুকের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া বিনা বিচারে সেই জলাধার সকল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু বহুদূর গমন করিয়া কোথাও জলাশয় দেখিতে পাইল না। লোক সমূহ জলাভাবে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল। সূর্যাস্ত পর্যান্ত সমস্ত দিন তাহারা অগ্রসর হইল, সন্ধ্যার সময়ে শকট থামাইয়া গরুগুলিকে মুক্ত করিয়া দিল। গরুগুলি তৃষ্ণায় চলৎশক্তি বিহীন হইয়া পড়িল এবং ক্ষীণকণ্ঠে শব্দ করিতে লাগিল। নিজেরাও জলাভাবে রন্ধনাদি করিতে পারিল না। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় সকলেই মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল। এদিকে রাত্রিকালে সেই নরখাদক অসভ্যগণ নিজ বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সেই নিদ্রিত, অসহায়, পরিশ্রান্ত লোক সমূহ ও পশুগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। তৎপরে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। কেবল সেই লোক সকলের অস্থিরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিল। আর সেই দ্রব্যপূর্ণ পঞ্চশত শকট যথাস্থানে পড়িয়া রহিল।

এদিকে দেড়মাস পরে বোধিসত্ব স্বকীয় পাঁচশত শকট দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া লোকজন সমভিব্যবহারে বাণিজ্যার্থ বহির্গত হইলেন। তিনি জলাধার সকল জলে পূর্ণ করিয়া লইলেন। লোকজনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে আমার অনুমতি ব্যতীত কেহ এক বিন্দুও জল যেন ব্যয় না করে। আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পথে যেন কেহ কোন পত্র পুষ্প ফলাদি ভক্ষণ না করে। বৃক্ষ লতা ফল সুঘ্রাণ ও সুদৃশ্য হইলেও বিষাক্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

জাতক বা বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

এই সকল উপদেশ দিয়া তিনি সেই মরুভূমিতে পৌঁছিলেন। মরুভূমির মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে সেই নরভুক্ পূর্ব্ববৎ মায়াবলম্বন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল ও পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণ করিয়া জল ফেলিয়া দিবার উপদেশ দিল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন যে, এই মরুভূমি জলশূন্য, ইহা শুনিয়াছি; অথচ এই লোহিতচক্ষু, কর্কশমূর্ত্তি লোকটি মৃণাল ভক্ষণ করিতেছে। এই কুটিল দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকটি আমাদিগকে বোধহয় প্রবঞ্চনা করিতেছে। কিন্তু আমিও প্রজ্ঞাশূন্য হইয়া ভ্রমপথে যাইতেছি না। ব্যাপার দেখিয়া বোধ হইতেছে যে এব্যক্তি অসভ্য নরখাদক রাক্ষস। তৎপরে সেই রাক্ষসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি নিজের গন্তব্য পথে গমন কর; যতক্ষণ না আমি স্বচক্ষে জল দেখি ও সেই জলের নিকট গমন করি ততক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দুও জল ফেলিয়া দিব না। তাহা শুনিয়া ঐ রাক্ষস চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার পর বোধিসত্ত্বকে তাঁহার অনুচরেরা বলিল—"মহাশয়! যে লোকগুলি আসিয়াছিল, তাহারা বলিয়া গেল যে সম্মুখের অরণ্যে জলাশয় আছে। আর প্রত্যক্ষও দেখিলাম যে তাহাদের বস্ত্রাদি সিক্ত ও উহারা মৃণাল ভক্ষণ করিতেছে তখন বৃথা পরিশ্রম করিয়া জল বহিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ গুরুভার দ্রব্য শীঘ্রগমনের বাধাজনকও বটে।" তদুত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন সম্মুখে এক ক্রোশের মধ্যে জলাশয় রহিয়াছে এবং সেখানে বৃষ্টিও হইতেছে,

ইহা ঐ ব্যক্তি বলিয়া গেল বটে কিন্তু এস্থানের বায়ু এত উষ্ণ কেন? আরও আমরা মেঘের কোন শব্দও শুনিতে বা বিদ্যুৎ দেখিতে পাইতেছি না। ইহা অতিশয় বিরুদ্ধ ব্যাপার। ইহারা অসভ্য নরভুক্ জীব। এই সকল রাক্ষস আমাদিগকে দুর্ব্বল দেখিলেই আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে সেই পূর্ব্বগামী মূর্খ বণিক ইহাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে।

এই সকল ন্যায়যুক্ত সদুপদেশ বাক্য বলিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দুর যাইবার পর তিনি সেই যুবক বণিকের পাঁচশত দ্রব্যপূর্ণ শকট ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনুষ্য ও পশু সমূহের অস্থি রাশি দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া বোধিসত্বের সঙ্গীগণ, ব্যাপার যে কি তাহা বুঝিতে পারিল। এবং বোধিসত্বের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহারা যে ভ্রম পথে গিয়া বিনষ্ট হয় নাই, তজ্জন্য আপনারা অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা পশুগণকে জলপান ও আহার করাইয়া নিজেরা ভোজন করিল ও কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে নিদ্রা যাইতে লাগিল। বোধিসত্ব ও অন্যান্য বলবান্ ব্যক্তিগণ অসিহস্তে সমস্ত রাত্রি পর্য্যায় ক্রমে জাগরিত থাকিয়া নিদ্রাতুর ব্যক্তিগণকে সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতে বোধিসত্ব নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক নিজের কয়েকটি ভগ্নপ্রায় শকট পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই মূর্খ বণিকের পঞ্চশত শকট হইতে কয়েকটি বাছিয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্যও প্রাপ্ত হইলেন। পরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া উচিত মূল্যে পণ্যদ্রব্য সমূহ বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধনরাশি ও সমস্ত অনুচর সহ নিজদেশে নিরাপদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই জাতক গল্পটি বলিয়া ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন—

অপন্নকম্ ঠানমেকে, দুতীয়ং আহু তাক্কিকা।
এতদঞ্ঞায় মেধাবী তং গণ্হে যদপন্নকম্॥

জগতে কেহ সরল পথ (সত্যকে) আশ্রয় করেন, কোন কোন তার্কিক ও বাক্‌চাতুরীশীল (অবোধ) ব্যক্তিরা অসরল মার্গ (অসম্যক মার্গ) আশ্রয় করে মেধাবী ব্যক্তি এই দুই প্রকার পথ জানিয়া যাহা সরল ও সম্যক্ মার্গ, যাহা সত্যানুগত সেই পথেরই অনুসরণ করিবেন।

যাঁহারা সত্যকে আশ্রয় করেন তাঁহারা দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে গমন করেন ও পরে অর্হত্ব লাভ করেন; কিন্তু যাহারা মিথ্যাশ্রয় করে, তাহারা নিরয় গমন ও নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে এবং মোহজালে নিপতিত হয়।

এই গল্প বলিবার পর বলিলেন যে দেবদত্ত সেই সময়ে সেই বোধহীন যুবক বণিক, এবং আমি সত্যানুরাগী বণিকপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।

ভগবান বুদ্ধের উপদেশে অনাথপিণ্ডের ঐ পঞ্চশত বন্ধু সম্যক্ মার্গে প্রবিষ্ট হইল।

শ্রীসেবানন্দ।
কাশী যোগাশ্রম।

ঈশ্বর-স্তোত্রম্।

(১)

যন্নামকীর্ত্তিমুদিতাং পুলকাঙ্কুরৈচ্ছে
র্গায়ন্তি পণ্ডিতজনাঃ প্রথিতাং পৃথিব্যাম্।
বিত্তং ন গোপয়তি যস্তু বনীয়কেভ্যঃ (১)
তং শ্রীশ্বরং (২) মমগুরুং শিরসা নতোঽস্মি॥

(২)

শীলেন সাধুনিকরো বশতামুপৈতি
দানেন যাচককুলং পরিহন্তি যাচ্ঞাম্।
যৎ সংশ্রয়াদপি জড়াঃ কবিতাং লভন্তে
তং শ্রীশ্বরং মমগুরুং শিরসা নতোঽস্মি॥

(৩)

সর্ব্বেষু ভূতনিকরেষু নিজাত্মভাবং
জ্ঞানেন কঞ্জজ (৩) ইব প্রথিতং জগত্যাম্।
চাতুর্য্যকার্য্যরহিতং পরমার্থবুদ্ধিং
তং শ্রীশ্বরং মমগুরুং শিরসা নতোঽস্মি॥

(৪)

সত্যেষু বাক্যনিচয়েষু দৃঢ়ব্রতং যং
মর্ম্মবিদন্ রিপুকুলক্ষয়কারিণং যং।
স্বর্দ্দেশবাসিভিরহো পরিগীতগাণং
তং শ্রীশ্বরং মমগুরুং শিরসা নতোঽস্মি॥

(৫)

যৎ সংশ্রয়াদতিঘৃণাস্পদনীচবুদ্ধি
দুষ্কর্ম্মজালবিরতঃ কুলপাংশুলোঽপি।
তেনৈব পৌরুষকুলং গদিতুং সমর্থা;
তং শ্রীশ্বরং মমগুরুং শিরসা নতোঽস্মি॥

(৬)

যস্তানুভাবমমলং পরিলোক্য তাব-
ন্নিন্দন্তি দুষ্টকুলজাতবিশিষ্টদোষাঃ।
পশ্যন্তি নৈব কুধিয়া মহতাং মহত্বং
তং শ্রীশ্বরং মমগুরুং শিরসা নতোঽস্মি॥

(৭)

স্বেচ্ছাতনুং নয়সি বৈ বিতনোষি কীর্ত্তিং
ব্রহ্মাংশকো নমু বিভো বপুষা হি কিং তে।
স্তব্ধো বিঘোষয়তি যং নরমেব নাস্ত
তং শ্রীশ্বরং মমগুরুং শিরসা নতোঽস্মি॥

(৮)

যস্মিন্ সুধীর্হি মুকুরে গুণমেব পশ্যেৎ
রাকাপতৌ(৪) সকল মাবসতি (৫) প্রমোদা।
যস্তাত্মবোধনগুণাকরদেবনন্দং
তং শ্রীশ্বরং মমগুরুং শিরসা নতোঽস্মি॥

ঈশ্বরাষ্টকং (৬) সম্পূর্ণম্।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

(১) যাচকেভ্যঃ সুদামাদিভ্যঃ।
(২) কিন্তু স্বীকৃত মায়ো বিশুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তিস্তাদৃশ্যাপি শ্রিয়া যুজ্যতে।
বেদান্ত দর্শনে ৩ অধ্যায়ে ৩ পাদে ৪০ সূত্রে শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ।
(৩) ব্রহ্মা।
(৪) চন্দ্রে।
(৫) শোভা।
(৬) বসন্ততিলক বৃত্তম্।

বিনয়াঞ্জলি।

(১)

চেতো জহাতু বিষয়ং মুনিভির্বিনিন্দ্যং
জ্ঞাত্বা কথং নিরয়বর্ত্মনি তে সুতৃষ্ণা।
শৃণন্ ময়া ত্বহিতে কথনে প্রবৃত্তং
মা যাতু সম্প্রতি সখে! যদি ভদ্রমিচ্ছেৎ॥

(২)

মা যাতু মুক্তি-ভবনং পরিহায় চেতঃ!
বৈকুণ্ঠধামবিষয়ে নহি তত্ত্বমস্তি।

লোকে যদীশ্বরকৃতং কিমু তৎ পৃথিব্যাং
নাস্তীতি শুদ্ধমনসা নিতরাং বিচিন্ত্যং ॥

(৩)

গোপীপতে শ্চরণপদ্মনিষেবনেন
তাপত্রয়ং নহি ভবেৎ সুতরাং বিমুক্তিঃ।
চেতস্ত্বমেব প্রসভং হরিপাদযুগ্মং
লব্ধা রমস্ব সু যতো নহি শান্তিরন্যা ॥

(৪)

পুত্রাদিমোহগহনে ভগবন্মদীয়ং
গন্তুং সদা প্রযততে কিমহং করোমি।
চেতশ্চিরং গুণনিধে! তব পাদযুগ্মে
নো বা গমিষ্যতি যতঃ কিমুচিত্রমস্মাৎ ॥

(৫)

সংসারমোহমদিরাং নিতরাং হি পীত্বা
লক্ষ্মীপতে! তব পদে বিমলে বিশোকে।
যাতিক্ষণং মম বিভো! চপলং ন চেতঃ
যাস্যামি ঘোর নিরয়ে নহি মে সহায়ঃ ॥

(৬)

সংসারভোগমপহায় নিরীহদেবং
নারায়ণং শিবময়ং পুরুষং পুরাণম্।
লোকাঃ কুকর্ম্মনিরতা ন ভজন্ত্যধীশং
প্রায়োগৃহে নিরয়বর্ত্মানি বদ্ধতৃষ্ণাঃ ॥

(৭)

নৈবং বিদন্তি সুরম্য স্তব পাদবীর্য্যং
মায়াং ত্বদীয়বশগাং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
অস্বেকুতঃ পরম! কৌ নরসিংহ! বিষ্ণো!
মায়েশ! ছিন্ধি সুতরাং গৃহজালমোহম্ ॥

(৮)

লোকো ন বেত্তি নিজমঙ্গলমত্যুদারং
হিংসাবিহারনিকরেষু সদা প্রমত্তঃ।
ঈশ! ত্বমেব নিজকার্য্যবিশালদক্ষঃ
যস্মান্ন পণ্ডিতমনোবিরতং হি কৃচ্ছ্রাৎ ॥ (১)

(৯)

সত্যং ভবান্ ত্রিভুবনে ন হি কশ্চিদন্যঃ
স্বপ্নোপমে তব পদং শ্রুতিভি র্বিমৃগ্যাম্।
কস্মাদ্ বিহায় মনুজঃ স্থিরতামুপৈতি
চিত্রং ন তৎ ত্বয়িবিভো হখিললোকনাথে ॥

(১০)

হে নাথ! হে কুলপতে! বসুদেবসূনো!
হে কৃষ্ণ! হে যদুপতে! কৃপয়াচ শশ্বৎ।
মায়াং ত্বদীয় রচিতাং ভববন্ধকর্ত্রীং
ছিন্দ্ধ্যাশু দেব! ভগবন্নিদমেব যাচে ॥

(১১)

ক ত্বং বরাঙ্গক! সু যাদব! পঙ্কজাক্ষ!
বৃন্দাবনে বিহরসি হ্যুত বিষ্ণুলোকে।
সর্ব্বান্ বিহায় গমনে মতিরস্তি তুভ্যং
দাস্যং ন দাস্যসি পদে তববা সকাশম্ ॥ (২)

(১২)

গোপেশ! গোপললনাকুলমানবন্ধো!
কৃষ্ণাশ্রয়স্য বিনয়ং কৃপণস্য ভূয়ঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে তব নাম কণ্ঠে
ঘোরে বিরাজতু চিরং ত্বিদমেব যাচে ॥

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

হরি-নাম।

—•:•:•—

হরি হরি বড় দুঃখ রৈল মোর মনে।
পইয়া দুর্ল্লভতনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু
হেন জন্ম গেল অকারণে ॥

ঠাকুর-প্রার্থনা।

দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে তাহার সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জীব যখন জননী-জঠরে অবস্থান করেন তখন পরমেশ্বরকে

---

(১) মিষ্টৌয়ং।

(২) মিষ্টৌয়ং।

প্রার্থনা করেন যে সংসারে গিয়া এরূপ কর্ম্ম করিব যাহাতে গর্ভযন্ত্রণা আর ভোগ না করিতে হয়।

ততঃ শ্রেয়ঃ করিষ্যামি যেন গর্ভে ন সম্ভবঃ।
পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে ৬৬ অধ্যায়ে ৪।

পুনর্নৈবং করিষ্যামি মুক্তমাত্র ইহোদরাৎ।
তথা তথা যতিষ্যামি গর্ভং নাপ্স্যাম্যহং যথা॥
মার্কেণ্ডেয় পুরাণে ১১ অধ্যায়ে।

এই উদর হইতে মুক্ত হইয়া এইরূপ কার্য্য করিব যাহাতে পুনরায় গর্ভ যন্ত্রনা ভোগ না করিতে হয়।

তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্য
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মাসে ভবিষ্যদুপসাদিত বিষ্ণুপাদঃ॥
(শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৩১।২০)

তজ্জন্য আমি বিষ্ণুরপদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সারথিরূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাকুল না হইয়া সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব যেন পুনরায় আমাকে আর গর্ভ-বাসরূপ নানা ক্লেশ ভোগ না করিতে হয়।

যন্ময়া পরিজনাস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
একাকী তেন দহ্যেহহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ॥
অহোদুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতি ক্রিয়াং।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচেহহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্॥
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তে প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেহহং তৎপ্রপদ্যে নারায়ণম্॥
গর্ভোপনিষদি ৬।

আমি যে পরিজনের জন্য শুভাশুভ কার্য্য করিলাম তজ্জন্য একাকী দগ্ধ হইতেছি ফলভোগী সকল চলিয়া গিয়াছে। হায়! আমি দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া কোন প্রতিকার দেখিতেছি না যদি এই যোনি হইতে মুক্তি লাভ করি তাহাহইলে মহেশ্বরকে ভজনা করিব; যদি এই যোনি হইতে মুক্তি লাভ করি তাহাহইলে অশুভ-ক্ষয় কর্ত্তা ও মুক্তিদাতা নারায়ণকে ভজনা করিব।

কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র জগন্মোহিনী মায়া আসিয়া তাহার উপর তাঁহার শক্তি-পাশ নিক্ষেপ করিলেন। ক্রমে যত বয়ঃ-প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তত প্রতিজ্ঞা বিস্মরণ হইয়া সংসারে আপনার দ্রব্যকে দূরে রাখিয়া পরকে আপনার করিতে লাগিলেন। পরে শুক্তিতে রজত বোধের ন্যায় মিথ্যাতে সত্য ভ্রম করিয়া সমুদয় মিথ্যা দ্রব্যকেও স্ত্রী পুত্র পরিবারকে সত্য মনে করিয়া আপনার হৃদয়ের ধন হরিকে পর মনে করিলেন। নিজে যে কি সংসারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি অথবা স্থূল দেহের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি এচিন্তা একবারও উদয় হইল না। তিনি কি স্থূলদেহ বিশিষ্ট জীব অথবা কি তদ্ব্যতীত অন্য পদার্থ? যদি স্থূলদেহ বিশিষ্টই তিনি তাহাহইলে স্থূলদেহের ধ্বংশে তাঁহার অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাউক। কিন্তু তাহা নহে কারণ তাঁহাকে শুভাশুভকর্ম্ম জন্য পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয়। তিনি রাজদেহেই আসুন অথবা শূকরদেহেই আসুন কর্ম্মফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং স্থূলশরীরের ধ্বংশে অন্য শরীর বর্ত্তমান

থাকে। সেই অন্য শরীরকে তাহাই বিচিন্তনীয়। নাস্তিকগণের মতে স্থূলদেহের ধ্বংশে সমুদায় ধ্বংশ হইয়া যায় অন্য কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে না। তজ্জন্য নাস্তিকগণ কহেন —

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
চার্ব্বাক্ দর্শনে।

যতদিন জীবিত থাকিবে সুখে থাকিবে, ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিবে; দেহ ভস্ম হইলে তাহা কি প্রকারে পুনরাগমন করিবে? কিন্তু পুনর্জন্ম যে হয় ইহা সকলেই বিশ্বাস করিবেন সুতরাং সেবিচার এক্ষণ অনাবশ্যক। স্থূলদেহের ধ্বংশে যে অন্যদেহ থাকে উহাকে লিঙ্গদেহ কহে।

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্। সাংখ্যদর্শনে ৩।৯।

ইহাতে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—

একদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সুতরাং সংসারে আসিয়া স্থূলদেহের তৃপ্তিতে সূক্ষ্মদেহের বা লিঙ্গদেহের বিষয় চিন্তা না করা মনুষ্যের কার্য্য নহে। সংসারে আসিলেই যে দিবা রাত্র সংসারচিন্তায় মনকে ডুবাইতে হইবে ইহা ত উদ্দেশ্য নহে। সংসারে থাকিয়া সংসারের কার্য্য কর কিন্তু মন যেন সংসারে লিপ্ত না থাকে। সংসারী ব্যক্তি কুম্ভমস্তকা নর্ত্তকীর ন্যায় হইবেন—

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্।
সঙ্গীতনৃত্যকতিতান বশং গতাপি
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণে ধীর্নটীব॥ (১)

ধীরব্যক্তি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তৎপর হইলেও মুকুন্দপদারবিন্দ ত্যাগ করেন না; যেরূপ নটী, সঙ্গীত ও বিবিধ নৃত্যের বশ হইলেও মস্তকস্থিত কুম্ভকে পরিত্যাগ করে না তদ্রূপ।

মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভুপাদকে কহিয়াছিলেন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নম্॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্য লীলা ১ পরিচ্ছেদে ধৃত যোগবাশিষ্ঠরামায়ণবচনম্। (২)

অন্যাসক্ত নারী গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত হইলেও হৃদয়ে সেই নবসঙ্গরসায়নকে আস্বাদন করিয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠে

বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

বহির্ব্যাপারসংরম্ভঃ হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব!॥

বাহিরে কর্ম্মযুক্ত কিন্তু হৃদয়ে সংকল্পশূন্যতা; বাহিরে কর্ত্তা কিন্তু অন্তরে অকর্ত্তা; হে রামচন্দ্র! তুমি এইরূপে বিহার কর।

যদি অন্তরে কামনাশূন্য না হওয়া যায় তাহাহইলে চির জীবন কামনা হৃদয়ে

(১) এই শ্লোকটি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু তাঁহার কোন গ্রন্থে উহা (যতদূর দেখিয়াছি) পাই নাই। পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে যদি কেহ কৃপা করিয়া এই শ্লোকটির রচয়িতা প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে বাধিত হই।

(২) উপশম প্রকরণে ৭৪ অধ্যায়ে ৮৩ শ্লোকঃ।

পোষণ করিলে মৃত্যুর সময় সেই কামনা উদয় হইয়া তদনুযায়ী জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিন্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥
পঞ্চদশী ধ্যানদীপে ১৩৭।

মনুষ্য মৃত্যু সময় যে যে ভাবকে স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে চিত্ত সেই সেই ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহা শাস্ত্রানুযায়ী।

শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
গীতায়াং ৮। ৬।

তজ্জন্য প্রহ্লাদ মহাশয় দৈত্য বালকগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

কৌমার (১) আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥
শ্রীভাগবতে ৭। ৬। ১।

প্রাজ্ঞব্যক্তি কুমার কালেই ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করিবেন কারণ মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ উহা অনিশ্চিত কিন্তু অর্থপ্রদ।

(১) কুমার কাল পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত যথা—
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাত্তং কৈশোরং যৌবনং স্যাৎততঃপরম্॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ দক্ষিণ ভাগে ১ লহরী ৫৮।
কৌমার কাল পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত, দশম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর তৎপরে যৌবন।

বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মাচরণ করিলে মৃত্যু সময়েও সৎচিন্তার উদয় হইবে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ৮ উল্লাসে সদাশিব পার্ব্বতীকে কহিয়াছেন—

বিদ্যামুপার্জ্জয়েৎ বাল্যে ধনদারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ॥

জ্ঞানীব্যক্তি বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জ্জন করিবেন; ধন ও স্ত্রী যৌবনে; প্রৌঢ় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ও চতুর্থ ভাগে প্রব্রজ্যাশ্রমে গমন করিবেন।

এই কথা বলিয়া সকল কার্য্যের ভাগ করিয়া দিয়াছেন ও তৃতীয় ভাগে ধর্ম্ম কর্ম্মের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কিন্তু সকল সময়েই পূর্ব্বোক্ত নর্ত্তকীর ন্যায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় অবস্থা পর্য্যন্ত যদি কেবল বিদ্যার্জ্জন ও ধনাদি অর্জ্জন করিলেন ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলেন তাহা হইলে ধর্ম্মার্জ্জন করা দুরূহ হইয়া উঠে। যেরূপ ক্ষুদ্র বৃক্ষকে শীঘ্র নত করা যায় কিন্তু ঐ বৃক্ষ পরিপক্ক হইলে তাহাকে নত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে তদ্রূপ অর্দ্ধজীবন যদি বিদ্যা ধনাদি উপার্জ্জনে ক্ষয় করা যায় তাহা হইলে তখনকার মনকে ধর্ম্মদিকে আনয়ন করা দুরূহ হইয়া থাকে; কারণ সংস্কার ত্যাগ করা কষ্ট সাধ্য।

সতীব যোষিৎ প্রকৃতিঃ সুনিশ্চলা।
পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেষপি॥
মাঘঃ ১। ৭২।

সতী স্ত্রী ও মানুষের স্বভাব জন্ম জন্ম আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

যদি বাল্যকালে কিম্বা যৌবনে ধনাদি উপার্জ্জন সময়ে মানুষ লক্ষ্য বিষয়ে দৃঢ় না

করিয়া কেবল গৃহকার্য্যেই ব্যস্ত থাকেন তাহা হইলে সেই সংস্কার ধর্ম্মোপার্জ্জন সময়েও উদিত হইবে। আরও দুইভাগ সময় যে জীবিত থাকিবেন তাহারই বিশ্বাস কি?

কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥

অদ্য যে কাহার মৃত্যু হইবে কে জানে? কারণ মনুষ্য জীবন চঞ্চল।

অহো হ্যনিত্যা মানুষ্যং জলবুদ্বুদচঞ্চলম্।

দ্রোণপর্ব্বণি ৭৮ অধ্যায়ে অভিমন্যু-বিয়োগে সুভদ্রা।

অথবা মোহমুদ্গরে—

নলিনীদলগত জলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবিতমতিশয় চপলম্।

মনুষ্যের শত বৎসর পরমায়ু, অজিতাত্ম ব্যক্তির তাহার অর্দ্ধেক নিদ্রায় গত হয়; আর কুড়ি বৎসর বাল্য ও কৈশোরে ক্রীড়ায় অতীত হয় পরে জরাতে অসমর্থ হইয়া আরও কুড়ি বৎসর অতীত হয়, বাকি দশ বৎসর দুর্দ্ধর্ষ কাম ও বলবান মোহদ্বারা গৃহাসক্ত হইয়া অতীত হয় কারণ কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি স্নেহ পাশাসক্ত মনকে মুক্ত করিতে সক্ষম হয়!

পুংসোবর্ষ শতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধং চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেহন্ধং প্রাপিতস্তমঃ।
মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ॥
দুরাপূরেণ কামেন মোহেন বলীয়সা।
শেষং গৃহেষু শক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতি হি॥
কো গৃহেষু পুমান্ শক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহ পাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্॥

শ্রীভাগবতে ৭।৬।৬—৯।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

দক্ষযজ্ঞ রহস্য।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—•:•:•—

দেবগণ প্রভৃতি পবিত্র কৈলাস ধামে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রশান্ত মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, মহতের ক্রোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; তাঁহারা বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের ক্রোধ এক দিন, ক্ষত্রিয়ের দুই দিন, এবং বৈশ্যের তিন দিন পর্য্যন্ত কোপ থাকে; যে ব্যক্তি তৃতীয় দিবাসান্তেও ক্রোধ পরিহার করিয়া চিত্তকে শান্ত করিতে না পারে সে ব্যক্তি অস্পৃশ্য চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। দেবগণ ইহাও বুঝিলেন, শ্রীভগবানে যেমন কোন প্রকার দোষের আরোপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ তাঁহাতে ক্রোধের আরোপ করাও অযৌক্তিক। পরমারাধ্য পরমেশ্বরের কাল্পনিক ক্রোধ কেবল সংসারের মঙ্গল ও জীবের কল্যাণ কামনায় একটা লীলাংশ মাত্র ভিন্ন কিছুই নহে। যাহাহউক, যোগীশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা যাহা কহিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—"হে দেব! আপনি জগতের বীজ এবং

জগতের কারণ। আপনি ধর্ম্মার্থ প্রসবিনী ত্রয়ীর (ঋক যজু সাম বেদত্রয়ের) রক্ষার জন্য যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন, দক্ষ কেবল তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। আপনি বর্ণ ও আশ্রমের স্রষ্টা, বেদপারগ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণ আপনারই ব্রতধারী এবং আপনিই সমস্ত কল্যাণের বাস্তব মূল কারণ। হে দেব! আপনি সমদর্শী এবং পরম কারুণিক। আপনার দ্বারা কাহারও প্রকৃত হত্যা হইতে পারে না, কারণ আপনি জীবের উদ্ধার-কর্ত্তা। মায়ার মুগ্ধ হইয়া যে কেহ অপরাধ করে, আপনার শরণাগত হইলে আপনি তাহাকে প্রসন্ন বদনে ক্ষমা করিয়া থাকেন। আপনি যজ্ঞের উদ্ভাবক, যজ্ঞের ফল ও দাতা এবং স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর। দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস হওয়ায় ইহাই বুঝা উচিত, আপনারই যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। হে দেব! আজ্ঞা করুন, যজমান দক্ষ পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠুন, এবং যে কেহ নিহত হইয়াছে তাঁহারা পুনরায় উত্থিত হইয়া আরোগ্য লাভ করুন। আপনার যজ্ঞভাগ আপনি গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হউন এবং পূর্ণানন্দে কল্যাণকর আশীর্ব্বাদ দান করুন।"

ব্রহ্মার সুমধুর বাক্য সমূহ শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য মুখে দেবদেব শিব কহিলেন "বালকের ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অপরাধ আমি মুখে আনা দূরে থাকুক, মনেও চিন্তা করি না। মায়ামুগ্ধগণ স্ব স্ব অপরাধের ফল তাহারা সমুচিতরূপে ভোগ করে, এই জন্য ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে।" এবম্প্রকার সকরুণ বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়া, দেবদেব মহাদেব বিশাল বিশালতর প্রচেতার ন্যায় প্রশান্ত বদনে, বসুমতীর ন্যায় অতুলনীয় ধৈর্য্য সহকারে, অনন্ত আকাশের ন্যায় উদার হৃদয়ে এবং গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় প্রেম ও স্নেহের উচ্ছ্বাসে যাহা কহিলেন তাহা ভগবানেরই সমুচিত। ভাগবতের মহামহর্ষি ও মহাকবি অতি সুন্দর রূপে এই স্থলে ভগবানের বিশ্বব্যাপী কৃপা ও ক্ষমা গুণের পরিচয় দিয়াছেন। বাইবেলের যিশুখৃষ্ট যখন শূলবিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছিলেন তখন নাকি উর্দ্ধদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন "হে স্বর্গস্থ পিতঃ! যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ আমাকে কষ্ট দিয়াছে তাহাদিগকে তুমি ক্ষমা কর।" ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক প্রসিদ্ধনামা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ইংরাজি বাইবেলে খৃষ্টের এই কথা পাঠ করিয়া তাঁহার Oriental Christ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "খৃষ্ট ভিন্ন ক্ষমাগুণের সুন্দরতর আদর্শ আর কি আছে?" ভাই মজুমদার মহাশয়ের বোধহয় ইহা জানা ছিল না যে, এবম্প্রকার এবং এতদপেক্ষা শতগুণে সুন্দরতর দৃষ্টান্ত হিন্দুশাস্ত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। যাহাহউক, মহাদেব কহিলেন "হে সমাগত দেবগণ! হে লোক-পালগণ! ভগদেবতা মিত্রদেবের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে, তিনি এক্ষণে চক্ষুষ্মান হইয়া যজ্ঞভাগ দর্শন করুন। যাঁহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন হইয়াছে তাঁহারা আরোগ্য হউন; যে সকল ঋত্বিকের বাহু নষ্ট হইয়াছে তাঁহাদের নব বাহু হউক। ভৃগুমুনির শ্মশ্রু

উৎপাটিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্মশ্রু হউক।” ইত্যাদি। শিবের আজ্ঞায় ও আশীর্ব্বাদে সকলের তাহাই হইল। অনন্তর দক্ষভবনে গমন করিয়া দেবদেব শিব দক্ষরাজার মৃতদেহে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। প্রজাপতি দক্ষ শিববরে দিব্য (জ্ঞান) চক্ষু লাভ করিয়া নিদ্রাপগমে জাগরিত মানবের ন্যায় অকস্মাৎ উত্থিত হইয়া সম্মুখে ভূতনাথকে দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার কলুষিত ...য়া শরতের সরসীর ন্যায় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। তিনি সভক্তি শিবের স্তব করিলেন। পাঠক মহাশয়েরা দেখিলেন মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হইলে সে ব্যক্তি প্রকৃত দর্শক বলিয়া গণ্য হয় না। সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি সেখ সাদি মহোদয় লিখিয়াছেন—

“চশম্ কুজা বাসদৎ দিদায়ে মাণি বেয়ার।”

ইহার প্রকৃত অর্থ এই—“হে মানব! তোমার চর্ম্মচক্ষু চক্ষু নহে, আধ্যাত্মিক (জ্ঞান) চক্ষু দ্বারা দর্শন কর।”

কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধে বীরাধিক বীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে ও প্রকৃত রূপে বুঝিতে বা দর্শন করিতে পারেন নাই। ভগবান কৃষ্ণ যখন তাঁহাকে দিব্যচক্ষু অর্পণ করিলেন তখন অর্জ্জুন বুঝিলেন, তাঁহার সম্মুখেপূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং উপস্থিত। কৃষ্ণ কহিলেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং॥

শ্রীকৃষ্ণকে তখন দর্শন করিয়া ভক্তিভরে মস্তকাবনত পূর্ব্বক অর্জ্জুন স্তব করিলেন।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

দক্ষেরও তাহাই হইয়াছিল। তিনি শিবকে স্তব করিলেন। অনন্তর ভগবান বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইলে লোকপালগণ কহিতে লাগিলেন, “হে আশ্রয়প্রদ! এই মায়াময় সংসার দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরায় সাতিশয় দুর্গম। অন্তক-(যম) রূপী ভয়ানক কৃষ্ণ সর্প ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। সংসারে বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণিকা সর্ব্বদা মনুষ্যগণকে প্রলোভিত করিতেছে। সুখ দুঃখ স্বরূপ সর্প সকল মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। শোক রূপ দাবাগ্নি দিগ্দাহ করিতেছে। এই সংসারে যে সকল অজ্ঞান লোক বসতি করে তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া এবং দেহভারে ও গেহভারে শ্রান্ত হইয়া কামবশে পীড়িত হইতেছে। অহো! তাহারা কত দিনে আপনার সুশীতল শান্তিপ্রদ শ্রীচরণকমল তলে উপস্থিত হইয়া সুখী হইবে! ক্লেশ-দাবাগ্নি-দগ্ধ তৃষার্ত্ত মনোহস্তী আপনার নির্ম্মল কথামৃত নদীতে নিমগ্ন হইয়া সমুদায় যন্ত্রণা ভুলিয়া যায় এবং ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া আর তাহাহইতে নির্গত হয় না।”

অনন্তর ভগবান বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া দক্ষপত্নী কহিতে লাগিলেন। “হে শ্রীনিবাস! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমাদিগকে ভক্ত বলিয়া গণ্য করুন। হে প্রভো! আপনি সৎ সুতরাং আমরা অসৎ প্রকাশক ইন্দ্রিয় দ্বারা আপনাকে জানিতে পারি না। আপনার অনন্ত কৃপা, অনন্ত সামর্থ্য ও অনন্ত লীলা। আপনি প্রসন্ন

হউন"। ইত্যাদি। অনন্তর ভগবান বিষ্ণু দক্ষকে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া শিব, দেবতাগণ, লোকপালগণ, ঋত্বিক, পুরোহিত প্রভৃতি সহ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহারাজাধিরাজ দক্ষ প্রবর্ত্তিত প্রথম যজ্ঞ ইঁহাদের প্রস্থানের পূর্ব্বে প্রোক্ত অসম্পূর্ণ যজ্ঞ পুনরায় আরদ্ধ করিয়া সকলের প্রীত উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুণ্যময় শ্রীমৎ ভাগবতে দক্ষ যজ্ঞের বিবরণের অবসান কালে মৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন "হে বৎস! প্রকৃত সতী রমণীর পতি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সতীপতি মহাদেব কেবল সতীর আরাধ্য নহেন পরন্তু সমগ্র বিশ্বের পূজ্য ও মহদাশ্রয়। হে বৎস! আমি বৃহস্পতি শিষ্য পরমভক্ত উদ্ধবের মুখে দক্ষযজ্ঞের এই পবিত্র, উৎকৃষ্ট ও সুললিত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ইহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে আয়ুর বর্দ্ধন, পাপের বিনাশন এবং জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।"

পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন, দক্ষযজ্ঞে সতীর তনুত্যাগ ঘটনা ভারতবর্ষীয় হিন্দুসাহিত্যে ও লোক সমাজে প্রবাদ বাক্য-বৎ পরিচিত হইয়া গিয়াছে। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,— আধ্যাত্মিক চক্ষু দিয়া দর্শন করিলে শিব ও সতী এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যিনি নারীরূপে প্রকৃতি তিনিই নররূপে "পুরুষ"। শিবকে সতী কহিতেছেন "সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে।" (অন্নদামঙ্গল)। প্রকৃতি যেমন সতী হইয়াছিলেন তেমনি কৃষ্ণবর্ণা কালীমূর্ত্তিতে দক্ষালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি কখন কৃষ্ণামূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। এই ভয়ানক কালমূর্ত্তি এবং কৃষ্ণকায় দেখিয়া দক্ষের ঘৃণা, বিদ্বেষ, কোপ ও বিরক্তির অধিকতর উদ্রেক হইয়াছিল।

লুকাইয়া দশমূর্ত্তি সতী হৈলা সতী।
গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মূরতি॥
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে।
শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥

দক্ষপত্নী যখন শিব-সামর্থ্য ও শিবমাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন, তখন গাইয়া ছিলেন—

"শিব নাম বলরে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে॥
শিব নাম লয়ে মুখে, তরিব সকল দুঃখে,
দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিবহয় শিব সেবনে॥"

(অন্নদা মঙ্গল)

একথা স্বতঃ সিদ্ধ যে, যিনি প্রকৃতি তিনিই কালী আবার তিনিই দুর্গা, সরস্বতী, রাধিকা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, মহামায়া প্রভৃতি নাম বা উপাধিতে বিখ্যাত। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে বুঝা যায়, একই পরমেশ্বর লীলাচ্ছলে কখন শ্রীকৃষ্ণরূপে, কখন শিব রূপে কখন, কখন শ্রীরামচন্দ্ররূপে, কখন মহিষমর্দ্দিনী রূপে, কখন শ্রীমতী রাধিকা রূপে এবংপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূ[illegible] স্বকার্য্য সাধন করান, অথচ তিনি নি[illegible] নির্গুণ, নিরঞ্জন এবং নিরপেক্ষ।* [illegible]

* প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনা[illegible]
"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাব[illegible]"
(ভগবৎগীতা)।

চক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে ইহাও বুঝা যায়, এই জগত শিবময়; জগত ব্রহ্মের সত্বায় পরিপূর্ণ। সমস্ত বিশ্বমণ্ডল সেই সচ্চিদানন্দের মহাপ্রকাশ মাত্র। জড় ও চৈতন্য উভয়েরই তিনি মূল কারণ। যেখানে জীব সেইখানে শিব, প্রত্যেক জীব শিবের সত্বার পরিচায়ক। কিন্তু "অহং শিবঃ" এই ভাব কেবল মুখের বাক্য মাত্র হইলে চলে না; শিবত্ব প্রাপ্ত না হইলে "আমি ব্রহ্ম" একথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই। জীব মাত্রেই ভগবানের অংশ বা সত্বা কিম্বা প্রকাশ হইলেই যে ভগবান হইয়া গেল, ইহা যাহারা বিবেচনা করে তাহারা বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা মূর্খতায় পরিপূর্ণ। সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্রের অংশ কিন্তু তথাপি সমুদ্র নহে। উভয়ে একত্রে অঙ্গীভূত হইয়া থাকিয়াও তরঙ্গ হইতে সমুদ্র সর্ব্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র; তরঙ্গ সমুদ্র নহে। সমুদ্রও তরঙ্গ নহে। "আমি ব্রহ্ম, আমাতে ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, সুতরাং পাপ পুণ্য কিছুই নহে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই নহে, স্বর্গ ও নরক কিছুই নহে, আমাতে কোন প্রকার পাপ স্পর্শ করিতে পারে না এবং পাপের জন্য আমি দায়ী নহি; এবং প্রকার ভাবনা কেবল অধমাধম গণ্ডমূর্খের ও মহাপরাধীর পক্ষেই সাজে, অপর কাহারও পক্ষে সাজে না। এইরূপ ভাবনা Downright blasphemy against God which is an unpardonable sin before man and Divine Providence. সুতরাং শাস্ত্রের কথা সমূহ তত্বজ্ঞানের সহিত আলোচনা করিয়া পালন করা উচিত।

পাঠক মহাশয়! দক্ষযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। পূর্ব্বকালে সনাতন ও সাত্বিক হিন্দুর রাজত্ব কালে ধার্ম্মিকেরা বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সকল যজ্ঞে সামাজিক ধর্ম্মনৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক বিষয় সমূহের আলোচনা হইত এবং ইহকাল ও পরকালের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইত। বিদেশীয় যবনদিগের ও খৃষ্টানদিগের শাসন বশতঃ ক্রমে ক্রমে এবম্প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত গিয়াছে। যাহাহউক, দক্ষযজ্ঞের বিবরণকে সর্ব্বভাবেই আলোচনা করা যাইতে পারে; ইহাতে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, আধ্যাত্মতত্ব, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের গুরুতর ও প্রয়োজনীয় কথা আছে। দক্ষযজ্ঞে শিবচরিত্র অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের অনন্ত সামর্থ্য, অনন্ত করুণা, সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি অসীম স্নেহ ভক্তের প্রতি প্রেম, অনুচরের প্রতি বৎসলতা এবং জীবের উদ্ধার ও কল্যাণের জন্য অভিলাষ, প্রভৃতি গুণ সমূহ দক্ষ জামাতা শিবচরিত্রে ভগবতের মহিমা মহোদয় পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। অহঙ্কার, নির্ব্বুদ্ধিতা, অজ্ঞানজনিত মায়া, বৈষয়িকতা বশতঃ মাৎসর্য্য, অত্যাচার, অপরাধ প্রভৃতি জন্য দক্ষরাজা দেবতা ও মানবদিগের নিকট অতীব বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৃথা গর্ব্বের কখনই স্থায়ীত্ব থাকে না; পরমারাধ্য পরমেশ্বর কখন পাপের প্রশ্রয় দেন না, পৃথিবী কখন অত্যাচারকে অধিক কাল ব্যাপিয়া সহ্য করেন না; ধর্ম্ম কখন নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম

নরপতিকে সহানুভূতি প্রদান করেন না; এই সকল কথা দক্ষের জীবনে সুন্দররূপে প্রতিভাত হইতেছে। গর্ব্বহারী ভগবান দক্ষের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। পৃথিবীর শত শত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর রাজার জীবনে এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। যে রাজা শক্তিশালী ব্যক্তিবৃন্দকে উপেক্ষা করে, শিক্ষিত ও সম্মানিত পুরুষকে অপদস্থ করে, ন্যায় বিচারে পরাঙ্মুখ হয়, ধনবল ও জনবলের আধিক্যবশতঃ অহঙ্কারী হইয়া ধরাকে সরাতুল্য জ্ঞান করে, প্রজাকে অকারণে ক্লেশ দেয় এবং রাজ্যবাসী জনসাধারণের সাধু অভিমতের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, সত্যাধিপতি দক্ষরাজার জীবন চরিত তাহার পক্ষে সুন্দর দৃষ্টান্ত হইতে পারে। দেবতার অংশে দক্ষের জন্ম; সমুদয় বিদ্যা, ধন ও সামর্থ্যের তিনি আকর স্বরূপ; দেবদেব শিবের তিনি শ্বশুর এবং নারায়ণী ভগবতীর তিনি পিতা; সমগ্র হিমালয় পর্ব্বতের তিনি নরপতি; দেবতারা তাঁহার বন্ধু, প্রধান প্রধান ঋত্বিকেরা তাঁহার মন্ত্রদাতা এবং সতীমাতা তাঁহার সহধর্ম্মিণী; অত্যাচারে, অপরাধে, অন্যায় বিচারে, অহঙ্কারে এবং নির্ব্বুদ্ধিতায় যখন এত বড় মহারাজাধিরাজের পতন ও বিনাশ হইয়াছে, তখন এই নশ্বর মর্ত্ত্য-ধামের মানবেরা কি জন্য এত গর্ব্ব করে তাহা বুঝি না। "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট" ইহা চিরন্তন প্রবাদ। ন্যায়, ধর্ম্ম, নিরপেক্ষতা ও স্নেহ, এই গুণ চতুষ্টয় রাজা ও রাজ্যের রক্ষক। পৃথিবীর যে কোন রাজা এই গুণ চতুষ্টয়কে পদতলে দলিত করে তাহার পতন ও বিনাশ অনিবার্য্য, ইহা জ্যামিতির সংজ্ঞার ন্যায় ধ্রুব বাক্য।

সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বীর পূজা।

ভারতবাসীর—তাহাতে আবার ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালীর মুখে বীরপূজার কথা বলা 'ভূতের মুখে রাম নামের' ন্যায় একটা অঘটনীয় ব্যাপার মনে করিয়া হয় ত অনেকে উপহাস করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগেরই নিকট জিজ্ঞাস্য—কুক্কুর কি চিৎ হইয়া শুইতে ইচ্ছা করে না? কিম্বা দাস্যোপজীবীর মনশ্চক্ষু একমুহূর্ত্তের জন্য কি, অন্ততঃ আপনাকে কুবেরালয়ের অধিপতি না হউক,—দ্বারপালরূপেও দেখিতে ইচ্ছা কি করে না? বিশেষ আজকাল যখন স্বদেশপ্রীতির সুরস শীকরকণায় বায়ুমণ্ডল পরিপূরিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যখন এই নব্যভারতের পক্ষে পরম-মঙ্গলময় স্বদেশী আন্দোলন, 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং,' ইত্যাদি জাতীয় অসাধ্যসাধন করিতেছে, বিদ্যা বুদ্ধিমত্তায় ঈর্ষার পাত্র, কিন্তু বিদেশীয়ানুকরণে দাসত্বানুরাগে ঘৃণার আধার বাঙ্গালী জাতিই যখন অক্ষুণ্ণ উৎসাহে অদম্য সাহসে অথচ অসীম সহিষ্ণুতায় ভারতীয় অপরাপর জাতি সাধারণের নমস্য হইয়াছেন; যখন উন্নত অনুন্নত সকল মস্তিষ্কই অল্প বিস্তর ক্রিয়াশীল; তখন নগণ্য লেখকদিগের

লেখনী ও যে কোন ও দেশীয় বিষয়ের আশ্রয়ে নির্ব্বাধ চলিতে সাহসী হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

বীর বলিলেই একজন মহাবলিষ্ঠ রণ-কুশল সেনানায়ক বুঝিতে হইবে সাধারণতঃ এইরূপ একটি প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই অর্থে ভারতভূমিকে বীরপ্রসূ বলিলে, কথাটা আধুনিকযুগে তাদৃশ সার্থক বলিয়া সহসা প্রতীয়মান হয় না। বাঙ্গালায় এরূপ বীরের সংখ্যা যশোহর ভূষণ মহারাজা প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম রায়েই শেষ হইয়াছে বলিলে বোধ হয় অনেকে আপত্তি করিবেন না। প্রাচীন বাঙ্গালীর সিংহল-বিজয় ত এক্ষণে উপকথায় পরিণত। মোহন লাল একজন বড় বীর ছিলেন শুনা যায়, কিন্তু বিদেশীয়ের পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাসে তাহার বিশেষ কিছুই উল্লেখ দেখিতে পাই না। অথচ সেই ইতিহাস পড়িয়াই বক্তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহীর সাহায্যে বাঙ্গলার তদানীন্তন ভীরু রাজা লক্ষ্মণসেনকে বিতাড়িত করিয়া অবাধে সমস্ত বাঙ্গলার অধিকার প্রাপ্ত হন— কাপুরুষ বাঙ্গালীরা দ্বিরুক্তি মাত্র করিতে সাহস করে নাই; চিলনওয়ালার যুদ্ধে জয় পরাজয় মীমাংসিত হয় নাই বরং শিখ-দিগের অপেক্ষা ইউরোপীয় বাহিনীর অধিক-তর উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছিল! ইত্যাদি অপূর্ব্ব জ্ঞানরাশি সংকলনে সমর্থ হই। ইহাতে বোধহয় বিজিত জাতির গুণাবলীর অপলাপ করিয়া বৃথা কতকগুলি কলঙ্ক আরোপ করাই বিজেতৃজাতির উদার ধর্ম্ম ও পরম মাহাত্ম্য। আবার উমীচাদ অর্থগৃধ্নু বিশ্বাস ঘাতক ! তাই উদার প্রকৃতি ক্লাইব, তাহাকে প্রতারিত করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন ; মহারাজ নন্দকুমার জাল জুয়াচুরি করিয়া দিনপাত করিতেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আপ্তবাক্যই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ, সুতরাং অন্য প্রমাণ প্রয়োগের তাদৃশ আবশ্যকতা বিবেচিত না হওয়ায়, অচিরে অসহায় ব্রহ্মাণের ফাঁসী হইয়া সমস্ত বিচারের অবসান হইল। অথচ তাহার দেড়শত বৎসর পরে এই উন্নততর সভ্যতার দিনে ডেভিডের ন্যায় একজন সাধারণ ফিরিঙ্গী সৈনিক আক্রোশ বশে একজন উচ্চবংশীয় ভারতবাসীর প্লীহাস্ফুটন করিয়া, মদিরা পানোন্মত্ততার জন্য সামান্য কিছু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, অর্দ্ধ সরকারী সংবাদ পত্রগুলি, ন্যায়ের অনুরোধে স্বজাতির প্রতিও রাজার কঠোর দণ্ডবিধানের কথা কীর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয় ব্রুটসের বিচারকাহিনীর অবতারণা করিয়া থাকেন। আবার ইংরাজ-জাতির গৌরব প্রধান প্রবন্ধ লেখক, রাজ-নীতিজ্ঞ ও ঐতিহাসিক লর্ড মেকলে, বাঙ্গা-লীরা মিথ্যাবাদী জালিয়াত, বঞ্চক ইত্যাদি যাবতীয় ঘৃণ্য দোষগুলি সমস্ত জাতির উপর আরোপ করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নাই। নরমাংসলোলুপ আফ্রিকাবাসীদিগের প্রতিও, বোধহয়, এরূপ দুহাতি চোপ শোভা পায় না। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহারা বিজেতৃজাতির বংশোদ্ভূত—তাঁহাদিগের সাতখুন মাপ। সত্য হউক বা না হউক, জগতের সমস্ত কলঙ্কের ডালি তাঁহারা আমাদিগের মাথায় চাপাইতে পারেন ; আমাদিগের কিন্তু একজন দিনজীবীর সম্বন্ধে

কোন সত্য দোষ ঘোষণা করিতে হইলেও, সর্ব্বদা মানহানির মোকদ্দমার (Defamation Caseর ভয়ে জড়সড় থাকিতে হয়,—আবার রাজ জাতীয়ের বিরুদ্ধে বলিয়া পাছে রাজবিদ্বেষের (Sedition) দাবিতেই বা পড়িতে হয় অনেক সময়ে এ আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয়*। অতএব আশু অথবা পেড্রো খানসামাই হউন, বা গলির চৌকীদারই হউন, তাঁহারা যখন রাজজাতীয়, তখন তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহাই বেদ-বাক্য.—যাহা করিবেন তাহাতেই আমাদের বাপের ঠাকুর না বলিলে নিস্তার নাই। হয় ত তাঁহার সাত পুরুষের মধ্যে কোন পূর্ব্বতনের সহিত কোনও ইংরাজ সংশ্রব ঘটিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার আর রাজ জতীয়ত্বে (Ruling Race) বাধা কি ? ইলবার্ট প্রভৃতির সৃষ্টি ত তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য। এই উপলক্ষে একটি ক্ষুদ্রগল্প পাঠকদিগকে উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—বড় বড় সহরে মিউনিসিপালিটিকে কুকুর হত্যারূপ মহৎকার্য্যানুষ্ঠানে ? অতিরিক্ত যত্নবান্ দেখা যায় এবং এই দয়াধর্ম্মপ্রণোদিত সৎকার্য্য সম্পাদন জন্য বহু সংখ্যক ডোম বা হাড়ি নিযুক্ত থাকে একদিন গলিতে দুইটি কুকুরকে অসাবধানে বেড়াইতে দেখিয়া, সুযোগ বুঝিয়া এক ডোমযুবক তাহাদিগকে বধারজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিল। ইতাবসরে একজন পাপ্রবয়স্ক সমব্যবসায়ী আসিয়া, তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'তুই করিতেছিস্ কি ?' সে বলিল 'কেন, কুকুর মারিতেই ত সরকার আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন ; অন্যের ন্যায় তুমিও যদি তাহাতে বাধা দেও, তাহা হইলে, আমাদিগের আর হুকুম তামিল করা হয় না দেখিতেছি!' বর্ষীয়ান্ উত্তর করিল, 'আরে আমি কুকুর মারিতে নিষেধ করি নাই, সরকার জন্ম জন্ম কুকুর মারিতে থাকুন ; কিন্তু তুই যে একটা বিলাতী কুকুর ধরিয়া যত গণ্ডগোল বাধাইয়া বসিয়াছিস্।' বালক ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল ও অবশেষে বলিল 'বিলাতী কুকুর ত বড়লোকে অনেক টাকা দিয়া কিনিয়া, যাহা তাঁহারই অনেক আত্মীয় স্বজনে চক্ষে দেখিতে পায় না এমন খাদ্যাদি দিয়া ও সর্ব্বদা সেবার জন্য চাকর নিযুক্ত করিয়া পরমযত্নে রাখেন, আমি তাহাদিগকে ধরিব কিরূপে ?' উত্তরে বৃদ্ধ বলিল, 'পাগল তাহারা ত খাস বিলাতী, আর ঐ সেটার মুখের লোম কিছু লম্বা দেখিতেছিস, ওটা 'দোআঁশলা' কুকুর, বিলাতীরই জাত, উহাকে ছাড়িয়া দে, সব ফজিহত মিটিয়া যাক।' দেশী হইতে বিলাতীর পরিচায়ক—মুখের দুই একটি লম্বালোম, বালক এই নূতন পরিভাষার

---

* পুলিশকমিশনের সমক্ষে পুলিশের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ ও কত কেলেঙ্কারির কথাই না প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ প্রতীকারমানসে প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগের দোষ উদ্ঘাটন করিলে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলেরই মানহানির দাবিতে পড়িতে হইতেছে, ইহাতে তাহাদিগের জুলুম বাড়িবে কি কমিবে তাহা অবশ্য রাজার বিচার্য্য। ইহা রাজনীতি—বিজীত জাতির সম্পত্তি নহে।

আবৃত্ত করিতে করিতে লম্বা লোমশূন্য ভাগ্যহীন নিরীহ দেশী কুকুরটিকেই বধ্য ভূমিতে লইয়া চলিল। এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বেসরকারী ক্ষুদ্র ইউরোপীয় বা ইউরেশীয়দিগের প্রতি আমাদিগের রাজভক্তির ন্যায়, দীর্ঘলোম বিশিষ্ট কুকুরের প্রতি ডোমের সম্মান প্রদর্শনও যে বীর পূজার অতিভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট উদাহরণ, তাহা হৃদয়বান মাত্রেরই স্বীকার্য্য এবং এই জন্যই আপাত প্রতীয়মান অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হইল। কারণ কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে অযথার্থ ও যথার্থ উভয় অংশই জানা আবশ্যক, নচেৎ বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞানলাভে সমর্থ হওয়া যায় না, অতএব লাস্কীর পূজার বিবরণকে অবান্তর বিষয় বোধে প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে কেন?

এদিকে ভারত ছয় সাত শত বৎসর যাবৎ বিদেশীয়ের কর কবলিত। এই দীর্ঘকাল হইতেই ভারত ভারতবাসীর গৌরব রক্ষা বিষয়ে রাজার সহানুভূতি হারাইয়াছে। এক দেশীয় ও সমধর্ম্মাবলম্বী হইলে অনেকটা সমপ্রাণতা। আসিয়া পরে কিন্তু কি পাঠানে, কি মোগলে কি ইংরাজে ভারতবাসীর সে সমপ্রাণতা লাভের হেতু আদৌ বিদ্যমান নাই। তাই পৃথ্বীরাজ স্তম্ভ কুতুব মিনারে, বৃন্দাবনের ও বারাণসীর প্রধান মন্দিরগুলি মসজিদে প্রয়াগ বরিশাল ময়মনসিংহ ও ঢাকা প্রমুথনগর ইলাহাবাদ, বাকরগঞ্জ, নসিরাবাদ প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত। আবার ইংরাজ রাজত্বকালে চুনারদুর্গ জেলখানায় ও পালামৌ ড্যাল্টনগঞ্জ পরিবর্ত্তিত এবং দিল্লী ও আগ্রার প্রাসাদাবলী বিশেষ২ কার্য্যে নিয়োজিত। তাই বলিতেছিলাম, ভারত যখন এখন শত শত যোজন দূরদেশবাসী ধর্ম্মান্তরানুরাগী জাতির অধিকৃত, তখন ভারতের যে কোন কালে কিছু ছিল, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয় ফলক হইতে মুছিয়া ফেলাই বোধ হয় ইংরাজ নীতিজ্ঞতার একমাত্র উদ্দেশ্য। নতুবা জেমস্ মীল মেকলে প্রভৃতি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের ঐতিহাসিক সত্যনির্দ্ধারণের এরূপ মতিভ্রমের অপর কোনও জাগতিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কি? নচেৎ ভারত যখন স্বাধীন ছিল, সেই সময়ে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের সভায় সন্ধি কামনায় আসিয়া বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা বলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন ও দেখিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার যে যে অংশ এখনও পাওয়া যায় ও ষ্ট্রাবো প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকের তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে যে বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নত সভ্যতা ও নীতিজ্ঞানের উচ্চ আদর্শেরই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ ইংরাজরাজ প্রতিনিধি, মেকলের ন্যায় শুধু বাঙ্গালীকে নয় সমস্ত ভারতবাসীর উপরেই বিথ্যাবাদী প্রভৃতি নানা সুমিষ্ট সম্ভাষণ উদ্গীরণ করিয়া স্বীয় চরিত্র মাহাত্ম্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয় শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা

আমরা কয়েক শতাব্দী হইতে অনুভব করিয়া আসিতে ছিলাম বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক যে এতদূর বিকারপ্রাপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হয়, যে তাহাতে মনুষ্য-স্বভাব—এমন কি প্রকৃতির পর্য্যন্ত আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে, এ খাতটি লর্ড কর্জ্জনের মুখারবিন্দ হইতে মৌলিক ভাবে নির্গত হইবার পূর্ব্বে জগৎ অবগত ছিল না। সেই জন্যই বোধ হয়, যে জাতি চুরির ভয়ে দরজায় কুলুপ বন্ধ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিত না, ন্যায়বিচারের আশায় ধর্ম্মাধিকরণ ও বিচারালয়ের অন্বেষণের প্রয়োজন বোধ করিত না, এক পরাধীনতা অপরাধেই কি সেই জাতির প্রকৃতি স্বর্গের দেবতা হইতে নরকের কীটের সমস্তরে পর্য্যবসিত? এ প্রশ্নের সমাধান সেই মহাপ্রতিভাবান্ মহাপুরুষ ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে বলিয়া বোধহয় না। কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ উদারাশয়তা—সত্বেও ভারতবাসী চিরকাল তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার চক্ষেই দেখিবে, যেহেতু তিনিই মৃতপ্রায় ভারতীয়দিগের হৃদয়ে নবজীবন অঙ্কুরিত করিয়া জাতীয় সঞ্জীবনী শক্তির বিকাশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। নবীন প্রদেশের নূতন শাসনকর্ত্তা নবকর্তৃত্বের প্রবল উত্তেজনায় সেই শক্তিতে দিন দিন গতি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং ভারতের অধস্তন সন্ততিদিগের হৃদয়পটে তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় রূপে লিপিবদ্ধ থাকিবে, সন্দেহ নাই। অতএব ভারতের নিকট ইঁহারাও বীরপূজা লাভের যোগ্য। উৎকৃষ্ট বীরে যে জাতীয় আত্মোৎসর্গ ও পরার্থে স্বার্থবলির দৃষ্টান্ত দেখা যায়, উক্ত মহামতিদ্বয়ে তাহার লেশমাত্র বিদ্যমান না থাকিলেও, তাঁহারা যে নিতান্ত নিকৃষ্ট বীর, তাহাও নহে; কারণ তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুসারেই হউক বা নাই হউক, তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপরই ভারতবর্ষের ভাবী উন্নতি নির্ভর করিতেছে; অতএব তাঁহারা মধ্যম বীর-শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, আবার যখন ভাবি, আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি; লৌকিক অবনতির দিকে যাইতে বসিয়া অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হইতে অগ্রসর হইয়াছি; তখনই 'আমাদিগের কি ছিল'?—এই প্রশ্নটি ক্ষণপ্রভার ক্ষীণ আলোক-রেখার ন্যায় মনোমধ্যে উদিত হইলে, কিছু সময়ের জন্য আমাদিগের অধোগতি যেন একটু প্রতীপগামী হয় বলিয়া কতকটা প্রতীতি জন্মে। তাই বলি, বিদেশীয়দিগের কুহকে ভুলিয়া আমাদিগের অতীত ইতিবৃত্ত, জাতীয় ইতিহাস ভুলিলে চলিবে না। কারণ ভূতের চর্ব্বিত চর্ব্বণে যদি কখনও ভবিষ্যতের অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়, এবং এই আশায় হস্তকণ্ডুতি নিবারণ ব্যপদেশে এই অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা। এখন, এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর 'বীর' শব্দের একটা লক্ষণ নির্দ্দেশ নিতান্ত সুসঙ্গত না হইলেও, বীর বলিলে আমাদিগকে যে কেবল মহাযোদ্ধাই বুঝিতে হইবে, এরূপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। ঐতিহাসিক যুগে জয়পাল, পৃথ্বীরাজ, ভীমসিংহ, সংগ্রামসিংহ, গুরুগোবিন্দসিংহ, রাজসিংহ প্রভৃতি যেমন অসাধারণ শৌর্য্য, রণনিপুণতা, স্বদেশপ্রেমিকতা ও আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত

রাখিয়া গিয়াছেন ; মহারাষ্ট্রধুরন্ধর ছত্রপতি মহারাজ শিবাজী, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ-সিংহ ও মিবারভূষণ প্রতাপসিংহ যে ভারত-বাসী সাধারণের সমান শ্লাঘার পাত্র ; শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ বল্লভাচার্য্য, নানক, রামদাস, তুকারাম, তুলসীদাস, চৈতন্য, হর্ষবর্দ্ধন,অশোক, বিক্রমাদিত্য, প্রতাপাদিত্য, শেরসাহ, আকবর, মীরকাশীম, নানা ফড়্‌-নবীস, রাণাড়ে, দয়ানন্দ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মহাত্মাগণও আমাদিগের কম গৌরবের সামগ্রী নহেন ; এবং এখনও পূর্ণ উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণশীল নাওরোজী, তিলক, গোখলে, লজপত রায়, ওয়াচা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণও যে আমা-দিগের গৌরবস্থল, তাঁহাদিগের কার্য্যা-বলী আলোচনা করিয়া বোধহয় কোন ভারতবাসীই তাহা অস্বীকার করিবেন না। পূর্ব্বোল্লিখিত মহাত্মাগণ একই প্রকার কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ না করিলেও, যখন নানা ভাবে দেশহিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশের—স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, তাঁহারাও যে আমাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-প্রণোদিত বীরপূজা গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র, এ সম্বন্ধেও বোধহয় কাহা-রও সন্দেহ নাই। রাজস্থানের অধিকাংশ স্থান ও কুরুক্ষেত্র, কোহল্পুর, থানেশ্বর প্রভৃতি রণভূমি—গ্রীকদিগের থার্ম্মপলি ও মারাথন যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় তীর্থরূপে পরিগণিত, সেই-রূপ এই সমস্ত স্বর্গবাসী ও জগৎবাসী মহাত্মাগণের লীলাক্ষেত্রও আধুনিক যুগের প্রত্যেক স্বদেশভক্ত ভারতবাসীর নিকট মহাতীর্থরূপে পরিগণিত, তাঁহাদিগের জীবন-চরিত্র সমালোচনাই প্রধান স্বাধ্যায় ; তাঁহা-দের চিত্র দেবপ্রতিকৃতি-স্থানীয়, তাঁহাদের জন্মতিথি আমাদিগের জাতীয় উৎসব দিবস-রূপে গ্রহণীয় এবং স্থানে২ তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনই * মঠপ্রতিষ্ঠার তুল্য-ফলোপধায়ক। এইগুলিই যথার্থ বীরপূজার অঙ্গ। উচ্চ আদর্শের সহিত এইজাতীয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে কালবশে তাঁহাদিগের মহা-প্রাণতা ক্রমে সংক্রমিত ও সঞ্চারিত হইয়া, আমাদিগের ন্যায় নগণ্যকেও মহান্ করিতে পারে। ইহাই এই পবিত্র পূজার পরম পুণ্যময় ফল।

পূর্ব্বোদাহৃত বীরপূজায় রাজা-প্রজা, কাহারও বিসংবাদ থাকিতে পারেনা। জাতীয় জীবনকার্য্যে বীরপূজার যে কি মহৎফললাভের সম্ভাবনা, তাহা এখনকার উন্নতির চরমসীমায় অধিরূঢ় জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য এককালে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জাপানের উপস্থিত উন্নতির মূলে বীরপূজার প্রভাব কম নহে। ইংরাজকবি বাইরণ এই বীর-পূজায় অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রীকদিগের প্রাচীনগৌরব পুনরুদ্ধার মানসে নবীন বয়সেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। অধিক কি, নেলসনের নামে কোন্ ইংরাজের, নেপোলিয়নের নামে কোন্ ফরাসীর ও

* বঙ্গবীর বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভার ও মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে আমরা বিশেষ পক্ষ-পাতী। বাঙ্গালার সাহিত্যগুরুর এ পর্য্যন্ত একখানিও জীবনচরিত প্রকাশিত না হও-য়ায় একটি বিশেষ অভাব রহিয়া গিয়াছে।

ওয়াশিংটনের নামে কোন্ যুক্তরাজ্যবাসী আমেরিকানের গর্ব্বিত শির পৌত্তলিকের ন্যায় নমিত না হয়? বিশেষতঃ নামের সহিত এক একটি জাতির হৃদয়তন্ত্রীগুলি এরূপভাবে গ্রথিত রহিয়াছে যে, একটিতে ঘাত প্রতিঘাত হইবামাত্র সবগুলি সমস্বরে বাজিয়া উঠে। কিন্তু কই, শিবাজীর নামোচ্চারণ মাত্রই ভারতবাসীর হৃদয়সমূহে যুগপৎ তাদৃশ তড়িৎপ্রবাহ ও ধমনীতে রুধিরধারা প্রবাহিত হওয়ার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় কই? সকল ভারতীয়দিগকে প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার গুণগানে জাতীয় গৌরবে উদ্দীপিত হইতে দেখি কই? কেন, শিবাজী কি উক্ত বিদেশীয় মহানুভবগণ অপেক্ষা কি বীরত্বে, কি দেশানুরাগে, কি আত্মোৎসর্গে, কোন অংশে হীন ছিলেন? আমাদের বোধহয়, এরূপ অবসাদের বিশেষ কোন কারণ আছে। যেমন মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই মৃগরাজ সিংহকে আপনার পদদলিত অবস্থায় অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে পারিয়াছে মাত্র, নচেৎ কোন সিংহ কোনকালে মনুষ্য পদতলে বিদলিত হইয়াছিল কিনা, সন্দেহস্থল; সেইরূপ বিদেশীয়ের ইতিহাসে আমরা মহাত্মা রামদাসশিষ্য ছত্রপতি শিবাজীকে পার্ব্বতীয় মূষিক, দস্যুদলপতি ইত্যাদি অপ-উপাধিভূষায় মণ্ডিত দেখি, তিনি লুণ্ঠনকারী, প্রতারক, নৃশংস, মনুষ্যোচিত কমনীয় গুণবিবর্জ্জিত, ভ্রাতৃদ্রোহী, পুত্রদ্রোহী ইত্যাদি বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পাই। সুতরাং তাহা পাঠে আমরা মহাবীরের সম্মাননার পরিবর্ত্তে অবমাননা করিতেই শিখিতেছিলাম; কাজেই এতাদৃশ আত্মত্যাগী দেশোদ্ধারকের যথোচিত সৎকার না-করা-জনিত মহাপাপে আমাদিগের অধোগতির পথও দিন দিন প্রশস্ত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু শুভক্ষণে স্রোত ফিরিয়াছে, তাই শিবাজী-মহোৎসব মহারাষ্ট্র অতিক্রম করিয়া ক্রমে বঙ্গ-বারাণসী প্রদেশেও জাতীয় উৎসব রূপে পরিগৃহীত হইয়া, আপামর সাধারণ্যে মহচ্চরিত্রের মহীয়সীশক্তি সঞ্চারিত করিবার শুভ অবসর উপস্থিত করিয়াছে। দেশীয় মহানুভবগণও তাঁহার যথার্থ জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া কূট ঐতিহাসিক প্রহেলিকার সমাধান করিতেছেন। এইরূপে সমস্ত বীরচরিত্রগুলি বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের অন্ধকারময় কুহেলিকা ভেদ করিয়া আত্মরশ্মিতে জগৎ যে দিন হইতে পরিব্যাপ্ত করিতে পারিবে, সেই দিনই বুঝিব, আমরা যথার্থ বীরপূজা করিতে শিখিয়াছি। এখনও আমাদিগের দেশ-মুখগণের যথার্থ চরিত্র জানিবার উপযোগী, তাদৃশ জাতীয় ইতিবৃত্ত বা জীবনী সংকলিত হয় নাই, সুতরাং বীরপূজায় আমাদের যথাভিলষিত একাগ্রতাও পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু আমাদিগের বালক ও যুবকদিগকে জাতীয় ভাবে শিক্ষা দিবার শুভ অবসরও আর সুদূরপরাহত আকাশকুসুম নহে। অতএব উক্ত প্রকার পুস্তক প্রণীত হইয়া 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্ণীত হইলে, আমাদিগের ন্যায় আমাদিগের পরবর্ত্তীগণের আর কতকগুলি কলুষিত ও নিষ্প্রয়োজনীয় জ্ঞানরাশির বোঝা বহিতে হইবে না। অতএব দেশহিতাভিলাষীগণের কর্ত্তব্য—স্বধর্ম্মের, স্বদেশের,

স্বজাতির মঙ্গল সাধনে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, সেই মহানুভবগণের জীবনচরিত যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতবাসীগণকে উজ্জ্বলতর ঐতিহাসিক আলোক সাহায্যে উন্নত আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করেন। আমাদিগের মতে ইহাই বীরপূজার প্রথম অনুষ্ঠান। ইংলণ্ডের সাহিত্য-সম্রাট কার্লাইল ও আমেরিকার পণ্ডিতচূড়ামণি ইমার্সন জগতের জন্য যাহা করিয়াছেন, আমরা আপনার জন্য, স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্যও কি তাহা করিতে পারিব না? অতএব ভারত-সন্তানগণ, আর উদাসীন থাকিবেন না, এই মহৎ অভাব মোচনে কৃতসংকল্প হউন। আসুন, আমরা মহত্তর চরিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, দেখিবেন নিজের চিত্তপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের ও স্বজাতিরও পরম উপকার সংসাধিত হইবে। ইহারই নাম কার্য্যতঃ বীরপূজা (Practical Heroworship)।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়।

—•:•:•—

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

অন্বয়।—সঞ্জয় উবাচ। তথা কৃপয়া—আবিষ্টং অশ্রুপূর্ণ—আকুল—ঈক্ষণং বিষীদন্তং তং মধুসূদনঃ ইদং বাক্যং উবাচ ॥১

প্রতিশব্দ —সঞ্জয় বলিলেন। সেইরূপ দয়া-বিশিষ্ট অশ্রুসম্পূরিত-কাতর নয়ন শোকনিরত তাঁহাকে নারায়ণ এই কথা বলিলেন ॥১॥

ব্যাখ্যা।—সঞ্জয় এখনও বলিতেছেন, সেই করুণার্দ্রহৃদয় গদগদশ্রুলোচন ব্যাকুলচিত্ত বিষাদ-নিমগ্ন অর্জ্জুনকে ভগবান্ পশ্চাল্লিখিত বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥৪১॥

কয়েকটি টীকার তাৎপর্য্য।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বিতীয়াধ্যায়ে আত্মানাত্মবিচারজনিত ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অর্জ্জুনের শোকমোহরূপ তমোরাশিকে অপনোদন করতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ মুক্ত পুরুষের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যখন উভয়দলে ভীষণ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং বীরগণ স্ব স্ব বাহু আস্ফালনপূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বীরকেশরী নরপুঙ্গব অর্জ্জুনের হৃদয়ে ধর্ম্মক্ষেত্র-মাহাত্ম্যেই হউক, কিংবা সত্ত্বগুণনিকেতন ভগবৎসান্নিধ্য বশতঃই হউক, সত্ত্বগুণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়াকাশে অহিংসা পরমধর্ম্ম, এই পরম জ্ঞানস্বরূপ দিবাকর সমুদিত হইল। সমর-প্রাঙ্গনে সমুপস্থিত পিতার ন্যায় প্রতিপালনকর্ত্তা পিতামহ ভীষ্ম, সমর-সন্ধানের শিক্ষা বিধানে সুদক্ষ পূজাস্পদ গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য ও ভ্রাতা দুর্য্যোধন প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণকে দর্শন করিয়া ভক্তি ও স্নেহে তিনি এতই বিকলিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন যে আর অস্ত্র-শস্ত্রাদির সহিত সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না এবং তিনি ভাবিতে লাগিলেন, জ্ঞানদাতা গুরু, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সম্পর্কিত জ্ঞাতি ও

চিরপরিচিত পরম প্রেমাস্পদ বন্ধুগণের বিনাশ সাধন অপেক্ষা, বল্কলবসন ধারণ পূর্ব্বক, বনবাস কিংবা ভিক্ষাশনই শ্রেয়স্কর। অর্জ্জুন এরূপ বিবেচনা করিয়া প্রতিপক্ষের উত্তেজনা জনিত কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন। সুবক্তা সঞ্জয় মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুরাশাকবলিত-হৃদয় দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভাবিলেন, অতঃপর আমার পুত্রগণের চিরবাঞ্ছিত রাজ্যৈশ্বর্য্য নিষ্কণ্টক হইল; কারণ ভীষ্ম দ্রোণাদি বীরগণের সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিতে পারে, পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে অর্জ্জুন ব্যতীত, এরূপ সমরদক্ষ দ্বিতীয় বীর আর লক্ষিত হইতেছে না। সেই শূর-কেশরী অর্জ্জুন যখন বৈরাগ্য হেতু সমরবিমুখ, তখন মৎপুত্রগণের বিজয়-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ঈদৃশ স্বস্থ-হৃদয় ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকন করিয়া, বুদ্ধিমান সঞ্জয় স্ববুদ্ধি-কৌশলে "ততঃ কিং" অর্থাৎ "তাহার পর কি হইল" পুত্রস্নেহপরায়ণ অন্ধরাজের এতাদৃশ হৃদয়গত অনুসন্ধানেচ্ছা অনুমান করিয়া, অঙ্কুরেই তদীয় আশাবৃক্ষের মূলচ্ছেদ বাসনায়, নিম্নলিখিতরূপ বাক্য বলিতেছেন। শুক্রশোণিত-সম্ভূত নশ্বর স্থূলদেহধারী ব্যক্তি বিশেষে প্রতিপালন-কর্ত্তা পিতামহ, শিক্ষাদাতা গুরু, প্রাণতুল্য ভ্রাতৃগণ ইত্যাদিরূপ মনঃকল্পিত মমতা বশতঃ অর্জ্জুন কর্ত্তব্য-বিমূঢ় কৃপাপরতন্ত্র ও স্বজনগণের বিচ্ছেদ ভয়ে বিষণ্ণভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই উদ্বেগাকুল ধনঞ্জয়কে ভগবান্ মধুসূদন, মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও ন্যায়রূপ দর্শনাদি শাস্ত্রদ্বারা প্রামাণীকৃত এবং লৌকিক দৃষ্টান্তাদি দ্বারা যুক্তিযুক্ত নানাবিধ সদর্থসম্পূরিত বাক্যাবলীসহকৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ভস্ম, পুরীষ ও কৃমি যাহার পরিণাম, তাদৃশ নশ্বর দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র ও অবিনাশী, তাদৃশ দেহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অর্জ্জুন পিতামহাদিরূপে কল্পনা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের বিনাশ সম্ভাবনায় নিরতিশয় ভীতভাবাপন্ন হইয়া আপনাকে কলুষিত বলিয়া তিরস্কৃত করিতেছেন। অর্জ্জুনের সেই বুদ্ধি-বিবেচনা আপাততঃ মনোহর হইলেও, নিতান্ত ভ্রমাত্মক এবং শুক্তিতে রজত কল্পনার ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র, এবংবিধ ভূরি ভূরি উপদেশ দ্বারা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের হৃদয়াবসাদ বিদূরিত করিয়াছিলেন। বন্ধুগণের বিচ্ছেদভয়ে হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনকে ভগবান এই সঙ্কট স্থানে উপেক্ষা করিলেন না। বরং অঘটঘটনপটীয়সী বৈষ্ণবী মহামায়ার মহিমায় বিকলমতি অর্জ্জুনের আত্মবিস্মৃতকারী মহামোহরূপ দুরন্ত মধু দৈত্যকে দমন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন। যিনি মধুনামা দৈত্যকে সূদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনিই মধুসূদন। এই অর্থে মূলে "মধুসূদন" এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বাক্য দ্বারা সঞ্জয় স্বপুত্রগণের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্কেতে বলিলেন যে, দুষ্টদলনকারী ভগবান্ হরি, নরকেশরী অর্জ্জুনের দ্বারা কুরু-কুল-কলঙ্ক তোমার পুত্রদিগকে নিহত করিয়া, ভূমণ্ডলে অশেষ যশোরাশি প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। অর্জ্জুন ত্বাং বিষমে কুতঃ অনার্য্যজুষ্টং অস্বর্গ্যং অকীর্ত্তিকরং ইদং কশ্মলং সমুপস্থিতম্ ॥২॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এই দারুণ বিপত্তিজনক সঙ্কট সময়ে তোমার হৃদয়ে কোথা হইতে আর্য্যগণের নীতিবিরুদ্ধ, পারলৌকিক অধোগতির কারণীভূত, কলঙ্ক বিধায়ক এবংবিধ চিত্তবিকারের আবির্ভাব হইল? ॥২॥

কয়েকটি টীকার তাৎপর্য্য।—অতঃপর মধুসূদন কি বাক্য বলিয়াছিলেন, সন্দেহসমাকুল ধৃতরাষ্ট্রের কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বজ্ঞ সঞ্জয় নিম্নলিখিত ভাবসংযুক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র ধর্ম্ম, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য, সমগ্র মোক্ষ, অর্থাৎ মোক্ষসাধনজ্ঞান, "ভগ" শব্দ প্রতিপাদ্য। এই ষড়্বিধ পদার্থ সম্পূর্ণভাবে ও অপ্রতিবন্ধরূপে যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান আছে, তিনিই ভগবান। অপিচ, প্রাণিগণের উৎপত্তি, বিনাশ, তদুভয়ের কারণ ভবিষ্যৎ সম্পদ, বিপদ, বিদ্যা, অবিদ্যাকে যিনি উত্তমরূপে বিদিত আছেন, সেই সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষই 'ভগবান' শব্দের একমাত্র লক্ষ্য। ঈদৃশ ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং স্বকীয় সখাকে অর্জ্জুন নামে সম্বোধন করিতেছেন। এই সম্বোধন বাক্য দ্বারা ইহা ব্যক্ত হইতেছে যে, যিনি সসাগরা বসুন্ধরা মধ্যে নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই অর্জ্জুন। অতঃপর বিষম স্বধর্ম্মবিমুখ অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে পার্থ নামধারিন্ ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর! এই বিষম সঙ্কট স্থানে সমাগত হইয়া, কি হেতু তোমার অন্তরে স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধ শিষ্টগণ-বিনিন্দিত কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হইল? তোমার হৃদয়ে সহসা এই যে দুরন্ত মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি, তাহা কি মুক্তির নিমিত্ত, কিংবা স্বর্গের অথবা কীর্ত্তি লাভ কামনায় সঞ্জাত হইয়াছে, ইহা আমি নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না।

যুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলের কুলধর্ম্ম। অপরিপক্কমনা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ আশয়শুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বিধিবোধিত স্বধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কদাপি গ্রহণ করেন না। কেন না, স্বধর্ম্মবহির্মুখ পুরুষের চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত তাদৃশ লোকের আনন্দময়ী মুক্তিলাভের উপায়ই বা কোথায়? নির্দ্বন্দ্ব, নির্ম্মম, নিরহঙ্কারী বিশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসিগণই স্বধর্ম্মোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসাদি আশ্রয় করিয়া থাকেন (সন্ন্যাসধর্ম্মের বিষয় পঞ্চমাধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে)। তুমি যখন সম্মুখ সমরে সমুপস্থিত হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তখন যে মুক্তিলাভের জন্য তোমার হৃদয়ে এরূপ প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

স্বধর্ম্মানুরক্ত শুদ্ধমেধা আর্য্যগণ স্বর্গকামনায় আশ্রমোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম সকল সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বনবাসাদি পরধর্ম্ম কদাপি আশ্রয়

করেন না। সম্মুখসংগ্রামে শত্রু কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়াও, তুমি যখন বহির্ম্মুখ ও বিভিন্ন-মতাবলম্বী হইলে, তখন স্বর্গলাভের জন্য তোমার অন্তরে এরূপ প্রবৃত্তি আবির্ভূত হইয়াছে, ইহাইবা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে?

যে বীরপুরুষগণ জগতে অতুল যশ কামনা করেন, তাঁহারা, যাহাতে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্রসম্পন্ন শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারা যায়, প্রাণপণে তাহারই ব্যবস্থা ও আয়োজন করিয়া থাকেন। সেই সময় অস্ত্র-শস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহারা বহির্ম্মুখ হয়, ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া ভূমণ্ডলে তাহাদের অনপনেয় অকীর্ত্তি সংঘোষিত হইতে থাকে। সুতরাং কীর্ত্তির জন্য যে তোমার এরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, তাহাইবা কিরূপে সিদ্ধান্ত করিব?

তোমার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত যশস্বী ও সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন পুরুষ, মুক্তি, স্বর্গ, কিংবা কীর্ত্তির অভিলাষে এরূপ নিন্দনীয়া নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, এতাদৃশ লোকবিগর্হিত কার্য্য কখনই অবলম্বন করেন না। অতএব এই বিপত্তি-পরিপূরিত বিষম স্থলে তোমার এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি নিতান্ত অনুচিত ও ক্ষত্রিয়কুলের অযশস্কর বলিয়া বোধ হইতেছে ॥২॥

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

অন্বয়।—কৌন্তেয় ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে পরন্তপ ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ ॥৩॥

ব্যাখ্যা—হে অরাতি-দলন ধনঞ্জয়! তোমার এবংবিধ কাতর ভাব কখনই শোভা পায় না, এই হেয় অবসন্নতা বিদূরিত করিয়া সত্বর সমরার্থ গাত্রোত্থান কর ॥৩॥

কয়েকটি টীকার তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন বলিয়াছেন, "ভগবন্! বন্ধুগণের বিনাশ ভয়ে আমি অতিশয় অধীর ও ব্যাকুলিত হইতেছি। আর গাণ্ডীব ধারণ করিতেও পারিতেছি না, এবং স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেও সক্ষম হইতেছি না; এইক্ষণে আমার উপায় কি, আদেশ করুন।" অর্জ্জুনকে এরূপ উৎসাহবিহীন ও কর্ত্তব্য-বিমূঢ় দেখিয়া, পুনর্ব্বার যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে, ভগবান্ বলিতেছেন, "হে পার্থ! অর্থাৎ পৃথাতনয়! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসাদে আমার পিতৃস্বসা কুন্তী-দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার ন্যায় মহৎব্যক্তির এবংবিধ ক্লৈব্য—অর্থাৎ কাতরতারূপ ক্লীবধর্ম্ম কদাপি শোভা পায় না। তুমি বিশ্ববিজেতা ও আমার সখা, তুমি কৈলাসধামে ভূতপতি ভগবান্ পিণাক-পাণির সহিত সাক্ষাৎ মহাসংগ্রাম সম্পাদন করিয়া জগতে অতুল খ্যাতিলাভ ও বিপুল কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছ, সুতরাং ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ হীন ক্ষত্রিয়ের ন্যায় এতাদৃশ কাতরতা তোমার উপযুক্ত হইতেছে না।

অতঃপর টীকাকারগণের ব্যাখ্যার স্থূল ভাব নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। ভগবানের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন, "হে ভগবন্! বলবীর্য্যের অভাব বশতঃ আমার এরূপ কাতরতা উপস্থিত হইয়াছে, আপনি এরূপ মনে করিবেন না; পূজ্যাস্পদ ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্মাদি গুরুজন

সন্দর্শনে আমার চিত্তে ভক্তি সহকৃত ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল হইয়া, এরূপ বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে। আর এই যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদি আত্মীয়গণ আমার অস্ত্র প্রহারে যমসদনে গমন করিবে, এজন্য তাহাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৃপা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অতএব "আমি যুদ্ধার্থ আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন বিঘূর্ণায়মান হইতেছে" ইত্যাদি হৃদয়-ভাব ও অবস্থা আপনার সমীপে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি।" অর্জ্জুনের এতাদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভগবান্ বলিতেছেন, "হে পরন্তপ, হে শত্রুদমনকারিন্! তুমি চিরদিন শত্রুবিজয়ী, অধুনা শত্রুগণের উপহাসাস্পদ হইও না। তুমি মনে করিতেছ, ভক্তিভাজন গুরুজন ও স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃগণকে দর্শনে তোমার হৃদয়ে বিবেক ও দয়া উৎপন্ন হইয়াছে; বাস্তবিক তাহা নহে। তোমার বর্ত্তমান বিহ্বলতা কেবল শোক-মোহজনিত; যেহেতু বিবেকিগণ কখনও নশ্বর স্থূল দেহকে বন্ধু-বান্ধবাদিরূপে কল্পনা করিয়া, তাহার দর্শনে আনন্দিত ও অদর্শনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হন না, এবং ক্ষণবিধ্বংসী-দেহধারী আত্মীয়-স্বজনের মরণাশঙ্কায় ব্যাকুলহৃদয় হইয়া কখনও তোমার ন্যায় কর্ত্তব্য-বিমুখ হন না। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সম্প্রতি সাধারণের ন্যায়, তোমারও শোক-মোহজনিত ক্ষুদ্র হৃদয়-দুর্ব্বলতাই উপস্থিত হইয়াছে। এই হেয় হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, সমাগত বীরবৃন্দ সমাকীর্ণ সমর-ক্ষেত্রে তোমার ক্ষুদ্রতাই প্রতিপাদন করিবে। তোমার দৈহিক সামর্থ্য ও সমুচিত সহায়ের কোনই অভাব দেখিতেছি না। সুতরাং তোমার এবংবিধ ভাবান্তর কেবল মমতা-নিবন্ধন হৃদয়জাত দুর্ব্বলতা। তুমি অবিলম্বে বিবেকবলে হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়া, এই ঘৃণিত জড়তা অপনোদন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থিত ও সজ্জীভূত হও॥৩॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ম, ২য়, ৩য় শ্লোকের মন্তব্য।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, ভগবদ্গীতার ১ম অধ্যায়ের ও ২য় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক পর্য্যন্তের টীকার আদৌ প্রয়োজন নাই; উহাতে কেবল ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি বা গীতার মুখবন্ধ মাত্র আছে। আধ্যাত্মিক, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুই নাই। দুই একটী সামান্য নৈতিক তত্ত্ব যাহা আছে, তাহা এতই সরল যে, তাহার ব্যাখ্যার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। এই জন্য জগৎপূজ্য, দর্শন-বিজ্ঞানের মূর্ত্তিমান অবতার আচার্য্য মহোদয় ঐ গীতার ১ম অধ্যায় ও ২য় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, একাদশ শ্লোক হইতে তাঁহার ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য টীকাকার, যথা—আনন্দ গিরি, শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন-সরস্বতী, বলদেব, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাশয়গণ ঐ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের অনুপযুক্ত ও পরিত্যক্ত টীকা লিখিতে বা শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটি করেন নাই; এমন কি, রামানুজ স্বামী মহাশয় উহার মধ্যে দুই একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ সকল টীকার মধ্যে

উল্লেখ-যোগ্য গভীর তত্ত্ব কিছুই নাই, এবং তদ্রূপ কোন তত্ত্ব মূলে না থাকায়, টীকার থাকিবারও সম্ভাবনা নাই। তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে, যথ—১ম, ২য় ও ৩য় শ্লোকে,—অর্জ্জুনকে করুণার্দ্রহৃদয়, গলদশ্রু-লোচন, বিষাদ-নিমগ্ন দেখিয়া, মধুসূদন (অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) বলিলেন—এই বিপত্তিকালে অনার্য্যজুষ্ট, অস্বর্গ্য এবং অকীর্ত্তিকর মোহ তোমার উপস্থিত হইল কেন? পার্থ! ক্লীবত্ব—অর্থাৎ পৌরুষ-বিহীনতা প্রাপ্ত হইও না। হে পরন্তপ। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হও।

কথা কয়েকটী অতি সরল ও পরিষ্কার বোধ হউক, টীকাকার মহাশয়গণ এ ৩টী সংস্কৃত শ্লোকের যে টীকা বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার বাঙ্গালা তাৎপর্য্যার্থ উপরে বিবৃত করিয়াছি; উহার সংক্ষিপ্ত সার এই :—

১। মধুসূদন শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য।

২। ভগবান্ শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এবং ভগবান্ শব্দের আভিধানিক অর্থ।

৩। অনার্য্যজুষ্ট, অস্বর্গ্য, অকীর্ত্তিকর, ক্লৈব্য, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি বাক্যগুলি প্রয়োগের উদ্দেশ্য।

৪। অর্জ্জুন, পার্থ, পরন্তপ শব্দের তাৎপর্য্য।

অবশ্যই পণ্ডিত ও ভাবুকগণ এক একটী শব্দকে নানা প্রকার উজ্জ্বল ভাবরূপ রঙে রঞ্জিত করিয়া পাঠকবর্গকে মোহিত করিতে পারেন; কিন্তু ঐ কয়েকটী শ্লোকের সাধারণ অর্থে যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন টীকাকার মহোদয়গণের বর্ণিত অর্থে গ্রন্থকারের ব্যবহার করার কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন দেখা যায় না। যদি উক্ত প্রকার আবশ্যক হয়, তবে টীকাকার মহোদয় মধুসূদন ও ভগবান্ নামের আভিধানিক অর্থ ব্যাখ্যান্তে তাহার ঐতিহাসিক রূপক-গুলির প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, গীতার পাঠকগণের ঐ সমস্ত গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং সৃষ্টি-রহস্য বুঝিবার সুযোগ হইত। তদ্ভিন্ন কেবল আভিধানিক ব্যাখ্যার জন্য ঐ সকল টীকার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না; যেহেতু সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মাত্রই অভিধান পাঠ করিয়াছেন এবং ঐ সকল আভিধানিক অর্থ অবগত আছেন।

আমি পণ্ডিতও নই, ভাবুকও নই। তবে টীকাকার মহোদয়গণ ১ম শ্লোকের টীকায় মধুসূদন নাম ব্যবহারের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার ছলনায় মধুদৈত্য হনন ঘটিত ঐতিহাসিক তত্ত্বের যে আভাস দিয়াছেন, তদবলম্বনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধুদৈত্য হননের প্রকৃত ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি রহস্য কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে বাধ্য হইলাম। উহার সহিত বলদেবকৃত টীকার উল্লিখিত মোহরূপ মধু হনন, এই রূপকালঙ্কারের ইতিহাসোক্ত মধুদৈত্য হননের সহিত অতি নিকট সম্বন্ধ থাকায়, ঐ ব্যাখ্যা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ঐ ১ম শ্লোকের বলদেবকৃত টীকায় প্রকাশ—"মধুসূদন ইতি তস্য শোকমধুং মধু হিংস্যতীতি," ইহার তাৎপর্য্যার্থ উপরের বর্ণিত মত অর্জ্জুনের শোক-মোহরূপ

মধুদৈত্যকে হনন অর্থাৎ দূরীকৃত করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যে তাহাকে নিয়োজিত করিলেন। এই জন্যই মধুসূদন শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন কৃত টীকায় "মধুসূদন ইতি স্বয়ং দুষ্টনিগ্রহকর্ত্তার্জ্জুনঃ প্রতি তবৈব বক্তা ভীতিভাবঃ।" নীলকণ্ঠের টীকায় "মধুসূদন ইতি দুষ্টহন্তৃত্বাদেব অর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্য তৎপুত্রানামপি হনিষ্যত্যেবেতি ত্বয়া জয়াশা ন কার্য্যেতি ভাবঃ।" ইহার তাৎপর্য্যার্থ—মধুদৈত্যের ন্যায় দুষ্টদলনকারী হরি অর্জ্জুন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে নিহত করিবেন, অতএব জয়াশা নাই, ইহাও সঞ্জয় মুখ দিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইয়াছেন।

ঐ ২০ শ্লোকের শব্দার্থ—সেই চরাচরের কারণভূত অব্যক্তের অব্যক্ত (অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির অভ্যন্তরে ঐ অব্যক্ত প্রকৃতিরও কারণভূত) অতীন্দ্রিয় অনাদি যে একটি ভাব আছে, তাহা সমুদয় ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না। ঐ অব্যক্ত প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ শুদ্ধ অনাদি ভাবই 'জ্ঞান-বিজ্ঞানময় তত্ত্ব' যথা "মাসাব্দ যুগ কল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা। নোদেতি নাস্তমেত্যেষা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভাঃ॥" মাস বর্ষ যুগ কল্প ভূত ভবিষ্যৎ কোন কালেই যাহার উদয় বা অস্ত নাই, সেই স্বয়ম্প্রভা সম্বিৎই প্রকৃতির কারণভূত জ্ঞানতত্ত্ব। (পঞ্চদশী ১ম অঃ তত্ত্ববিবেক।)

এই গীতায় উল্লিখিত অব্যক্ত প্রকৃতির অভ্যন্তরে অব্যক্তের জ্ঞান-বিজ্ঞানময়তত্ত্ব আছে। ঐ তত্ত্বের অস্তিত্ব বোধহয় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদ্‌গণও অস্বীকার করিতে পারেন না। অস্বীকার করিলে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত আকর্ষণ-বিকর্ষণ-তাড়িৎ-ম্যাগনেটের আশ্চর্য্য শক্তি-গুণের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না। তদ্ভিন্ন প্রকৃতির বা প্রাকৃতিক তত্ত্বের মধ্যে অন্ততঃ অব্যক্ত জ্ঞানশক্তির (Latent Intelectual force) অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে মানব-মস্তিষ্কে জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ ও সৃষ্টির সামঞ্জস্য অসম্ভব হয়। যাহার আদৌ অস্তিত্ব নাই রাসায়নিক সংযোগে তাহার বিকাশ অদার্শনিক বা অযৌক্তিক। বাস্তবিক, প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আবরণীশক্তি আছে। আবরণীশক্তি হইতে জড়তত্ত্বের উৎপত্তি। ঐ জড়প্রধানা অন্ধক্রিয়াশক্তি হইতে অন্ধ জ্ঞানহীন জীবের উৎপত্তি। অতএব স্বেদজ কীটাদি এবং কীটবৎ ও তদ্‌গুণবিশিষ্ট জীবাণু ঐ জড়প্রধানা শক্তির অধীন। শাস্ত্রীয় ভাষায় আবরণী বা জড়শক্তিকে তমপ্রধানশক্তি বা তমোগুণ কহে। ক্রিয়া-উদ্দীপনী শক্তির নাম রজোগুণ, এবং জ্ঞানবিকাশিনী শক্তির নাম সত্ত্বগুণ। জ্ঞানমিশ্রিত কার্য্যকরী শক্তি হইতে সৃষ্টিশক্তি বা সৃষ্টিকারী তত্ত্বের বিকাশ। পৌরাণিক ভাষায় উহাকে ব্রহ্মা কহে এবং জ্ঞানতত্ত্বই বিষ্ণু। ঐ বিষ্ণুই অনন্তশায়িত বিশ্বের বিরাট আত্মা (Universal soul)। শাস্ত্রমতে বিষ্ণুর কর্ণই শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ। ঐ আকাশে সত্ত্বপ্রধান দেববৎ সূক্ষ্ম জৈবীতত্ত্ব তমঃপ্রধান শত্রুভূত সূক্ষ্ম জড়প্রধান অন্ধ অনিষ্টকারী (বিসূচিকা,

---

* "পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ। যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥"

(গীতা ৮ম অঃ ২০ শ্লোক।)

প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি বহু রোগের বীজরূপ) সূক্ষ্ম কীটবৎ তত্ত্ব আছে। শেষোক্ত তত্ত্ব আকাশের মল স্বরূপ।

সৃষ্টির প্রথম যুগে যখন পৃথিবী জলময় অর্থাৎ তরল আজ্যাবৎ পদার্থ ছিল, তখন তমঃপ্রধান শক্ত্যুদ্ভূত কীটবৎ সূক্ষ্ম পদার্থ কর্তৃক তন্মধ্যস্থ অর্থাৎ দ্রবময়ী পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ (জলের সারাংশ) মধু (সম্ভবতঃ প্রাণীতত্ত্বের বিকাশ হয়) আবরিত হওয়ায়, ঐ তমঃপ্রধান কীটবৎ আবরণী শক্তির সহিত, ঐ কেন্দ্রস্থ কার্য্যকরী শক্তির সংঘর্ষণ হয়; ঐ সংঘর্ষণে তদভ্যন্তরস্থ কার্য্যকারী জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশ হওয়ায়, ঐ জ্ঞানমিশ্রিত কার্য্যকরী শক্তির সংঘর্ষণ সৃষ্টির বিঘ্নকারক জলশোষকারী অসংখ্য অজ্ঞানময় প্রাণীতত্ত্বাবরক কীট পদার্থ নষ্ট এবং তাহার দৈহিক পদার্থ হইতে ঐ জল ঘনীভূত ও কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হয়। অতএব ঐ সৃষ্টিবিঘ্নকারী মধুকৈটভ বিনষ্ট হওয়ায়, ঐ জ্ঞানময়ী সৃষ্টিকরী শক্তি কর্তৃক সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন এবং ক্রমিক উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবের আবির্ভাব হইয়াছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা আমার মনঃকল্পিত নহে। রাজা রাধাকান্ত দেবকৃত "শব্দকল্পদ্রুম" এবং চণ্ডী হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতাংশ দৃষ্টি করিলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে, যথা—

"কূর্ম্মপৃষ্ঠগতা পৃথ্বী বিলীনেবাভবজ্জলৈঃ।
তাং বিশীর্ণাং যোগনিদ্রা মহামায়া ব্যলোকয়ৎ॥
তাং বৈ দৃঢ়তরাং কর্ত্তুং পৃথ্বীং প্রতীতদেবকী।
উপায়ং চিন্তয়ামাস কথং পৃথ্বী ভবেদ্দৃঢ়া॥
ইদানিমাজ্যাবৎ পৃথ্বী দ্রবৃত্তা কোমলাজ্জলৈঃ
সৃষ্টিকালে জনান্ বোঢ়ুং কথং শক্তা ভবিষ্যতি॥
* * * * * *
তৎ (বিষ্ণু) কর্ণমলচূর্ণেভ্য মধুনামাসুরোঽভবৎ।
ততোঽভূৎ কৈটভো নাম বলবানেঽহসুরো মহান্॥
উৎপন্ন সচ পানার্থং যস্মান্ মৃগিতবান্ * মধু।
ততোস্তস্য মহাদেবী মধুনাম্না করোস্তদা॥
উৎপন্ন কীটবৎ জাতি মহামায়া করে যতঃ।
অতস্তং কৈটভাখ্যাস্তু স্বয়ং দেবী তদাকরোৎ॥
* * * * * *
উদ্ধৃতানাং পৃথীনাস্তু তয়োর্ম্মেদো বিলেপনৈঃ।
সুদৃঢ়ামকরোৎ পৃথ্বীং ক্লেদিতাং তোয়রাশিভিঃ॥
মেদো বিলেপিতা যস্মাৎ গীয়তে মেদিনীতি সা॥"

* মৃগিতবান্ অর্থে মর্দিতবান্।

পৃথিবী আজ্যাবৎ—অর্থাৎ ঘৃতের ন্যায় তরল অবস্থা থাকা কালে সৃষ্টিকারিণী শক্তি কর্তৃক ঐ পৃথিবীর কাঠিন্য বা দৃঢ়ত্ব পারণ তত্ত্ব বিষয় যখন আলোচিত হইতেছিল, সেই সময় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ নামক বলবান অসুর উৎপন্ন হইয়া জলের সারাংশ মধু পানার্থে উদ্যত হওয়ায়, মধুনামে এবং উহা কীটের ন্যায় উৎপন্ন বিধায়, কৈটভ নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঐ মধু কৈটভের মেদ-বিলেপন হইতে পৃথিবী দৃঢ়ীভূতা হইয়াছিল; তজ্জন্য পৃথিবী 'মেদিনী' আখ্যায় আখ্যাতা হইয়াছে।

চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত : অং ৫৯ হইতে ৬৩ এবং ৮৪ হইতে ৮৯ শ্লোক যথা—

"যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥৫৯
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ* ৬০॥
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্ ৬১
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়ঃ স্থিতঃ ৬২
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্।
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্ ॥৬২
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥৬৩

* * * * * *

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা। ৮৪
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ।
নেত্রাস্যনাসিকা বাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ। ৮৫
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ৮।
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥৮৭
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণংজনিতোদ্যমৌ। ৮৮
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ। ৮৯"

* কেন্দ্রস্থ সারতত্ত্ব—যদ্দ্বারা জীবসৃষ্টি হয়। ইহাই সৃষ্টিকারী তত্ত্ব।

‡ পৃথিবীর কেন্দ্র। নিদ্রিত জ্ঞানতত্ত্ব অব্যক্তই চিৎশক্তি Latent Intelectual force.

উপরোক্ত শ্লোকগুলির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য—

যখন কল্পান্তে জগৎ একার্ণবীভূত ছিল, তখন বিষ্ণু (জ্ঞানতত্ত্ব) অনন্ত-শয্যায় যোগ-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। সেই সময় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ উৎপন্ন হইয়া ঐ বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হওয়ায়, তিনি বিষ্ণুকে জাগরিত করিবার জন্য বিষ্ণুর তেজশক্তিরূপিণী যোগনিদ্রার স্তব করিয়াছিলেন। ঐ স্তবে তুষ্টা হওয়ায়, ঐ শক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞানময় বিষ্ণু জাগরিত হইয়া, পঞ্চসহস্র বর্ষ ঐ অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে মধুকৈটভ নিহত হয়।

ইহাদ্বারা আমার কৃত উপরোক্ত সৃষ্টি-রহস্য ঘটিত ব্যাখ্যা প্রামাণিক কি না, পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

কর্ম্ম ও ফলিত জ্যোতিষ।

নক্ষত্র ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

কৃষ্ণপক্ষে নির্ম্মল গগন মণ্ডলে আমরা যে অসংখ্যাসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাদিগকে নক্ষত্র কহে। ইহাদের জ্যোতির অল্পাধিক্য অনুসারে ইংরেজী জ্যোতির্বিজ্ঞান ইহাদিগকে ৬ ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। আমাদের চর্ম্মচক্ষুতে যত তারকা দেখিতে পাই, তাহার সংখ্যা প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার মাত্র। সুতরাং গোলার্দ্ধে তিন সহস্র নক্ষত্রের বেশী আমাদের

নয়নগোচর হয় না; কিন্তু দূরবীক্ষণ দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, প্রায় দুইকোটী নক্ষত্র মানবের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে।* কারণ মানবের চর্ম্মচক্ষুর অগোচরীভূত দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগণ দূরবীক্ষণ সহযোগে গোচরীভূত হইয়া থাকে। কোন্ নক্ষত্র কত বড়, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কারণ দূরত্বের ন্যূনাধিক্য বশতঃ ক্ষুদ্র বৃহত্তর দেখায় বৃহৎ ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হয়। উজ্জ্বলতা সম্বন্ধেও তদনুরূপ নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র হইলেও উজ্জ্বলতর—দূরস্থ বৃহৎ হইলেও মলিন ও নিষ্প্রভ দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং তাহাদের দূরত্ব অবধারণ করা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। তাহাদের উজ্জ্বলতানুসারেই পূর্ব্বোক্ত বিভাগাদি হইয়াছে। ষষ্ঠ বিভাগের ক্ষেত্রে যেরূপ দীপ্তিশালী, ৫ম বিভাগের ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ, ৪র্থ শ্রেণীস্থ ৬ গুণ, তৃতীয় শ্রেণীস্থ দ্বাদশ গুণ; দ্বিতীয় বিভাগস্থ নক্ষত্র পঞ্চবিংশতি ও প্রথম বিভাগস্থ একশত গুণ বেশী দীপ্তিশীল। প্রথম বিভাগের নক্ষত্রগণ মধ্যে সিরিয়াস (Sirius) নামক নক্ষত্র সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম এবং আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ নক্ষত্র সূর্য্য ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্রাপেক্ষা ৬,৪৭০,০০০,০০০,০০ গুণ অধিকতর উজ্জ্বল ও প্রভাকর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নক্ষত্রাদির দূরত্ব অবধারণ অতি আয়াসসাধ্য তাহা আমাদের ধারণায় আসিতে পারে না। তবে তাহাদের আলোকের গতি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরত্বের মোটামোটি একটা হিসাব করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল পথ গমন করে। সূর্য্যালোক আমাদের নিকট আসিতে প্রায় আট মিনিট তিন সেকেণ্ড লাগে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আলোকের গতি অনুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটী ১২ লক্ষ ৭ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী, স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদি এই পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত থাকিত এবং যদি ৩০ মাইল প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন চালিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে এই ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে ট্রেন ছাড়িলে, ২২৪৫ সালে সূর্য্যমণ্ডলে পৌঁছিবার সম্ভাবনা। আবার যে নক্ষত্রটী সূর্য্যের অতি সমীপবর্ত্তী, তাহার আলোক এই ভূমণ্ডলে আসিতে সার্দ্ধ তিন বৎসর অতীত হইয়া যায়। সাধারণতঃ প্রথম বিভাগস্থ নক্ষত্রের আলোক আসিতে ১৫ বৎসর ৬ মাস, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৮ বৎসর তৃতীয় শ্রেণীর ৪৩ বৎসর লাগে। জ্যোতির ন্যূনাধিক্য বশতঃ এইরূপ নক্ষত্র বিভাগ করিলে, দ্বাদশ শ্রেণীস্থ নক্ষত্রের প্রভা আমাদের নিকট পৌঁছিতে ৩৫০০ বৎসর লাগে।†

যে আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে

* 'Twenty millions is the estimate of the text books; but professor Barnard believes that the camera will record the presence of, at least, 500,000,000, with the certainty that there must be a still larger number which are not visible "Visions of glory, spare my aching sight.",

The Anglo American Times.

† Lock year's Astronomy.

১,৮৫,০০০ মাইল (কেহ কেহ বলেন ১,৮৭,০০০ মাইল)। সেই আলোক এই পৃথিবী মণ্ডলে আসিতে কলিযুগের প্রথম কালের $\frac{7}{10}$ অংশ অতীত হইয়া যায়; হয়ত কলির প্রথম সঞ্চারেই কোন নক্ষত্রের জ্যোতি এই পৃথিবী অভিমুখে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই; আবার হয়ত কোন নক্ষত্র কলির আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে আলোক দান করিয়া কোথায় সুদূর প্রদেশে মানবের কল্পনাতীত স্থানে প্রস্থান করিয়াছে; অথবা যে নক্ষত্র-প্রভা এক্ষণে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান, সেই নক্ষত্র হয়ত বহুকাল পূর্ব্বে বিনাশ বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। জগৎপাতার সৃষ্টিকৌশল ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা ক্ষুদ্র মানবের চিন্তা ও ধারণার অবিষয়ীভূত; তবে যতদূর জানিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয়।*

এই যে আকাশমণ্ডলে অতি মলিন ও নিষ্প্রভ মেখলা-মালা দেখিতে পাই— যাহাকে আমরা ছায়াপথ Milky way) কহি, তাহা কি? মনে হয় যেন আকাশ-মণ্ডল ইহা দ্বারা সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা নক্ষত্রপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্বে যে দুই কোটী নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রায় এক কোটী আশি লক্ষ নক্ষত্র এই ছায়াপথেই অবস্থিত। এই সকল নক্ষত্র যে ক্ষুদ্র, তাহা নহে। ইহারা যে ঘনসন্নিবিষ্ট অথবা পুঞ্জীকৃত, তাহাও নহে; তাহারা যে নিষ্প্রভ, তাহাও নহে। তাহারা বৃহৎ, জ্যোতির্ম্ময় ও পরস্পর বহু দূরবর্ত্তী। যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র ও মলিন দেখি, তাহা দূরত্ব বশতঃ। এই পৃথিবী হইতে যে যত অধিক দূরবর্ত্তী, সে তত ক্ষুদ্র বলিয়া অনুমিত হয়। সামান্য পর্ব্বতোপরিস্থ বৃক্ষাদি নিম্ন হইতে কত ক্ষুদ্র ও কত ঘন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলে সেই ভ্রম দূরীভূত হয়। যতই সমীপবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই

* "Light from some of the telescope stars we are told, required 5760 years to reach the earth, and from some of these clusters the distance is so great that light would take half a million of years to pass to the earth; so that we see object, not as they really are, but as they were, half a million of years ago. These stars might have become extinct thousands of years ago, and yet their light might still present itself to us. Startling amazing as this is Camille Flammarion, in a recent number of the Deutsche Recue, makes a statement which ourtops it and makes it seem modest in comparision. He asserts that, though light travels so fast the photographic lens of a modern telescope receives impressions of stars whose thin rays of light have been millions of years travelling to the earth; rays which, perhaps, set out on their journey hitherward before this our earth had started on its appointed course; rays, some of them, perhaps, of stars which have run their appointed course, which have virified worlds like ours, and have ages ago been burnt out and resolved into their ultimate atoms, which the rays they once shed still travel onword into space." The Angle American times,

হাদের আয়তন ও ব্যবধানের বিশালতা দৃষ্টিগোচরীভূত হয়। যে সকল নক্ষত্র পুঞ্জীকৃত ও অতীব নিস্প্রভ বলিয়া বোধহয়, প্রকৃত-পক্ষে তাহা নহে—তাহারা আকাশের ঊর্দ্ধ্ব ভাগে অতি বিস্তৃত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। আমাদের সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী নক্ষত্র সূর্য্য হইতে যতদূরে অবস্থিত, সম্ভবতঃ উক্ত নক্ষত্রগণ পরস্পর ততদূরে স্থিত। উত্তর গোলকার্দ্ধে সিগনাস (Cygnes) নামে এক নক্ষত্র চক্র আছে, তন্মধ্যস্থ দুইটি নক্ষত্র মানবের চর্ম্মচক্ষুতে একটী বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের ব্যবধান চারিঅর্ব্বুদ সাতাইশ কোটী এবং পঞ্চাশ লক্ষ মাইল।*

খৃষ্ট-জন্মের এক শতাব্দী পূর্ব্বে—রোডস নগরে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগ্রগণ্য হিপ্পার-কস্ (Hepparchus) যে সকল নক্ষত্র আবিষ্কার করেন, তাহার ২৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫০ বৎসর পরে মহাত্মা টলেমি (Ptolemy) সেই সকল নক্ষত্রকে ৪৮ চক্রে (Constellation) শ্রেণীবদ্ধ করেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই চক্র-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া, সম্প্রতি ১০৯ চক্রে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে প্রধান প্রধান নক্ষত্র-চক্রের নাম প্রদর্শিত হইল।

Northern constellation —

1. Ursa major
2. Ursa minor
3. Draco
4. Cephens
5. Bootes
6. Curna Borealis
7. Hercules
8. Lyra
9. Cygnus
10. Cassiopia
11. Orscus
12. Auriga
13. Serpentarius
14. Serpens
15. Sagitta
16. Aquila
17. Delphinus
18. Aqualeus
19. Pegasus
20. Andromeda
21. Triongulum
22. Camels perdalis
23. Cones Venatici
24. Vulpicula et Anser
25. Cor caroti

Southern constellation—

1. Cetus
2. Orion
3. Lepus
4. Canis major
5. Canis minor
6. Argo Navis
7. Hydra
8. Crater
9. Corvus
10. Centaurus
11. Lupus
12. Ara
13. Corona Australis
14. Pescis Australis
15. Mono ceros
16. Columlea Noachi
17. Crux Australes

(Vide Lockyar's Astronomy)

নক্ষত্রের উজ্জ্বলতানুসারে প্রথমে যে আমরা ষষ্ঠ বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রথম বিভাগস্থ নক্ষত্রগণ মধ্যে নিম্নলিখিত নক্ষত্র সর্ব্বাধিক উজ্জ্বল।* নক্ষত্রদিগের গতি অপরিসীম। সূর্য্যের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৪ মাইল বা ঘণ্টায় ১৪,৪০০ মাইল। আর আর্কটিউরাস (Arcturus) নক্ষত্রের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৫৪ মাইল অথবা ঘণ্টায় ১৯৪৪০০ মাইল।

* (1) Sirius, (2) Canopus (3) Alpha, (4) Arcturus (5) Rigel, (6 Capella, (7) Vega, (8) Proceyon, (9) Betel guis,

নক্ষত্রগণের প্রভা একরূপ নাই—বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট। কেহ লাল, কেহ নীল কেহ পীত, কেহ হরিৎ, কেহবা শুভ্রবর্ণ। মিঃ এনস মহোদয়ের পর্য্যবেক্ষণ অনুসারে তিনটী লাল, ৫টী নীল, একটী পীত, ৩টী হরিৎ ও ৯টী শুভ্রবর্ণ নক্ষত্র। * ইহাদের আবার সময়ে সময়ে বর্ণের হ্রাস-বিশেষ হইয়া থাকে।

নক্ষত্রচক্রের যেরূপ আকার উপলব্ধি হইয়াছে, তদনুরূপ নামকরণ হইয়াছে। যথা উরশা মেজর (Ursa Major) বৃহৎ ভল্লুক (The great Bear), এবং উরশা মাইনর Ursa Minor) ক্ষুদ্র ভল্লুক (The little Bear) সিগনাস Ciygnes) সারস পক্ষী (The Swan), লেপাস (Lepus) শশ (The Hare) কেনিস মেজর (Canis Major বৃহৎ কুকুর (The great dog) কেনিস মাইনর—ক্ষুদ্র কুকুর, লুপুস Lupus) ব্যাঘ্র, কোলাম্বা নোয়াকি (Colamba Noachi) "নোয়ার কপোত (Noa's dove) ইত্যাদি।

আর্য্যশাস্ত্রেও অনেক নক্ষত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ২৭টী নক্ষত্রের সহিত মানবের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং ধ্রুবতারা গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণের কীলক বা মেধীস্তম্ভ স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকেই অবলম্বন করিয়া গ্রহরাশি প্রভৃতি শূন্যমার্গে অনবরত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; কখনও স্থানভ্রষ্ট বা কক্ষচ্যুত হয় না। †

আর্য্যশাস্ত্রে এই ধ্রুব বিষ্ণুর পরমপদ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কঠোর তপস্যা প্রভাবে উত্তানপাদ-পুত্র পরমভাগবত ধ্রুব এই "সপ্তর্ষীণাং যে চ বৈমানিকাঃ সুরাঃ" স্থান প্রাপ্ত হন। ইঁহার চতুর্দ্দিকে নক্ষত্ররূপী ইন্দ্র, ধর্ম, অগ্নি ও কশ্যপ নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে - যেমন "বায়ুবশা কর্ম্মসারথয়ঃ" কর্ম্ম-সারথি-বায়ুবশতঃ মেঘ ও শ্যেনাদি পক্ষী আকাশ মণ্ডলে ভ্রমণ করে ভূমিতে পতিত হয় না; সেইরূপ গ্রহ নক্ষত্রাদি "প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগানুগৃহীতাঃ কর্ম্মনির্ম্মিত গতয়ো ভুবি ন পতন্তি" প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগানুগৃহীত, কর্ম্মের বশীভূত হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; ভূমিতে পতিত হয় না। "কেচিদেতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য যোগধারণায়াম্" শিশুমাররূপী ভগবান্ বাসুদেবের যোগধারণায় অবস্থিত। সুতরাং তাহাদের পতনের কোন সম্ভাবনা নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

(10 Archerner 11) Alderbaron (12) Beta centari, (13) Alpha crusis, (14) Antoris, (15) Atair, (16) Spica. (17 Famal tant. (18) Beta cruses, (19) Pullux, (20 Regulus.

* Red stars—Alderlearan, Antores, ann Betelgius.

Blue stars—Capella, Rigel, Bellatrux, Procyon and Spica.

Green stars—Sirius, Vega, Atair, and Denele.

Yellow star—Arcturus.

White stars—Regulus, Denebola, Famelhant and Polaris.

(Vide Lockuer's astronomy)

† "মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভস্থিতে।
নিরক্ষদেশ সংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রিতে॥
ভচক্রং ধ্রুবয়োর্বদ্ধমাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ।
পর্য্যাত্যজস্রং বদ্ধা গ্রহকক্ষা যথাক্রমম্॥"

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

"সৃষ্ট্বা ভচক্রং কমলোদ্ভবেন গ্রহাদি সহিতং তারাদি সংস্থৈঃ।
শশ্বৎ ভ্রমে বিশ্বসৃজা নিযুক্তং তদন্ততারেব তথা ধ্রুবতারে॥"

(সিদ্ধান্ত শিরোমণি)

১৩শ বর্ষ। ফাল্গুন চৈত্র। ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

১৮২৮, ১৩১৩।

গ্রাহক মহোদয়গণ!

বর্ত্তমান বর্ষের দেয় মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৮।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

যোগ-শাস্ত্র।

—•:•:•-

১। যোগোপদেশ। বেদ, স্মৃতি, আগম, পুরাণ, ভগবদ্গীতা, অন্যান্যগীতা এবং যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সমস্ত জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রাণায়ামযোগ, সমাধিযোগ এবং ভক্তিযোগ প্রতিপাদক উপদেশবাক্য আছে, সে সমস্ত নিত্য কি অনিত্য?

২। ইহার উত্তর এই যে, সে সমস্তই নিত্যবাক্য। কেননা ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্ন বেদশাস্ত্র প্রবাহরূপে নিত্য। সেই বেদই ঐ সকল উপদেশের বীজকোষ। ক্রমে ক্রমে অধিকার ও যুগ-প্রয়োজনাদির উত্তরসাধকতা নিমিত্তে ঐ সমস্ত বীজ যথাঋতুতে ভারতের উর্ব্বর ধর্ম্মক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়। বামদেব, কণ্ব, মধুচ্ছন্দা, মেধাতিথি, বশিষ্ঠ, আঙ্গীরস প্রভৃতি ঋষিগণ ঐ সমস্ত বীজের স্রষ্টা। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ বীজের বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তির ও প্রত্যেক বৃক্ষের বিশেষ বিশেষ ফলদানের শক্তির স্রষ্টা। *

* কেহ তর্ক তুলিতে পারেন যে, যখন অনিত্য ঋষিগণ বেদশাস্ত্রের স্রষ্টা, তখন তাহা নিত্য হইতে পারেনা; কেননা এই অনিত্য-সংযোগেই বেদের নিত্যত্বের বাধ। অপরঞ্চ, একই ঋষিগণ কিরূপে প্রতিকল্পে আবির্ভূত হইতে পারেন? এই প্রকার আপত্তির মীমাংসা বেদান্ত-স্মৃতি-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই যুক্তিসঙ্গতরূপে দৃষ্ট হয় এবং সেই সকল মীমাংসার উপরে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ব্রহ্মসূত্রে (বেদান্তে) আছে—"শব্দ ইতিচেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" ১।৩।২৮ বেদ নিত্য। যদি তদুক্ত দেবতা ও ঋষিগণকে অনিত্য বল, তবে বেদও

৩। কল্পে কল্পে বা যুগে যুগে যথা ঋতুতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাঁহারা বিশেষ দর্শিতা সহকারে ঐ সমস্ত বীজ বপন পূর্ব্বক বৈদিক-উদ্যান রচনা করেন। তত্রস্থিত বৃক্ষসমূহ, স্ব স্ব শক্তি ও প্রজাগণের প্রয়োজনানুসারে, পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় অথবা সমজাতীয় পূর্ব্ব যুগের ন্যায়, ভারত-সমাজে ক্রিয়াবিধি, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগাদি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল-প্রসূ পাদপশ্রেণী রূপে শোভা পাইয়া থাকে, এবং মন্ত্র, অনুশাসন, অর্চ্চনা, গুহ্যজ্ঞান-রহস্য, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সাদি ফল দান করে।

৪। ঐ সমস্ত মহা মহা ফল বৈদিক উপদেশ রূপী। সেই উপদেশ সকল প্রবাহরূপে নিত্য এবং প্রতিকল্পে ও প্রতিযুগে পূর্ব্ববৎ সমান রূপে দৃশ্যমান ও কার্য্যসাধক। অতএব জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের উপদেশ সকল, বেদমূলকত্ব বিধায় প্রবাহরূপে নিত্য-বাক্য এবং অব্যয়। প্রলয়ে সে সমস্ত বীজান্ত ধ্বংস হয় না; কিন্তু অন্যান্য বৈদিক তত্ত্বের সহিত সূক্ষ্মরূপে গিয়া পরমাত্মাতে অবস্থিতি করে; পুনঃ সৃষ্টিকালে সেই সমস্ত সত্যই, পুনঃপ্রকটীভূত হয়। কোন নূতন সত্য অভ্যুদিত হয় না।

৫। অতএব এইসকল যোগোপদেশ কোন ব্যক্তিবিশেষের মত বা পাশ্চাত্য দর্শনাদির ন্যায় কোনরূপ স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত নহে; কিন্তু সনাতন। যে সকল ঋষিগণ অথবা ঈশ্বরগণ তৎসমস্তের বক্তা, ন্যায় প্রত্যেক কল্পে পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় 'ভাবা' 'দেবাদয়ঃ' দেবতা, ঋষি, বেদ পুরোহিত, যজমান, ক্রিয়া ও যজ্ঞীয় উপকরণ সমস্ত আবির্ভূত হয়েন। "নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনং। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকারসঃ। ঋষীণাং নামধেয়ানি যথাবেদ শ্রুতানিবৈ। যথানিয়োগযোগ্যানি সর্ব্বেষামপি সোঽকরোৎ" (১। ৫ ৬২—৬৩)। বিধাতা আদিতে সেই পূর্ব্বসঞ্চিত বেদ হইতে দেবতা, ঋষি প্রভৃতির নাম, রূপ ও কর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ধরাপৃষ্ঠে সৃষ্টি রচনা করিলেন। এখানে "জাতি" শব্দ পদ ও গোত্রবাচক।

অনিত্য হইবে। কিন্তু তাহা বলিতে পার না। যেহেতু বেদ হইতেই নিখিল সংসার প্রকটিত হইয়াছে। এ কথা বেদ ও স্মৃতিতে আছে। অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর সহিত এবং সমস্ত দেবতা ও বেদের দ্রষ্টা ঋষিগণের সহিত বেদের জাতিপুরঃসর-সম্বন্ধ। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নহে। "অতএব চ নিত্যত্বং।" (ঐ ২৯) অতএব বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধ। "সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধোদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।" (ঐ ৩০) যদিও সৃষ্টি ও প্রলয়ের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে, তথাপি কোন নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং কোন নূতন-সংযোগ-দোষ বেদে অর্শেনা। সেহেতু পূর্ব্ব সৃষ্টির মতন সমান নাম, রূপ ও জাতিপুরঃসর পরসৃষ্টিতে বস্তু সকল এবং বৈদিক দেবতা, ঋষি, রাজগণ ও কর্ম্মকাণ্ড আবির্ভূত হয়েন। পূর্ব্বাপর অবিরোধ। যথা "পূর্ব্বকল্পবৎ" ইহা মন্ত্রবর্ণ এবং স্মৃতির সিদ্ধান্ত। মনু কহেন (১।২১) "সর্ব্বেষান্তু সনামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।" প্রভু হিরণ্যগর্ভ আদিতে বেদ হইতে সকলের নাম ও কর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সৃষ্টি রচনা করিলেন। বিষ্ণুপুরাণে কহেন—"যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানা রূপাণি পর্য্যয়ে, দৃশ্যন্তে তানিতান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু" (১।৫।৬৫) যেমন ঋতু পর্য্যায়ক্রমে ফলপুষ্পাদি পূর্ব্ববৎ দেখা দেয়, তাহার

তাঁহারা পুরুষবুদ্ধি বা ইষ্টসাধন-পবৃত্তিজন্ম তৎসমস্ত প্রণয়ন করেন নাই; কিন্তু বেদ-স্মৃত্যাদি শাস্ত্র দৃষ্টিতে করিয়াছেন। বেদস্মৃতি আশ্রয় করিয়া তাঁহারা যে সকল তত্ত্ব প্রচারিত করিয়াছেন মাত্র। নতুবা মূলের ব্যত্যয় করেন নাই।

৬। যাহা বেদমূলক নহে, এ ভারতবর্ষে তাহার গৌরব নাই। তন্ত্রে ও গীতাতে মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণ যদি যোগাদি সম্বন্ধে কোন নূতন কথা কহিতেন, তবে তাহার আদর হইত না। ফলে শাস্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত সত্যই সনাতন। অভিনব রূপে তাহার মধ্যে প্রক্ষেপ করা যাইতে পারে, এমন কোন সত্য ত্রিজগতে এবং ঋষি ও ঈশ্বর-গণের মনে অবশিষ্ট নাই। যাহা শাস্ত্র বিরোধী, তাহা শাস্ত্রের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। যদি পাওয়া যায়, তবে তাহাই প্রক্ষিপ্ত। ফলে চতুর্যুগব্যাপী এই অখণ্ড ভারতমণ্ডলস্থ অগণ্য-শিষ্য-সেবক-পরিবেষ্টিত অধ্যাপকগণের খরতর যামকতা লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাদৃশ দুষ্টকর্ম্ম সাধনে কোন ইষ্টসাধনেচ্ছু ব্যক্তি সাহসী হইতে পারে নাই। অতএব প্রক্ষিপ্ত-বাদীগণ নিশ্চিন্ত হউন।

৭। যেমন প্রক্ষেপের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ অপহরণ দোষও অর্শে না। কাহারও সম্পত্তি তাহার বিনানুমতিতে কেহ আত্ম-সাৎ বা হস্তান্তর করিলে, তাদৃশ কার্য্যকে অপহরণ কহা যায়; কিন্তু যাহা সার্ব্বজনীন, তাহা গ্রহণে ও ব্যবহারে অপহরণ দোষ ঘটে না। রৌদ্র, বায়ু, সাগরের জল প্রভৃতির ব্যবহার অপহরণ শব্দের বাচ্য নহে।

৮। সেইরূপ শাস্ত্রীয় বচন, উপদেশ, বিচার ও সিদ্ধান্ত সকল নিত্য এবং অধিকার, প্রকরণ, বিদ্যা ও শাখা-সম্প্রদায়-ভেদে সাধারণ সম্পত্তি। একটী বচন সমপ্রকরণে অথবা একই সিদ্ধান্ত সমান অধিকরণে যদি স্মৃতি, গীতা, তন্ত্র ও পঞ্চদশীতে দৃষ্ট হয়, তবে তাদৃশ স্থলে চৌর্য্য সন্দেহ করিতে নাই। তথা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, একই সত্য সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে এবং উক্ত শাস্ত্র সকল পরস্পর একই সিদ্ধান্তের পোষকতা করিতেছেন।

৯। এইরূপ গ্রহণ ও উপসংহরণ শাস্ত্র-কারদিগের মধ্যে চিরকাল প্রচলিত আছে। ফল ও বিদ্যা সংগ্রহেরও ঐরূপ রীতি থাকা দৃষ্ট হয়। "উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ" (বেঃ সুঃ ৩।৩।৫) কোন শাখাতে যদি অগ্নিহোত্র-বিধির ফল অযুক্ত থাকে, তবে শাখান্তর হইতে তাহার ফল-সংগ্রহ হইবেক। "সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে" (ঐ ৩।৩।১০) প্রাণ-বিদ্যাতে ঐতরেয়ক ও কৌষীতকী শাখাতে অযুক্ত গুণ সকল ছান্দোগ্য ও কাণ্ব শাখা হইতে আহরণ হইবেক। "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (৩।৩।১১) উপাসনার সুবিধা জন্য নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেতে তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত আনন্দাদি গুণ সকল অন্যান্য শাখাতে উপসংহৃত হইবেক। ভগবদ্গীতায় সাংখ্যযোগ প্রকরণে কঠোপনিষদের কতিপয় শ্রুতি প্রায় অবিকল উক্ত হইয়াছে এবং আরো নানাস্থানে শব্দতঃ—অর্থতঃ অনেক শ্রুতি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রকরণ-বিরুদ্ধ দোষ অর্শে নাই। ঐ রূপ নানা তন্ত্রে, শ্রুতিবাক্য সকল অবিকল দৃষ্ট হয় এবং নানা পুরাণে, বচন, বিবরণ, প্রভৃতি

তত্ত্বকথার পরস্পর বিনিময় দেখা যায়। ফলে মূলতঃ সবই বেদ।

১০। এইরূপ সংগ্রহাদি সনাতন ব্যবহার; কেননা শাস্ত্রীয় সত্য সমস্তই সনাতন এবং সকলের সাধারণ সম্পত্তি। তন্মধ্যে কোন নূতন কথা বা নূতন ধরণের শাস্ত্র আসিতে পারেনা। পরস্পরের মধ্যে সনাতন উপদেশ সকল যতই আহরিত ও প্রসারিত হউক, কিন্তু মূলের ব্যত্যয় হয় না।

১১। ভগবদ্গীতা। অনেকে মনে করেন, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড এক প্রকার নিরীশ্বর ধর্ম্ম; তাহা বিধিবিহিত নীরস কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন ঈশ্বরকে হৃদয়ের দেবতা রূপে প্রকাশ করে না। অতএব তাঁহাদের মতে ভগবদ্গীতাই, কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগে ঈশ্বরারাধনার বিধি প্রদান করিয়াছেন। সেই বিধির নামই "কর্ম্মযোগ"। সুতরাং তাঁহারা বলেন, ভগবদ্গীতা-শাস্ত্রই যোগধর্ম্মের স্রষ্টা, আবিষ্কারক এবং অবতারক।

১২। কিন্তু তাহা নহে। এই ভারতবর্ষে কোন নূতন তত্ত্ব বা নববিধান আসিয়া শাস্ত্ররূপে দাঁড়াইতে পারেনা। বেদ স্মৃতিতে যে কথার মূল নাই, তাহা ভগবদ্গীতাতে কিরূপে স্থান পাইতে পারে? তাহা হইলে অশাস্ত্রদোষ হয়। কিন্তু মূলতঃ সমস্ত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডই ঈশ্বরারাধনার উদ্দেশে। অতঃ ফলাভিসন্ধি প্রশস্ত নহে। অতএব তৎসমস্তই মূলতঃ কর্ম্মযোগ। এইজন্ত বেদোক্ত কর্ম্মযোগই গীতাতে প্রকাশ পাইয়াছে।

১৩। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে, ভগবান, অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন, "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং" অব্যয়যোগ আমি পূর্ব্বকালে বিবস্বান সূর্য্যকে কহিয়াছিলাম। "সএবায়ং ময়াতেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ"। সেই পুরাতন যোগ এক্ষণে আমাকর্ত্তৃক তোমার নিকটে কথিত হইল। শঙ্করাচার্য্য কহেন, জ্ঞাননিষ্ঠা (জ্ঞানযোগ) আর তল্লাভের উপায় রূপ কর্ম্মযোগ, এই উভয়নিষ্ঠারূপ "বেদার্থ যোগং বিবস্বতে আদিত্যায় সর্গাদৌ প্রোক্তবান্ অহং"। এই নিষ্ঠাদ্বয়রূপী যোগ আমি সৃষ্টির আদিতে সূর্য্যকে কহিয়াছিলাম। আনন্দগিরি কহেন— "বেদমূলত্বাদব্যয়ং"। বেদমূলকত্ব বিধায় এই যোগ অব্যয় শব্দে কথিত হইয়াছে। "অনাদিবেদমূলত্বাৎ যোগস্ত পুরাতনত্বং" অনাদিবেদমূলত্ব বিধায় এই যোগের পুরাতনত্ব। স্বামী কহেন "অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ং" এই যোগের ফল অবিনাশী। অতএব এই যোগ অনাদি, অবিনাশী, পুরাতন। কোন নবাবিষ্কৃত, অমূলক-নূতন বিধান বা পুরুষবুদ্ধির কার্য্য রূপে ভগবদ্গীতাতে অবতীর্ণ হন নাই।

১৪। ভগবানের কথায় অর্জ্জুনের সন্দেহ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার জন্ম (বসুদেব-গৃহে) ইদানীং হইয়াছে, আর সূর্য্যের জন্ম সৃষ্টির আদিতে হইয়াছিল। অতএব তুমি যে, পূর্ব্বকালে সূর্য্যকে যোগ কহিয়াছিলে, ইহা কিরূপে জানিতে পারিব? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান কহিলেন।—

১৫। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামী-
শ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম-
মায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজা-
ম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ
দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

১৬। অর্থ। হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার জ্ঞানশক্তির বিলোপ না হওয়ায়, সে সমস্তই জানিতেছি; তুমি অজ্ঞানাবৃত, এজন্য জানিতে পারিতেছনা। আমি জন্মরহিত, অনশ্বরস্বভাব, এবং সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্তা হইয়াও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। জীবদিগের ন্যায় কর্ম্মফলভোগার্থে বাধ্য হইয়া নহে, কিন্তু কেবল লোকানুগ্রহার্থ স্বীয় মায়াদ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহধারণ করি। হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখন তখন আমি আপনার শরীর সৃষ্টি করিয়া, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মীদিগের বিনাশ করতঃ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

১৭। এই চারিটী শ্লোকের অর্থ অনুধ্যান করিলে বুঝা যাইবে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পরব্রহ্মের অবতার রূপে বিজ্ঞাপন করিতেছেন। এই বিজ্ঞাপনে, ব্রহ্মলক্ষণ সমস্তই দেদীপ্যমান। শঙ্করাচার্য্য কহেন "দেহবান ইব ভবামি, জাত ইব আত্মমায়য়া, ন পরমার্থতঃ লোকবৎ।" আমি দেহধারীর ন্যায় হই; স্বীয় মায়াদ্বারা জন্মগ্রহণ করার ন্যায় প্রকাশ পাই; কিন্তু লোকে যেমন কর্ম্মজন্য শরীর ধারণ করে, আমি তেমন করি না। স্বামী কহেন—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়া অবতরামি" আমি স্বীয় বশীভূতা স্বকীয়া নির্ম্মলা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক অতিশয় জাজ্বল্যমান এবং অত্যন্ত মনোবুদ্ধি বলবীর্য্যাদি ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট দেহ সৃষ্টি করতঃ সেই দেহযোগে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হই।

১৮। তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ নামরূপবিহীন, নির্গুণ, নিরাময়, নিরাকার ও নিরঞ্জন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত সমস্ত প্রকৃতি ও অবিদ্যা-মায়া ব্যতীত, তাঁহার স্বীয় বশে অপরিসীম নির্ম্মলা মহাশক্তি অর্থাৎ প্রকৃতিশক্তি ও মায়াশক্তি বিদ্যমান থাকে; তাহার দ্বারা তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। এই গুণ ব্রহ্মলক্ষণ। তিনি সেই প্রকৃতি ও মায়াশক্তি দ্বারা যে শরীর ধারণ করেন, তাহা তাঁহার স্বরূপ নহে, কর্ম্মজন্যও নহে। সুতরাং সে দেহ তাঁহার স্বরূপে আরোপিত ও কল্পিত অধ্যাস মাত্র। জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বপ্রকার উপাধির সহিত উক্ত ব্রহ্মাধ্যস্ত উপাধি তিরোহিত হইয়া নিরঞ্জন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে জীব আত্মস্থ হয়েন। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বিজ্ঞাপনে কেবলই ব্রহ্মলক্ষণ বিদ্যমান ‡

‡ আমি বলিলাম "শ্রীকৃষ্ণের এই বিজ্ঞাপনে কেবলই ব্রহ্মলক্ষণ বিদ্যমান"। আমার

১৯। কিন্তু ভগবানের প্রতি প্রশ্ন এই যে, তুমি কখন কি নিমিত্ত অবতীর্ণ হও? অবতীর্ণ না হইয়া কেবল কি ইচ্ছামাত্রে প্রয়োজন সাধন করিতে পারিতেনা? উত্তর— যখন যখন জনসমাজে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, আমি তখন তখন অবতীর্ণ হই। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি কি? না, "যথা বর্ণাশ্রমাদি লক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সাধনস্য অভাবো ভবতি অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোঽধর্ম্মস্য" (শঙ্কর)

এই উক্তিকে অনেকের মনে অর্থান্তর উপস্থিত হইতে পারে, এজন্য আমি এ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের এই বিজ্ঞাপনের স্পষ্ট তাৎপর্য্য এই যে "আমি প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া মায়া দ্বারা দেহধারণ করি"। আমার বক্তব্য এই যে, পরব্রহ্ম, প্রকৃতি ও মায়ার অতিক্রান্ত তিনি তদুভয়ের বশীভূত নহেন। বরং উভয়ই তাঁহার বশীভূত ও অনুগত। তাহা দ্বারা তাঁহার স্বেচ্ছায় দেহধারণ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। সৃষ্টির উদয়কালেও তিনি স্বীয় বশীভূতা নিষ্কলা মায়াতে উপহিত হইয়া, মায়িক কলেবরে ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টির কার্য্য সাধন করিয়াছেন। সেই সমস্ত রূপ "অমানুষিক"। এইরূপ মায়া ও প্রকৃতিকে নিয়মিত করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। তাহা কেবল ব্রহ্মেরই সাধ্য। রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারবৃন্দও সেই মায়া ও প্রকৃতিকে নিয়োগ পূর্ব্বক মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বিজ্ঞাপনে কেবলই ব্রহ্মলক্ষণ বিদ্যমান। তাঁহার বা রামচন্দ্রের মূর্ত্তি কেবল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কার্য্য। কিন্তু স্বরূপ-লক্ষণে ব্রহ্ম অরূপ নিরুপাধিক ও নিরঞ্জন। অবতারগণ দেহ ধারণ নিবন্ধন, আপাততঃ এরূপ লক্ষণ-বিশিষ্ট না হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানটী জাজ্জ্বল্যমান থাকা দৃষ্ট হয়; কেননা তাঁহারা স্ব স্ব কথায় ও উপদেশে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা সময়ে সময়ে জনসমাজে এমত সকল অমানুষিক ও অলৌকিক কীর্ত্তি করিয়াছেন, যাহা কেবল ঈশ্বরেই সম্ভবে। তবে স্বীকৃত মায়িক উপাধিবশতঃ মধ্যে মধ্যে অথবা অধিকাংশতঃ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। অতএব অবতারদিগের এই চতুর্বিধ লক্ষণ যথা (১)— প্রকৃতি ও মায়াকে স্বেচ্ছাকৃত শরীর ধারণের এবং অলৌকিক কার্য্যের উপাদান করণ; (২) স্ব স্ব স্বরূপ বিস্মৃত না হওন; (৩) সময়ে সময়ে বিস্ময়জনক অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন; এবং (৪) যেমন কুলে যেমন সময়ে জন্মিয়াছেন, তদনুযায়ী আচরণ।

Colonel vans kennedy, with reference to the following remarks of Professor Wilson, thus observes— "I do not exactly understand what Professor Wilson means by this remark : Rama, although an incarnation of vishnu, commonly appears (in the *Ramayana*) in his human character alone.' I suppose he means, that Rama is seldom described, in that poem, as exerting his devine power ; for he always appears in it, as a man even when he acts as a god. Nor can I understand what the notion is which Professor Wilson has formed of a divine incarnation ; for he observes that 'the character of Krishna is very *contradictorily* described in the *Maha bharata*— usually as a mere mortal, though

যখন মানবগণের অভ্যুদয়-সাধন (ঐহিক-পারত্রিকের মঙ্গল-সাধন) সামাজিক বেদ-স্মৃত্যাদিবিহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি জাতির প্রতিপালনীয় বর্ণাশ্রমাদি-লক্ষণ-ধর্ম্মের এবং নিঃশ্রেয়স সাধন নিবৃত্তি-ধর্ম্মের অভাব হয়, আর ব্রাহ্মণের অপমান ও পরপীড়নাদি অধর্ম্মের উদ্ভব হয়; তত্তদবসের আমি মানব সমাজে জন্মগ্রহণ করি। জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ না হইলে, কেবল অলৌকিক ও অদৃশ্য ইচ্ছাদ্বারা জনসমাজের শাসন ও শিক্ষা সাধিত হওয়া সামাজিক বিধির বিরুদ্ধ।

২০। এই জন্মগ্রহণ "তত্ত্বতঃ" "পরানুগ্রহার্থমেব" স্বামী ৪।৯) কেবল সমাজের

---

frequently as a divine person.' But is not that precisely the character of an incarnation—a man, occasionally displaying the powers of a god?

(Wilson's vishnu Purana Vol. V. P. 284 1870.)

অতঃপর এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কিছু কিছু বেদান্ত পড়িয়াছেন, কিন্তু অবতার মানেন না। তাঁহারা তর্ক করেন যে, যেমন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ শাস্ত্রদৃষ্টিতে "অহং ব্রহ্মাস্মি" "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ বলিবার অধিকারী, সেইরূপ রাম-কৃষ্ণাদি অবতারগণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে আপনাদিগকে "ব্রহ্ম" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা অবতার নহেন। এইরূপ তর্কের প্রতি সংক্ষেপ উত্তর এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে আপনাকে "আমি ব্রহ্ম", বলিয়া মনে করা যত সহজ, বোধ হয় গোবর্দ্ধন ধারণ বা বানরের সহ মিত্রতা তত সহজ নহে।

(চ. শে. ব.)

হিতের নিমিত্ত। কিন্তু "বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং"? তুমি ঈশ্বর, তবে কি তুমি ক্রোধপূর্ব্বক নির্দ্দয় হইয়া পাপীদগকে বিনাশ কর? উত্তর—তাহা নহে। তাহা নিগ্রহ নহে, কিন্তু অনুগ্রহ। "ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোহপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ং যথাহুঃ, লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে, তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরীতি" (স্বামী ৪৮) দুষ্ট সকলকে নিগ্রহ করাতেও ভগবানের নির্দ্দয়তা শঙ্কা করিও না, যথা, আচার্য্যেরা কহিয়াছেন যে, বালকের লালন পালনে ও তাড়ন করায় যেরূপ মাতার নির্দ্দয়তা হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরেরও গুণদোষের নিয়মকর্ত্তৃত্বে নির্দ্দয়তা সম্ভবেনা। যেহেতু "নিগ্রহোহপি দণ্ডকপোহনুগ্রহঃ" (স্বামী ৫ ১৪) পরমেশ্বরের নিগ্রহরূপ দণ্ডই অনুগ্রহ। অর্থাৎ দণ্ডে পাপীর পাপক্ষয় হয়।

২১। এ স্থানে প্রসঙ্গতঃ দুইটী পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। "ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) স্বয়ং উত্থিত হইয়া, * * ক্রোধে আগত শিশুপালের মস্তক ক্ষুরধার চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন। শিশুপাল হত হইলে পর * * সকল লোকের সমক্ষে আকাশচ্যুত উল্কার ন্যায় শিশুপালের দেহস্থ জ্যোতি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ শরীরে প্রবেশ করিল। তিন জন্মে আনুপূর্ব্বিক (ভগবানের সহ) শত্রুতাবিষ্ট বুদ্ধিদ্বারা (ভগবানকে তীব্রচিন্তারূপে) ধ্যান করতঃ শিশুপাল মরণোত্তর (শ্রীকৃষ্ণশরীরে) তন্ময় হইয়াগেল; যেহেতু অনুধ্যানই গতির কারণ।" (শ্রীমদ্‌-ভাগবত ১০ স্কঃ। ৭৪ অঃ। ২৮-২৯ শ্লোক) অপরঞ্চ, শ্রীকৃষ্ণের গদাঘাতে দন্তবক্রের

মরণোত্তর "শিশুপালের শরীর-জ্যোতির ন্যায়, দন্তবক্রের শরীরস্থ সূক্ষ্মতর জ্যোতি, সকলের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের শরীর মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল।" এতাবতা, ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়া পাপীদিগকে বিনাশ করিলেও, তাঁহার অপার করুণাতে তাহারাও উদ্ধার লাভ করে। জগতের মধ্যে হিন্দু-শাস্ত্র ব্যতীত আর কোনো দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র এই লোমহর্ষণ ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করেন নাই। ভগবানের শরীর ধারণ ব্যতীত, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, এইরূপ দৃষ্টান্ত সকল জন-সমাজে সম্যক্‌রূপে, সম্পূর্ণ শুভফলের সহিত, প্রচারিত ও সকলের বুদ্ধিতে মুদ্রিত হইতে পারিত না।

২২। এইক্ষণ প্রাগুক্ত গীতাবচনের অবশিষ্ট তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ভগবান কহিলেন, তাঁহার এইরূপ জন্ম ও কর্ম্ম অনেক গত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু "তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি"। অর্থাৎ "তানি অহং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাবত্বাদনাবরণ জ্ঞানশক্তিরিতি বেদ" (শঙ্কর) "অলুপ্ত বিদ্যাশক্তিত্বাৎ" (স্বামী ৪ ৫) তৎসমস্ত জন্মের কথা এবং সেই সমস্ত জন্মে যত কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা আমি সকলি জানি, অর্থাৎ সে সমস্ত আমার মনে আছে। কেননা, আমি নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ ও মুক্তস্বভাব বিধায় আমার জ্ঞান-শক্তি 'অনাবৃত'—প্রতিবন্ধ-রহিত এবং অলুপ্ত।

২৩। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা, ভগবান, ইহাই বিজ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি সৃষ্টির আদিতে "রূপান্তরে" অন্যরূপে ধরিয়া (স্বামী ৪।৫) সূর্য্যদেবকে এই যোগ কহিয়াছিলেন। এই যোগ, জ্ঞাননিষ্ঠা (বিবেকজ আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞান) ও কর্ম্মনিষ্ঠা (ফলাভিসন্ধি-বর্জ্জিত ভগবদারাধনাযুক্ত ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মানুষ্ঠান) রূপ নিখিল বেদার্থ-পরিপূর্ণ, বেদমূলক, অনাদি পুরাতন এবং অবিনাশী। অর্থাৎ ইহা নূতন সৃষ্ট—রচিত বা আবিষ্কৃত নহে। সমগ্র বেদশাস্ত্র "শব্দ-ব্রহ্ম" রূপে ব্রহ্মাঙ্গ। তন্মধ্যে সমুদয় মন্ত্র-কাণ্ড, ব্রাহ্মণকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপনিষৎ এবং যোগবিভাগভুক্ত। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সকল তাৎপর্য্যতঃ ব্রহ্মলাভেরই পরম্পরা উপায় স্বরূপ। সেই ভাবে তাহা "যোগ" শব্দ-সংজ্ঞিত। যোগই ক্রিয়ার অমৃতরস—প্রেম-ভক্তিরূপ অভেদাঙ্গ। উপনিষদই সেই রসের সাগর এবং স্বয়ম্ভু—স্বয়ংপ্রকাশ পরব্রহ্মই সেই রসস্বরূপ। ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত যে বেদ-শাস্ত্র, তিনি প্রতি কল্পের আদিতে পরমাত্মা-ব্রহ্ম হইতে অভ্যুদিত হইয়া সৃষ্টির দ্বারস্বরূপ ব্রহ্মমানসে (ব্রহ্মার হৃদয়ে) গুপ্ত হয়েন। সেই আদি অবতার স্বরূপ ব্রহ্মা সূর্য্যের জনক, অধিষ্ঠাতৃদেবতা, বিষ্ণুতেজস্বরূপ এবং লক্ষণা-সম্বন্ধে সূর্য্যস্থানীয় হিরণ্যগর্ভ রূপ সবিতা দেবতা।

২৪। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম। এজন্য তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন "এই যোগ আমি পূর্ব্ব-কালে সূর্য্যকে কহিয়াছিলাম"। এ স্থানে সূর্য্যকে কহা অথবা সূর্য্যের হৃদয়ে নিহিত, স্থাপিত বা প্রকাশিত করা সম-অর্থবাচী। তিনি কহিলেন—দীর্ঘ কালবশে এই যোগ নষ্ট হইয়াছে। অতএব তিনি স্বীয় ভক্ত অর্জ্জুনকে তাহা অদ্য উপদেশ করিলেন।

২৫। এই উপদেশ দ্বারা ভারত-সমাজে

অনেকগুলি শুভফল যুগপৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ অন্যান্য উপদ্রব ও অত্যাচার-শান্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের বেদস্মৃত্যাগম-বিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বেদাদি সৎ-শাস্ত্রে যত যোগাঙ্গ বাক্য আছে, তাহার অর্থ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ বিধিবিহিত সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডই যে ব্রহ্মেতে উদ্দিষ্ট, এই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ দৈব ও পৈত্র্য প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল যে—কর্ম্মসমাপ্তি-কালে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে বা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত হয়, পুরোহিত ও যজমান উভয়েই তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এবং পঞ্চমতঃ ক্ষত্রিয় বর্ণের স্বধর্ম্ম যে যুদ্ধ ও রাজ্যরক্ষাদি, তাহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট-নিষ্কাম ধর্ম্ম এবং বেদস্মৃতির বিধিমূলক। যোগধর্ম্মের এই শেষোক্ত অবয়বটী, ভগবান্, অর্জ্জুনকে গীতাতে পদে পদে উপদেশ দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

সতীত্ব ও নারীশিক্ষা।*

—•:•:•—

যে দেশে পতিনিন্দা শুনিয়া শিবানী সতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল; দেবাদিদেব ত্রিগুণাতীত মহাদেব যাঁহার শোকে উন্মত্ত হইয়া মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া ভারতময় ছুটিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তজ্জন্য বিষ্ণুচক্র-ছিন্ন সতীর পবিত্র মৃতদেহের অংশ একান্ন স্থানে পতিত হওয়াতে, সেই সকল স্থান 'একান্ন মহাপীঠ' রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; যে সকল মহাপীঠে যুগযুগান্তর ধরিয়া একান্ন দেবীমূর্ত্তি পূজা হইতেছে। যতকাল পুণ্যভূমি ভারতভূমি থাকিবে, ততকাল মহাপীঠ সকলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিবে, এবং ততকাল ধর্ম্মপ্রাণ সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী সেই সকল মহাতীর্থে মহাদেবীর পূজার্চ্চনা করিবেন ও মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবেন। যে দেশে কঠোর ব্রতপরায়ণা সাবিত্রী সাধনা-বলে, পুণ্যবলে, ধর্ম্মরাজ যমকে প্রসন্ন করিয়া মৃত পতিকে জীবিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যে দেশে সসাগরা ধরার অধীশ্বর দশরথের পুত্রবধূ সীতাদেবী অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সুখ, হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া, বল্কলধারিণী হইয়া, পতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনানুগমন করিয়াছিলেন; অট্টালিকার পরিবর্ত্তে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া, স্বর্ণপালঙ্কের দুগ্ধফেননিভ শয্যার স্থলে পর্ণশয্যায় শয়নে অপার শান্তি, পরম আনন্দ অনুভব করিয়া, যিনি চিরদিনের জন্য নারীজাতিকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি, আনন্দ সম্পদে নহে, ঐশ্বর্য্যে নহে, অলঙ্কারে নহে, ভোগে নহে, পরন্তু পতিসেবায়, পতির আনুগত্যে, পতির অবস্থানুসরণে, পতির যত্নে, পতির প্রেমে। যে দেশে দময়ন্তী সতী স্বয়ম্বরপ্রথারও স্বর্গীয়, মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন; যে স্বয়ম্বর-প্রথার সহিত লালসা, বাসনা, কামনার সংস্পর্শও নাই, যে সতীত্বের নিকট সকল প্রকার

---

* সন ১৩১৩ সালের ১০ই পৌষ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের বিরাট অধিবেশনে টাউনহলে পঠিত।

প্রভাব, সর্ব্ববিধ মোহ, প্রলোভন, গুণ-গরিমা বিধ্বস্ত; দেবশক্তি, দেবসম্পদও নগরাজার মানব-শক্তির নিকট সঙ্কুচিত ও পরাভূত, আজ কালের বশে সেই দেশে সতী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে হইতেছে।

ব্রহ্মা এই ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণুরও পুনঃ পুনঃ অবতার এই ভারতভূমিতে। সতীর লীলাক্ষেত্রও এই ভারত। পৃথিবীর আর কোনও দেশে কি সতীর এরূপ উচ্চ, মহান্ আদর্শ পাওয়া যায়? "কায়মনোবাক্যে" সতী কথাটী হিন্দুর নিজস্ব। সে ভাব অনুভব করিতে কয়জনে সক্ষম? দেহে সতী থাকিলে অথবা দেহ ও বাক্যে সতী থাকিলেও 'সতী' নাম যোগ্য হয় না। মনে সতীই প্রকৃত সতী। সমগ্র জীবন যাঁহার পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, যিনি পতি-প্রেমে তন্ময়া, যাঁহার প্রতি শিরায়—প্রতি লোমকূপে পতির রূপ বিরাজিত, তিনিই প্রকৃত সতী; ভারতে কায়মনোবাক্যে সতীই সতী নামে অভিহিত।

হিন্দু সতীর আর একটী লক্ষণ এই:—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"

অর্থাৎ স্বামী বিপন্ন হইলে যিনি নিজেকে বিপন্না জ্ঞান করেন, স্বামী আনন্দিত হইলে আনন্দিতা হন, স্বামী প্রবাসে যাইলে যিনি মলিনা ও কৃশা হন এবং স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, তিনিই যথার্থ পতিব্রতা।

এরূপ সুন্দর—এরূপ মধুর দৃষ্টান্ত কি জগতের আর কোন স্থলে পাওয়া যায়? এক হিন্দুনারী ব্যতীত অন্য কোন নারী কি স্বামী প্রবাসে থাকিলে বিশেষ মলিনা বা কৃশা হন—না স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণে যাইতে পারেন?

যোগবলে, তপঃপ্রভাবে, ঋষিগণ ভূত-শক্তিকে আয়ত্ত করিতেন, রৌদ্রাতপ, শীত-বর্ষা, নির্ব্বিকারে সহ্য করিতেন; কিন্তু সতীনারী যে সতী-তেজ-বলে অগ্নিতে আত্ম-সমর্পণ করিতেন, সে তেজের নিকট অগ্নির তেজ বোধহয় জলের মত শীতল মনে হইত। নহিলে মুসলমান বাদসাহগণের অত্যাচার-ভয়ে শত শত রাজপুত-মহিলা হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে সোনার দেহ বিসর্জ্জন দিতেন কিরূপে? পৃথিবীর কোন দেশের কোন ইতিহাসে একপ একটী দৃষ্টান্তও কেহ দেখাইতে পারিবেন কি?

রাজপুত-মহিলাগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সত্বেও ইংরাজরাজ ভারত হইতে সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। স্বভাবতঃ একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেহে লাগিলে আমরা কতই কাতর হই, দেহের কোনও এক ক্ষুদ্র অংশ দগ্ধ হইলে জ্বালা যন্ত্রণায় কত আর্ত্তনাদ করি; কিন্তু এই ভারতে আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করিয়া, যুগযুগান্তর হইতে সহস্র সহস্র হিন্দুনারী পতির চিতায় আত্মদেহ সমর্পণ করিয়াছেন! জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, আর্ত্তনাদ নাই, কাতরতার কোন প্রকার অভিব্যক্তি নাই, মৃতদেহের ন্যায় জীবন্ত দেহ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল—যেন জড়ে চেতনে কোনও ভেদ নাই! অনেক ইংরাজ জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বচক্ষে সাবস্ময়ে এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অবনতভাবে

এ স্থলে সে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ইংরাজরাজ যদি হিন্দু নারী-প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, তবে আইন-বলে চিরদিনের প্রথা উঠাইয়া দিতেন না। বিবাহ কালে হিন্দুদম্পতী দেবতাকে সাক্ষী করিয়া এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সংস্কার সম্পাদন করিতেন :—

"ওঁ যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্॥"

অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক। প্রকৃত হিন্দু-সতীর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে তাহা প্রতিপালিত ও আচরিত হইত। পতির মৃত্যুতে পতিদেহের মাংস অস্থি প্রভৃতি যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইত, সতীর দেহও যেন তদ্রূপ হইয়া যাইত! নহিলে জ্বলন্ত চিতায় নিঃশব্দে, নীরবে দগ্ধ হওয়া কি সম্ভব হইত? কেবল তাহা নহে; পতির শোকে পতিব্রতা এতাদৃশী বিহ্বলা হইতেন, পতির সহিত পরলোকে মিলিত হইবার আশায় এতদূর উৎকণ্ঠিতা হইতেন যে, দৈহিক যন্ত্রণা যন্ত্রণা বলিয়াই অনুভূত হইত না; অপরিসীম মানসিক বেদনা কর্ত্তৃক সে যাতনা অভিভূত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইত। আরও একটী সূক্ষ্ম ক্রিয়া হইত; জন্মান্তরবাদী হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন জাতি বিশ্বাস করেন না যে, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় প্রাণবায়ুর সহিত দেহান্তর আশ্রয় করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥"
(গীতা—১৫শ—৮ম শ্লোক)

যেমন বায়ু গমন কালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লয় ও অন্য দেহে প্রবেশ কালে উক্ত ইন্দ্রিয়শক্তি সমূহের সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

পতি-প্রেমে তন্ময়া হিন্দুসতী পতির অস্তিত্বে নিজ অস্তিত্ব অনুভব করিতেন; তদভাবে নিজে মৃতবৎ হইয়া যাইতেন। জ্বালা, যন্ত্রণা, সুখ, দুঃখ ভোগ করিবার কর্ত্তা মন ও বুদ্ধির সহিত চলিয়া গেলে, ইন্দ্রিয়গুলির তন্মাত্রও দেহ ত্যাগ করে; স্থূলদেহে তখন যাতনা বেদনার অনুভূতিও বিনষ্ট হয়; তাই যে সকল হিন্দুসতীর দেহ মাত্র ভিন্ন, হৃদয় মন আত্মা পতির সহিত একীভূত—অভিন্ন, পতির চিতানলে স্থূল দেহ দগ্ধ করা তাঁহাদের [illegible] দুরূহ ব্যাপার ছিল না। [illegible] অন্য লোকে প্রাণ দিতে [illegible] কন্যাগণেকে সদ্য পিতৃহীন [illegible] আবার তখনি মাতৃহীন করিতে মাতার মনে মমতার উদ্রেক হইত না! তিনি পতি-বিয়োগ-মুহূর্ত্ত হইতেই সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিদেশী রাজার প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। বরং এরূপ আইন করা উচিত ছিল যে, যে স্থলে উত্তেজনা, প্ররোচনা, বা বলপ্রয়োগ করিয়া [illegible] করানো হইবে, সে স্থলেই আইন মত দণ্ড দেওয়া যাইবে। সহমরণের

প্রথা দেশব্যাপী ছিল না বটে, অধিকাংশ হিন্দুবিধবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই অবলম্বন করিতেন। কোন কোন দেশীয় রাজার রাজ্যে আজও সহমরণ প্রথা আছে। ইংরাজ-রাজ্যেও মধ্যে মধ্যে সতীর সহমরণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; অনুমৃতার সংখ্যা আরও অধিক। সহমরণের প্রথা উঠিয়া সতীর একটী উচ্চ আদর্শ, নারী-চরিত্র-গঠনের একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত অপসারিত হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে সহমরণের ব্যবস্থা থাকিলেও, সংসার রক্ষার জন্য, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, ধর্ম্মের আদর্শ সমুজ্জল রাখিবার নিমিত্ত বিধবার ব্রহ্মচর্য্যকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর আসন সহমৃতার অপেক্ষা উচ্চতর। কারণ সহমৃতার ধর্ম্ম সকাম এবং ব্রহ্মচারিণীর ধর্ম্ম নিষ্কাম। পতি-বিয়োগে সহমরণোদ্যতা সতীর শরীর ও মনের যে অবস্থা ঘটিত প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীরও সেই অবস্থা ঘটে, কিন্তু তাঁহার এতদূর ধৈর্য্য—এতদূর সহিষ্ণুতা, যে তিনি সন্তান-সন্ততির মুখ চাহিয়া, সংসারে ভাসিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া, পাষাণ বুকে করিয়া সারা জীবন অতিবাহিত করিতেন। ব্রহ্মচারিণী অনুদিন—অনুক্ষণ মনশ্চক্ষে স্বামীদর্শন লাভ করেন, স্বামী-সেবা—স্বামী-সেবায় তন্ময়া থাকেন; শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁহার পতিই ধ্যান, পতিই জ্ঞান, পতিই চিন্তা। তাহাতেই তাঁহার অপার আনন্দ, অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি, পরম শান্তি। সমুদ্রাপেক্ষা গভীরতর শোক, হিমালয়াপেক্ষা গুরুতর পাষাণভার যন্ত্রণার উপশমের জন্য হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা করিয়াছেন—হিন্দু-বিধবা হিন্দু-গৃহের কর্ত্রী—হিন্দু-সংসারের প্রতিপালিকা। দেবার্চ্চনা, ব্রত, উপবাস, তাঁহার নিত্য কার্য্য। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত পরিবারবর্গের রোগে পরিচর্য্যা, একাদিক্রমে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ করিয়া, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা কেবলমাত্র সংযতা জিতেন্দ্রিয়া হিন্দু-বিধবা ব্যতীত অন্য কোন নারীর বা পুরুষের শক্তি, সামর্থ্য, অধ্যবসায় বা উৎসাহে হইতে পারে না। কেবল মাত্র তাহা নহে, অনেক সংক্রামক ব্যাধি হিন্দুবিধবাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রত্যেক হিন্দুসংসারে আজও যে নিত্য দেবসেবা হয়, গৃহ-বিগ্রহের পূজা হয়, সে সমস্ত সতী ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবার প্রভাবে ও চেষ্টায়। ইঁহারা না থাকিলে, অনেক পরিবারে দোল, দুর্গোৎসব ক্রিয়া কলাপ বন্ধ হইয়া যাইত। গৃহস্থের অতিথিসেবা, গোসেবা, মুষ্টিভিক্ষা লোপ পাইত। এক কথায়, ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের সুন্দর ব্যবস্থায় সতী, ব্রহ্মচারিণী, পরোপকারে—পর-সেবায়—নিষ্কাম কর্ম্মে ও নিষ্কাম ধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করেন। মানব সহস্র সহস্র জন্ম সাধনার ফলে যে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়, যে দৃশ্য বড়ই দুর্ল্লভ, সতী ব্রহ্মচারিণীতে সেই নিষ্কাম ভাব স্বতঃস্ফুপরিস্ফুট। সংসারের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও সংসারে উদাসিনী; সংসারের সুখ, শান্তি, সুশৃঙ্খলার জন্য এত চিন্তিত থাকিয়াও এমন গভীর বৈরাগ্য; দুই বিসদৃশ ভাবের এমন সুন্দর সামঞ্জস্য তাঁহাদেরই সাধ্যায়ত্ত। যে অবস্থায় সুখ, সাধ, বাসনা, কামনা,

পতির অনুগামী হইয়াছে, ইন্দ্রিয়নিচয় অন্তর্মুখ এরূপ বৈরাগ্য, এরূপ উদাসীনতা, এরূপ নিষ্কাম ভাব সেই অবস্থাতেই সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক।

যে সমাজের প্রকৃতি এইরূপ, যুগযুগান্তর হইতে যে সমাজ সতীত্বের পবিত্র ও স্বর্গীয় ভাবে অনুপ্রাণিত, কালধর্ম্মে বিজাতীয় অনুকরণ-প্রভাবে সে সমাজে একটা গণ্ডগোল উঠিয়াছে; মনটা কেমন বিভ্রান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল আজ "সতীত্ব ও নারীশিক্ষা" সম্বন্ধে দু'চারি কথা বলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুষমায় পরিপূর্ণ চিত্রখানি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে যাইতেছে দেখিয়া; একটী আদর্শ মুছিয়া ফেলিয়াছে, আবার আর একটী আদর্শ মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াস দেখিয়া, আমাদিগকে এই কার্য্যের ভার লইতে হইয়াছে। কলির শাসনে যুগধর্ম্মে সতীত্ব হীনপ্রভ হইয়াছে; সতীর সংখ্যা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে; বাসনা—কামনা ভোগবিলাস রাহুর ন্যায় যেন সতী ভূমিকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। বাসনা-কামনা পূরণে লালসা-আকাঙ্ক্ষার অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়; রোগ, তাপ জ্বালা যন্ত্রণা শতদিক্ হইতে আক্রমণ করে, জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠে, দেহ রোগের আধার হয়, আয়ুক্ষয় হয়, অকালমৃত্যু ঘটে, এসব দেখিয়া শুনিয়াও আমরা বিভ্রান্ত হইতেছি। কি দুর্ব্বুদ্ধি! কি অপরিণামদর্শিতা! গৃহে অগ্নি লাগিলে, সুশীতল বারিসেচনে তাহা নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিয়া, কুম্ভ পূর্ণ করিয়া ঘৃত ঢালিবার ব্যবস্থা হইতেছে! ইন্দ্রিয়দমনের চেষ্টা না করিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থের পরামর্শ দেওয়া হইতেছে! সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা না করিয়া সতীত্ব নাশের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চলিতেছে! হিন্দু বিধবার বিবাহ ত সংযমের ব্যবস্থা নহে, ইন্দ্রিয়চরিতার্থেরই বিধিবদ্ধ প্রণালী। সমাজে যে পাপস্রোতের প্রবাহ দেখিয়া তোমরা ভয়ে, আতঙ্কে, বিভ্রান্ত হইয়াছে, যে মহাপাপ মোচনের জন্য এত সচেষ্ট হইয়াছে, বিবাহে সে মহাপাপ বিন্দুমাত্র কমিবে না। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে আছে, তোমরা বলিয়াছ বলিয়াই এ পাপ বাড়িতেছে; এত অনিষ্ট, এত অনর্থ হইতেছে। তোমরা যে দয়াপরবশ হইয়া বল, যে সব বালবিধবা রজোদর্শনের পূর্ব্বে পতিহীনা হইয়াছে, তাহাদের আবার বিবাহ হওয়া উচিত, তাহা তোমাদের বিষম ভ্রম। সমস্ত জীবনটা সুখ, সাধ, ভোগে বঞ্চিত হইবে বলিয়া যদি তাহার বিবাহের ব্যবস্থা হয়, তবে অল্পদিন যে স্বামী-সহবাস করিয়াছে, তাহারও ত সমস্ত জীবনটা পড়িয়া রহিল; ৪।৫ বৎসর যে ভোগ করিয়াছে তাহারও জীবনের ত অনেক বাকি। তবে কেবল, যে রজোদর্শনের পূর্ব্বে পতিহীনা হইয়াছে, তাহারই পক্ষে এ ব্যবস্থা কেন? পাপাচারের ভয়, নরহত্যার আশঙ্কা বালবিধবার পক্ষে যত, যুবতী বিধবার পক্ষে আবার ততোধিক। তবে বিবাহের সীমানির্দ্দেশ কোথায় করিবে, কিরূপে করিবে? বিধবাবিবাহ দিয়া সমাজের ইষ্ট সাধন হইবে, ইহা যদি বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সকল বিধবার বিবাহ দেওয়া উচিত। তাহা ত পারিবেনা; তবে কেন বিধাতার

উপর কলম চালাইতে যাইতেছ? জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্ম ফলে—অদৃষ্টবশে যাহাদের বৈধব্য ঘটিয়াছে, সেই প্রারব্ধ ফল খণ্ডন করা তোমর সাধ্য কি? পুরুষকারের দ্বারা সঞ্চিত ও ভবিষ্য কর্ম্ম খণ্ডন করা যায়, কিন্তু প্রারব্ধ ফল খণ্ডন করা বা রোধকরা বিধাতারই অসাধ্য, তা মানব-শক্তির কা কথা!

সতীর সতীত্ব রক্ষার উপায়, প্রবৃত্তির পথ নহে নিবৃত্তির পথ। সতীর যথার্থ সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ ভোগবিলাসে নহে সংযমে। প্রথমেই বলিয়া রাখি, এই নিবৃত্তির পথ এবং ভোগবিলাস পরিহার করিয়া সংযমী হওয়া কেবল নারীর কর্ত্তব্য নহে, পুরুষের ও অপরিহার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুশাস্ত্রে, হিন্দুসমাজ অগ্রে পুরুষের পক্ষে সে ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষার সূত্রপাত হইতে পুরুষকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত। তপস্যা, যোগাভ্যাস পুরুষেরই কার্য্য, নারীর নহে। কঠোরতার ব্যবস্থা, সংযমের ব্যবস্থা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ব্যবস্থা কেবল নারীর জন্য নহে, পুরুষেরও জন্য। যাহারা বলে হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুসমাজ পক্ষপাতী, তাহারা সত্যের অপলাপ করে এবং অনভিজ্ঞতা ও বিবেকহীনতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে মাত্র। শাস্ত্র বা সমাজের কোন দোষ নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুজাতি অধঃপতিত; প্রায় সহস্র বৎসরের কুসংসর্গে অনেকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, উচ্ছৃঙ্খল এবং যথেচ্ছাচারী। হায়! সতীর মর্য্যাদা আমরা বুঝিনা, পদে পদে সতীর নির্য্যাতন সতীর লাঞ্ছনা করি, সেই মহাপাপ আমাদের রোগ, শোক, অকালমৃত্যু, দুঃখ, দারিদ্র্য ও অশেষ যন্ত্রণার অন্যতম কারণ।

এখন সংক্ষেপে প্রকৃত নারীশিক্ষার কথা বলি। এই আর্য্যভূমি, পুণ্যভূমি, কর্ম্মভূমি ভারতে কর্ম্মই শিক্ষার মূলাধার, সকল শিক্ষাই কর্ম্মজনিত কর্ম্মই এখানে পূজিত, সম্মানিত; রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত কর্ম্মীরই গৌরব করেন, কর্ম্মীর দ্বারাই পরিচালিত, কর্ম্মীরই অধীন। এখানে চরিত্রহীন বিদ্বানের স্থান অতি নিম্নে। কর্ম্ম দেখাইয়া, চরিত্র দেখাইয়া, মনুষ্যত্ব দেখাইয়া, ক্রমে ক্রমে শিক্ষায়, শাস্ত্রে ও জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মিত। কর্ম্ম-বলে, সাধনা-বলে, জ্ঞানী ও ভক্তই ভারতে যুগযুগান্তর হইতে দেবতার ন্যায় পূজিত। তা ছাড়া, কি সাংসারিক, কি সামাজিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, কোনও কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মের জন্য কোনও শিক্ষা ধর্ম্মব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারিত না। কেবল মাত্র 'পুঁথিগত বিদ্যা' হিন্দু-প্রকৃতির বিরোধী। সুতরাং পূর্ব্বকালে নারীশিক্ষাও সেই ভাবে প্রদত্ত হইত। পুরুষ ও নারী উভয়কেই একশিক্ষায় শিক্ষিত করিবার—উভয়কেই এণ্ট্রান্স, এফ, এ, বি, এ, পাশ করাইবার একপ নির্ব্বুদ্ধিতা প্রাচীন হিন্দুগণের ছিল না। পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অধিক কি, নারীর শারীরিক গঠন-প্রণালী ও শারীরিক ধর্ম্ম পুরুষ শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। উপার্জ্জনের ভার, জীবন-সংগ্রামের ভার পুরুষের; সংস্থান, সংসার-সংরক্ষণ ও পালনের ভার নারীর। কিন্তু হায়রে সাম্যবাদ! হায়রে স্থূল-দর্শিতা! ইউরোপ ও আমেরিকায় পুরুষ

ও নারীর এক প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইংরাজাধীন ভারতেও ইংরাজ-রাজ ভারত-ললনাগণের শিক্ষাবও সেইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। উক্ত পাশ্চাত্য উভয় দেশই আজ অপরিণামদর্শিতার বিষে জর জর। তাহাদের কাহিনী আমাদের দিবার প্রয়োজন নাই—অবসরও নাই। সংবাদপত্রে, নভেলে, কাব্যে, এবং অনেক উদাহরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণেও পাওয়া যাইতেছে। আমাদের দেশে বিজাতীয় শিক্ষার কি বিষময় ফল ফলিয়াছে, সংক্ষেপে বলিতেছি। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর প্রধান কুফল লজ্জাহীনতা, বিলাসিতা, আড়ম্বরপ্রিয়তা ও ভোগপরায়ণতা। লজ্জা সতীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ, প্রধান সৌন্দর্য্য ও পরম গৌরবের বৃত্তি। অধিক কি, লজ্জা-বলেই সতী নারী আত্মরক্ষায় সক্ষম হন। সংযম অভ্যাসের উপাদানই লজ্জা। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে আছে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

জগৎ রক্ষার জন্য, সংসারে ধর্ম্মরক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়া, স্বয়ং দেবী ভগবতী দয়া করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে লজ্জা রূপে অবস্থিতা। তাহা না হইলে মানব পশুর অধম হইত, সোণার সংসার মহাশ্মশানে পরিণত হইত। বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা শিখিয়া, মনকে স্বাধীনতা দিতে শিখিয়া, বাসনার দাসী হইয়া, শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে দিন দিন লজ্জার হ্রাস হইতেছে, তাহাতে আমাদের সমাজে যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহার বর্ণনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। সংসারের জন্য কষ্ট, সহিষ্ণুতা, সুখ, সাধ, ভোগে বৈরাগ্য, প্রভৃতিগণে ত্যাগস্বীকার ও নিঃস্বার্থভাব হিন্দুললনার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা সেই মহান্ স্বর্গীয়ভাব বিনাশ করিতে উদ্যত। একদিকে পুরুষদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে নারীগণের স্বার্থপরতা, আত্মসুখাকাঙ্ক্ষা, বিশাল বঙ্গ-পরিবারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। পুস্তকের কীট হইয়া, বিলাসভোগের কৃমি হইয়া, নারীগণ সন্তান-সন্ততির লালন পালন, যত্ন তত্ত্বাবধানে অবকাশ পান না। প্রচীন রমণীরা শিশু রোগ প্রতীকারের কত সহজ—সুন্দর উপায়, কত ব্রতাশু তত্ত্ব জানিতেন; তাহাতে দরিদ্র দেশের প্রচুর ডাক্তার ও ঔষধ-খরচ বাঁচিয়া যাইত; তাহার স্থলে এখন নারীগণকে ইতিহাস, ভূগোল, Mathematics, science শিখানো হয়—তাহাতে ইহকালও নষ্ট, পরকালও নষ্ট। কত গৃহ হইতে এখন আত্মীয়গণের আশাস্থল অন্নপূর্ণার ভাব অন্তর্হিত। এখন রাঁধুনীর হাতে খাইয়া চিত্তে অতৃপ্তি, দেহে অস্বাস্থ্য ও প্রাণে স্ফূর্ত্তির অভাব হইতেছে। বর্ত্তমান নারীশিক্ষার ফলের এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এখন আবার আমাদের বাঁচিতে হইবে, বাঁচাইতে হইবে; আবার সেই সনাতন পথে ফিরিতে হইবে। পড়াও তাঁহাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত পুরাণসমূহ। মন যাহাতে কলুষিত হয়, বিকৃত হয়, ইংরাজি ছাঁচে ঢালা এমন নাটক, নভেল, কাব্য, কবিতা, আর স্পর্শ করিতে দিওনা। শিখাও তাঁহাদিগকে পূজার্চ্চনা, গুরুজন-সেবা, রোগীর শুশ্রূষা, দীন দরিদ্রে দয়া, অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে

বস্ত্রদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান। আর বসাইয়া দাও সেই প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী হিন্দুবিধবা সতীর চরণ-প্রান্তে। এমনজ্বলন্ত, জীবন্ত, পরিপূর্ণ, মহান্ দৃষ্টান্ত—মূর্ত্তিমতী শিক্ষা সংসারে আর কুত্রাপি পাইবে না। ব্রহ্মচারিণীর মত পবিত্র কর্ম্মসমুদ্রে ডুবাইয়া দাও, তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে—নিষ্কামভাবে কর্ম্মে জীবনোৎসর্গ—আত্মোৎসর্গ করিতে শিখাও। এ সমস্ত মনকে পবিত্র করিবার—অর্থাৎ চিত্ত-শুদ্ধির অব্যর্থ ও অমোঘ মহৌষধ। ব্রহ্মচারিণীর অনুকরণে সংযতা, জিতেন্দ্রিয়া, পবিত্রা, সাধ্বী হইবে। নারীশিক্ষার নামান্তরই সতীত্ব। সতী না হইলে, সংসারের ঘরণী, ভরণী, অধিষ্ঠাত্রী দেবী হওয়া যায় না। প্রকৃত সতী-জীবন এক জন্মের শিক্ষা ও সাধনার ফল নহে; বহুজন্মের সাধনা, তপস্যা, সংস্কারের ফলে একটী সতী জন্মে। আজ সোণার ভারত শ্মশানে পরিণতপ্রায়। পূর্ব্বের ন্যায় ভারত আবার সতীত্ব-গৌরবে পূর্ণ হইলে, সতী নারীতে ভারত মণ্ডিত হইলে, সতীর সন্তানগণে মনুষ্যত্ব, পুরুষকার, তেজ, বীর্য্য আবার ফিরিয়া আসিবে; তাহাদের অবনত মস্তক আবার উন্নত হইবে। সোণার ভারত আবার সোণার হইয়া যাইবে।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ।

সংসারে 'ছোট' ও 'বড়'—এই দুইটি কথা লইয়া বিবাদ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজ বলেন আমি বড়, মার্কিন বলেন আমি বড়, ফ্রেঞ্চ বলেন আমি বড়; জর্ম্মাণ বলেন আমিই বড়। আবার প্রাচীন হিন্দু-আর্য্যগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিয়া থাকেন—আমিইত বড়, অপর সকলে ছোট। এইরূপ বড় হইবার অভিমান কেবল জাতিগত হিসাবে নহে, উহা দেশগত, বংশগত, এমন কি—ব্যক্তিগত হিসাবেও মানবের অস্থি-মজ্জায় যেন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব, কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত আচার ও নিষ্ঠা থাকুক্ আর নাই থাকুক্, তিনি একজন সদাচার-সম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ শূদ্রকে তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট-বোধে তাঁহার সহিত একত্র ওঠা-বসা ও আহারাদি করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। আবার যিনি শূদ্র, তিনি হয়ত আধুনিক বিদ্যাভিমানাদির বশে নিজেকে বড় মনে করিয়া ব্রাহ্মণাদির মধ্যে সঙ্কীর্ণতা অনুভব করেন। ছোট-বড়-অভিমান সকল মানবের মধ্যেই স্বভাবসিদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

তাহাহইলে এখন প্রকৃত পক্ষে ছোটইবা কে? আর বড়ইবা কে? প্রাচীন আর্য্য মনীষী ও মহর্ষিগণ এতৎসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। তাঁহারা বলেন, যিনি আত্মদর্শী বা আত্মজ্ঞানী, তিনিই বড় বা শ্রেষ্ঠ; আর যাঁহার আত্মদর্শন নাই, তিনিই ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্ট। আত্মা কি, আমি কে; আত্মাতে ও আমাতে সম্বন্ধ কি? অন্যান্য যাবতীয় আত্মার ও আমার আত্মার সম্বন্ধ কি? পৃথিবীর সহিত আমার কিরূপ সম্বন্ধ, আমার কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য; যিনি এই সমস্ত সম্যক্‌রূপ আলোচনা ও

সাধনা করিয়াছেন, তিনিই মহান্ ও বৃহৎ। আত্মদর্শন ব্যতিরেকে, আত্মপদার্থ কি, সম্যক্ উপলব্ধি ব্যতীত, মানুষ বড় হইতে পারে না। এই আত্মদর্শন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। এতৎসম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা উক্ত আছে। পুরাকালে মহর্ষি-আরুণির-শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র ছিলেন। শ্বেতকেতু মহাপণ্ডিত হইয়া গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্বেতকেতু ভাবিতে লাগিলেন—"আমি একজন মহাপণ্ডিত; পাণ্ডিত্যে আমার দ্বিতীয় ও সমকক্ষ আর কেহ নাই।" পরমজ্ঞানী মহর্ষি আরুণি পুত্রের মুখ-প্রতিবিম্ব ও ভাব-স্বভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পুত্র একজন নানাশাস্ত্রদর্শী অভিমানী পণ্ডিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মহর্ষি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে তাঁহার সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করাইবার জন্য বলিলেন,—

"শ্বেতকেতো যন্নু সৌম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি"।

"কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি; যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"।

"যথা সৌম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকোরো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।"

"যথা সৌম্যৈকেন নখকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যং এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি।"

"ন বৈ নূনং ভগবন্ত স্ত এতদবেদিষু র্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেবমেতদ্ ব্রবীত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ"।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"

উপরিউক্ত শ্লোকগুলির মর্ম্মার্থ এইরূপ,—

আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "তুমি সমস্ত সাঙ্গ-বেদাধ্যয়ন করিয়া নিজেকে গর্ব্বিত ও মহামনা মনে করিতেছ, তুমি এরূপ কিছু তোমার গুরুর নিকট হইতে জানিয়াছ কি, যাহা জানিলে, অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অনালোচিত বিষয় আলোচিত হইতে পারে এবং অজ্ঞাত পদার্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায়। হে শ্বেতকেতো! যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না, সেই ব্যক্তি সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া অন্যান্য পরিজ্ঞান জানিলেও কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে না।"

শ্বেতকেতু পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "একটি মাত্র পদার্থের বিজ্ঞান দ্বারা অপর সমস্ত পদার্থ-বিজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?" ইহা তাঁহার নিকট নিতান্তই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ও তিনি তাহা পিতৃসমীপে নিবেদন করিলেন। মহর্ষি আরুণি তাঁহাকে লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে লাগিলেন।—মৃত্তিকা হইতে ঘট, কলস, শরাব, উদঞ্চন প্রভৃতি নানা পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ঘট, কলস,

শরাব, উদঞ্চন, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র; এক মৃত্তিকার পরিজ্ঞান হইলে, মৃত্তিকা-জাত এই ঘট-কলস-শরাব-উদঞ্চন সকলেরই পরিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সুবর্ণ হইতে কটক, কেয়ূরাদি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে; কটক, কেয়ূর, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র; এক সুবর্ণের পরিজ্ঞান হইলে, কটক, মুকুট, কেয়ূরাদি তাবৎ পদার্থের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে; এবং যেমন একটি নখকৃন্তনের তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে, সমুদায় কার্ষ্ণায়স বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ একমাত্র কারণ-পদার্থের বিজ্ঞান জন্মিলে, সেই কারণ হইতে বিকারজাত সমস্ত পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। মহর্ষি আরুণি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, উৎপত্তির—অর্থাৎ এই পৃথিব্যাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সদ্‌ব্রহ্মই ছিলেন। সেই সদ্বস্তু অতি সূক্ষ্ম; তিনি আকাশাদি হইতে নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বগত, নিরঞ্জন ও নিরবয়ব। এখন এই জগৎ যে নামরূপক্রিয়া ও বিকারাদিবিশিষ্ট দেখা যাইতেছে, উৎপত্তির পূর্ব্বে ইহার নাম-রূপাদি কিছুই ছিল না। তখন একমাত্র সদ্‌ব্রহ্মই ছিলেন। সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে নামরূপবিকারজাত তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্বেতকেতু ব্রহ্মবিজ্ঞান বা আত্মবিজ্ঞান হইতে এইরূপে নিজের তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। মানব যত দিন আত্মানুশীলনে রত না হয়, তত দিন 'আমি বড়, অপরে ছোট' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যত দিন মানবের মধ্যে অভিমান থাকিবে, তত দিন তাহার বড় হইবার সাধ্য নাই। অভিমানের সহিত মহত্ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা আত্মদর্শনে বা আত্মানুশীলনে অভিমানই প্রধান প্রতিবন্ধক। যাঁহার মধ্যে অভিমান যত পরিমাণে বর্ত্তমান, তিনি তত পরিমাণে ক্ষুদ্র।

যিনি আত্মদর্শী, তিনিই সুমহান্ ও সুবৃহৎ। কেন না, আত্মবিজ্ঞান বা ব্রহ্ম-বিজ্ঞান ভিন্ন জগতে কোন বিজ্ঞানই সুসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ নহে। এক ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে। বৃহদর্থ-বোধক ধাতু হইতে 'ব্রহ্ম' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহার অপেক্ষা সুবৃহৎ আর কিছুই নাই, তিনিই ব্রহ্ম। মানব এই অসীম সুবৃহৎ ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে সেই সুমহান্ ভাবের মধ্যে নিজের জীবোপাধি-অবচ্ছিন্ন সসীমত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব হারাইয়া ফেলে। তখনই মানব বড় হইয়া যায়। যে যথার্থ বড় হইয়া যায়, তাহার ছোট-বড় অভিমান ছুটিয়া যায়। সে তখন আমি ছোট কি আমি বড়, দেখিবার অবকাশ পায় না। এইরূপে মানব যখন আত্মানুশীলনে তৎপর থাকে, তখনই তাহার অভিমান একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। তখন সে একগাছি তৃণের মধ্যেও সুবৃহৎ ব্রহ্ম-ভাবের উপলব্ধি করে এবং আপেক্ষিক লঘুত্ব ও গুরুত্ব বোধ হারাইয়া ফেলে। ফলে সাধনারম্ভে নিজের লঘুত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব-বোধরূপ দৈন্য ব্যতীত উপাস্য-উপাসক-ভাববোধেরই অভাব ঘটে। প্রেম-ভক্ত্যবতার শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এতাবতা স্থিরীকৃত

হইল, যিনি আত্মবশী, যিনি আত্মানুশীলনে সতত রত এবং যিনি উপাসকরূপে দৈন্ত জন্ম আত্ম ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাত, প্রকৃতপক্ষে তিনিই বড়। আত্মানুশীলনে রত হইতে হইলে, মহত্ত্ব-পরিণামী মানবগণকে কতকগুলি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়। সেই সমস্ত ধর্ম্ম যে ব্যক্তি বা যে জাতির মধ্যে যত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তি বা সেই জাতি তত অধিক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। ভাগবতে উক্ত আছে,—

'সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবং।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতং॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তি ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেবচ॥
প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্ম্মানোঽহনহংকৃতিঃ॥
এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥"

এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে জাতির মধ্যে বা যে মানবের মধ্যে সত্যভাষণ, পবিত্রতা, দয়া, চিত্তসংযম, অর্থীদিগের প্রতি মুক্তহস্ততা, সন্তোষ, সরলতা, অন্তঃকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিশ্চল ভাব, তপস্যা, সাম্য, তিতিক্ষা, অত্যধিক লাভে ঔদাসীন্য, শাস্ত্রবিচার, আত্মবিষয়ক জ্ঞান, নির্লোভ, ঐশ্বর্য্য, তেজঃ, বল, স্মৃতি বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যানুসন্ধান, স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা, কৌশল বা ক্রিয়া-নিপুণতা, কান্তি বা সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, চিত্তের অকাঠিন্য বা মৃদুভাব, প্রাগল্ভ্য বা প্রতিভার আতিশয্য, প্রশ্রয় বা বিনয়, সুস্বভাব, মনের ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম-পটুতা, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য বা শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, মান, অহঙ্কার ভাবের অভাব, এই সমস্ত গুণ যে পরিমাণে বর্ত্তমান, সেই জাতি বা সেই মানব সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ।

ক্ষুদ্র ও বৃহতের মধ্যে আর একটি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র বলি, বাস্তবিক তাহা ক্ষুদ্র নহে। আমাদের দর্শন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়-শক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ বলিয়া পদার্থ সকলকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। ঐ যে ক্ষুদ্র অণু, যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম আর কিছুই নাই, উহাও এক একটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ মহান্ এবং উহা হইতে এক একটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইতে পারে। যোগিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থের উপর সংযমশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা নূতন কিছুই উৎপন্ন করিতে পারেন না। যাহা আছে, তাহাই সংযম-শক্তি-প্রভাবে উৎপন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা বুঝিতে হইলে, পতঞ্জলি ঋষির নিম্নোদ্ধৃত সূত্র-মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়।—

"সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ।"

"ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্য প্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা পরিণামঃ।"

"এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণা-বস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ।"

"শান্তোদিতা ব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতে ধর্ম্মী।"

পূর্ব্বোক্ত সূত্র কয়টি, তাহার ব্যাসভাষ্য ও পণ্ডিতপ্রবর বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত "যোগ-বার্ত্তিক" যদি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হইবে, কেবল মাত্র ক্ষুদ্র বস্তু হইতে বৃহদ্বস্তু নহে, সকল বস্তু হইতে সকল বস্তুর আবির্ভাব-সম্ভাবনা আছে। সকল দ্রব্যই সর্ব্বশক্তির আশ্রয়; পরন্তু তাহার অভিব্যক্তি দেশ, কাল, আকার ও ক্রিয়া প্রভৃতি নিমিত্ত নিচয়ের অধীন। সুতরাং দেশ-কালাদির ব্যভিচার না হইলেই কার্য্য-কারণ ভাব স্থির থাকে, অন্যথা অন্যপ্রকার হইয়া যায়। সেই অন্য প্রকারকে বা ব্যভিচারোৎপন্ন কার্য্যনিচয়কে লোকে 'অদ্ভুত' বলিয়া ব্যাখ্যা করে, পরন্তু প্রকৃত অদ্ভুত নাই। যাঁহারা যোগী, তাঁহাদের দৃঢ় সঙ্কল্পের নিকট দেশাদির প্রতিবন্ধকতা থাকে না। সেই জন্যই তাঁহারা প্রত্যেক বস্তু হইতে সর্ব্ববিধ বস্তুর আবির্ভাব অনুভব করিতে পারেন। কার্য্য-অভিব্যক্তির—অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য আবির্ভাবের কারণ-কূট কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতির বৈচিত্র্য। সুতরাং সর্ব্বত্রই সর্ব্বশক্তি থাকিলেও, দেশভেদে, কালভেদে ও ক্রিয়াভেদে কখন কোথাও কিছু হয়, কখনবা কোথাও কিছু হয় না। বেত্র-বীজ হইতে বেত্রের আবির্ভাব, মৃত্তিকার আবির্ভাব ও কদলী বৃক্ষের আবির্ভাব, এই বিবিধ আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়াছে। বেত্র বীজ দাবদগ্ধ হইলে, তাহা হইতে কদলী বৃক্ষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অন্যথা অন্যপ্রকার হইয়া থাকে। এতদনুকূলে পণ্ডিতপ্রবর তাঁহার যোগ-বার্ত্তিকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল।

"সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বশক্তিকং।......যত্র সর্ব্বং সর্ব্বশক্তিমদিতি অত্রার্থে পূর্ব্বাচার্য্যৈরিদং বক্ষ্যমাণং প্রমাণমুক্তমিতি। তত্রাদৌ প্রত্যক্ষস্থলে শক্তিমনুমাপয়াত। জলভূম্যোরিতি। স্থাবরেষু রসাদিভিঃ মধুরাম্লসুরভ্যাসু রক্তিমহৃৎকঠিনত্বাদিভির্ঘনমূর্ত্তরূপত্বং তজ্জল-পৃথিব্যাঃ পরিণামনিমিত্তকমিতি অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রত্যক্ষতো দৃষ্টম্ অতো জলভূমী স্থাবরাত্মকে স্থাবর শক্তিমত্যৌ ইতিভাবঃ। শক্তিং বিনাপি কার্য্যকারণেহতি প্রসঙ্গাৎ তথা জঙ্গমেষু যদৈশ্বরূপ্যং তৎ স্থাবরাণাং পরিণাম নিমিত্তকং দৃষ্টং মনুষ্যাদীনাং ধান্যাদিস্থাবরকার্য্যাণাং ধান্যাদি বিশেষৈঃ রূপাদি বিশেষ দর্শনাৎ তথা স্থাবরাণাং যদ্বৈশ্বরূপ্যং তজ্জঙ্গমানাং পরিণামনিমিত্তকং দৃষ্টম্। গোময়দুগ্ধাদিভির্ধান্যচম্পকাদীনাং স্থাবরাণাং বিচিত্ররূপরসাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ। এবমাদিদৃষ্টান্তৈঃ সর্ব্বেষু বস্তুষু সর্ব্ববিকারজননশক্তিসিধাতীত্যাহ।......যদি চ সর্ব্বত্র সর্ব্বসজাতীয় বস্তু জননশক্তির্ন স্বীক্রিয়তে তদা কথমেকস্মাদেব চতুর্মুখশরীরাদখিল দেব-দানবনরপশ্বাদি সমুদ্ভবঃ কথংবা অগস্ত্য-জাঠরাগ্নেঃ সমুদ্রশোষণং কথং বা

ব্রহ্ম-বিষ্ণু রুদ্র পার্ব্বতী শরীরাদিষু বিশ্বরূপ দর্শনম্। যোগীনাঞ্চ স্বশরীর মনসোরনন্তা বিভুত্বয় উপপদ্যেরন্ কিং বহুনা।

"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"
(গীতা)

"ইত্যাদি বাক্যৈঃ সর্ব্বপানিশরীরৈঃ সর্ব্বজাতীয় বস্তুসত্তাবচনং শক্তিরূপতাং বিনা আঞ্জস্যেন নোপপদ্যতে।"...

বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত হইল না। উপরি উদ্ধৃত সূত্রগুলির ভাষ্য ও "যোগবার্ত্তিক" আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত হইবে যে "সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বশক্তিকং" প্রত্যেক বস্তু হইতে সকল বস্তু উদ্ভব হইবার শক্তি তদ্বস্তু-নিহিত আছে। এইজন্য আত্মজ্ঞানী ও সমদর্শী যোগীদিগের নিকট 'ক্ষুদ্র' ও 'বৃহৎ' বলিয়া পৃথক্ কোন পদার্থ নাই।

শঙ্করসেবক
ভারতী শতানন্দ—
(গিরিশগুহা।)

কঃ পন্থা ?

কোন্ পথে যাইবে ? কোথা হইতে কোন্ পথে এ কোথায় আসিয়াছ, আর কোন্ পথে কোথা যাইবে, তাহা কি বুঝিতেছ ? ঘনশব্দবিকবা তিমিরাবগুণ্ঠিতা এ অমারজনীতে কিছু দেখিতে শুনিতে পাইতেছ কি ? দামিনীর চমকা আলোকে যদিবা পথ দেখিতে পাইবার আশা ছিল, তথাপি আশে পাশে দৃষ্টিপাত করিতেই যে ক্ষণপ্রভার তীক্ষ্ণরশ্মি-শলাকাগুলি সূচের মত চক্ষে বিঁধিয়া গেল, আর বজ্রনাদে তোমার কর্ণপটহ বুঝি ফাটিয়া গেল! তোমার চক্ষু দুইটী উন্মীলিত হইতে না হইতেই যে মুদিয়া গেল এবং হাত দুইখানি কর্ণ আচ্ছাদন করিল! তুমি কি করিয়া দেখিবে ? কি করিয়াইবা শুনিবে ? এখন উপায় কি ? তোমার এই দুঃসময়ে কি এমন কোন বন্ধু নাই, যে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা তোমার অজ্ঞান-তিমিরাবৃত চক্ষু দুইটী ফুটাইয়া দিবে ? এই অবস্থায় ভগবান্ মনু মানবের হিতার্থে কি পথ দেখাইয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেবচ॥"

বুঝিলে কি ?

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

কথাগুলি একবার বিচার করিয়া দেখ। তুমি রক্তাম্বর-পরিধান মুণ্ডিতমস্তক ঐ নব্য যুবকটীর—

"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ"

কিম্বা দাম্ভিক দাসদৌহিত্রের—

"পুরাণোপপুরাণানাং বেদানাং ভ্রমভঞ্জনম্"

অথবা পিতৃমরণোত্তর জন্য অর্ব্বাচীন শক্তিপুত্রের—

"কৃতেতু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ। দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" এ সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া,

মনু যাহা বলিতেছেন এবং বিশ্ব-বেদবিস্থাবিৎ ব্যাসদেব মনুবাক্যের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখ।

(পথের জটিলতা।)

মনু একই স্থানে যাইবার চারিটী পথ বলিয়া দিলেন। প্রথম পথটী বেদমার্গ, তদভাবে দ্বিতীয় স্মৃতিমার্গ, তদভাবে তৃতীয় সদাচারমার্গ। ব্যাসদেব 'যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে' মহাভারতে যক্ষের 'কঃ পন্থা'র প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

"বেদা বিভিন্না স্মৃতয়োঃ বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনোযেন গতঃ সঃ পন্থা" কিনা—

বেদ একটী নয়, ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব ভেদে চারিটী; তাহার প্রত্যেক খানিতে আবার বহু কাণ্ড, এবং প্রত্যেক কাণ্ডে বহু শাখা; সুতরাং ইদানীং খাঁটি বেদ-পথে যাইতে পথিকের পথ 'ভ্যাস্তা' হইয়া যায়; তাহাতে পথিককে কেবল শাখা মৃগের মত ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ বেদান্ত-পথ আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে বেদমার্গ এখন কণ্টকী বন-জঙ্গলে বুঁজিয়া গিয়াছে। এখন বেদমার্গে যাইতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রূপ কুদ্দালী দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতে হয় এবং পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পথিককে আরও উদ্ভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত হইতে হয়। ফলতঃ 'বেদাঃ বিভিন্নাঃ'—সুতরাং অগম্যাঃ।

স্মৃতি-পথটীও দেখ। বেদ মূলে চারি খানি হইয়াও, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ভেদে শতাধিক। অবান্তরগুলি বাদদিয়া, স্মৃতিও মূলেই উনবিংশখানির কম নহে।

"মন্বত্রি বিষ্ণু হারিত যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন বৃহস্পতিঃ॥
পরাশর ব্যাস সংখলিখিতৌ দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপ বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥"

এই এতগুলি ডাক-নামের স্মৃতি, ব্যাখ্যা-ভেদে না জানি কত স্মৃত্যর্থচন্দ্রিকার সৃষ্টি হইয়াছে! তাহাতে আবার স্মৃতিগুলির মধ্যেও নাকি ভালমন্দ মার্কা মারা আছে।

"বাশিষ্ঠঞ্চৈব হারীতং ব্যাসং পারাশরং তথা। মানবং শঙ্খ লিখিতৌ সাত্ত্বিকা মুক্তিদা-শুভাঃ॥ চ্যাবনং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ আত্রেয়ং দাক্ষমেবচ। কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদা মতাঃ॥ গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সংবর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতং। সাংখ্যং চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ॥"

তা এরূপ ভালমন্দ ভেদ হওয়া, এমন অসঙ্গত নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ গোমাংস ভক্ষণের বিধি দিয়াছেন, কেহ নিষেধ করিয়াছেন। কেহ বিধবার বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন, কেহ অবস্থা-ভেদে সধবারও বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অত্রিমুনির "ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোঽবেদকর্ম্মণা। নাপমূত্রপুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্ম্মণা॥ অসবর্ণস্তুযোগর্ভং স্ত্রীণাং যোনৌ নিষেব্যতে। অশুদ্ধা সা ভবেন্নারী যাবদগর্ভং ন মুঞ্চতি॥ বিমুক্তে তু ততঃ শৈল্যে রজসাপি প্রজায়তে। সা তদা শুদ্ধ্যতে নারী বিমলং কাঞ্চনং যথা॥" ব্যবস্থাটা দেখিলেই অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ 'স্মৃতয়ঃ বিভিন্নাঃ'—সুতরাং অগম্যাঃ।

এখন 'সদাচার' পথটার বিচার কর। মনু বলেন—"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্য

দন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥" কিন্তু এখন সে সরস্বতী ও দৃসদ্বতী অদৃশ্যপ্রায়। সুতরাং তদন্তরস্থিত 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' কালের করাল আবর্ত্তে এখন অচিহ্ন হইয়াছে। এখন সে দেবনদীও নাই, সে দেবনির্ম্মিত দেশও নাই। সে কালের ব্রহ্মাবর্ত্ত যে আজ ম্লেচ্ছাবর্ত্তে খৃষ্ট, মোস্‌লেম্, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সী, হিন্দু, বিবিধ জাতির নানা সম্মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব খিঁচড়ী হইয়া আছে! ফলতঃ সে মুনি-ঋষিও নাই, সে সদাচারও নাই। আর পূর্ব্বতন মুনি-ঋষিরা পরস্পর দেখাদেখি করিয়া আপন আপন বিশিষ্টতা সম্পাদনার্থ যে সকল উদ্ভট সদাচার আপন আপন আচার ব্যবহারে দেখাইয়া গিয়াছেন, আজকালকার ক্ষীণজীবী ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে তাহার অনুকরণ সহজ সাধ্য নহে; পরন্তু "হনুকরণে" পরিণত হইয়া যায়! সদাচারী মুনি-পুঙ্গব দুর্ব্বাসার ভ্রুকুটি-কুটিলাননের নেত্রাবর্ত্তনও কি সহজে আচরণীয়? অকামা সসত্ত্বা ভ্রাতৃপত্নী মমতার প্রতি দেবগুরু বৃহস্পতির 'সকল জীবের হিতাচরণ' মনে করিয়া কাহার নাসিকা না কুঞ্চিত হয়? একলা পাইয়া, দিবালোকে পথের মাঝে কলিধর্ম্ম-বক্তা পরাশর মুনি কুমারী সত্যবতীর প্রতি যে সঙ্গত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ঘৃণায় ও লজ্জায় কাহার মাথা না হেঁট হয়? বস্তুতঃ সদাচারী সাধু মুনি-ঋষি কেহ এক মতাবলম্বী নহে। সুতরাং যে স্থানে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" পুনশ্চ "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"।

প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, যে স্থলে সদাচার অনির্দ্দিষ্ট—মুনয়ঃ বিভিন্নাঃ—সুতরাং বেদই বল, স্মৃতিই বল আর সদাচারই বল, সকল পথই মতসঙ্কর-দোষ দুষ্টি জন্য অগম্যবৎ। তবে উপায়? কঃ পন্থাঃ? ভয় নাই।

(পথ গুহা নিহিত।)

ভাই! তুমি হয় তো পথ তিনটীর অগম্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া মনে করিতেছ, তবে বা "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" কিনা ধর্ম্মের পথ বা তত্ত্ব দুর্গম পর্ব্বত-গুহার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে। তুমি কখনই যাইবার পথ পাইবে না। কিন্তু সে ভয় নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব গুহা নিহিতই বটে; তবে কিনা, সে গুহা দুরধিগম্য পর্ব্বতের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন গুহা নহে। এ গুহা পথিকের হৃদয়-কন্দর। চক্ষের সম্মুখে বাহিরে না থাকিয়া, অন্তঃকরণের অন্তস্তলে লুক্কায়িত—গুম্ফিত বলিয়া নাম হইয়াছে গুহা। বস্তুতঃ—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" শ্লোকের গুহা সেই গুহা—

"অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।"

অর্থাৎ অণু হইতেও ক্ষুদ্রতর এবং মহৎ হইতেও মহত্তর আত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে যে গুহাতে নিহিত আছেন, এ সেই গুহা।

"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকেচ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।"

অজ্ঞের অপরিজ্ঞাত জন্য দূরাবস্থিত এবং জ্ঞানীর পরিজ্ঞাত জন্য নিকটাবস্থিত

চেতনাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে যে গুহাতে নিহিত আছেন, এ সেই গুহা।

"পুরুষ এবেদং বিশ্বং। * * *
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকীরতীহ সৌম্য।"

যে পরম পুরুষ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, সেই পরম পুরুষকে যে গুহানিহিত দেখিয়া ভাগ্যবান ব্যক্তি অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিঁড়িতে পারে, এ সেই গুহা। তাই 'গুহা' শব্দ শুনিয়াই হতাশ হইও না। ভাল মন্দ বাছিয়া আপনার পথ স্থির করিতে পারুক্ বা নাই পারুক্, কেহই দেখ দাঁড়াইয়া নাই। সকলেই কোন না কোন পথ ধরিয়া আসিয়াছে, আবার কোন না কোন পথ ধরিয়া যাইবেই যাইবে।

(সরল পথ।)

"মহাজনো যেন গতঃ সঃপন্থা।"

যার মহাজন যে পথে যান, অথবা যাহার মহাজন যাহাকে যে পথে যাওয়ান, সে সেই পথে যায়। "নান্যো পন্থাবিদ্যতেঽয়নায়।" যাইবার আর পথ নাই। বুঝিতে পারিয়া থাক বা নাই থাক, আসিয়াছ তাঁহারই পথ ধরিয়া এবং যাইতে হইবেও তাঁহারই পথ ধরিয়া।

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্যইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুংনেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ॥"
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি:
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

কি না—যদি অহঙ্কার-বশে তুমি ও পথে যাইতে না চাও, তোমার সে ইচ্ছা নিষ্ফল হইবে। কেন না, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে এই পথে লইবে। তুমি মোহ প্রযুক্ত যে পথে যাইতে চাহিতেছ না, তোমার জন্ম-কর্ম্মার্জ্জিত স্বভাব-বশেই তোমাকে তাহাতেই যাইতে হইবে। জান না, সর্ব্বেশ্বর সকলেরই হৃদয় গুহাশয্যায় শুইয়া শুইয়াই সকলকে মায়াভিভূত করিয়া, যন্ত্রারূঢ় পুত্তলীর মত ঘুরাইতেছেন!

কেন ভাই! বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে অমন করিয়া তাকাইয়া রহিলে যে? কথাটা মনঃপুত হয় নাই? কথাটা শুনাইতেছে না ভাল বটে? তুমি হেন একটা বড় লোক—কি না ক্রীড়-পুত্তল হইয়া নাচিতেছ—হাসিতেছ, কখন কান্দিতেছ! কথাটা প্রীতিপ্রদ হইতেছে না? তোমার বিশ্বাস যে, তুমি স্বাধীনাচারী, আপনার মর্জ্জিমতই সকল কর্ম্ম করিতেছ বা না করিতেছ। অহঙ্কার এমনই বটে! অহঙ্কার-রাক্ষসের দুর্ভেদ্য গাঢ় ঘনাবরণে বিবেক-সূর্য্যকে এমনই আচ্ছন্ন করে বটে! তা তত্ত্বজ্ঞান রূপ বজ্রের সাহায্যে এ হেন বৃহৎকায় বৃত্রাসুরকেও তাড়াইতে পারা যায়। গুহাসীন দধিচি মুনি যে দিন দয়া করিয়া তোমাকে বজ্র নির্ম্মাণের সাহায্য করিতে তাঁহার অস্থি দিবেন, সেই দিন অহঙ্কার রাক্ষস কোথায় পলাইবে যাইবে!

আজ ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া অহঙ্কারের অপ্রতিহত প্রাধান্য। 'স্বাধীনতা' ইহার ইষ্টমন্ত্র, সুতরাং ঘোরতর স্বেচ্ছাচারী। সৌভাগ্যের কথা যে, মুখে স্বেচ্ছাচারী হইলেও, কার্য্যতঃ স্বেচ্ছাক্রমে এক পদও বাড়াইতে পারে না। পরন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া সমগ্র জগতের সহিত আপনাকেও পরেশাধীন বলিয়া

স্বীকার করে। না করিয়া যে উপায় নাই। প্রাণটা রক্ষা করা ত চাই। কারণ প্রাণটা নিজের নহে। তা ভগবান যার অহঙ্কারকে যেমন গড়াইয়াছেন—যেমন মতি গতি দিয়াছেন, সে তেমনি হইয়াছে।

(পরাধীনতা।)

আর—যাদু, মাধু, রাম, শ্যাম, তোমরা, আমরা, তাহারা কি? আমাদের জন্ম কর্ম্মের উপর কি আমাদের স্বায়ত্তশাসন ছিল না? তুমি যেন পুরুষটা, "কুড়ি আঙ্গুল মাথাটা, দুই হাত নাকটা, আর চক্ষু কর্ণ হাত পা নাই"—তুমি দেখিতেছ, শুনিতেছ, ধরিতেছ, দৌড়িতেছ কেমন করিয়া, বল দেখি। কেন, নীরব কেন? তুমি স্বয়ং কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, যাহা ইচ্ছা নয়, তাহা কখনও কর না, তবে বলিতে পার না কেন, তুমি কোথা হইতে কি জন্য কোথায় আসিয়াছ? আর কি জন্য কোথায় যাইবে? তুমি যে পুরুষকারের বড়াই করিতে চাও, তোমার কোন্ স্থানে সেই পুরুষকার প্রকাশ কর, একবার বুঝাইয়া দেও দেখি। তোমার এই দুর্লভ নর-জন্মের উপর কি তোমার আপনার কোন সজ্ঞান কর্ত্তৃত্ব ছিল? কর্ত্তৃত্বটা বড় কথা, কোন সম্মতিই কি ছিল? তোমার জন্ম কি তোমার ইচ্ছানুসারে হইয়াছে? তোমার দেহ-মন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এ সকল কি তোমার স্বেচ্ছার্জ্জিত সম্পত্তি? তুমি গরু-গাধা না হইয়া, চারি-হাত বা চারি পা হইয়া না জন্মিয়া, দ্বিপদ হইয়া জন্মিয়াছ—স্ত্রীরূপ না ধরিয়া যে পুরুষ রূপে জন্মিয়াছ, একি তোমার ইচ্ছানুসারে? তুমি স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ডে না জন্মিয়া, পরাধীনতার পীঠস্থান এই অধঃপতিত বঙ্গ-দেশে জন্মিলে কেন? বস্তুতঃ তোমার জন্মের উপর এবং জন্মগত দেহ-গঠনের বিশেষত্বের উপর তোমার কোন স্বায়ত্ত-শাসন ছিল না। তোমার দেহ-রচনায় তোমার শাসন না থাকিলেও, যদি সেই দেহকে ইচ্ছামত চালনা করিতে পারিতে, তাহা হইলেও তোমার কতকটা স্বাধীনতা স্বীকার করিতাম; কিন্তু তোমার দেহকেও ত তুমি ইচ্ছামত চালনা করিতে পার না। তুমি শতবার ইচ্ছা করিয়াও সর্ব্বাবস্থায় কর্ণে শুনিতে বা চক্ষে দেখিতে পার না। পক্ষী আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, তুমি ইচ্ছা করিয়াও উড়িতে পার না;—কিম্বা মীনের দেখা দেখি জলে ডুবিয়া জলে বাস করিতে পার না। যদি শুনিতে হয়, কর্ণ দ্বারাই শুনিতে হইবে, দেখিতে হয়, চক্ষু দ্বারাই দেখিতে হইবে। ফলতঃ যিনি তোমার জন্ম দিয়াছেন, তোমার দেহ রচনা করিয়াছেন, তিনি দেহের যে অঙ্গ দ্বারা যে কার্য্য করিবার শক্তি-সামর্থ্য বা যোগ্যতা যে ভাবে দিয়াছেন, তোমাকে সেই অঙ্গ দ্বারা সেই কার্য্যই সেই ভাবে করিতে হইবে, তাহার অন্যথা তুমি করিতে পার না।

তুমি হয় তো বলিবে যে, তোমার জন্ম, দেহ-রচনা বা দৈহিক কার্য্য-যোগ্যতার উপর কোন স্বায়ত্তশাসন না থাকিলেও, তোমার যে অঙ্গ দ্বারা যে কার্য্য করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে, সেই অঙ্গ দ্বারা সেই কার্য্য করা না করারও কি একটা স্বাধীনতা নাই? কিন্তু দেখিতে হইলে, চক্ষু দ্বারা ভিন্ন কর্ণ দ্বারা দেখিতে নাই বা পার, কিন্তু ইচ্ছা হইলে

না দেখিতেও ত পার। এই প্রবন্ধ লিখায় দৃষ্টান্ত দ্বারাই তুমি হয় তো বুঝিতে চাহিবে, চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা লিখিতে অক্ষম হইয়া না হয় হস্ত দ্বারাই লিখিতে বাধ্য হইলাম, কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি না লিখিয়া থাকিতে পারি না? এত দিন ত লিখি নাই, আজ লিখিতে বসিয়াছি, একি আমার স্বাধীনতা-মূলক কার্য্য নহে? ইচ্ছা হইলে কাগজ কলম ফেলাইয়া দিয়া কি হাত গুটাইয়া বসিতে পারি না? ফলে ইচ্ছাও স্বাধীনা নহে! সমস্যার কথা বটে। কিন্তু ইহার পূরণ আছে। পূরণ এই যে আমাদের যোগ্যতার গণ্ডীর মধ্যে কোন কর্ম্ম করা না করায় যে একটা স্বাধীনতা আমরা অনুভব করি, তাহা অধীনতারই নামান্তর মাত্র। তবে সেই অধীনতার মূল আমার দেহ-সন্নিবিষ্ট ব্যতীত দেহ-বহির্ভূত নহে। অর্থাৎ যাঁহার অধীন হইয়া আমরা কার্য্য করি, তিনি বাহিরের কোন ব্যক্তি না হইয়া আমারই অন্তরঙ্গ—আমারই হৃদয়-গুহাশায়ী বটেন। আমার অজ্ঞানজ মোহবশতঃ সেই অন্তরঙ্গ মহাশয়কে আমরা ভুলিয়া থাকি; সুতরাং আমরা যে তাঁহার অধীন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, অহঙ্কারবশে তাঁহারই ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলিয়া মনে করি। সম্মুখস্থ ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য কর। ঘটিকার কাঁটাগুলি কেমন টিক্ টিক্ করিয়া তালে-তালে নাচিতে নাচিতে ঘুরিতেছে। শীত-গ্রীষ্মভেদে কিম্বা ভূপৃষ্ঠের অবস্থান-ভেদে কখনও দ্রুত—কখনও ধীরে চলিতেছে, আবার সময়ে আয়ুক্ষয়ে অচল হইতেছে। এ সকল কার্য্য ঘটিকার স্বায়ত্ত শাসনাধীন কি? যে শক্তি-বলে ঘটিকা সচেতনের মত সাকার অবয়বে কার্য্য করিতেছে, তাহা তাহারই অন্তরঙ্গ বটে। তুমি কি ঘটিকাকে স্বাধীন বলিবে? অন্তর্নিবিষ্ট শক্তি-বলে কার্য্য হইলেও, তুমি অবশ্য ঘটিকাকে স্বাধীন বলিতে প্রস্তুত নও, অথচ তোমার আপনার বেলায় স্বীয় সোপাধিক চৈতন্য জন্য অহংকার-বশে অন্তরঙ্গকে অমান্য করিয়া, তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকে তোমার আপনার স্বেচ্ছা-কৃত বলিয়া প্রচার করিতেছ!

(ক্রমশঃ)

হরিনাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ভক্তচূড়ামণি বিদ্যাপতি মহাশয়ও সময়ে গাইয়াছেন—

"আধ জনম হাম্ নিঁদে গোঁয়ায়নু,
জরা-শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রঙ্গরসে মাতনু,
তোহে ভজব কোন্ বেলা॥"

চারি আশ্রমের মধ্যে সংসারাশ্রম শ্রেষ্ঠ। কথিত হইয়াছে—

"চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।"
বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৯৬।২১। [?]

মহাভারতেও কহিয়াছেন—

"গৃহস্থো গার্হস্থ্যং বর্ত্তয়েৎ। তদ্ধি সর্ব্বা-
শ্রমাণাং মূলমুদাহরন্তি।"
শান্তিপর্ব্বণি ১২০।১০।

কিন্তু এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কেবল আহার, নিদ্রা ও ব্যবায়াদি পশু-বৃত্তিতে

জীবন নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। স্থূলদেহের তৃপ্তিতে সূক্ষ্মদেহের তৃপ্তি বিবেচনা করা উচিত নহে।

এই সংসার সুখের। স্বর্গবাসিগণও এই সংসারে আসিতে ইচ্ছা করেন।

"স্বর্গিনোপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িনস্তথা।
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্॥"

শ্রীভাগবতে ১১। ২০। ১২॥

স্বর্গ ও নরকবাসী উভয়েই এই সংসারে আসিতে ইচ্ছা করেন; কারণ ইহা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাধক। স্বর্গ ও নরকবাসী উভয়ের শরীর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধক নহে।

সুতরাং এই শ্লোকেই সংসারে আসিবার উদ্দেশ্য কি, স্পষ্টই বলিয়াছেন।

যদি স্থূলশরীরের তৃপ্তিজন্য ও ইন্দ্রিয় সকলের চরিতার্থতা জন্যই মনুষ্যের সংসারে আসিবার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সংসারে মনুষ্য হইয়া আসিবার প্রয়োজন কি ছিল? পশু যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলেও হইত। কারণ উভয়ের ক্রিয়াই এ বিষয়ে সমান।—

"জীবন্তি পশবঃ সর্ব্বে খাদন্তি মেহয়ন্তি চ।
জানন্তি বিষয়াকারং ব্যবায়সুখমদ্ভুতম্॥
নতেষাং সদসদ্‌জ্ঞানং বিবেকো নচ মোক্ষদঃ।
পশুভিস্তে সমা জ্ঞেয়া যেষাং ন শ্রবণাদরঃ॥"

শ্রীদেবীভাগবতে ১। ৬৬—৭।

পশু সকল জীবন ধারণ করে, মল-মূত্র পরিত্যাগ করে, স্ত্রীসঙ্গম-জনিত সুখকেই সার জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহাদের সদসৎ জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ বিবেকও নাই; যাহাদের (ভগবন্নাম-গুণাদির) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আদর নাই, তাহারা পশুতুল্য।

বিষয়ভোগের জন্য আমাদের সংসারে আগমন উদ্দেশ্য নহে।

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত নপতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

শ্রীভাগবতে ১১। ৯ ২৯।

বহু জন্মের পর এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, ধীর ব্যক্তি—যতক্ষণ মৃত্যু না হয়, ততক্ষণ নিজের মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবেন; কারণ বিষয়-ভোগ সকল যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াই হইয়া থাকে। এই মনুষ্য-দেহ অনিত্য, কিন্তু পরমার্থপ্রদ, কারণ মোক্ষ পর্য্যন্ত এতদ্দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

প্রহ্লাদও কহিয়াছিলেন—

"সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা! দেহযোগেন দেহি-
নাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখমযত্নতঃ॥"

ঐ ৭। ৬। ৩

হে দৈত্যবালকগণ! ইন্দ্রিয়জনিত সুখ, দেহীদিগের জন্ম গ্রহণ করিলেই দুঃখের ন্যায় সর্ব্বত্র—অর্থাৎ পশ্বাদি-দেহেও পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্ট বশতঃ বিনা যত্নে লাভ হইয়া থাকে। সে সুখ সকলেরই সমান; কারণ রাজা রাণীর সহিত সঙ্গমে যে আনন্দ ভোগ করেন, শূকর শূকরী-সহযোগেও তদ্রূপ আনন্দ ভোগ করে; রাজা বিবিধ সুখাদ্য রাজভোগ আহার করিয়া যে আনন্দ ভোগ করেন, শূকর অমেধ্য বিষ্ঠাদি ভোজন করিয়াও সেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং যদি ইন্দ্রিয় সুখের জন্যই সংসারে আসিতে হয়, তাহা হইলে রাজদেহেই আইস

অথবা শূকর দেহেই আইস, উভয়ই সমান।

অন্তর্দৃষ্টি না করিয়া, কেবল বিষয়-ভোগের পরিণাম অতি শোচনীয়; কারণ সে বিষয়ীর চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইয়া জন্ম-জন্ম সংসারে বিষয় ভোগ করিতেই সেই বিষয়ীকে আনয়ন করে; কারণ মৃত্যুর সময় তাহার বিষয়-চিন্তারই উদয় হইয়া থাকে—

"বিষং বিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেশঘ্নং বিষম্॥"

যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্য প্রকরণে ২৯।১৩।

বিষয়কেই বিষ বলা যায়; বিষকে বিষ বলা যায় না; কারণ বিষ এক জন্মকে নষ্ট করে, কিন্তু বিষয় জন্ম-জন্মান্তরকে নষ্ট করে।

বিষয় উপস্থিত আপাত-আনন্দ দান করে, কিন্তু পরিণামে পরিতাপ প্রদান করে—

"আপাতরম্যাঃ বিষয়াঃ পর্য্যন্তপরিতাপিনঃ॥"

ভারবিঃ ১১। ১২।

তজ্জন্য মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্র রাজার সহিত বাক্যালাপ করিতে চাহেন নাই। তজ্জন্য তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কহিয়াছিলেন—

"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাংবিষয়িণামপি।
যথা হের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥"

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলা ১১ পরিচ্ছেদে।

স্ত্রীলোক ও বিষয়ীদিগকে আকারেও ভয় করা কর্ত্তব্য। যেরূপ সর্পের আকার দেখিয়া মনের ক্ষোভ হয়, তদ্রূপ।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষো র্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধুঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮ অঙ্কে।

নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্‌ভজনোন্মুখ ও ভব-সাগরের পার-গমনেচ্ছু ব্যক্তির বিষয়ী ও স্ত্রীলোকসন্দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও ভয়ানক কার্য্য।

সুতরাং বিষম বিষয়-চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

মনুষ্য সংসারী হইবেন, কিন্তু পাপ করিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়া যেন পরিবার প্রতিপালন না করেন; কারণ সে পাপ কেবল কর্ম্মকর্ত্তা ভোগ করিবেন। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন—

"যতনে যতেক ধন পাপে কাটায়লু,
মিলি পরিজনে যায়।
মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায়॥"

পদকল্পতরু, ৪র্থ শাখ—৩৬ পল্লবে।

দেহাভিমানী স্থূল হইতে বাসনা করিয়া থাকেন; কিন্তু শোণরোগে স্থূল হইতে বাসনা করিবেন না।

"স্ফীততা নতু শোথজা।"

যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে সৎপথে থাকিয়া সৎ-চিন্তা করেন, তাঁহারা জীবনের সদ্ব্যয় করেন; তাঁহারা ধন্য। কিন্তু ইহা দুরূহ বলিয়া জীবনের চতুর্থ-ভাগে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিবার বিধি আছে—

"সাত্ত্বিকানাং বনে বাসো গ্রামে বাসস্তু রাজসঃ।
তামসং দ্যূতমদ্যাদিসদনং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

কল্কি পুরাণে ১১ অধ্যায়ে।

মায়ার কেমন মোহিনী শক্তি যে, সংসারে থাকিতে গেলে নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিতে দেন না! ছিদ্রঘটাম্বুবৎ যে জীবন প্রতি-দিন ক্ষয় পাইতেছে, তাহার যে সদ্ব্যবহার করিতেছি না, হৃদয়ে সে চিন্তার একবারও

উদয় হয় না! প্রতিদিন যে কত শত লোক অকালে আত্মীয় পরিজনকে কাঁদাইয়া শমনের করালগ্রাসে পতিত হইতেছেন, তাহা দেখিয়াও চৈতন্য হয় না!

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃস্থায়িত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"
বনপর্ব্বণি ৩১২ অধ্যায়ে ১ ৪।

যক্ষরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সংসারে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যুধিষ্ঠির কহিয়াছিলেন—প্রতিদিন জীব সকল যমালয়ে গমন করিতেছে, কিন্তু অবশিষ্ট সকলে স্থায়িত্ব ইচ্ছা করিতেছে, ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে! বিবাহের পূর্ব্বে মানুষ দ্বিপদ, বিবাহ করিয়া চতুষ্পদ, পুত্রাদির পিতা হইয়া ষট্পদ প্রভৃতি জীবের সাদৃশ্য লাভ করিয়া, তখন তিনি সংসারের দাস, স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগরূপে বর্ত্তমান হইয়া, যেন সংসার তাঁহার, আত্মীয়-পরিবারবর্গ তাঁহার, এই মোহে মজিয়া থাকেন। এ সংসার যে তাঁহার বিদেশ, তাঁহার যে স্বদেশ আছে, সে চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় না; পাইয়াও সে চিন্তা হৃদয়ে স্থায়ী হয় না! একবার ক্ষণপ্রভার ন্যায় উদয় হইয়া তখনই লয় পায়! আত্মীয় পরিবার যে তাঁহার কেহই নহে, ইহাও চিন্তা করেন না।

"একঃ প্রসূয়তে বিপ্রা! এক এব বিনশ্যতি।
একস্তরতি দুর্গানি গচ্ছত্যেকস্তু দুর্গতিম্॥"
অসহায়ঃ পিতা মাতা তথা ভ্রাতা সুতো গুরুঃ।"
জ্ঞাতি সম্বন্ধবর্গাশ্চ মিত্রবর্গাস্তথৈব চ।
"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ-লোষ্ট্র সমং জনাঃ।
মুহূর্ত্তমপি রোদিত্বা ততো যান্তি পরাঙ মুখাঃ"
ব্রহ্মপুরাণে ১০৭ অধ্যায়ে।

ব্যাসদেব মুনিগণকে কহিয়াছিলেন—হে বিপ্রগণ। মনুষ্য একা জন্ম গ্রহণ করে, একা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, একা পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয় ও একা পাপ ভোগ করে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি, কুটুম্ববর্গ ও মিত্রবর্গ, কেহই সঙ্গে যান না; তাঁহারা মৃত শরীরকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র সমান জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া ও মুহূর্ত্ত মাত্র রোদন করিয়া প্রত্যাগমন করেন।

যদি জীবদ্দশায় মনুষ্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম তাঁহার সঙ্গে গমন করেন; কারণ ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু—

"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ-লোষ্ট্র সমং জনাঃ।
মুহূর্ত্তমেব রোদিত্বা ততো যান্তি পরাঙ মুখাঃ॥
তৈস্তচ্ছরীরমুৎসৃষ্টং ধর্ম্ম একোঽনুগচ্ছতি।
তস্মাৎ ধর্ম্মঃ সহায়শ্চ সেবিতব্যঃ সদা নৃভিঃ॥"
অনুশাসনিক পর্ব্বণি ১১১ অধ্যায়ে।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ-লোষ্ট্র সমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥
মনুঃ ৪। ২৪১।

একোহি জায়তে জন্তুরেক এব বিপদ্যতে।
ধর্ম্মস্তমনুযাত্যেকো ন সুহৃদ্ন চ বান্ধবাঃ॥
মৎস্যপুরাণে ২১১ অধ্যায়ে।

দেহং পঞ্চত্বমাপন্নং ত্যক্ত্বা কৌ কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ।
বান্ধবা বিমুখা যান্তি ধর্ম্মো যান্তমনুব্রজেৎ॥
স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পূর্ব্বভাগে ৩৫। ৩৮

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥
মনুঃ ৮। ১৭।

যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন—

যশ্চ ধর্ম্মং সদা রক্ষেৎ ধর্ম্মস্তং পরিরক্ষতি॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ৯। ৯২॥

ধর্ম্ম ভিন্ন স্বর্গভোগের আশা নাই—

ধর্ম্ম এব প্লবো নান্যঃ স্বর্গং দ্রৌপদি গচ্ছতাম্।
সৈব নৌঃ সাগরস্যেব বণিজঃ পরমিচ্ছতঃ॥

বনপর্ব্বণি ৩১। ২৪।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কহিয়াছিলেন "হে দ্রৌপদি! স্বর্গে গমন করিবার ধর্ম্মই এক মাত্র নৌকা; উহা বণিকের সাগর-পারের এক মাত্র নৌকার ন্যায়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তির সত্ত্ব প্রকৃতি থাকে—

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃক্ষমাধৃতিঃশৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত!

শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৬ অধ্যায়ে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন—হে ভারত! (১) ভাবীকল্যাণ-পুরুষের এই সকল সত্ত্বগুণ হইয়া থাকে, যথা—অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপিশুনতা (পরোক্ষে দোষ প্রকাশ না করা), ভূতে দয়া (দুঃখীজনে অনুকম্পা), অলোলুপ্ত্ব (ভোগ্য বিষয় থাকিতেও যে ইন্দ্রিয়ের অবিক্রিয়ত্ব অথবা লোভাভাব), মার্দ্দব (অক্রূরতা), হ্রী (অকার্য্যে প্রবৃত্তিতে লোকলজ্জা), অচাপল্য (ব্যর্থ ক্রিয়া-শূন্যতা), তেজ (প্রাগল্ভ্য), ক্ষমা (পরিভবেও ক্রোধ ত্যাগ), ধৃতি (দুঃখাদিতে অভিভূত হইলেও চিত্তের স্থৈর্য্য), শৌচ (বহিরন্তর-শুদ্ধি), অদ্রোহ, (জিঘাংসারাহিত্য), অতিমানিতা (আপনাতে পূজ্যত্ব ও অভিমানশূন্যতা)।

উপরোক্ত সকল গুণই ধার্ম্মিক ব্যক্তির থাকিতে পারে, কিন্তু অস্মদ্দেশে অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম, উহা অধিকাংশ লোক ধারণাই করেন না। অস্মদ্দেশে বৈষ্ণব পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতাধ্যায়ী পণ্ডিতগণেরও অনেকের এই ধারণার অভাব! অস্মদ্দেশে বৈষ্ণব-মণ্ডলীতেও অনেকেই মৎস্যভক্ষণকে পাপ বলিয়া মনে করেন না!

অনেকেই স্বীয় জিহ্বা-লালসা পূরণার্থে অসংখ্য জীব ভক্ষণ করিয়া থাকেন; জীবের জীবনে কিছুমাত্র মমতা করেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়! পূজা তিনপ্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক পূজায় জীবহিংসা নাই। তামসিক পূজক অনেক জন্মের পর রাজসিক পূজক হয়েন; রাজসিকও অনেক জন্মের পর সাত্ত্বিক হয়েন। সত্ত্বগুণ না হইলে তিনি অভীষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারেন না; নারায়ণের কৃপালাভ করিতে পারেন না। যতক্ষণ দেহে হিংসা-প্রবৃত্তি থাকিবে, ততক্ষণ তিনি নারায়ণের কৃপাভাজন কখনই হইবেন না। জীব স্বহস্তে বধ না করিলে যে পাপভাগী হয় না, এমন নহে—ভক্ষণ করিলেও পাপ ভোগ করিতে হয়—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তাচ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥"

মনুঃ ৫। ৫১। কুলার্ণবতন্ত্রে ২ উল্লাসেচ।

যিনি বধে অনুমতি দেন, যিনি বধ করেন, যিনি খণ্ড২ করেন, যিনি বিক্রয় করেন, যিনি পাক করেন, যিনি পরিবেশন

(১) শুদ্ধ ভরত-বংশোদ্ভব বশতঃ তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমিও তাদৃশ ধর্ম্মযোগ্য, এই জন্য সম্বোধনে "ভারত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

করেন ও যিনি ভক্ষণ করেন, সমুদায়ই ঘাতক। তজ্জন্য কহিয়াছেন—

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
সজীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে ॥
যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণীনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপসুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥
"যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্রচ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন ॥"
মনুঃ ৪৫—৪৭।

যে আপনার সুখের জন্য অহিংসক জীবকে বধ করে, সে ব্যক্তি জীবিত হইয়াও মৃত ও কখনও সুখ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি প্রাণীগণের বন্ধন ও ক্লেশ না ইচ্ছা করেন, তিনি সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন। যিনি কাহাকেও বধ না করেন, তিনি যাহা চিন্তা করেন, যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ও পরমার্থ-তত্ত্বের অনুসন্ধানে মন দেন, তৎসমুদায়ই অনায়াসে প্রাপ্ত হন।

প্রাণিহিংসা অকর্ত্তব্য; এতদ্বিষয়ে "পদ্ম-পুরাণে" কহিয়াছেন—

"প্রাণহিংসা ন কর্ত্তব্যা কদাপি চ বিচক্ষণৈঃ।
ক্রিয়তেঽপি চ তদ্ধিংসা বিদধাতি স্বয়ং বিধিঃ ॥
আয়ুপুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ সম্পদশ্চ যশাংসিচ।
প্রাণহিংসাপ্রবৃত্তানাং হরেৎক্রুষ্টো বিধিঃ স্বয়ম্ ॥
কিং জপৈঃকিং তপোভির্ব্বা কিম্বা দানৈঃকিম-ধ্বরৈঃ।
হিংসেতি বর্ণদ্বিতয়ং যস্যাস্তি হৃদয়ে সদা ॥
যঃ প্রাণহিংসকো মর্ত্ত্যঃ স এব হরিহিংসকঃ।
সর্ব্বপ্রাণিশরীরস্থো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥
আত্মানং বহুধা সৃষ্ট্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সংসারকৌতুকাগারে ক্রীড়েৎ শিশুরিব স্বয়ম্ ॥
শরীরিণঃ শরীরং হি নিলয়ং পরমাত্মনঃ।
পরমাত্মা স্বয়ং বিষ্ণুর্যতো হিংসাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
পরপ্রাণবিনাশেন নাত্মতুষ্টি র্বিধীয়তে।
ক্ষণং স্যাদাত্মনস্তুষ্টিরন্যেষাং প্রাণসংক্ষয়ম্ ॥
চরিত্রমেতল্লোকানাং মন্যেঽদ্ভুতমিব ক্ষিতৌ।
আত্মতৃপ্তিং প্রকুর্ব্বন্তি পরং হন্তাতি সততঃ ॥
ধীমানাত্মপরং জ্ঞানং কদাচিৎ কুরুতে নচ।
অহং বিষ্ণুর্যতো বিষ্ণুরিতি চেতসি ভাবয়েৎ ॥
পরদুঃখেন যো দুঃখী সুখী যশ্চ পরশ্রিয়া।
সংসারেঽস্মিন্ স বিজ্ঞেয়ঃ সাক্ষাদেব হরিঃ স্বয়ম্ ॥
ধিগস্তু তৎ সুখং নৃণাং মোহবিহ্বলচেতসাং।
পরহিংসাবিধানেন সুখং যৎস্যাদ্ভুজঙ্গম ॥
সুখানি বাপি দুঃখানি দীয়ন্তে যানি জন্তবে।
অচিরে নৈব তান্যেব লভন্তে ভুবি মানবাঃ ॥"
ক্রিয়াযোগসারে ৮ অধ্যায়ে ১০৮। ১২৯।

সর্প ভুজঙ্গমকে কহিয়াছেন—

বিচক্ষণ ব্যক্তি কদাচ প্রাণীহিংসা করিবেন না; করিলে বিধাতা স্বয়ং তাহার হিংসা করিয়া থাকেন। যাহারা প্রাণ হিংসায় রত থাকে, বিধাতা তাহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়া আয়ু, পুত্র, স্ত্রী, সম্পৎ ও যশকে হরণ করেন। যাহার "হিংসা" এই দুই বর্ণ সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকে, তাহার জপ, তপ, দান ও যজ্ঞে প্রয়োজন কি? যে প্রাণী-হিংসা করে, সে হরিকে হিংসা করিয়া থাকে। যেহেতু ভগবান্ ঈশ্বর হরি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে থাকেন। ভূতভাবন ভগবান্ আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করিয়া, এই কৌতুকাগার সংসারে স্বয়ং শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শরীরীর শরীরই পরমাত্মার নিলয়। স্বয়ং বিষ্ণুই পরমাত্মা; তজ্জন্য হিংসা পরিত্যাগ করিবে। পর-প্রাণ বিনাশ করিলে

কখনও আত্মার তুষ্টি হয় না। ক্ষণকালের জন্য আত্মার আপাত-তুষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যের প্রাণ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। এ সংসারে লোকের চরিত্র কি অদ্ভুত, অন্যকে যত্নপূর্ব্বক হত্যা করিয়া আত্মতৃপ্তি বোধ করিয়া থাকে! ধীমান্ ব্যক্তি কদাচ আত্মপর জ্ঞান করেন না; আমি বিষ্ণু, ইনি বিষ্ণু, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন। যিনি পরদুঃখে দুঃখী ও পরসুখে সুখী, এ সংসারে তিনি সাক্ষাৎ হরি বলিয়া পরিগণিত হন। হে ভুজঙ্গম! মোহবিহ্বলচিত্ত মানবগণের পরহিংসাবিধানের সুখকে ধিক্। জন্তুগণকে যে সুখ কিম্বা দুঃখ দেওয়া গিয়া থাকে, মনুষ্যগণ অচিরেই সেই সকল সুখ কিম্বা দুঃখ লাভ করিয়া থাকে। মহাভারতেও অহিংসাই পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন—

"অহিংসা পরমো ধর্ম্ম স্তথাহিংসা পরো দমঃ।
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ॥
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ স নৃশংসতরো নরঃ॥
নহি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিঞ্চ নবিদ্যতে।
তস্মাদ্দয়াং নরঃ কুর্য্যাৎ যথাত্মনি তথা পরে॥
প্রাণদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
সর্ব্বমাংসানি যো রাজন্ যাবজ্জীবং ন ভক্ষয়েৎ।
স্বর্গে স বিপুলং স্থানং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥
যে ভক্ষয়ন্তি মাংসানি ভূতানাং জীবিতৈষিণাম্
ভোক্ষ্যান্তেতেহপিভূতৈস্তৈরিতিমেনাত্র সংশয়ঃ॥
মাং স ভক্ষয়তে যস্মাদ্ভক্ষয়িষ্যে তথাপ্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বমনুবুদ্ধস্ব ভারত॥"

অনুশাসন পর্ব্বণি ১ ৬ অধ্যায়ে।

পুত্রমাংসোপমং রাজন্ খাদতে যোহবিচক্ষণঃ।
মাংসং মোহসমাবিষ্টঃ পুরুষঃ সোহধমঃ স্মৃতঃ॥

ঐ ১১৪ অধ্যায়ে।

ন ভয়ং বিদ্যতে জাতু নরস্যেহ দয়াবতঃ।
দয়াবতামিমে লোকাঃ পরেচাপি তপস্বিনাম্॥

ঐ ১১৬।

তজ্জন্য ধর্ম্মের লক্ষণই অহিংসা কহিয়াছেন—

অহিংসা লক্ষণোধর্ম্ম ইতি ধর্ম্ম বিদোবিদুঃ॥

ঐ ঐ

যিনি মৎস্যাশী, তিনি সর্ব্বমাংসাশী—

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

মনুঃ ৫। ১৫।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম দম, অহিংসা পরম দান, অহিংসা পরম তপ। যে নিজ মাংস পরমাংস দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইতে নীচমনা আর নাই ও সেই ব্যক্তি অতিনৃশংস। সংসারে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর কিছুই নাই; তজ্জন্য মনুষ্য যেরূপ আপনাকে, তদ্রূপ অন্যে দয়া করিবে। প্রাণ দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই ও হইবে না। হে রাজন্! যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন সর্ব্ব মাংস ভক্ষণ করেন নাই, তিনি নিঃসন্দেহ স্বর্গে বিপুল স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জীবিতাভিলাষী জীবের যে মাংস ভক্ষণ করে, সে সেই জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। (মাংস শব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—মাং= আমাকে; স=সে ভক্ষণ করিবে) হে ভারত! আমাকে যখন ভক্ষণ করিতেছে, তখন আমিও উহাকে ভক্ষণ করিব, ইহাই 'মাংস' শব্দের মাংসত্ব জানিবে॥

হে রাজন্! যে অবিচক্ষণ ব্যক্তি মোহাবিষ্ট হইয়া পুত্র মাংসের ন্যায় মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি অধম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

দয়ালু ব্যক্তির কখনও ভয় থাকে না; দয়ালু তপস্বী ব্যক্তিগণ ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৩শ বর্ষ, ১৩শ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র | ১৩১৩ সাল, ১৮২৮ শকাব্দা।

সামধ্বনি

—•:০:•—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
তদ্ বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায়
১২
সত্বনে।
২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
শং য়দ্ গবে ন শাকিনে।

(ঋং ৪।৭।২৫।২)

অন্বয়ঃ,

(হে স্তোতারঃ) বঃ সুতে পুরুহূতায় সত্বনে তৎ সচা গায়, যৎ শাকিনে, গবে ন, শং (ভবতি)

হে স্তোতারঃ—হে স্তোতৃগণ!

বঃ— যূয়ম্ আপনারা—

সুতে— অভিযুতে সোমে সতি; সোমরস অভিযুক্ত বা নিবেদিত হইলে—

পুরুহূতায়—বহুভির্যজমানৈরাহূতায়; বহু যজমান দ্বারা আহূত—

সত্বনে—শত্রূণাং সাদয়িত্রে; যদ্বা ধনানাং সনিত্রে দাত্রে, শত্রুসমূহের বিনাশকর্ত্তার উদ্দেশে কিম্বা ধনদাতার উদ্দেশে—

তৎ—তৎ স্তোত্রম্; সেই স্তোত্রটি।

সচা—সহসংহতা ভূত্বা; সকলে মিলিত হইয়া—একস্বরে—

গায়—গায়ত; গান করুন।

যৎ—স্তোত্রম্ যে স্তোত্র—

শাকিনে—শক্তিমতে—শক্তিমানের নিমিত্ত।

গবে ন—যথা গবে যবসং সুখকরং ভবতি, তদ্বৎ; গাভীর উদ্দেশে প্রদত্ত

ঘাস যেমন সুখকর হয়, সেইরূপ—

শং—সুখকরং ; সুখকর হয়।

হে স্তোতৃগণ! যে ইন্দ্রদেবকে বহু যজমানগণ আহ্বান ও প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যিনি ধনদাতা ও শত্রুগণের উৎসাদয়িতা, তাঁহার জন্য সোমরস অভিষুত ও নিবেদিত হইয়াছে; আসুন, আমরা অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া একত্রে সমস্বরে সেই স্তোত্রটী গান করি। গাভীর উদ্দেশে প্রদত্ত ঘাস যেমন তাহার অতি সুখকর হইয়া থাকে, তদ্রূপ শক্তিমান ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের এই গীত-স্তোত্রটি সুখকর হইবে।

সামবেদে প্রথম অধ্যায়ে 'অগ্নি'র স্তব করা হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অগ্নি শব্দ পরমাত্মা-বাচক। এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রের স্তব করা হইতেছে। ইন্দ্র শব্দও পরমাত্মাবাচক; ইহা নিরুক্ত গ্রন্থে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। পরমৈশ্বর্য্যবাচক 'ইদি' ধাতু হইতে 'ইন্দ্র' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, তিনিই ইন্দ্র। এই ইন্দ্র শব্দ কোন স্থলে সূর্য্য, কোন স্থলে বায়ু এবং কোন স্থলে নিরাকার ব্রহ্মকে বুঝাইয়াছে, বেদে ইহা দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ 'ইরা' শব্দকে উপপদ করিয়া, 'দৃ' ধাতু বা 'ধা' ধাতু বা 'ধৃ' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন করেন। তখন যিনি "ইরা"কে (মেঘকে) ভেদ করেন, অথবা যিনি "ইরা"কে (অন্ন বা বলকে) ধারণ করেন, ইত্যাদি প্রকার অর্থ প্রকাশ করিবে। সুতরাং 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ইন্দ্র শব্দে মোটের উপর পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রস্তোত্র সেই পরম ব্রহ্মের স্তুতি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই মন্ত্রের দ্রষ্টা বৃহস্পতির পুত্র শংযুঋষি। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা ইন্দ্র। তন্মধ্যে একটি উহ্যগানের ৪।১।৬ষ্ঠ॥ অপরটি সামচতুষ্টয় গেয় গানের ৩।১।১ম হইতে ৪র্থ। এই চারি সামের মধ্যে দুইটির নাম 'রৌদ্র' ও অপর দুইটির নাম "মার্গীয়ব"; অথবা "মার্গীয়ব" ও ২য়, ৩য় সামদ্বয়ের নাম "রৌদ্র"; ৪র্থের নামও মার্গীয়ব"; অথবা সকলগুলির নামই "রৌদ্র" কিম্বা সকলগুলিই "মার্গীয়ব"।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

যস্তে নূনং শতক্রতবিন্দ্র। দ্যুম্নি-

২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২

তমো মদঃ। তেন নূনম্ মদে

মদেঃ। (ঋং ৬।৬।১৮।১)

অন্বয়ঃ,

হে শতক্রতো! হে ইন্দ্র! দ্যুম্নিতমঃ যঃ মদঃ নূনম্ তে (অস্মাভিঃ অভিষুতোঽস্তি); তেন নূনম্ মদে, (অস্মান্‌অপি) মদেঃ।

হে শতক্রতো—হে শতবিধ প্রজ্ঞান! হে শতবিধ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ইন্দ্র! অথবা একশত ক্রতু (যজ্ঞ) লভ্য যে ইন্দ্রত্ব, তদ্বান্ ইন্দ্র। অথবা শত শব্দ বহুবাচক; ক্রতু শব্দ কর্ম্মবাচক; যাহার সম্বন্ধে বহুকর্ম্ম আছে, তিনিই শতক্রতু, অর্থাৎ যিনি বহুকর্ম্মবান্ ইন্দ্র।

দ্যুম্নিতমঃ—যশস্বিতমঃ; অতিশয় যশঃপ্রকাশক।

যঃ মদঃ—যঃ সোমঃ; মাদ্যন্তি অনেন ইতি মদঃ—যে সোম।

নূনম্—পুরা; অগ্রে।

তে—ত্বদর্থম্; আপনার জন্য।

(অস্মাভিঃ অভিষুতঃ অস্তি—আমাদের দ্বারা নিবেদিত রহিয়াছে)।

তেন—অস্মাভিঃ দীয়মানেন সোমেন; আমাদিগের দ্বারা প্রদত্ত সোম-রস দ্বারা।

নূনম্—ইদানীম্; অধুনা।

মদে—তৎপানেন মদে—তব সঞ্জাতে সতি; সোমপান দ্বারা মত্ত হইলে পর।

(অস্মান্ অপি) মদেঃ—ধনাদি দানেন ত্বং মাদয়; আমাদিগকে নিশ্চয়ই ধনাদি অভীষ্ট প্রদান দ্বারা মত্ত করিবেন।

হে শতক্রতো! হে ইন্দ্র! আপনি বহু প্রাজ্ঞ, সুবিজ্ঞ ও পরমৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ। উন্মত্ততাজনক বা তেজোবর্দ্ধক পদার্থের মধ্যে অতিশয় যশস্বী বা প্রশস্ততম সোমরস পানে আপনি উন্মত্ত ও প্রহৃষ্ট হইলে, আমাদিগকেও ধনাদি অভীষ্ট প্রদানে মত্ত ও সুখী করিবেন, ইহা আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

* অঙ্গির-বংশীয় শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ ঋষি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা, গায়ত্রী ছন্দ। দেবতা ইন্দ্র। এতন্মূলক সাম একটি মাত্র। ইহা গেয়গানের ৩।২।৫ম। এই সামটির প্রকাশক অশ্বঋষি এবং তদনুযায়ী ইহার নাম "আশ্ব" হইয়াছে।

মদেঃ—মদী হর্ষে, অন্তর্ভাবিতণ্যর্থঃ, "ছন্দসি বহুলম্" ইতি শপ্।

২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
গাব! উপবদাবটে মহী যজ্ঞস্য
৩ ১ ২ ৩ ১। ২। ৩ ১ ২
রপ্সুদা উভা কর্ণা হিরণ্যয়া॥
(ঋক্ ৮।৫।১৬।২)

অন্বয়ঃ

হে গাবঃ (যূয়ং) যজ্ঞস্য রপ্সুদা মহী উভা হিরণ্যয়া কর্ণা অবটে উপবদ।

হে গাবঃ—হে ধর্ম্মদুঘাঃ! অথবা হে ধর্ম্মদুঘাঃ—হে ধর্ম্মদুঘা গো সকল! 'ধর্ম্মদুঘা' শব্দে ধর্ম্মযজ্ঞ-সম্পাদনকারী বা ধর্ম্মযজ্ঞের সাধনকারী, ইহাই বুঝাইতেছে। যেমন 'অগ্নিহোত্র' 'বাজপেয়' প্রভৃতি যজ্ঞ আছে, তদ্রূপ একটি ধর্ম্মযজ্ঞও আছে। ইহার অনুষ্ঠানে শুদ্ধ অক্ষয় ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে; ইহা দিবারাত্র যজ্ঞ। ইহাতে কেবল গো ও অজার দুগ্ধেরই বিশেষ আবশ্যকতা। আর 'হে ধর্ম্মদুঘা গো সকল' বলিলে, যে সমস্ত গাভীগণের দুগ্ধে 'ঘর্ম্ম' অর্থাৎ শরস্নেহ (মালাই বিশেষ) প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে বুঝাইবে।

'গো-শব্দোঽজয়া অপ্যুপলক্ষকঃ, অজাপয় গোঽপি (মহাবীরে আসেচনীয়ত্বাৎ) এখানে গো শব্দে অজাকেও উপলক্ষ করিতেছে; সুতরাং এখানে গো শব্দে অজা-দুগ্ধও বুঝাইবে।

যূয়ং—তোমরা।

যজ্ঞস্য—"ধর্ম্মযাগস্য সাধনভূতে;' ধর্ম্ম-যজ্ঞের সাধক;

রপ্সুদা—রপ্সুদে আশ্লিষ্টাঃ ফলদে—রিপ্সোরখিনোর্দাতব্যে বা; যদ্বা রপণং রপ্ মন্ত্রঃ তেন সুদাতব্যে অথবা—

যুদক্ষরণে, রপা মন্ত্রেণ ক্ষারণীয়ে দোহনীয়ে— ঈদৃশে –গবা অয়ো পয়সী ; সুতরাং "রপ্সুদা" শব্দে অভিপ্রেত ফলপ্রদানকারী গো বা অজার দুগ্ধ, কিম্বা অশ্বিনী-দেবতা দ্বয়কে প্রদান যোগ্য, কিম্বা মন্ত্র-দোহনীয় গো-অজার দুগ্ধ. এই সকল অর্থই বুঝাইবে।

মহী—মহতী বহুলে অপেক্ষিতে ; বহুল পরিমাণে প্রয়োজন হইয়াছে।

উভা—উভৌ ; উভয় বা দুই।

কর্ণা—কর্ণস্থানীয়ৌ দ্বৌ কর্ণৌ ; দুইটি কর্ণবিশিষ্ট।

হিরণ্যয়া—হিরণ্ময়ৌ, সুবর্ণরজতময়ৌ ; সুবর্ণময় বা সুবর্ণ-রজতময়।

অবটে—অবটং মহাবীরং প্রতি ; মহাবীরের নিকট ; যজ্ঞে যে কটাহে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ঘর্ম্ম অর্থাৎ 'পরমেহ' (মালাই-বিশেষ) প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে মহাবীর কহে।

উপবদ—উপাগচ্ছত ; আগমন কর।

ধর্ম্মযজ্ঞের সাধক ও মন্ত্র-দোহনীয় গো-অজার দুগ্ধ আমাদের বহুল পরিমাণে প্রয়োজন হইয়াছে ; অতএব হে ধর্ম্মদুঘা ও ঘর্ম্মদুঘা গো সকল ! তোমরা এক্ষণে সুবর্ণময় কর্ণদ্বয়বিশিষ্ট কটাহ সমীপে আগমন কর। (হে পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র ! আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট গো সকল প্রদান করুন)।

এই মন্ত্রে প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ বহু ঐশ্বর্য্যশালী, গবাদি সম্পত্তিমান্ ও সতত যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যে অনুরাগী ছিলেন, তাহাই সূচিত হইতেছে।

৬ প্রগাথ-পুত্র হর্য্যত ঋষি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। গায়ত্রী ছন্দ। দেবতা ইন্দ্র। এতন্মূলক সামদ্বয় গেয় গানের ৩।১। ৬ষ্ঠ ও ৭ম ; ইহাদের প্রকাশক 'ইটত' ঋষি, সেই জন্য ইহাদের নাম 'ঐটত' হইয়াছে।

'উপবদাবটে'—'উপবদ'-বর্ণব্যত্যয়ঃ। 'উপবদাবটে'-ইতি ছন্দোগাঃ। 'উপাবতা বতম্'-ইতিবহ্বৃচাঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অরমশ্বায় গায়ত শ্রুতকক্ষারং
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গবে। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥

(ঋং ৮।২।১৯।৫)

অন্বয়ঃ,

হে শ্রুতকক্ষ ! অশ্বায় (ইন্দ্রস্য) অরং গায়ত, গবে (ইন্দ্রস্য) অরং গায়ত, ধাম্নে ইন্দ্রস্য অরং গায়ত।

হে শ্রুতকক্ষ—শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ আত্মানমেব সম্বোধয়তি ; হে শ্রুতকক্ষ আত্মন্ ! এখানে শ্রুতকক্ষ ঋষি নিজেকেই সম্বোধন করিতেছেন।

অশ্বায়—ইন্দ্রেণ দীয়মানায়াশ্বায় তদর্থম্ ; ইন্দ্র তোমাকে অশ্ব দিবেন, তজ্জন্য।

অরং—অলং ; পর্য্যাপ্তং ; পর্য্যাপ্তরূপে।

গায়ত—গায় ; গীতিং কুরু ; গান কর।

গবে—গবাদি লাভার্থম্ ; গবাদি সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত।

ইন্দ্রস্য ধাম্নে—ইন্দ্রকর্ত্তৃকায় গৃহায় ; ইন্দ্র তোমাকে গৃহ দিবেন, তন্নিমিত্ত।

গায়ত—গায় ; স্তোত্রং কুরু ; স্তুহি ; স্তব কর।

হে শ্রুতকক্ষ আত্মা ! তুমি পর্য্যাপ্তরূপে সামগান কর। ইন্দ্র তোমাকে অশ্ব দিবেন,

ইন্দ্র তোমাকে গাভী দিবেন, ইন্দ্র তোমাকে বাসস্থান দিবেন। অতএব তাঁহার প্রীতির তদ্বিষয়ক স্তোত্র পর্য্যাপ্তরূপে গান কর।

* শ্রুতকক্ষ ঋষি এখানে নিজকেই সম্বোধন করিতেছেন। প্রার্থনা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিরূপে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সহকারেও ভগবানের উপাসনা করিতে, অশ্ব-গবাদি ধনসম্পত্তি প্রার্থনা করিতে ও সাধু সরল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা আর্য্যঋষিগণ পরিজ্ঞাত ছিলেন। আমরা সকলই খাই ও তজ্জন্য ছুটাছুটি করি, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপাসনা সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া, তাঁহাদের সন্তান হইয়াও নানারূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছি।

এই মন্ত্রের দ্রষ্টা শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষঋষি; গায়ত্রী ছন্দ; ইন্দ্র দেবতা; এতন্মূলক সামদ্বয়ের প্রকাশকও সেই শ্রুতকক্ষ ঋষি। এই সাম দুইটি গেয় গানের ৩। ২। ৮ম ও ৯ম। ইহাদের নাম 'শ্রৌতকক্ষ'।

গায়ত—বচনব্যত্যয়ঃ; গায়।

ইন্দ্রস্ব—কর্ম্মণি ষষ্ঠী।

"শ্রুতকক্ষা"—"শ্রুতকক্ষ" ইতি চ পাঠৌ।

শঙ্কর-সেবক—ভারতী শতানন্দ।

(গিরিশগুহা।)

হিন্দুধর্ম্ম ও স্বদেশী আন্দোলন।

ধর্ম্মই হিন্দুর সর্ব্বস্ব। ধর্ম্মই হিন্দুর হিন্দুত্ব। যেদিন ধর্ম্মোন্নতিতেই হিন্দু সর্ব্বোন্নত; অধুনা ধর্ম্মাবনতিতেই হিন্দু অবনত—অধঃপতিত এবং পুনরায় ধর্ম্মোন্নতিতেই হিন্দুর পুনরুন্নতি সম্ভাবিত। অতএব ধর্ম্মসর্ব্বস্ব হিন্দুর ধর্ম্মোন্নতির অপচয়ে বা বিনিময়ে অন্য কোন উন্নতিই বাঞ্ছনীয় নহে। শাস্ত্র সেই ধর্ম্মের ভিত্তি, আচার তাহার প্রাচীর এবং দেবভক্তি বা ঈশ্বর-পরায়ণতাই সেই ধর্ম্ম-মহাহর্ম্ম্যের অভ্রভেদী চূড়া। হিন্দুসমাজ তাহাতে চিরঅধিষ্ঠিত ও আশ্রিত। এ আশ্রয় ছাড়িয়া জগতের সর্ব্বসুখৈশ্বর্য্য হিন্দুর অনাস্থেয় ও অগ্রাহ্য। এখন কথা এই যে, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে অনেকে আমাদের এই স্বধর্ম্ম-দুর্গে আঘাত করিতে উদ্যত। তাঁহারা এই স্বদেশী আন্দোলনে একাকারিতা বা একাচারিতা আনিয়া, আমাদের জাতিভেদ—বর্ণাশ্রমাচার বিসর্জ্জনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে চান। কলিকাতার সেই "National dinner" প্রভৃতি উক্ত বিকট মত-বৃক্ষেরই বিকৃত ফল। স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়া স্বদেশী আন্দোলনই হিন্দুর প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয়। হিন্দু স্বধর্ম্ম শিরে ধরিয়া, তৃণ-পত্রাশী—তরুতলবাসী হইতেও সম্মত, কিন্তু স্বধর্ম্ম পদে দলিয়া, জগতের রাজ্য সুখৈশ্বর্য্য, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, সমাজনৈতিক একতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কিছুতেই হিন্দুর বিন্দুমাত্র স্বার্থবুদ্ধি বা সম্মতি-সহানুভূতি সম্ভাবিত নহে। স্বদেশী আন্দোলন হিন্দুর প্রাণপ্রিয় সাধন; বরং স্বদেশী আন্দোলন হিন্দুর স্বধর্ম্মাচারের সম্পোষণ ও সংশোধনেরই স্বাভাবিক সহায়। সুতরাং ইহা আমাদের জাতীয় শুভ স্বস্ত্যয়ন। কিন্তু আমাদের

স্বধর্ম্মের বিরোধিতায় ইহার যে ব্যাভিচার, তাহা সুতরাং আমাদের অস্বস্ত্যয়ন অভিচার-মাত্র। অপর, মঙ্গলময় ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হিন্দুর আশ্বাস এবং তাহারই নামান্তর অদৃষ্ট হিন্দুর বিশ্বাস। সুতরাং আস্তিক ও ভক্ত হিন্দু কোন অবস্থায়—কোন ঘটনায় হতাশাবসন্ন বা বিমগ্ন হইতে পারেন না। অথচ যথাশক্তি ও যথাসম্ভব পুরুষকার হিন্দুর সাধ্য; পুরুষকার সাধনে হিন্দু ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আজ আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলনের সমুদ্দীপক বঙ্গ-ভঙ্গ সংঘটনে যে দেশব্যাপী দুঃখ-তরঙ্গ, হিন্দুর তাহাতে সম্যক্ সহানুভূতি এবং তৎপ্রতীকারার্থ পুরুষকার মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি অবশ্যকর্ত্তব্য; কিন্তু ঐ ঘটনা মঙ্গলময় বিধাতৃবিহিত আমাদেরই অবশ্য-ভোগ্য যথাযোগ্য কর্ম্মফল বুঝিয়াই, হিন্দুর বিষাদাবসন্ন হইবার যো নাই। আমরা যদি ভগবন্নির্ভরতারূপ ধর্ম্ম ও আত্মনির্ভরতা রূপ কর্ম্ম, এই দুইকে পুরুষকারে ও অদৃষ্টে অভিন্ন ভাবে চালাইতে পারি, তবে এই অমঙ্গল-মূর্ত্ত বঙ্গ-ভঙ্গ আমাদের 'শাপে বর' রূপে মঙ্গলই প্রসব করিবে। রাজার কাগজ-কলমে যাহা ভাঙ্গিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মে—কর্ম্মে—মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা চিরমিলনে যোড়া লাগিবে। এই ঘটনায় আমরা আট-কোটী যদি একযোটী হই, আমাদের আপন কাজ আপনারা বুঝিয়া লই, সবাই এক-ঐক্যে কায়মনোবাক্যে স্বদেশ ও 'স্বদেশী'র সেবায় রত রই, তবে ইহাকে শাপে বর, বিষাদে প্রসাদ, গরলে অমৃত, বা মরণে জীবন কেন না বলিব? আজ যে এদেশে কর্জ্জন ফুলার প্রভৃতি ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী অনভিনন্দিত ও নিন্দিত হইয়াছেন, হিন্দুর তত্ত্ববিচার-পূত চক্ষে—ইঁহাদের পুরুষকার-পক্ষে—নিমিত্তরূপেই আমাদের প্রতি বিপক্ষতা; কিন্তু অদৃষ্টপক্ষে, ঈশ্বরেচ্ছারূপে নববঙ্গোন্নয়ন-লক্ষ্যে বরং সপক্ষতা, তাহাতে সন্দেহ কি? এই জন্যই বলিতে, চাই জগতে কেহ হিন্দুর শত্রু নাই, কেহ বিদ্বেষভাজন নাই; কেহ গালাগালির পাত্র নাই। গোড়ায় সেই একেরই খেলা জানিয়া, অনেকে সেই একেরই বিকাশ ও বিলাস মানিয়া, সেই প্রেমময় পরমেশ-প্রসাদে হিন্দুর প্রেমালিঙ্গন জগন্ময় প্রসারিত!

স্বদেশী আন্দোলনে খাঁটি স্বদেশপ্রেম রূপ পরম ধর্ম্মই আমাদের নিয়ামক। অপ্রেম, বিদ্বেষ, গালাগালি, দলাদলি, এ প্রেমধর্ম্মময় কর্ম্মযোগের অঙ্গস্পর্শেও অনধিকারী। যে সব 'স্বদেশী' বক্তৃতায় ও লেখায় কেবল বিদ্বেষ-বিষাক্ত বিদেশী-নিন্দন, কেবল ইংরাজাপভাষণ, কেবল গালাগালির ঝড়-ঝঙ্কার ও তদ্ধেতু, রাজায়-প্রজায়, প্রজায় প্রজায়, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় দলাদলীর কীটসঞ্চার, সে বক্তৃতা বা সে লেখা হিন্দু কেবল উদ্ধতত্তা, অনভিজ্ঞতা, অসংযম, অনিয়ম, বোকামী ও পাগলামীর ফলমাত্র মনে করেন। শুধু উদ্দামতায় আসর তাতাইয়া, উত্তেজনায় ছেলে ছোকরা মাতাইয়া, কুশল ত কিছুই নাই; উহা কেবল আসল কাজের মাথায় মূষল প্রহার মাত্র।

ভগবান্ করুন, যেন কেবল গালিবাজী ও গলাবাজীই আমাদের 'স্বদেশী আন্দোলন'-চক্রের কলঙ্কস্বরূপ না হইয়া উঠে।

গালাগালি ত স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। মেয়েমানুষেরা হাতে পারে না, মুখে সারে। পুরুষ যে হবে, কাজে সে দেখাবে। পুরুষ মুখে মিত, কিন্তু বুকে অমিত। কখনও বা তাল ঠুকে রুখে দাঁড়ালে—অপরিমিত! ফলে পৌরষই পুরুষকারিতা; গালাগালি কেবল স্ত্রীধর্ম্মিতা বা কাপুরুষতা মাত্র। হিন্দু-নীতি-শাস্ত্র বলেন,—

"দদতু দদতু গালি র্গালিমন্তো ভবন্তো।
বয়মপি তদভাবাৎ গালিদানেঽপ্যসমর্থাঃ॥
জগতে বিদিতমেতদ্দীয়তে বর্ত্তমানং।
নহি শশক-বিষাণং কোঽপি কস্মৈ দদাতি॥"

অর্থাৎ—

গালিমন্ত আপনারা, দি'ন দি'ন গালি।
আমরা অভাবে তার, দিতে নারি গালি॥
জগতে বিদিত—যাহা আছে, তাই দেয়।
কাহাকেও শশ-শৃঙ্গ নাহি দেয় কেহ॥

বাস্তবিক 'গালিওয়ালা' লোকেই গালি দিতে পারে। যার নাই যা, সে কি দিবে তা? ঈশ্বর করুন, আমরা যেন কখনও দানার্থে 'গালিমন্ত' না হই। অত্যাচারী অন্যায়-কারীকে পুরুষের মত 'নগদ বিদায়ে' শিক্ষা দেও, অজ্ঞানীকে জ্ঞান দেও, অবোধকে প্রবোধ দাও। পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে দয়া কর। ক্ষমতায় ক্ষমাশীল হও। শিষ্টের পালন কর, দুষ্টের দমন কর, সমতায় ন্যায়পর হও। পুরুষ হও, মানুষ হও। বলী ও ধনী হও। কর্ম্মী ও ধর্ম্মী হও। জীবন্ত ও জাগ্রত হও। জগতে সভ্য ও সমুন্নত জাতিরূপে আবার প্রকট পরিচয় দেও। নচেৎ এ নরলোকে নরাকারে—শিয়াল-কুকুরের মত ঘৃণিত, বিকৃত, অবজ্ঞাত ও অভিসপ্ত অস্তিত্ব অপেক্ষা নাস্তিত্ব প্রার্থনীয়। বিড়ম্বনা অপেক্ষা বিলোপই বাঞ্ছনীয়।

হিন্দু! যদি বাঁচিতে চাও, জাগিতে চাও, উঠিতে চাও, এই অনন্যোপায় ভগবৎ-কৃপায় প্রাপ্ত 'স্বদেশী' সাধন ধরিয়া থাক; কিন্তু স্বীয় স্বধর্ম্মাচার বিশেষত্ব বজায় রাখ। নচেৎ 'আপনা হারা' হইয়া কি কেবল বাতুল-বিক্রিয়ার অভিনয় দেখাইবে? যার জন্য সাধিবে, তাকে পাইবে না। যার জন্য রাঁধিবে, সে খাইবে না। অতএব বুদ্ধিমান হিন্দু এই স্বদেশী আন্দোলনে স্বধর্ম্ম বাড়াইবেন ভিন্ন হারাইবেন না।

স্বদেশী আন্দোলনে নূতন যত আসে, আসুক; কিন্তু পুরাতন সম্বল কিছু না যায়। পৈত্রিক বিত্ত-স্বত্ব বজায় রাখিয়া যে ব্যক্তি নব বিত্ত অর্জ্জনে কৃতকার্য্য, সেই বুদ্ধিমান বিষয়ী,—সেই বাহাদুর। পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত পুরাতন গৃহ-দেবতার অঙ্গে যেরূপ নবোৎসবোপলক্ষিত অভিনব ভূষণ-বেশ, স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রূপ স্বত্বত্বে সেইরূপই নবজীবন-সমাবেশ।

ভারতের চিরপবিত্র পুরাতন পৈত্রিক সম্পত্তি ভগবদ্ভক্তি, গুরুভক্তি, প্রভুভক্তি প্রভৃতি যেমন ভাল জিনিষ, রাজভক্তিও তদ্রূপ একটি ভাল জিনিষ। হিন্দুশাস্ত্রমতে ভক্তি মাত্রই আধ্যাত্মিক পবিত্র বস্তু। সকল ভক্তিই ভগবানে পৌঁছায়। সর্ব্বভক্তি-সরিৎই সেই শক্তি-সমুদ্রে আত্মসমর্পণ করে। সর্ব্বভক্তি-ফল-বিধানই সেই ভক্তৈকপ্রিয় সর্ব্বফলদ ভগবানই করিয়া থাকেন। সর্ব্বভাজনার্পিত সরল ভক্তিই তিনি নিজ নৈবেদ্য রূপে প্রসাদ করিয়া দেন। হিন্দুর সর্ব্বপ্রথম

ভগবদ্ভজনের উপকরণ ঐ সমস্ত পুরাতন ভক্তিধর্ম্ম-সম্পদের বিলয়ে বা বিনিময়ে, অন্ততঃ ব্যাঘাতে বা বিকারে পাশ্চাত্য-পরিচিত নূতন ধরণের স্বদেশভক্তি আমরা চাহিনা। বাস্তবিক আমাদের বর্ত্তমান 'স্বদেশী' ব্যাপারটি বাহ্যতঃ কিন্তু বিদেশী আমদানী জিনিস। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা-সম্ভূত এই নূতন স্বদেশভক্তিটি ভারতের পূর্ব্বপরিচিত পুরাতন সম্পত্তি নহে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহাবাক্য আমাদেরই শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমুখনির্গত; যাঁহার রাজত্বের "রামরাজ্য" খ্যাতি সুরাজ্যের সর্ব্বোত্তম আদর্শরূপে আর্য্য-ভারতের চির-শিরোধার্য্য। উক্ত বাক্যে জন্মভূমির প্রিয়তাধিক্যজনিত গৌরব বুদ্ধির শিক্ষাবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতে স্বদেশভক্তি রাজভক্তি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু ছিল না। উহা রাজভক্তিরই অন্তর্গত ছিল। কারণ তখন স্বদেশীই রাজা ছিলেন। আর স্বদেশী প্রকৃতি-রঞ্জনই সেই রাজার রাজধর্ম্ম ছিল।

স্বদেশের যাহা কিছু ভাল করিতে হয়, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রানুশাসিত মন্ত্রী-মন্ত্রিত হইয়া রাজাই সমস্ত করিতেন; প্রজাপুঞ্জ কার্য্যে তার নিমিত্ত-যোগী ও ফলে তার ফলভোগী হইত। সেই প্রাচ্য প্রকৃতির স্বদেশভক্তি ও রাজভক্তির সংমিশ্রণ আজ প্রাচ্য-প্রভাত-নক্ষত্র জাপানরাজ্যে প্রকটিত ও প্রমাণিত। আজ মিকাডো, জাপান, জাপ-প্রজা, একই বস্তুর তিন ভাবের তিনটি নাম-মাত্র! রাজা, দেশ ও জাতি, তিন শব্দে যেন একেরই ত্রিবিধ বিবৃতি।* এসিয়ায় এ [illegible]শিক্ষার আদিগুরু ভারতবর্ষ। রাজভক্তি ভারতে ঈশ্বর-ভক্তিরই ঐহিক রূপান্তর-বিশেষ। "নরাণাঞ্চ নরাধিপম্" শ্রী ভগবানের শ্রীমুখোক্ত এই গীতাবাক্যে নরলোকে রাজাতেই তাঁহার অংশ, অধিষ্ঠান বা প্রকাশ, ইহা বিস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, রাজার দেবত্ব বা ঈশ্বরাংশত্ব-নির্দ্দেশক আরও বিস্তর বচন-প্রমাণ আর্য্যশাস্ত্রে আছে; উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র। ফলে শাস্ত্রানুসারে হিন্দু রাজভক্ত হইতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য; তজ্জন্য বিশেষ শিক্ষার আয়োজন বা আইনের প্রয়োজন নাই। সুতরাং স্বভাবতই হিন্দুভারতে পাশ্চাত্য-প্রলয়ঙ্কর এনার্কিষ্ট, নিহিলিষ্ট বা সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতির সমুদ্ভব সম্ভাবিত নহে। আজ ভগবদিচ্ছায় প্রায় সহস্রাব্দ যাবৎ হিন্দুভারত অহিন্দু রাজার অধীন; কিন্তু ইতিহাসে বোধ হয় এমন উদাহরণ দুর্ল্লভ যে, সাধারণ প্রজা ভারতে কখনও কোথাও বিদ্রোহী হইয়া রাজ-হন্তারক হইয়াছে। ফলে জন্মভূমির প্রতি সানুরাগাসক্তির সহিত অবিচ্ছিন্ন রাজভক্তি হিন্দুভারতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইংরাজের প্রথম আমলে যে "সিপাহী-বিদ্রোহ" হইয়াছিল, তাহা প্রজা-বিদ্রোহ নহে; তাহা রাজ-বিরুদ্ধে রাজসৈন্য-বিদ্রোহ মাত্র। সাধারণ প্রজা শান্তিতেই ইংরাজাধীন শাসনস্থ ও বিশ্বস্ত ছিল; নচেৎ ইংরাজ অত সহজে বিদ্রোহ দমন ও শান্তি-সংস্থাপনে সমর্থ হইতেন না।

দোষ দেখানো বন্ধুর কাজ; উহা বিপক্ষতা বা বিদ্রোহিতা নহে। হিন্দু বিশ্বাস করেন যে, ভগবদিচ্ছাতেই—মঙ্গলময় ভগবানের চিরসেবক হিন্দুভারতের ভবিষ্যৎ-মঙ্গলার্থেই এই ইংরাজ রাজশাসনাধীনতা উপস্থিত

হইয়াছে। তবে কর্ম্মচারীবিশেষের উদ্দেশ্যের ভ্রান্তি-বশে বা কর্ম্মপ্রণালী দোষে যে কোন আপাত-অমঙ্গল বা অশান্তির হেতু ঘটে, তৎসংশোধনার্থেই সময় সময় এইরূপ দোষপ্রদর্শনাদির প্রয়োজন হয় বটে। বর্ত্তমান বঙ্গভঙ্গ-ব্যাপার উপলক্ষে ও স্বদেশী আন্দোলন-পক্ষে যে সব রাজকার্য্যগত দোষ প্রদর্শিত বা পর্য্যালোচিত হইতেছে, সরল-বিচারে বুঝিলে, তাহা বরং নির্দ্দোষ রাজ্যশাসন-সংকল্পের সহায়তাস্বরূপ রাজহিতৈষিতারই ফল মাত্র। তদ্ভিন্ন অবিচারিতচিত্তে কেবল 'যো হুকুম্-নবিসী' করা রাজভক্তি নহে; উহা রাজতোষামোদ বা চাটুকারিতা মাত্র। হিন্দু বিশুদ্ধ রাজভক্তিকে শিরোধরে, কিন্তু রাজতোষামোদকে ঘৃণা করে। আজকাল অনেক রাজপুরুষ প্রলোভনে বা ভয়প্রদর্শনে রাজভক্তি আদায় করিতে চান; কিন্তু তদ্রূপে আদায়ী মাল রাজতোষামোদ ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু তাঁহারা সেই ঝুঁটা মালেই তুষ্ট; বরং তদ্ভাবে রুষ্ট।

ভগবান ইংরাজকে ভারতের শাসন-পালনের ভার দিয়াছেন; ইংরাজের উচিত যে, সেই ভগবানের দিকে চাহিয়া, ন্যায়-ধর্ম্মানুগত ভাবেই সেই কর্ত্তব্য পালন করেন; নচেৎ কেবল আপন কোলে ঝোল টানিলে, ভারতবাসীর মুখের দিকে সম-সুখে-দুঃখে না চাহিলে, তাঁহার রাজধর্ম্ম রক্ষা পায় না। ভারত-প্রজাকে নিয়ত দুঃখে, দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে, দুর্ব্বলতায়, রোগে, দুর্ভোগে—অকালমৃত, জীবন্মৃত, অবনত, অকর্ম্মণ্য, অবসন্ন, বিষণ্ন, নিরন্ন ও নিতান্ত নগণ্য জঘন্য অবস্থায় সংসারে কথঞ্চিৎ বাঁচাইয়া রাখিয়া, যদি ইংরাজরাজ কেবল স্বজাতি ও স্বদেশ পোষণার্থেই ভারত শোষণ করেন, তবে তাঁহার কেবল রেল-বিস্তারণ, ডাক-প্রসারণ, পূর্ত্ত-প্রবর্দ্ধন, মিউনিসিপাল্ মার্জ্জন, সৈন্যসংবর্দ্ধন বা পুলিস্ প্রবলীকরণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রোজ্জ্বল রাজকর্ম্মরাজিতেও প্রকৃত রাজধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না। সুতরাং ভারত-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ রাজবিরোধিতার সম্ভাবনা না ঘটিলেও, রাজভক্তির স্বভাব-শক্তির অভাব বা অল্পতা অসম্ভব নহে। অতএব যাহাতে তাহা না ঘটে, আর যাহাতে আমরা জগতে বাঁচিতে পারি, বাড়িতে পারি, মানুষ হইয়া মনুষ্য-সমাজে মুখ দেখাইতে পারি, যাহাতে ইংরাজ আমাদিগকে স্নেহাৎ তাঁহাদের ভোজোচ্ছিষ্টমাত্র ভোগে কথঞ্চিৎ জীবন-ধারণাধিকারী – শৃগাল কুক্কুর-সম্ভার নরদেহ-মাত্রধারী, অথবা হুজুরের কাজের কুলী-মুজুর মাত্র মনে না করিতে পারেন; যাহাতে আমাদের অন্ন-বস্ত্র যোটে, ন্যায্য স্বত্বলাভ ঘটে, বল-বীর্য্য বাড়ে, ভীরুতা-জড়তা ছাড়ে, শিল্প বজায় থাকে, ব্যবসায়-বাণিজ্য জাঁকে; আমাদের সাহিত্য, সংগীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষ সমুন্নত হয়; আমাদের যোগমর্ম্ম, জ্ঞান-ধর্ম্ম ও সদাচার-সৎকর্ম্ম অব্যাহত রয়; আর যাহাতে আমাদের জন্মস্বত্বগত স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ্য অবস্থা এবং মুখ্যতঃ ভারতের জন্যই ভারত-শাসনের ব্যবস্থা হয়, সেই সমস্তেরই সংসিদ্ধির আশায় আমরা এই সর্ব্বার্থসাধন স্বদেশী আন্দোলনে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমাদের 'স্বদেশী আন্দোলন' ভগবৎকৃপার

সফল হইলে, আমাদের বিদেশীয় রাজত্বেও স্বদেশীয়তার সুফল ফলিতে পারে। বিদেশী রাজায় দোষ নাই, যদি স্বদেশী স্বার্থের তিনি রক্ষক হন; আবার স্বদেশী রাজায়ও গুণ নাই, যদি স্বদেশী স্বার্থের তিনি ভক্ষক হন। থাক্ চিরপরাধীনপ্রায় ভারতের কথা, থাক্ ইংলণ্ডের অধীন 'ইণ্ডিয়া'র কথা, খাস্ ইংলণ্ডেই দেখুন, তাহার খাঁটি স্বদেশী রাজা ১ম চার্লস্ ও ২য় জেমসের সহিত ইংরাজ-প্রজাসাধারণের কি প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষণ! আবার 'ওলন্দাজ ৩য় উইলিয়ম্‌ই ইংলণ্ডের পূর্ণস্বাধীনতার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। প্রজারঞ্জক ১ম জর্জও বৈদেশিক ছিলেন। অথচ খাস্ ইংলণ্ড-জাত সম্যক্ স্বদেশীয় ৩য় জর্জ প্রজাপীড়নকারী—প্রজার ন্যায্যাধিকারহারী! আবার নেপোলিয়নের ফরাসী সেনাপতি সুইডেনের সিংহাসনে সাদরে সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রজারঞ্জনে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সে দিনও ডেন্‌মার্কের এক রাজপুত্র নরওয়ের নব-নরেশ্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ফলে প্রজা লইয়াই রাজ্য; প্রজার সর্ব্ববিষয়িণী সমুন্নতি সম্পাদনই রাজার রাজধর্ম্মের কার্য্য। এ হেন রাজা দেশী হউন, বিদেশী হউন, তিনিই দেশের অভিভাবক, দেশের মা-বাপ, দেশের প্রকৃত বন্ধু ও প্রভু।

আজ ইংরাজ যদি কেবল স্বজাতি-সংপোষণার্থেই 'পৌনে পনর আনা' ভারতসত্ত্ব না শোষিতে থাকেন, আর বেচারা ভারত-সন্তানদের বাঁচিবার ও মানুষ হইবার যোগ্য ভোগ্য অংশ রাখেন, এবং প্রজা শান্তি-রক্ষা ও সময়োপযোগী সর্ব্ববিধ সম্ভাবিত স্বদেশ-সমুন্নয়ন-শিক্ষা এবং ধন, বল, বিস্তার অবাধ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন, তবেই ঈশ্বর যে মঙ্গলোদ্দেশে ইংরাজকে ভারতের অখণ্ড অধীশ্বর করিয়াছেন, তাহার সুসিদ্ধি ঘটিবে। অন্যথা রাজা-প্রজা উভয় পক্ষেরই অশান্তি ও অনভ্যুদয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

অবশ্য ইংরাজ এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে কেবল গঙ্গাস্নান করিতে বা কেবল তীর্থধর্ম্ম করিতে আসেন নাই। তাঁদের রাজ্য-বাণিজ্য বা ক্ষাত্র-বৈশ্যত্ব ভগবদিচ্ছায় আজ পরস্পর সাপেক্ষ। বরং মূলতঃ রাজ্য বা ক্ষত্রিয়ত্ব গৌণ, বাণিজ্য বা বৈশ্যত্বই মুখ্য। এ অবস্থায় ইংরাজ অবশ্য নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই ভারতে আর্থিক স্বার্থলাভের অধিকারী। কিন্তু তিনি নিয়ত কেবল স্বীয় "সিংহভাগ" দখল করিলেই ঈশ্বরাভিপ্রায়-প্রীতির ব্যাঘাত ঘটে; সুতরাং তাহা তাঁহার পরিণাম-অভ্যুদয়ের অন্তরায়ই হইয়া উঠে। যদি ভারত-সন্তানকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিয়া বৃটন্ সন্তান ভারত-মাতার প্রদত্ত ও প্রয়োজনীয় শুল্ক-পণ্যাদির যথাযোগ্য ভোগ্যতায় উচিত আদান-প্রদান ও এ দেশের সর্ব্ববিধ সেবাধিকারের অপক্ষপাত বিধান করেন, তবেই ভগবদিচ্ছানুকূলতায় উভয় পক্ষেরই অবিসংবাদিত অভ্যুদয়-সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং ভগবদভিপ্রেত—ভারতশাস্ত্রানুমোদিত—ভারত-প্রকৃতির অনুগত রাজভক্তি ও প্রজানুরক্তির পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে ভারতের পুনঃসঞ্জীবন ও পুনরুন্নয়ন শান্তির সহিত সম্ভাবিত ও সম্পাদিত হইতে পারে। উভয় পক্ষেরই অপ্রাপ্ত-প্রাপণ ও প্রাপ্ত-পালন রূপ

'যোগক্ষেম' সিদ্ধ হইতে পারে। আর একটু 'টীকা' করিয়াও ভাঙ্গিয়া বলা যায় যে, প্রাচ্যআর্য্যভারত স্বীয় আর্থিক অভাব দূর করিয়া, পাশ্চাত্যের পারমার্থিক অভাব পূরণেসহায় হইতে পারেন এবং পাশ্চাত্যও আপন অপক্ষপাতিত ও সুসঙ্গত আর্থিক স্বার্থের অবিরোধে ভারতের আবশ্যকীয় আর্থিক স্বার্থোন্নতির সুবিধান করিয়া, স্বীয় পারমার্থিক পূর্ণতায় পরিতৃপ্ত হইতে পারেন।

আরও একটু বিশদভাবে ও ভারতীয়-ভাবে বুঝিতে হইবে। জগতে পারমার্থিক উন্নতির জন্য ব্রাহ্মণত্ব চাই; কিন্তু ঐহিক উন্নতির জন্য ক্ষাত্র-বৈশ্যত্ব আবশ্যক। ভগবৎ-কৃপায় আমাদের ব্রহ্মণ্য-সত্ত্বের আজিও কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে, কিন্তু ক্ষাত্র-বৈশ্যত্বের শোচনীয় অবনতি হইয়াছে। আর আজ পাশ্চাত্যের ক্ষাত্র বৈশ্যত্বের প্রবল প্রভাব; কেবল ব্রাহ্মণত্বেরই যা কিছু অভাব। ইংরাজের ভারতাধিকারে ভগবদিচ্ছায় যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে, ন্যায়-ধর্ম্মের অপ্রতিকূল ভাবে অর্থাৎ মঙ্গল-ময়ের ইচ্ছানুকূল ভাবে তাহা সংপালিত ও সংবর্দ্ধিত হইলেই সে প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে।

আশা আছে, একদিন সেদিন আসিবে। অন্ততঃ বিশ্বমঙ্গলময়ী ঈশ্বরেচ্ছার দাস হিন্দুর তাই বিশ্বাস ও আন্তরিক আশ্বাস।

স্বদেশী ভাবেই 'স্বদেশী' সাধন স্বাভাবিক ও সুফলপ্রদ। গঙ্গাজলেই গঙ্গামৃত্তিকা গুলিয়া ব্যবহার করিতে হয়। অতএব আমরা যদি স্বধর্ম্ম ও স্বজাতীয় শাস্ত্রানুগত সামাজিক আচার-ব্যবহার বজায় রাখিয়া, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি, গুরুভক্তি, রাজভক্তি প্রভৃতির অব্যাঘাতে, শুদ্ধ স্বদেশানুরক্তির প্রেরণায় এই স্বদেশীব্রত পালন করিতে পারি, তবে ভগবৎকৃপায় শীঘ্রই আমাদের সুদিন—সেদিন আসিবে। নচেৎ এই স্বদেশী-আন্দোলনের গোলমালের সুযোগে আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব জীবিত থাকার এক মাত্র উপকরণ—আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় জাতিভেদ-দুর্গস্থিত স্বধর্ম্মাচারের পরিহারিতায় ও একাকার-কারিতায় সে আশা দুরাশা। কেবল গলাবাজী, কলমবাজী, দলাদলি, গালাগালি, রাজার সঙ্গে যেন রোখারুখি—জেদাজেদি, আবার আপনাদের মধ্যেও মত-বিপ্লবের ভেদাভেদি, শত্রুতাবুদ্ধির বিনির্দ্দেশ, আর অপ্রেম—অনৌদার্য্য-বিজৃম্ভিত বিদেশী-বিদ্বেষ; হিন্দুর মতে এ সব রজস্তমোগুণজাত অধর্ম্মমূলক উপকরণে কদাচ আমাদের এই পবিত্র মাতৃপূজা-মহাযজ্ঞ শুভসংপূর্ণ হইবার নহে।

হিন্দুর বিশ্বাস, অধর্ম্মমূলক মন্দ জিনিষ কিছুই এই ধর্ম্মভূমি ভারতে বেশি দিন টিঁকিবেনা। কৃপাময় ইচ্ছাময়ের কৃপেচ্ছা হইলে, সে সুদিন আসিতেও বড় বেশি দিন লাগিবেনা। বোধ হয়, যেন শুকতারা উঠিয়াছে, "পূবে ফরসা" ফুটিয়াছে। এত মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত, কাঁদাকাটি, শোণিত-শোষণ, পোষণের নামে পেষণ, সংস্কারের নামে সংহার ও পরার্থের নামে "সাড়েষোল আনা" স্বার্থসাধন প্রভৃতি রজস্তমের বিকট বিস্তার ব্যাপারের মধ্যেও সমস্ত সুসভ্যাখ্য জগৎ যুড়িয়া যেন একটা সত্ত্বগুণের সাড়া পড়িয়াছে। কিছু দিন

পূর্ব্বে কোন দেশবাসী দেশান্তরবাসীর প্রতি স্বার্থান্ধ-ব্যবহার-বিশেষের জন্য জগতে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিত না; কিন্তু অধুনা চিরস্বেচ্ছাচারী রুস্ও স্বেচ্ছাসঞ্চালনে জগতের মুখের দিকে তাকায়। ফলে জগৎ ব্যাপিয়া যেন একটা সত্ত্বের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। আঁধারের আবরণে যার যা খুসী তা করার আর তত সুবিধা নাই। অধুনা উলঙ্গ স্বেচ্ছচারিতায় প্রায় সবারই বাধো বাধো ভাব; ইহা অবশ্য শুভ লক্ষণ। আমরা এই শুভসুযোগে আমাদের আত্মরক্ষার অনন্যোপায় 'স্বদেশী' সাধন ধরিয়াছি। ভগবান আমাদের ভরসা, ধর্ম্ম আমাদের সহায়, ন্যায় আমাদের পরিচালক, প্রেম আমাদের পথপ্রদর্শক। আর এতদুপায়ে জন্মভূমির সেবারূপ মাতৃপূজা-ব্রতই, আমাদের সর্ব্বার্থসাধক। উপস্থিত স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের এই সাধুস্বত্ব ঠিক থাকিলে, অবশ্যই আমাদের দুঃখ দূর হইবে। কালক্রমে—যুগপরিণামে ধর্ম্মসর্ব্বস্ব হিন্দুর মর্ম্মগত চরম আশা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

ভগবদিচ্ছায় পূর্ব্বকথিত সার্ব্বভৌমিক সত্ত্বপ্রভা প্রকাশের ক্রম-বিকাশে সে দিন এক দিন আসিবে, যে দিন (পাশ্চাত্য মতেই বলি) পরমেশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ স্থগিত হইবে, রক্তপাত রহিত হইবে। ভগবদিচ্ছায় যিনি যে দেশ বা যে জাতির রাজা বা রাজস্থানীয় হইবেন, সমাজ্ঞী সমবায়ে তিনি তদ্দেশ ও তজ্জাতির মূর্ত্তিমান মঙ্গলরূপী রহিবেন। ভারতের ঐহিক উন্নতি আবার আসিবে, পারমার্থিক উন্নতি পূর্ণ প্রভায় হাসিবে। ভারতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব-গৌরবের স্খলিত সিংহাসন আবার জগৎ মাথায় তুলিয়া ধরিবে। ইংরাজ-প্রমুখ ঐহিকোন্নত পাশ্চাত্য জাতি ভারতের শিষ্যতায় প্রয়োজনীয় পারমার্থিকতা পাইয়া পূর্ণতা লাভ করিবে। ভগবদিচ্ছায় সেই সত্ত্বময় সত্যযুগের শুভ পুনরাবির্ভাবে ভারতের অধঃপতিত ক্ষাত্র-বৈশ্যত্ব পুনরুন্নত হইবে; এবং ভারতে (অদ্যাপি উন্নত) ব্রাহ্মণত্ব পূর্ণোন্নতি পাইয়া, পুনরায় সমগ্র পৃথিবীর গুরুত্ব গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। আর সেই দিনই ভগবৎকৃপায় আমাদের এই স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশে বিদেশে চরম ও পরম পরিণাম-কৃতার্থতা লাভ করিবে। আমাদের এই মাতৃযজ্ঞের পূর্ণাহুতি জগন্মাতৃ-প্রসাদে পূর্ণ পরিসমাপ্ত হইবে।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

ভগবদ্গীতার ভক্তিযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সপ্তম শ্লোকে শ্রীভগবান কহিতেছেন—

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামিন চিরাৎপার্থময্যাবেশিত চেতসাম্॥" ৭।

এই শ্লোকটি পরিষ্কার রূপে অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান ব্যাখ্যা স্বরূপে পুনরপি বলিতেছেন—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

উপরিউক্ত উভয় শ্লোকের অর্থ এই— "যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে (ঈশ্বরে) অর্পণ করিয়া ঈশ্বরপরায়ণভাবলম্বন পূর্ব্বক ভগবানের ধ্যান ও উপাসনায় রত থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সত্বরে এই মৃত্যুদুঃখময় সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন; কিন্তু ঈশ্বরে নিবেশিতচিত্ত না হইলে তাহা হয় না।" এই মায়াময় সংসার-সাগর পরিত্রাণের জন্য—অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু বারিতের জন্য, মোক্ষাভিলাষী মানবগণের পক্ষে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করার একান্ত প্রয়োজন। ১ম—ভক্তিরসে হৃদয় সিক্ত করা, ২য়—নিষ্কাম হইয়া সমস্ত ক্রিয়াদি ভগবানে সমর্পণ করা, ৩য়—ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তাঁহার ধ্যান-উপাসনা করা, ৪র্থ—সতত ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত থাকা। সপ্তম শ্লোকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "আমি এবম্প্রকার ভক্তদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকি"; অষ্টম শ্লোকে তিনি কহিয়াছেন—"অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ" অর্থাৎ "নিঃসন্দেহ ঊর্দ্ধদেশে লইয়া যাইব।" এই 'ঊর্দ্ধ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? ঊর্দ্ধশব্দের সাধারণ অর্থ উপরিভাগ, শূন্য, স্বর্গ, ভুবর্লোক, মস্তক, আকাশ প্রভৃতি। কেহ লিখিয়াছেন "অতঃ ঊর্দ্ধং" অর্থে 'শরীর পাতানন্তরং'; কেহ লিখিয়াছেন ঊর্দ্ধং অর্থে ঊর্দ্ধদেশ (স্বর্গলোক); কাহারও মতে প্রাণকে সাধন দ্বারা মস্তকে রাখিয়া, মৃত্যুকে জয় করার নাম "ঊর্দ্ধ"। এস্থলে শেষোক্ত অর্থ ঠিক নহে, কারণ ইহা সাধনসাপেক্ষ; কিন্তু ভগবান এস্থলে অযাচিত দয়ার ভাব দেখাইতেছেন; সাধনের কথা কহেন নাই। সাধন সাপেক্ষের নিজের পরিশ্রমসাধ্য জিনিষ; কিন্তু এস্থলে ভগবান নিজের দয়াগুণ প্রকট করিয়া কহিতেছেন— "আমি আমার অসীম দয়া ও সামর্থ্য এবং ভক্তবৎসলতা গুণে) ভক্তকে উদ্ধার করিব" সুতরাং এই শ্লোকে "ঊর্দ্ধং" অর্থে ভুবর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মোক্ষ প্রভৃতি বুঝাইতেছে। কিন্তু প্রমাথী চিত্তকে সংযত করিয়া একাগ্র করা অত্যন্ত কঠিন, এইজন্য ভগবান বলিতেছেন—

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥"৯

অর্থ—"হে ধনঞ্জয় (অর্জ্জুন)! যদি চিত্ত স্থির করিয়া সমাধান করিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইবার চেষ্টা কর। কেহ কেহ "অভ্যাসযোগ" অর্থে সদ্‌গুরূপদিষ্ট উপায় লক্ষ্য করিয়াছেন। গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট উপায়ই শিষ্যের চিত্তসংযমের প্রধান উপায়, সন্দেহ নাই; কিন্তু চিত্তসংযম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছেন এবং ভগবানকে পুনঃ পুনঃ উত্তর দিতে হইয়াছে; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, মনুষ্যের পক্ষে চিত্তসংযম করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম বিষয়। চিত্তসংযম না হইলে, ধর্ম্মের কোন অঙ্গই সাধিত হয় না। চিত্তটি সংযত হইলেই ধর্ম্মের অর্দ্ধপথ অতিক্রম করা যায়। পাতঞ্জল ঋষি লিখিয়াছেন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দুই উপায় দ্বারা প্রমাথী মনকে শাসন করা যায়। ইতঃপূর্ব্বে ইহা একবার আলোচনা করা গিয়াছে, সুতরাং পুনরায়

ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। কিন্তু অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিতেও যাহারা অপটু, তাহাদিগের জন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ আরও সহজ উপায় দেখাইতেছেন—

"অভ্যাসেপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি" ॥১০

অর্থাৎ অভ্যাসযোগে অসমর্থ হইলে, ঈশ্বরের উদ্দেশে পুণ্য (সাধু) কর্ম্ম কর এবং সৎকর্ম্ম করিলে, সিদ্ধি (মনস্কামনা) পরিপূর্ণ হইবে। যদি তাহাও না করিতে পার, তাহাহইলে—

"অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ॥১১

সর্ব্বকর্ম্মের ফল (অর্থাৎ যাহা কিছু ভাব বা কর) একমাত্র ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিষ্কামী হও এবং সংযতাত্মা হইয়া থাক। শ্রীভগবান এই উপায়গুলি দেখাইয়া, উপায়গুলির পরম্পরাগত শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রমাণ জন্য কহিতেছেন—

"শ্রেয়োহিজ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" ॥ ১২।

অর্থাৎ, অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠতর; ধ্যান হইতে ত্যাগ (বৈরাগ্য) শ্রেষ্ঠতর; কারণ ত্যাগ হইতেই শান্তির উদয় হয়। তাহাহইলে ভগবানের উপদেশে ত্যাগই শ্রেষ্ঠতম উপায় হইল। কেবল জ্ঞানবিহীন অভ্যাসে কি ফল হইতে পারে? সুতরাং অভ্যাস হইতে জ্ঞান মুখ্যতর। যে জ্ঞানে পূজা, উপাসনা, বিশ্বাস, ধ্যান প্রভৃতি নাই, সে জ্ঞানে ফল কোথায়? সুতরাং ধ্যান শ্রেষ্ঠতর; কিন্তু বৈরাগ্যবিহীন, মায়াজড়িত, বাহ্যিক ধ্যানে কি সুফল হইতে পারে? অতএব ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এইগুলির পরস্পর সম্পর্ক আছে; শৃঙ্খলে গ্রন্থির যেমন সম্বন্ধ, এখানে তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। এইরূপ দুর্লভ শান্তির অবস্থায় উপনীত হওয়া বহু পুণ্যের—বহুভাগ্যের—বহুসাধনার কার্য্য। এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥" ১৩

এই প্রকার হইতে হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বভূতে বিদ্বেষরহিত হইয়া, কৃপালু, বন্ধুব্যবহারী, সর্ব্ববিধ ভোগে মমতাহীন, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমভাব এবং ক্ষমাশীল হইবে। ভক্তগণ ভগবানের সদাই প্রিয়, কিন্তু তথাপি কোন্ কোন্ ভক্ত—কি কি প্রকারের ভক্ত তাঁহার বিশেষ প্রিয়, তৎসম্বন্ধে ভগবান কহিতেছেন——

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ" ।১৪

অর্থাৎ যোগযুক্ত, সংযতচিত্ত, ঈশ্বরবিষয়ে স্থিরলক্ষ্য ও ভগবানে মনোবুদ্ধিসমর্পণকারী ভক্ত ভগবানের প্রিয়। তাহার পরে পুনরপি ভগবান কহিতেছেন—

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।" ১৫।

যাহা হইতে কোন প্রাণী দুঃখ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি কাহারও নিকট হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হয় না; যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয়

ও উদ্বেগ হইতে বিমুক্ত, সেই ভক্ত আমার (ঈশ্বরের) প্রিয়।

"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃস মেপ্রিয়ঃ।" ১৬

"যিনি স্পৃহাশূন্য, সাত্ত্বিকভাবসম্পন্ন (অর্থাৎ দেহ মন ও আত্মায় পবিত্র), কার্য্য-কুশল (অর্থাৎ উৎসাহী, নির্ভীক্ এবং পরি-শ্রমপরায়ণ), নিরপেক্ষচেতা (ন্যায়বান) বিগতব্যথ এবং সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, এরূপ ভক্ত ঈশ্বরের প্রিয়। এই শ্লোকান্তর্গত 'গতব্যথ' শব্দের অর্থ গত ঘটনার ক্লেশকে স্মরণ না করা, বর্ত্তমান কালের দুঃখ সহ্য করা এবং ভবিষ্যতে কোন সাধু বিষয়ে ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে ভাবিয়া, তাহা হইতে নিরস্ত না হওয়া। "সর্ব্বারম্ভপরি-ত্যাগী" অর্থে "সর্ব্বান্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ।" এই শব্দের প্রকৃত অর্থ এই—অর্থাৎ কোন বিষয়ের আরম্ভও নাই এবং ত্যাগও নাই; আহ্বানও নাই এবং বিসর্জ্জনও নাই; অর্থাৎ সকল বিষয়ে, সকল অবস্থায়, সর্ব্বকালে সমভাব—একই ভাব।

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগীভক্তিমান্যঃস মেপ্রিয়ঃ॥" ১৭।

"যিনি প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল কিম্বা অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ অথবা অপ্রিয় দর্শন বা প্রাপ্তি হেতু নিরানন্দ হয়েন না, যাঁহার বিদ্বেষ বা বিষাদ নাই, যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি শুভাশুভে সমবোদ্ধা, এমন ভক্ত আমার (ঈশ্বরের) প্রিয়।" এই শ্লোকান্তর্গত "শুভাশুভ পরিত্যাগী" শব্দের অর্থ পাপ-পুণ্য বৈরাগ্যশালী, অর্থাৎ পাপেও বৈরাগ্য, পুণ্যেও বৈরাগ্যযুক্ত।

"সমঃশত্রৌচ মিত্রেচতথামানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥১৮।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনীসন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃস্থিরমতির্ভক্তিমান্মেপ্রিয়োনরঃ।
১৯।
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০"

অর্থাৎ "যাঁহারা শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে সমজ্ঞানী, শীত ও উষ্ণ-তায় কাতরতাশূন্য, আসক্তিহীন, নিন্দা ও প্রশংসায় এক ভাবাপন্ন, অনর্থক বাক্য-[illegible] করেন না (সার কথা ভিন্ন অনেক বাক্য কহেন না), অল্পে সন্তুষ্ট, বাসস্থান-হীন, স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্ত ঈশ্বরের প্রিয় শিষ্য। যাঁহারা এই সকল উপদেশ কার্য্যতঃ পালন করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে ভগবৎপরায়ণ হইতে পারেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের অতীব প্রিয় ভক্ত ও অতীব প্রিয় শিষ্য বলিয়া গণ্য।" অষ্টাদশ শ্লোকে "সঙ্গবিবর্জ্জিত" নামে এক শব্দ আছে, ভগবদ্গীতার অনেক শ্লোকে 'সঙ্গ' শব্দ উল্লিখিত আছে; কিন্তু পঞ্চদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ইহা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুসংসর্গী লোকের গমনাগমনে যিনি কুসঙ্গের প্রভাবে পরিচালিত হয়েন না এবং সৎসংসর্গীর সমাগমেও যিনি নূতন ভাবে ধর্ম্মের কথায় শিক্ষিত হয়েন না, এমন মহোন্নত পুরুষের নাম "সঙ্গবিবর্জ্জিত ভক্ত"। উনবিংশ শ্লোকান্তর্গত "মৌনী" শব্দের অর্থ একেবারে "বাক্শূন্য" নহে।

যিনি অকারণে বা বৃথা বাজে কথা কহিয়া সময় অপব্যয় না করেন অথবা সার কথা ভিন্ন অন্য কথা না কহেন এবং অল্প ভিন্ন বহুবাক্য না বলেন, তিনিই মৌনী পুরুষ। "অনিকেতঃ" শব্দের অর্থ গৃহত্যাগী অথবা গৃহে থাকিয়াও মমতাশূন্য কিম্বা একবারে বাসহীন। এরূপ ভক্ত যেখানে বাস করেন, সেই স্থানেই তাঁহার নিবাস এবং যতক্ষণ বাস করেন, ততক্ষণই সেইস্থান তাঁহার আশ্রম। বিংশ শ্লোকে ভগবান বর্ত্তমান অধ্যায়ের উপদেশকে "ধর্ম্মামৃত" শব্দে অভিনন্দিত করিয়াছেন এবং "অতীব প্রিয় ভক্ত" মানবের পূর্ণ লক্ষণসমূহ উপরিউক্ত শ্লোক কয়েকটিতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিয়াছেন। "সংক্ষিপ্ত" শব্দ ব্যবহার করিলাম বটে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সার; এতদপেক্ষা ভক্তের আর কি লক্ষণ হইতে পারে?

অষ্টাদশ শ্লোকান্তর্গত "সঙ্গবিবর্জ্জিত" শব্দটি আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে আকাঙ্ক্ষা করি। সুসঙ্গ ও কুসঙ্গ, এতদুভয়ের প্রভাব হয়ে যিনি অবিচলিত থাকেন; যাঁহার কুসঙ্গ বা সুসঙ্গ দ্বারা মতান্তর বা মতান্তর হয় না, সেই মহাপুরুষ "সঙ্গবিবর্জ্জিত ভক্ত"। 'মতান্তর' অর্থে একভাব, একমতি, একরূপ ভিন্ন অন্যচেতা না হওয়া, সর্ব্বাবস্থায় সমভাবী। (unmoved by influences of good or bad man.) ধর্ম্মপিপাসু পাঠকেরা এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 'মতান্তর' শব্দের অর্থ কি? মনে করুন; এক ব্যক্তি সাকারোপাসক, এক ধার্ম্মিক পুরুষ তাঁহার কাছে ক্রমাগতঃ 'লেক্‌চর' বা উপদেশবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিরাকারোপাসক করিবার চেষ্টা করিতেছেন; লেক্‌চর শুনিয়া অব্যবস্থিতচেতা ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইল, অমনি তিনি সাকারোপাসনা ছাড়িয়া নিরাকারের উপাসক হইলেন। আবার কয়েক দিবসের পরে ঐরূপ এক ব্যক্তির মুখে সাকারের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ববৎ সাকারোপাসক হইয়া গেলেন। ইহারই নাম মতান্তর। অথবা শাক্ত পুরুষ বৈষ্ণব হইলেন, বৈষ্ণব পুরুষ শাক্ত হইলেন। ইহারও নাম মতান্তর। প্রকৃত কথা এই, গুরূপদিষ্ট পথ কেহ যেন না ভুলেন; সেই এক সুপথে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। আজ একটা, কাল একটা, পরশু নূতন আর একটা, এমন অব্যবস্থচেতা হইলে, ইহকূল ও উহকূল, এই উভয়কূলই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য ভগবদ্‌গীতায় ভগবান পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, সংশয়বাদীর কোন কালেই কল্যাণ নাই।

পাঠক মহাশয়! ভগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায়—অর্থাৎ ভক্তিযোগ সমাপ্ত হইল; কিন্তু আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। বারান্তরে সমাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

(ক্রমশঃ)

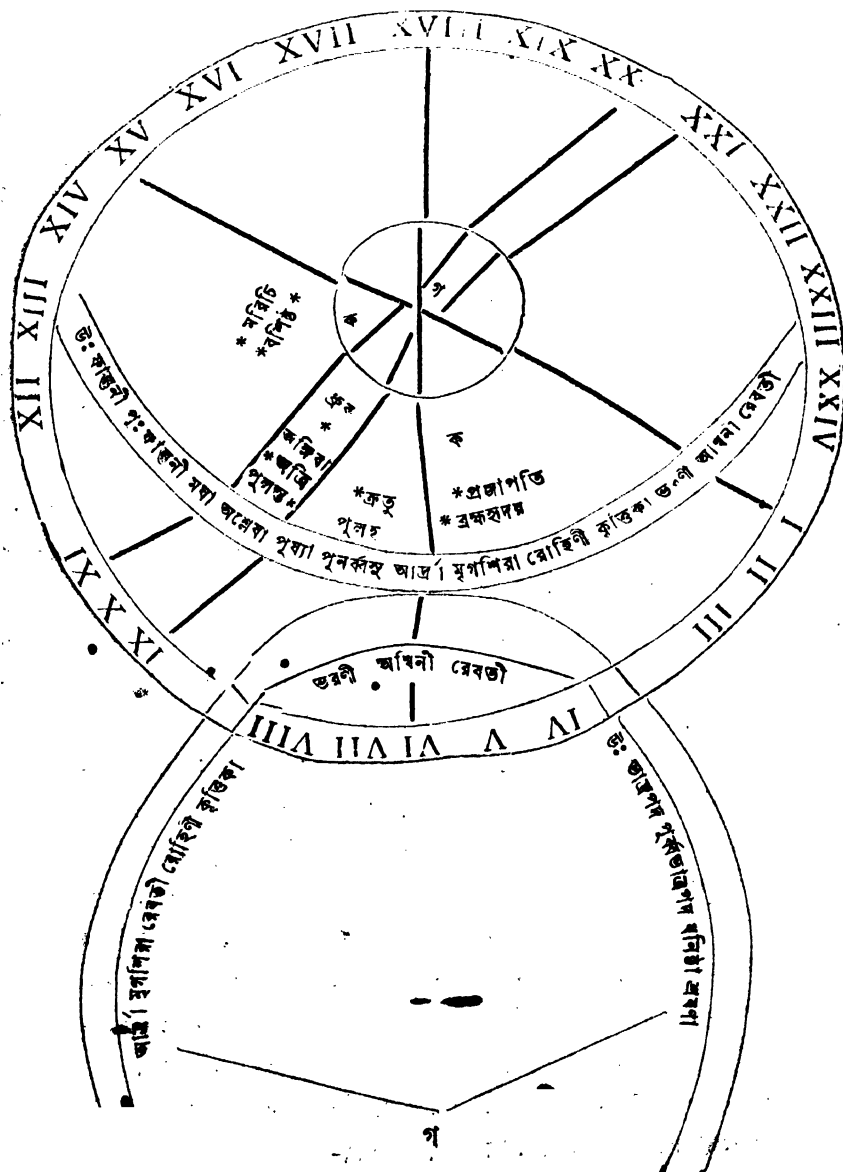
শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ভারত-নীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

চিত্র।

এই চিত্রে রাশিচক্রকে নিরক্ষদেশের সমতলে বর্দ্ধিত করিয়া অর্থাৎ বিপর্য্যস্ত ভাবে রাশিচক্রকে স্থাপন করিয়া দেখান হইতেছে।



এতাবতা প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিৎপণ্ডিতগণের মতে সপ্তর্ষিগণ একত্রে গতিশীল এবং উহারা উত্তর মেরুর সন্নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র চক্রে বা মণ্ডলে মৃদুভাবে ভ্রাম্যমান। এজন্য উহারা সপ্তর্ষিপুঞ্জ নামে আখ্যাত না হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল (সপ্তর্ষিচক্র) নামে অভিহিত, এবং পূর্ব্ববর্ণিত সপ্তর্ষিরেখা (অত্রি-পুলস্ত্য মধ্য রেখা) যখন মঘায় ছিলেন, তখন পরীক্ষিতের রাজত্ব-কাল। আল্‌বেরুণি নামক জনৈক আরবীয় পর্য্যটক প্রায় ৯৫৩ শকাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে লিখিয়াছেন যে, তিনি কাশ্মীরে অবস্থিতি কালে ৯৫২ শকাব্দার এক খানা কাশ্মিরীয় পঞ্জিকা দেখেন, তাহাতে লিখিত ছিল যে, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল অনুরাধা নক্ষত্রে ৭৭ বৎসর অতিবাহন করিয়াছিল। মঘা হইতে অনুরাধা অষ্টম নক্ষত্র, সুতরাং মঘা হইতে অনুরাধায় ৭৭ বৎসর অতিবাহন করিতে ৭৭৭ বৎসর লাগিয়াছিল। পাঠক, বুঝিয়া লইতে হইবে যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল একবার রাশিচক্র ঐ ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মঘা হইতে অনুরাধায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; সুতরাং পরীক্ষিতের রাজত্ব-কাল ৯৫২ শকাব্দায় ৩৪৭৭ (২৭০০+৭৭৭) বৎসর, সুতরাং বর্ত্তমান ১৮২৭ শকাব্দায় (১৩১২ বঙ্গাব্দ ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ) পরীক্ষিতের রাজত্ব-বয়ঃক্রম ৪৩৪২ বৎসর—অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের ২৪২৭ বৎসর পূর্ব্বেই, দেখান হইয়াছে যে, "বৃহৎসংহিতা" মতে শকাব্দার সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে, যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব-কাল নির্ণীত হয়। বর্ত্তমান-শকাব্দা ১৮২৮, ইহার সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে, ৪৩৫৩ বৎসর যুধিষ্ঠিরাবির্ভাবের বয়ঃক্রম হয়। এই মতানুসারে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব খৃষ্টের জন্মের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। মধ্য কালের কোন কোন জ্যোতিষ গ্রন্থে 'যৌধিষ্ঠিরাব্দ' বলিয়া একটি অব্দের উল্লেখ আছে; ঐ যৌধিষ্ঠিরাব্দের ২৫২৬ অব্দেই নাকি শকাব্দার উৎপত্তি। বোধ হয় বৃহৎসংহিতাকার এই জন্যই শকাব্দার সহিত ঐ যৌধিষ্ঠিরাব্দ (২৫২৬) যোগ করিতে বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী আল্‌বেরুণীও কাশ্মিরী-পঞ্জিকাস্থ যৌধিষ্ঠিরাব্দের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারেও যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব ২৪৪৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দায় হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, আদিকালে মঘানক্ষত্র নক্ষত্র-চক্রমধ্যে বৃহত্তম ও অস্তের পরিমাপক বলিয়া গণ্য হইত। খৃষ্টের জন্মের ২২৮০ বৎসর পূর্ব্বে মঘানক্ষত্র উত্তরক্রান্তি বৃত্তের অতি সন্নিকট ছিল। ঐ সময় উহাদের দূরত্ব মোট ২৭ কলা মাত্র ছিল। সুতরাং বার্ষিক গতির সময়, যখন সূর্য্য মঘায় উপক্রম করিতেন, তখনই 'ক্রান্তি-পাত' বিন্দুতে উপস্থিত হইতেন। ঐ সময় সূর্য্যের উচ্চ অজ হতে মঘা ১২ কলা মাত্র দূরে থাকিতেন। উত্তর ক্রান্তি সিংহ রাশিস্থ হইলেই হিন্দু জাতির পবিত্র সময় উপস্থিত হইত। ইহাও একরূপ নিশ্চিত যে, খৃষ্টজন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তরক্রান্তি সিংহরাশিস্থ মঘানক্ষত্রের আদিতে উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময় ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ

মঘার আদি বিন্দুকেই ক্রান্তিবৃত্তের আবর্ত্তন-প্রত্যাবর্ত্তনের অন্ততর সীমা বলিয়া গণ্য করিতেন। ইহাও নিশ্চিত যে, স্থির নক্ষত্র মঘাপুঞ্জের প্রধানতম নক্ষত্রেই খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে বাসন্তীক্রান্তি বিন্দুপাত হইত এবং ঐ সময় সমস্ত লোকই মঘাসহ সূর্য্যকে উদিত হইতে দেখিতেন। ঐ সময় মঘার আদিবিন্দু হইতে রাশিচক্রের কেন্দ্র গ পর্য্যন্ত একটী রেখা কল্পিত হইয়াছিল, ঐ রেখাই ঋষিরেখা—অচল, অথচ ক্রান্তিরেখা সচল। দুইরেখার সম্মিলন-হেতু অচলে ও সচলে ভ্রান্তি হইয়াছে।

যে চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে, ঐ চিত্রটি ভাল করিয়া বুঝিলেই পাশ্চাত্যমতও বিষদরূপে বোধগম্য হইবে। নিরক্ষদেশের কল্পিত সমতলে ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডলের চিত্র কল্পিত হইয়াছে। ক নিরক্ষবৃত্তের কেন্দ্র, গ অয়নমণ্ডলের কেন্দ্র। নিরক্ষবৃত্তের কেন্দ্র 'ক' বিপরীতভাবে 'গ' কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকস্থ রাশিচক্রের দিকে গমন করায়, সচল বৃহৎ ক্রান্তিরেখা একবার আবর্ত্তন কালে, 'গ' 'ক' কেন্দ্র দিয়া গমন করে এবং ঐ গমন কালে, ও চক্রের প্রতি নক্ষত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। খৃষ্টের জন্মের ৪২৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ঐ ক্রান্তিরেখা 'গ ক' আবর্ত্তন কালে সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রান্তস্থিত 'মরীচি' নামক তারায় সম্মিলিত হইয়াছেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে মরীচির দ্রাঘিমা ১৭৫°১৮´[illegible] ছিল। ঐ ক্রান্তিরেখা প্রত্যাবর্ত্তন কালে, যখন খৃষ্টের জন্মের ৩৫১০ পূর্ব্বাব্দায়, উত্তরফাল্গুনীর প্রথম বিন্দুতে ছিল, তখন ঐ রেখা সপ্তর্ষিমণ্ডলের অদিরায় সহিত প্রায় সম্মিলিত হইয়াছিল। ৯৬০ বৎসর পরে ঐ ক্রান্তিরেখা পূর্ব্বফাল্গুনীর প্রথম পাদে সম্মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই মঘার শেষবিন্দুতে ক্রান্তিরেখা উপস্থিত হয়। মঘায় আর ৯৬০ বৎসর অবস্থান করিয়া, ক্রান্তিরেখা মঘার প্রথম বিন্দুতে পৌছিয়াছিল। এতাবতা বলা যায় যে, যখন ক্রান্তিরেখা শেষ বিন্দুতে উপস্থিত হয়, তখন খৃষ্টের জন্মের ২৫২০ পূর্ব্বাব্দা, এবং উহা মঘার প্রথম বিন্দুতে খৃষ্টের জন্মের ১৫৯০ অব্দে উপস্থিত হয়। ঐ সময় ঐ ক্রান্তিরেখা পূর্ব্বোক্ত অপরিবর্ত্তনশীল অচল ঋষিরেখার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের পাশ্চাত্য পঞ্জিকানুসারে দক্ষিণ উত্থান ও অবতরণ হেতু সপ্তর্ষিমণ্ডলের ক্রতু নামক তারায় দ্রাঘিমা ১৩৩° ৪৪´ ২৫" বিকলা ও মঘার প্রথম বিন্দুর দ্রাঘিমা ১২৮° ২৩´ ২০" এতাবতা বলা যায় যে, ক্রতুর সহিত ক্রান্তিরেখার সম্মিলনস্থান হইতে মঘার আদি বিন্দু সংযোজক রেখাই ঋষিরেখা। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ মতান্তর বশতঃ ক্রান্তিরেখার গতি জন্যই ঋষিরেখার গতি নির্ণয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে ক্রান্তিবৃত্তের কেবল আবর্ত্তনই ধরা হইত, কিন্তু অধুনাতন কালে জ্যোতিঃশাস্ত্রের উন্নতি হওয়াতে, উহাদের আবর্ত্তন ও প্রত্যাবর্ত্তন, উভয়ই নির্ণীত হইয়াছে। এতাবতা পাশ্চাত্য মতানুসারে ক্রান্তিরেখা এক এক নক্ষত্রে ৯৬০ বৎসর থাকা নির্ণীত হইয়াছে এবং সপ্তর্ষিরেখা অচল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সাধারণতঃ ঐ ৯৬০ বৎসর স্থলেই ১০০০ বৎসর ধরা হয়।

এক্ষণে উক্ত পাশ্চাত্যমতানুসারেই বা যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কোন্ সময় নির্ণীত হইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক। যে সময় মঘার সপ্তর্ষিরেখা অথবা ক্রান্তিরেখা, ঐ সময় পরীক্ষিতের রাজত্ব। এক নক্ষত্রে ক্রান্তিরেখা এই মতানুসারে ৯৬০ বৎসর থাকে, তাহা পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরীক্ষিতের সময় *হিন্দু জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদিগের 'সপ্তর্ষিরেখা' মঘার সম্মিলিত হয়। মঘার আদি বিন্দু হইতে ঐ সম্মিলন-স্থানের দূরত্ব ৪০ ৩৮´ ৩৫" বিকলা। মঘার আদি বিন্দুতে ক্রান্তিপাত ১৫৯০ খৃঃ পূঃঅব্দে হয়। ঐ সম্মিলন-স্থান হইতে আদিবিন্দু ৪ ৩৮´ ৩৫" বিকলা দূরবর্ত্তী; সুতরাং ঐ দূরত্ব অতিক্রম করিতে, ক্রান্তিরেখার অন্ততঃ ৩৩৩ বৎসর লাগিয়াছিল। (১৫৯০+৩৩৩ ১৯২৩) খৃষ্টপূর্ব্বাব্দার সপ্তর্ষিরেখাও ক্রান্তিপাত রেখার সহিত মঘার সম্মিলন হয়। পাশ্চাত্য মতানুসারে ও আমাদের গণনায় পরীক্ষিতের রাজত্ব, খৃষ্টের জন্মের ১৯২০ বৎসর পূর্ব্বে, সুতরাং যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবও খৃষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৬৭ অধ্যায়ে একটী শ্লোক আছে "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তোমাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠিরঃ। ত্রিভাগশেষঃপক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥" ভীষ্ম ১০ দিন যুদ্ধ করিয়া শরশয্যাগত হয়েন। তখন দক্ষিণায়ন জন্য তিনি কলেবর পরিত্যাগ না করিয়া, উত্তরায়ণ জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। পরে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই, যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন 'হে যুধিষ্ঠির! উত্তরায়ণ আরম্ভ, এদিকে সৌম্য (চান্দ্র) মাঘ মাস উপস্থিত। এই শুক্ল পক্ষ, এই মাস অর্থাৎ চান্দ্রমাসও ত্রিভাগ-শেষ, এই আমার মৃত্যুর কাল।' এই বলিয়া শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। এতাবতা স্পষ্ট বোধ করা যায় যে, ঐ সময় চান্দ্রমাঘ মাসের শুক্লাষ্টমীতেই উত্তরায়ণ আরব্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐ সময় মঘানক্ষত্রেই ক্রান্তিপাত হইত, এবং চান্দ্রমাসেই রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ ধরা হইত। চান্দ্র মাসে উত্তরায়ণ ধরিলে, তৎসময় গণনা করা যায় না। কেহ কেহ চান্দ্র মাঘমাস ধরিয়া গণনা করিতে বসিয়া বলিয়াছেন যে "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে যখন উত্তরায়ণ হয়, তখন শুক্লপক্ষ এবং তখন চান্দ্রমাঘ মাসের চতুর্থাংশ গত হইয়াছিল। ৩০এ ফাল্গুনও যদি চান্দ্রমাস শেষ হইয়া থাকে, তাহাহইলেও দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগকে ৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত দিন গণনা করিতে হইবে। ৭ই পৌষ হইতে ৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৫৮।৫৯ দিন পাওয়া যায়। রবির এখন যেরূপ গতি আছে, তদনুসারে ঐ ৫৮ কি ৫৯ দিনে প্রায় ৫৮ অংশ গমন করে। এই ৫৮ অংশ অয়নবিন্দু সরিয়া যাইতে কত বৎসর লাগিতে পারে?" এরূপ গণনার বা সময়নিরূপণের কোন মূল্যই নাই, কারণ আমাদিগের মত নগণ্য লেখকের অনুমান-বিজৃম্ভিত ৩০শে ফাল্গুন, চান্দ্রমাঘের শেষ না হইয়া, ৩০শে মাঘ বলিলেও, যাহা লিখিত আছে, তাহার কি বিরুদ্ধ হয়? যদি ৩০ মাঘ ধরা যায়, তাহাহইলে যুধিষ্ঠিরাদি নিতান্ত আধুনিক হইয়া পড়েন;

সুতরাং যে কালনির্ণয় উদ্দেশ্যে শত শত মনস্বীগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত, তাহার জন্য আমাদের অনুমান-বিজৃম্ভন নিতান্ত হাস্যজনক। বঙ্গীয় গ্রন্থকারকুল-গৌরব স্বর্গলোকগত বঙ্কিমবাবু আবার ঐ শ্লোকে সৌরমাসও অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাচীন জ্যোতিষের তত্ত্ব যতটুকু এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতে মহাভারতীয় কালে যদিও সৌর কালাদি সুবিদিত ছিল, কিন্তু সাধারণ গণনাদিতে যে সৌরগণনা প্রচলিত ছিল, এরূপ কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই. সুতরাং সৌরমাস ধরাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। তাই বলিয়া "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সৌরমাস প্রচলিত ছিল, এ কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতেছে না" বলা সঙ্গত হয় নাই। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কেন, তাহারও অনেক পূর্ব্বে সৌরকাল গণনা আরব্ধ হইয়াছে। মনুসংহিতা মহাভারতের পূর্ব্বের গ্রন্থ, উহার অনেক স্থলেই সৌরকালের বহুল বহুল উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ, তাহাতেও ঋতু (৫) ও অয়নের (৬) উল্লেখ থাকাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মহাভারতের কালে কেন, সেই আদি বৈদিক যুগেও ভারতে সৌরগণনা একবারে অপ্রচলিত ছিল না।

পাশ্চাত্যমতে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরীক্ষীতের সময় মঘায় ক্রান্তিপাত হইয়াছিল। যখন বাসন্তী অয়নান্তবিন্দু কৃত্তিকার প্রথম বিন্দুতে, তখন ধনিষ্ঠার ৩২০´ কলায় দক্ষিণ-অয়নান্ত বিন্দু ছিল। যখন ক্রান্তিপাত ধনিষ্ঠার শেষ বিন্দুতে হইত, তখন অপর ক্রান্তিপাত অশ্লেষার মধ্যভাগে হইত। ঐ ক্রান্তিপাত-সময় নিরূপণ করিতে দেখা যায়, অয়নান্ত-রেখা ঐ সময় বিশাখার মধ্য-দিয়া যাওয়ায়, ঐ ক্রান্তিরেখাকে দ্বিখণ্ড করিয়াছে এবং কৃত্তিকার প্রথম বিন্দু দিয়া গমন করিয়াছে। ঐ কৃত্তিকা-সম্পাত-বিন্দুই তদানীন্তন বাসন্তী অয়নান্ত বিন্দু। বোণ্ট সাহেব ঐ সময় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, মঘায় ক্রান্তিপাত-বিন্দুর দ্রাঘিমান্তরে কৃত্তিকার প্রথম বিন্দু হইতে (অশ্বিনীর প্রথম বিন্দু হইতে গণনা করিয়া) ১০২°২০´। খৃঃ পূঃ ৭৫০ অব্দের ইংরেজী পঞ্জিকার অয়নান্ত-বিন্দু হইতে ঐ মঘায় ক্রান্তিপাত বিন্দুর দ্রাঘিমান্তর ১৪৬°২১´। এতাবতা বুঝাযায় যে, অয়নান্ত বিন্দু ৪৪°১´ কলা পশ্চাৎপদ হইয়াছে। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে অয়নান্তবিন্দুর শত বার্ষিক গতি ১°—৪৭, সুতরাং অয়নান্তবিন্দুর ৪৪°১´ কলা ফিরিয়া যাইতে, হিন্দু-জ্যোতিষ মতে অয়নান্ত বিন্দুর শত বার্ষিক গতি ১°৪´ হইতে, ঐ ৪৪°১´ কলা ফিরিয়া যাইতে, ৪১২৪ বৎসর লাগে। বোণ্ট সাহেবের মতে অয়নান্তবিন্দুর বার্ষিক গতি ৫০´´ বিকলা; তাহা হইলে ঐ ৪৪°১´

(৫) ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা * * *
মরুতঃ সোমং পিব ঋতুনা * * *
২৩ সুক্ত। ১ম মণ্ডল। ১ম
অষ্টক, ঋগ্বেদসংহিতা।

(৬) উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায়-
পন্থামন্বেত বা উং।
সুক্ত।১ম মণ্ডল।১ম অষ্টক-
ঋগ্বেদসংহিতা।

কলা যাইতে ৩১৮০ বৎসর লাগে। যথার ক্রান্তিপাত হিন্দু-মতে ৪১২৪—১৭৫০= ২০৭৪ এ খৃঃ পূঃ অব্দ; বোণ্টমতে ৩১৮০—১৭৫০=১৪৩০ খৃঃ পূঃ অব্দ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল জ্যোতিঃ-শাস্ত্রানুসারে যদিও একরূপ নির্ণীত হইল, কিন্তু ঐ নির্ণয়ের উপর নির্ভর করা যায় না; কারণ প্রাচীন হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্র ও আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিঃশাস্ত্রে অনেক বিষয়ে অনৈক্য। তাহার একটি প্রধান কারণ, প্রাচীন কালে হিন্দু-জ্যোতির্বেত্তারা যে সমস্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে গণনা করিতেন, আধুনিক যন্ত্রাদি তদপেক্ষা উন্নত, এই জন্যই গণনায় বিশেষ পার্থক্য। প্রথমতঃ হিন্দু-জ্যোতিঃশাস্ত্রকারগণ বলেন, সপ্তর্ষিগণ গতিশীল ও এক এক নক্ষত্রের সমদেশে ১০০ বর্ষ বাস করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, সপ্তর্ষির কোন গতি নাই; সপ্তর্ষি-রেখা ভ্রমে ক্রান্তিরেখাই ধরা হইয়াছিল। আবার সেই ক্রান্তিরেখাও এক এক নক্ষত্রে ৯৬০ বৎসর থাকে। এই উভয় মতের কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা, অথবা দুইটাই সত্য, তাহা মীমাংসা করা বর্ত্তমানে অসাধ্য। হইতে পারে, কালে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের আরও উন্নতি হইলে, পুনরায় ঐ সপ্তর্ষির গতি অনুমিত ও প্রমাণীকৃত হইবে।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন, যুধি-ষ্ঠিরের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা পরাশর ও গর্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। কাপ্তেন উইলফোর্ড বলেন যে, পরাশর ও গর্গ খৃষ্টজন্মের ১১৮০ অব্দ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত ডেভিস ও অধ্যাপক বার্ণার্ড বলেন, উহাঁরা খৃষ্টজন্মের ১৩৯১ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সার উইলিয়াম্ জোন্স বলেন যে, পরীক্ষিত কলিযুগ-প্রারম্ভে—অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের ৩০০৫ অব্দ পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন। বার্ণার্ড সাহেব বলেন যে, হিন্দু অনুমান অনুসারে খৃষ্টের জন্মের ১৭১৭ অব্দ পূর্ব্বে পরীক্ষিত আবির্ভূত হয়েন। বোণ্ট সাহেব বলেন যে, ভারত-যুদ্ধ খৃষ্টের জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। বোণ্ট সাহেবের এইরূপ নির্দ্ধারণের কোন যৌক্তিকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমাদের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার তথাবিধ নির্দ্ধারণে বার্ণার্ড প্রভৃতি পণ্ডিতগণও অনুমোদন করেন নাই।

জ্যোতিঃশাস্ত্র অপার সমুদ্রবিশেষ বিস্তৃত হইলেও, আমাদের ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ; সুতরাং তদ্দ্বারা যুধি-ষ্ঠিরাদির আবির্ভাব নির্ণয় অভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পুরাণই অস্মদাদির ঐহিক ও পারত্রিক অবলম্বন, সুতরাং পুরাণাদির সাহায্যেইবা উহা কতদূর যথাযথরূপে নির্ণীত হইতে পারে, তাহাও সবিশেষ আলোচ্য।

মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্॥"

পরীক্ষিতকে বলা হইতেছে—"আপনার জন্ম হইতে নন্দাভিষেক-কাল পর্য্যন্ত পঞ্চ-শতোত্তর সহস্র বৎসর অর্থাৎ ১৫০০ শত বৎসর।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

অর্থাৎ আপনার জন্ম হইতে নন্দাভিষেক পর্য্যন্ত দশোত্তর পঞ্চশত বর্ষ অর্থাৎ ১৫১০ বৎসর। এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে 'পঞ্চ শতানি' না হইয়া 'শতংপঞ্চ' হওয়াতে অর্থের ব্যতিক্রম হওয়া উচিত। ইহার উত্তর ব্যাকরণ শাস্ত্রেই যথেষ্ট। বিশেষতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, পরীক্ষিতের সমকালীন মগধরাজ মার্জ্জারি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত রাজগণ ১০০০ বৎসর রাজ্যভোগ করেন। দ্বাদশস্কন্ধে আছে, রিপুঞ্জয়ের পর প্রদ্যোত বংশীয়গণ ১২৮ বৎসর, কৈশুনাগবংশ ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। কৈশুনাগ বংশের পরবর্ত্তী রাজাই নন্দ; সুতরাং মার্জ্জারি হইতে নন্দ পর্য্যন্ত ১৪৯৮ বৎসর। পূর্ব্ব পাঠের প্রতি দৃষ্টি করিলেও এরূপ আপত্তি বা সন্দেহ হইতে পারে না।

বর্ত্তমান মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণে এ শ্লোকটী আবার অন্যরূপ দৃষ্ট হয়। যথা—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেক কাল পর্য্যন্ত সহস্র পঞ্চদশ বৎসর হইয়াছিল। মুদ্রাকর-প্রমাদ বা লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ এ শ্লোকটী এরূপ পাঠে মুদ্রিত, কারণ এ অধ্যায় ও উহার পুরোবর্ত্তী অধ্যায়েই এই পুরাণকার বলিয়াছেন যে, সোমাপি (নামান্তর মার্জ্জারি) হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত ১০০০ বৎসর; তৎপরে প্রদ্যোত বংশীয়গণ ১২৮ বৎসর ও তৎপরে কৈশুনাগগণ ৩৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; তৎপরেই নন্দাভিষেক হয়।

পুরাণকার কি বাস্তবিক এইরূপ ভ্রম করিয়াছেন? পুরাণকারগণ কি আধুনিক গ্রন্থকারের ন্যায় 'মাদকঘূর্ণিত-লোচন' হইয়া বা 'গাঁজা খাইয়া' এইরূপ অসঙ্গত পাঠ লিখিলেন? তাহা হইতে পারে না। লিপিকর বা মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতই এরূপ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ একমত হইয়া বলিতেছেন যে, নন্দবংশীয়গণ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিলে, চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়েন। চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টের জন্মের ৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব মৎস্যপুরাণ-মতে ১৫০০+১০০+৩৮১=১৯৮১ খৃঃ পূঃ অব্দে। শ্রীমদ্ভাগবত-মতে ১৪৯৮+১০০+১০০+৩৮১=১৯৭৯ খৃঃ পূঃ অব্দে বিষ্ণুপুরাণ মতে ১৫০০+১০০+৩৮১ =১৯৮১ খৃঃ পূঃ অব্দে। এতাবতা বলা যাইতে পারে যে, যুধিষ্ঠিরাদি অন্ততঃ খৃষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ প্রাচীন আর্য্য-জ্যোতির্ব্বিৎ ব্রহ্মগুপ্তের অভ্যুত্থান কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু যে কয়েক জনে চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতে সকলেরই পরস্পর অনৈক্য। কেহ বলেন, ব্রহ্মগুপ্ত ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে, কেহ বলেন ৫৫৮ খৃষ্টাব্দে, কেহ বা বলেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-লেখক মহাত্মা লিখিয়াছেন (৭) যে বোপ্ট

(৭) Mr. Bently states that the astronomer Brahmagupta flourished about a. b. 527, shortly after procuding the reign of Salambdhi.

Note-Vide Todd's Rajsthan.

বলেন, যে জ্যোতির্ব্বেত্তা ব্রহ্মগুপ্ত ৬২৭ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং সলোম্বধি রাজার রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে ছিলেন। আমরা সমস্ত পুরাণ তন্ন তন্ন করিয়াও সলোম্বধি রাজার নাম পর্য্যন্ত পাইলাম না। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ কবিতা ও বিষ্ণুপুরাণের টীকা দৃষ্টে বোধ হয়, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সাহেব সংস্কৃতে 'স লোমধিঃ' (অর্থাৎ সেই লোমধি) দেখিয়াই 'সলোম্বধি'ই একটী নাম স্থির করিলেন। একে সংস্কৃত ভাষা, তাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের জটিলতা; যাঁহার 'স লোমধিঃ' দেখিয়া সলোম্বধি নাম স্থির হয়, তিনি যে আর্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের হীনতা ও আধুনিকত্ব প্রতিপাদনে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

সংস্কৃতভাষা-সাগরে লম্ফ প্রদানে পরপারোত্তীর্ণ সাহেবের কথা বজায় রাখিয়াই দেখা যাউক, যুধিষ্ঠিরকে কত আধুনিক করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণেই বর্ণিত আছে—মহানন্দ-বংশের পরে মৌর্য্যবংশীয় ভূপতিগণ ১৩৭ বৎসর, তৎপরে পুষ্পমিত্র বংশ ১১২ বৎসর, পরে বসুদেব-বংশ ৩৪৫ বৎসর, তৎপরে বৃষণ ও তদীয় ভ্রাতা কৃষ্ণ ও তদ্বংশীয় শেষ রাজা (বোণ্ট-কথিত সলোম্বধির) লোমধিঃ পর্য্যন্ত রাজগণ ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি-মতে পরীক্ষিত হইতে নন্দাভিষেক ১৫০০ বৎসর। নন্দ-বংশীয়গণ ১০০ বৎসর রাজত্ব করিলে, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়েন। মৌর্য্য-বংশীয়গণ ১৩৭ বৎসর, পরে শুঙ্গ বংশ ১০০ বৎসর, পরে কণ্ব বংশ ৩৪৫ বৎসর, তৎপরে বৃষণাদি লোমধি ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। এতাবতা দেখা যাইতেছে যে, পরীক্ষিত হইতে লোমধি পর্য্যন্ত (১৫০০+১০০+১৩৭+১০০+৩৪৫+৪৫৬)=২৬৩৮ বৎসর। লোমধি ৫২৭ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত, সুতরাং পরীক্ষিত (২৬৩৮—৫২৭) বৎসর খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন।

রাজস্থানের ইতিহাস লেখক মহাত্মা কর্ণেল টড্ সাহেব লিখিয়াছেন—রাজ-তরঙ্গিণীকার বলেন যে, পরীক্ষিত হইতে বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থ-সিংহাসনে ৪ বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ বংশের শেষ রাজা রাজপাল। তিনি কুমাউন রাজ সুখবন্ত কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে, সুখবন্ত দিল্লী আক্রমণ করায় বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক পরাভূত হয়েন। (৮) রাজা সুখবন্ত ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া

---

(৮) From Parikshit who succeeded Yudhisthira to Bikramaditya four dynasties are given in continuans chain exhibiting sixty six princes to Rajpal who invading Kumaon was slain by Sukabanta. The Kumaon conqueror seezed upon Delhi, but was soon disposed by Vikramaditya.

Raghunath
Note—T's Rajstan.

Sukavunta a prince from the northern mountains of Kumaon ruled 14 years, when he was slain by Vikramaditya and from Bharat to this period 2915 years have elapsed.

Translation of Rajastan
by Wilson
T's Rajasthan.

বিক্রম কর্তৃক পরাভূত হয়েন এবং ভারত-যুদ্ধ হইতে ঐ সময় পর্য্যন্ত ২৯১৫ বৎসর হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য খৃষ্টজন্মের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন, সুতরাং যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব খৃষ্টজন্মের (২৯১৫—৫৬) ২৮৫৯ বৎসর পূর্ব্বে বলা যায়। মহাত্মা কর্ণেল টড-কৃত রাজস্থানে, রাজাবলি ও রাজতরঙ্গিণীর উইলসন সাহেব কৃত অনুবাদে স্থানে স্থানে টীকা দেওয়া হইয়াছে। এক স্থানের টীকায় গ্রন্থকার দেখাইতেছেন—যুধিষ্ঠির হইতে পৃথ্বীরাজের রাজত্ব ৪১০০ বৎসর। পৃথ্বীরাজ ১২১৫ সম্বতে (খৃঃ ১১৫৯৬৯) রাজা হয়েন। এতাবতা বলা যায়, যুধিষ্ঠির খৃষ্টজন্মের ২৯৫১ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পরলোক গত ডাঃ রাম দাস সেন (M. R. A. S.) মহোদয় বলেন, রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—"কলির ৬৫৩ বৎসর গতে কুরু-পাণ্ডবের প্রাদুর্ভাব হয়। রাজাবলীমতে যুধিষ্ঠির ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজসূয় যজ্ঞ করেন; তাহার পরই পাশাখেলা, বনবাস, অজ্ঞাতবাস ও যুদ্ধ প্রভৃতিতে ১৪ বৎসর; সুতরাং (৬৫৩+৭৬+১৪) ৭৪৩ বৎসর কলির গতাব্দায় ১লা অগ্রহায়ণ ভারত-যুদ্ধ। পঞ্জিকাকারদিগের মতে কলির বর্ত্তমান বয়ঃ ৫০০৬। ৫০০৬—৭৪৩=৪২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে ভারত যুদ্ধ; সুতরাং খৃষ্টজন্মের ২৩১৮ বৎসর পূর্ব্বে ভারত-যুদ্ধ। এরূপও বলা যায় যে, ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ২২৫৮ খৃঃ পূঃ অব্দে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন।

পরলোকগত মহাত্মা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ২টী শ্লোক (১৫) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘায়, আর নন্দ মহাপদ্মের সময় পূর্ব্বাষাঢ়ায় ছিলেন। মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র, অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ (১০×১০০) ১০০০ বৎসর দূরবর্ত্তী। ঐ দুইটী শ্লোকের অর্থ বোধ হয় এই যে, যে সময় সপ্তর্ষিরা পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন, তখন নন্দ প্রভৃতির সময় হইতে কলির বৃদ্ধি হইবে। এই শ্লোকদ্বয় দ্বারা পুরাণকার যে কোন বাঁধাবাঁধি কাল নির্ণয় করিতেছেন, তাহা বোধ হয় না। সাধারণতঃ কলির বৃদ্ধি আরম্ভ বলাই উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। যে বঙ্কিম বাবু নিজ গ্রন্থের এক স্থলে পুরাণকার ঋষিদের উক্তি "গাঁজাখুরি"—এরূপ আভাস প্রকাশ করিতেও ক্রটী করেন নাই, সেই বঙ্কিম বাবুই আবার সেই গাঁজাখোর পুরাণকার ঋষিদের লিখিত ২টী শ্লোক দৃষ্টে ভ্রমে পতিত হইয়াই দলিল খাড়া করিতেছেন। কেন না, ঐ দলিলটী না দেখাইতে পারিলে যুধিষ্ঠিরাদি আরও প্রাচীন হইয়া পড়েন। পুরাণকার ঋষিরা ঐ দুইটী শ্লোকের কয়েকটী শ্লোক পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরীক্ষিত হইতে নন্দাভিষেক

(১৫) প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥
৪র্থ অঃ। ২৪। বিষ্ণুপুরাণ

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥
২ অ। ১২ স্কন্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত।

১৫০৮। ১৫০০ বৎসর; সুতরাং এ২ ২টী শ্লোকেই যে তাহার বিরুদ্ধ কথা দুই জনেই বলিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং ঐ ২টী শ্লোক দ্বারা সাধারণতঃ কলির বৃদ্ধিই সূচিত হইতেছে; উহা দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের পরিমাপ হয় নাই। বিশেষতঃ নন্দ বলিলেই যে মহানন্দকে বুঝাইবে নিশ্চয়, তাহাইবা কিরূপে বুঝিব? প্রদ্যোত বংশেও একজন নন্দ বর্দ্ধন ছিলেন। তাঁহাকে বুঝাইলে আর কথাই নাই; সম্ভবতঃ তাহাই হইবে; কারণ দেখান হইতেছে যে, পরীক্ষিতের সমকালীন মার্জ্জারি হইতে প্রদ্যোৎ-বংশের (যে প্রদ্যোতবংশে নন্দ বর্দ্ধন) রাজত্ব কালের প্রারম্ভ ১০০০ বৎসর; সুতরাং এখানে মহানন্দ না হইয়া নন্দবর্দ্ধন হওয়াই সম্ভব। এই জন্যই স্বর্গীয় মহাত্মা বঙ্কিম বাবুর প্রদর্শিত প্রমাণে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই।

মহাভারতের কালনির্ণয় সম্বন্ধে আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উড়িষ্যার অন্তর্গত খণ্ডগিরি নামক গিরিপুঞ্জের শৃঙ্গ উদয়গিরির হাতীগুহার দ্বারস্থ, প্রস্তর-লেখ্যের আদর্শ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এ২ লেখ্যে 'ঐর' নামক রাজার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। বিগত ১২৮৯ সালের ভারতী পত্রিকায় উড়িষ্যার ইতিহাসে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, মহারাজ ঐর এ২ ১২৮৯ সালের ২২৭২ বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গ দেশের (আধুনিক উড়িষ্যার) রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এতাবতা স্থির হয় যে, বর্ত্তমান ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ঐর মহারাজার রাজত্ব-বয়ঃক্রম ১২৮৬ বৎসর। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেক কাল ১৫০০ বা ১৫১০ বৎসর; সুতরাং পরীক্ষিতের জন্ম হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত (১৫১০+২২৮৬) ৩৭৯৬ বৎসর। এতাবতা পরীক্ষিতে জন্ম খৃষ্টজন্মের ১৮৯০ বৎসর পূর্ব্বে; সুতরাং যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এ বিষয়ে কোন আপত্তিই হইতে পারে না।

আমরা যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে কয়েক প্রকার কালের প্রমাণাদি পাইলাম, তাহা নিম্নে একত্র প্রকটিত করিলাম। ঐ সমস্ত কালের কোন্‌টী ঠিক, তাহা নির্দ্ধারণ করা অস্মদাদি সদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হইলেও আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব কাল পূর্ব্বে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে একত্র সমাবেশিত হইল।

যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব-কাল।

গর্গাচার্য্য মতে, যৌধিষ্ঠিরাব্দ স্বীকারে ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ অব্দ।

গর্গাচার্য্য মতে আল্‌বেরুণি-লিখিত কাশ্মিরী পঞ্জিকানুসারে গণনায় ১৯৮১ খৃঃ পূঃ অব্দ।

মৎস্য পুরাণ মতে ১৯৮১ খৃঃ পূঃ অব্দ।

বিষ্ণু পুরাণ মতে ১৯৮১ খৃঃ পূঃ অব্দ।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে ১৯৮৯ খৃঃ পূঃ অব্দ।

বোণ্ট্‌ প্রভৃতির উল্লিখিত বুদ্ধগুপ্তের আবির্ভাব ধরিয়া, পুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া গণনানুসারে ২১০০ খৃঃ পূঃ অব্দ

উদ্ধৃত রাজমালা ও রাজতরঙ্গিণী-মতে

২৮৫৯ খৃঃ পূঃ অব্দ। টড্‌ধৃত পৃথ্বীরাজের রাজত্ব ধরিয়া গণনায় ২৯৫১ খৃঃ পূঃ অব্দ। ডাক্তার রামদাস সেন ধৃত রাজতরঙ্গিণী মতে ২২৬৮ খৃঃ পূঃ অব্দ। উড়িষ্যার হাতীগুহায় প্রস্তর-লেখ্যানুসারে ১৯০০ খৃঃ পূঃ অব্দ।

উপসংহার কালে আমাদের নিবেদন, সহৃদয় পাঠকগণ ও নিরপেক্ষ সমালোচকগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া, প্রত্যেক প্রমাণের মৌলিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যেটী অবলম্বনীয় হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবেন। আমাদের এ সম্বন্ধে মোট এই মাত্র বক্তব্য যে, যুধিষ্ঠিরাদিকে যিনি যতই আধুনিক বলুন, যুধিষ্ঠিরাদির আবির্ভাব খৃষ্টজন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, ইহাতে কোন সন্দেহের কারণ দৃষ্ট হয় না।

মরণ-তরণ হরি-স্মরণ।

"হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি।" (শঙ্কর)

[ছড়া]

মরণ! মরণ! মরণ!
সর্ব্বনেশে স্মরণ!
মরণ! মরণ! মরণ!
সর্ব্ব ভয়ের কারণ!
ভুলে আছি যাই,
টিঁকে আছি তাই।
মরণ' মনে নাই,
হাসি খেলি তাই।
নৈলে যেতাম ক্ষেপে,
মরণ-মরণ ভেবে!

ক্বচিৎ যখন ভাবি,
মন যেন খায় খাবি!
কেমন যেন হই;
আমায় আমি নই!
একটু পরে অম্‌নি,
আবার যেমন্‌ তেম্‌নি!

ক্বচিৎ কভু ধীরে
ভাবি মরণটীরে।
তাইত! এত ভয় কি?
মর্‌'লেইনা হয় কি?
সবাই ত মর্‌ছে;
ভেবে কে কি কর্‌ছে?
তবু ভাবনা যোঠে,
মরণ মনে ওঠে!—
কলেরা কি ম্যালেরিয়া,
ডিসেণ্টি কি ডাইরিয়া,
টাইফয়েড্‌—নিউমোনিক্‌,
কিম্বা প্লেগ্‌ বিউবোনিক্‌;
সাপের ছোবল্‌, বাঘের থাবল্‌,
কিম্বা সে কুম্ভীরের কবল;
আগুনে পোড়া,—জলে চুবুনি,
ছটফটি কি হাবুডুবুনি!
তীর-গুলি কি ছোরার চোপ্‌;
শূলের খোঁচা, দায়ের কোপ;
রোগে—অপঘাতে—বিষে,
সাধের প্রাণটি যাবে কিসে,
সেই ভাবনাই বিপত্তি!
তাই মরণে আপত্তি।
দিব্যি যখন ঘুমিয়ে আছি,
অম্নি অম্নি হলেই বাঁচি!
কিন্তু তা'ত হবার নয়।
এই এক দফা—মরণ-ভয়॥

দোস্‌রা দফার ভয়,
নরক যদি রয়,
তবেই দফা শেষ!
সুকৃতির নাই লেশ;
হরেক্‌ রকম পাপ,
এড়ান নাইরে বাপ!

(হয়ত)
'কুম্ভীপাকে'ই যাব ;
কি যাতনাই পাব !
(ওঃ !)
পুরাণাদি শাস্ত্র মাঝে
যে নরক-বর্ণনা আছে,
এক রত্তি হলে সত্যি,
তাতেই যে ঘোর্ বিপত্তি !
নরক ভেবে কাঁপে বুক ;
তাই মরণে অনিচ্ছুক !

তেস্‌রা দফার ভয়,
নীচ জন্ম বা হয়।
(পাছে)
"হাতের পাঁচ" হারাই,
মানব-জনম্ না পাই।
(আহা !)
শ্রীকৃষ্ণ-ভজার
মজার বাজার—
নরজন্ম সার—
পাই কি না পাই আর !
(হায় !)
দুষ্কর্ম্মের দোষে,
দুরদৃষ্ট-বশে,
পোকা-মাকড়-গাছ,
পশু-পাখী-মাছ,
কি বা হতে হবে—
ফের্ ফিরে এ ভবে ?
ফের্ ফিরে এই মর্ত্ত্যে,'
চরাচরে চর্‌তে,
কি রূপ হবে ধর্‌তে ?
কি সাজ হবে পর্‌তে ?
পারিনা ঠিক্ কর্‌তে,
তাই চাইনা মর্‌তে।

চৌঠা দফার কষ্ট—
ভবের ভোগটি নষ্ট !
পঞ্চমে বিশেষ—
প্রিয়-বিরহ-ক্লেশ !

(হায় !)
সবই পড়ে রবে,
কি না জানি হবে !
আমি কোথা যাব !
আর কি এ সব পাব ?
(হায় !)
নিয়ে এলাম দেহ,
সঙ্গী নহে সেহ !
(আহা !)
এরূপ রূপের ঘটা !
বর্ণে স্বর্ণ ছটা !
এমন নাকের বাঁশীটি !
এমন মুখের হাঁসিটি !
এমন বুলী মিষ্টি,
এমন আঁখির দৃষ্টি !
(আহা !)
কিবা বুকের পাটা !
কেমন নরম গা-টা !
হাত কাদার দলা,
তুল্‌তুলে পা'র তলা !
(আমার)—
এমন দেহখানি
কি হবে না জানি !

(আহা !)
এই যে বিধুমুখী,
এই যে খোকা-খুকী,
এই তেতালা বাড়ী,
এই যে ঘোঁড়া-গাড়ী !
(আমার)
বোট্-বজরা-পিনিস্,
কতই সখের জিনিস্ !
(আমার)
'ফজ্‌লী' আমের গাছ,
পুকুর-পোরা মাছ !
ফল ফুলরী নানা,
ক্ষীর-সর-ছানা,
চাটুনি-চিনিপানা,
মোণ্ডা-মিহিদানা !

(আহা !
কিবা সখের আহার !
কি পোষাকের বাহার !
(আমার)
নোটের তাড়া, টাকার তোড়া,
বেনারসী-শালের যোড়া,
উলের তোষক, ফুলের তোড়া,
কোঁচ-কেদেরা শাটিন্-মোড়া ;
খাস্অম্বুরী-তাম্বুলীন,
দেল্খোস্ ও কুন্তলীন,
চা চুরোট চকোলেট্,
ব্রাণ্ডি-বরফ লেমনেড্ !
(আমার)
খোকার বদনখানি,
খুকীর মধুর বাণী,
প্রাণ-প্রেয়সীর হাসি,
শক্ত মায়ার ফাঁসী !
(ওঃ !)
শমন যখন ডাক্‌বে,
কোথা বা কি থাক্‌বে !
(রবে)
যেথার তা সেথায় ;
আমিই যাব কোথায় !
জগৎ সমভাব ;
আমারি অভাব !
ধরা রবে ধর্‌তে ;
মর্ত্ত্যের হবে মর্‌তে ;
সেই ভাবনায় মরি ;
তাই মরণে ডরি।

(ফলে)
স্পষ্ট কথা কই,
মর্‌তে রাজী নই।
(আহা !)
মরণ আসে ;
ক্রমে ঘনায় পাশে !
ক্রমে ফেলে পা,
ক্রমে মেলে হা !

(যখন)
ঠিক্ সময়টি মিল্‌বে,
গপাৎ করে গিল্‌বে !
(উঃ !)
ভেবে উঠি শিউরে ;
উপায় না পাই ঠাউরে।

তবে কিনা শাস্ত্র-মাঝে,
সাধু-ভক্ত জনের| কাছে—
একটি কথা শোনা আছে—
একটি খবর্ জানা গ্যাছে।—
('খোঁস্ খবরের ঝুঁটাও ভাল'—
নিরাশা-আঁধারে আলো !)
এ অপায়ের উপায়—
কৃপাময়ের কৃপায়।
উপায় হরির ও পায় !
হরি নামটি জপায় !
(অতি)
সহজ প্রতীকার—
'হ' ও 'র'য়ে ই-কার !
অর্থাৎ কিনা 'হরি'—
নামেই শমন তরি !
(যেমন)
হোমিওপ্যাথিক্ ডোজে
বিকট বিকার ঘোচে ;
(যেমন)
'সূচিকাভরণ' বড়ী—
বিকার-নারণ-করী ;
(যেমন)
বোড়ের একটি চেলে
'বাজিমাৎ' হয় হেলে;
(যেমন)
ভীষ্মের একটি শরে
দশটি হাজার মরে !
(তেমি)
'হ' আর 'র'য়ে ই-কার।
হরে ভব-বিকার।
(ঐ) আখর দুটি খাঁটি
যম-তাড়ানো লাঠী !

(ঐ) দু-আখরের দাপে,
ডরে শমন কাঁপে।
দু-আখরের চোটে
ভয়ে শমন ছোটে।
দু-আখরের ঘায়,
মরণ মারা যায়!!
(কেন)
হরিনাম যে লয়,
তার আবার কি ভয়?
(তারে)
ছোঁয়না রবি সুতে,
নে যায় বিষ্ণুদূতে।
(ও যে)
হাসিমুখে মরে,
যম যাতনায় তরে।
হরে 'হরি-বলা'—
কালে দেখায় কলা!
(ও তার)
নীচজন্ম, নরক-ভীতি,
প্রিয়-বিরহ, ভোগ-বিরতি,
যম-যাতনার বিষম ভয়,
হরিনামেই সর্ব্ব লয়।
ভবে আসা-যাওয়ার ক্লেশ,
দু-অক্ষরে দুয়েরি শেষ!
(আহা!)
এমন সহজ উপায়
থাক্‌তে হরির কৃপায়,
'হরি' বল্‌তে নারি!
ওটিই যেন ভারি!
বক্কেশ্বরের বাবা—
'হরি' বল্‌তে বোবা!
'হরি' শুন্‌তে কালা!
'হরি' জপ্‌তে জ্বালা!
(ও নাম)
ভার-বোঝা ত নয়,
বল্লেই ত হয়!
(হায়!)
তবু মতি লয়না,
হরি-বলা হয়না!

যত সন্দ-ধন্দ,
যত বাধা-বন্ধ,
অবহেলা-আলস্য,
উপেক্ষা বা ঔদাস্য,
'হরি' বল্‌তে ঠোঁটে,
সবই এসে যোটে!
তাও প্রাণে সয়না,
হরি বলাও হয় না।

আসল কথা এই,
বিশ্বাসটি নেই!
মূলধনটির অভাব,
তাতেই এ স্বভাব।
(আহা!)
বিশ্বাসটি ফলে
বড় ভাগ্য-বলে।
(নামে)
বিশ্বাসটি যার,
আশ্বাসটি তার।
নিঃশ্বাসটি তাই—
নিঃশেষে ভয় নাই!
(ও যে)
নাম-মহিমা জানে,
'নাম-নামী এক' মানে,
(যায়)
নামে রতি-মতি,
নামে নতি-গতি,
নামে রুচি যার,
সর্ব্বসিদ্ধি তার।
বিশেষ কলিযুগে,
শুনি শাস্ত্র মুখে,
কাতর কলির জীবে
নামটি শুধু নিবে;
[illegible]
সহজে কাজ সারবে
হরি দয়ার নিধান;
তাই এ দয়ার বিধান

(আহা!)
নাম বিনে নাই গতি।—
সহজ সাধন অতি।—
(হায়!)
হেলায় হারায় যেই,
হতভাগ্য সেই।
বাজে কাজে যার
বুদ্ধি ক্ষুর-ধার,
আসল কাজে নেই;
আসল বোকা সেই।
(থাকৃতে)
সহজ উপায় করে,
পরখ্ যে না করে,
সন্দেহে কাল হরে,
মিছে ঘুরে মরে;
(কিম্বা)
বাজে কাজে ডুবে,
যে রয় বিষয়-কূপে,
আসল কাজে নেই,
আসল বোকা সেই।

ভাই বলি ভাই!! জাগ,
হরিনামে লাগ;
বল হরিবোল,
মিট্‌বে সকল গোল।
মরণ-হরণ হবে,
হরির চরণ পাবে!
হরি-প্রেমে মজ্‌বে,
মজায় হরি ভজ্‌বে!
আর কি ভবে চাই?
বল তবে ভাই!—
হরি-প্রেম-ভরে
হরেকৃষ্ণ হরে!
বল অবিরাম—
হরে হরে রাম!
বল হা[illegible]
হরিবোল হরি!!

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

তমোলুক-ইতিহাস।—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ রক্ষিত প্রণীত। ১৩৪ পৃষ্ঠার পুস্তক। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

আমরা "তমোলুক-ইতিহাস" পাঠে প্রীত হইলাম। অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহের এইরূপ সংগৃহীত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। অধুনা ভগবৎকৃপায়—স্বদেশী আন্দোলনের সর্ব্বতোমুখী প্রভায় তরল নাটক-নভেলী রুচি অস্মদ্দেশে কিছু অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; তৎপরিবর্ত্তে জীবন-চরিত ও ঐতিহাসিক পুস্তকাদির প্রতি সাহিত্যিক সুধী-সমাজে আগ্রহ দৃষ্ট হইতেছে, এবং এই জন্যই "তমোলুক-ইতিহাস" আজ সময়োপযোগী সমাদর লাভের যোগ্য, সন্দেহ নাই।

তমোলুক-ইতিহাসের আর একটু বিশেষত্ব এই যে, অর্ণবযান-যোগে সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্য-বলে আজ পৃথিবীর স্বাধীন সভ্য-জাতি সমূহ যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, এই প্রায় সহস্রাব্দ পরাধীন ভারতীয় আর্য্যজাতিও একদিন যে সেই সমৃদ্ধির সুপ্রসিদ্ধ অধিকারী হইয়াছিল, তাহার পরিষ্কার প্রমাণ এই পুস্তকে বর্ত্তমান। তমোলুকের প্রাচীন নাম 'তাম্রলিপ্তি' 'তাম্রলিপ্ত' ইত্যাদি। এই তাম্রলিপ্তি এক দিন ভারতের প্রধান এবং বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্য-বন্দর ছিল। একদিন এইখান হইতেই অর্ণবপোতে সিংহল, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত ও বাণিজ্য-বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন হইত। বৌদ্ধবিপ্লবের পূর্ব্বে এবং তৎসময়ে তমোলুকের [illegible]বর পৃথ্বী-প্রখ্যাত ছিল। তৎপর ক্রমশঃ প্রকৃতির বিধানবিশেষে সমুদ্র দূরে সরিয়া যাওয়ায় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক

কারণে তমোলুকের বাণিজ্য-বিলোপ ও অবনতি ঘটে। কালে সেই তমোলুক আজ কাল-কুক্ষির অনন্ত তমঃপুঞ্জে লুকাইবার মত হইয়া 'তমোলুক' নাম সার্থক করিতেছে। কেবল তদধিষ্ঠাত্রী দেবী 'বর্গভীমা'র পীঠস্থান-পত্তন ও ইদানীং ইংরাজরাজকৃত মহকুমা স্থাপন দ্বারা অস্তিত্ব ও পরিচয় কথঞ্চিৎ বজায় আছে। যাহাহউক, প্রাচীন ভারতের পূর্ণ নিজস্ব অর্ণবযান-যোগে সামুদ্রিক বাণিজ্যযাত্রার প্রকৃষ্ট প্রামাণিক পুস্তক রূপে এই "তমোলুক-ইতিহাস" সহৃদয় স্বদেশানুরাগী মাত্রেরই সমাদরণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ প্রত্নতত্ত্বানুরাগী পাঠকবৃন্দের ত ইহা প্রিয় উপভোগ্য হইবার যোগ্য।

এই পুস্তক-প্রণয়নে ত্রৈলোক্য বাবু যে গবেষণা, বিচারণা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই বিশেষ প্রশংসার্হ। সাহিত্যের হিসাবেও পুস্তকখানি সুন্দর হইয়াছে। ভাষাটি অত্যন্ত সরল, সুমিষ্ট ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। তবে স্থানে স্থানে কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বাগ্‌বিন্যাস আছে এবং কতকগুলি মুদ্রণ-প্রমাদও দৃষ্ট হইল। ভরসা করি, ভবিষ্যৎ-সংস্করণে বহীখানি নির্খুত হইবে।

"জন্মভূমি"—মাসিক সমালোচনী-পত্রিকা। ফাল্গুন। ১৩১৩ সাল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদকের নাম অনুল্লিখিত। ছাপা-কাগজ ভাল। দামও কম; বার্ষিক (মায় ডাঃ মাঃ) ১॥০ টাকা মাত্র। তারপর লেখা; তাও অপ্রশংসনীয় নয়। এবার সর্ব্বশুদ্ধ ১২টি প্রবন্ধ আছে। ডাঃ হেম বাবুর প্রবন্ধটি বেশ কাজের। আমাদের এ নিত্য নানারোগ-জীর্ণ—বিশীর্ণ বাঙ্গালী-সমাজে স্বাস্থ্যের কথা, রোগ-নিবারণের কথা, পরীক্ষিত ঔষধাদির সংবাদ বিশেষ উপকারী ও দরকারী সন্দেহ নাই। 'পরমকল্যাণগীতা' নামানুরূপ বটে, কিন্তু সকল কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহন কালে আহারের উপকারিত্ব শরীর-বিজ্ঞান-সিদ্ধ ও বহুপরীক্ষিত। শ্রীশ্রীসদাশিবোক্ত তন্ত্র-শাস্ত্রান্তর্গত বিখ্যাত "স্বরোদয়" শাস্ত্রে ইহার সম্যক্ বিবৃতি আছে। ফলে স্বরোদয়তত্ত্ব যোগ-মার্গীয় সুধী সাধকের সমাদর-সম্মত। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ স্বামীর "পরম-কল্যাণগীতা" মোটের উপর বেশ শিক্ষাপ্রদ, সন্দেহ নাই। বিবাহ বাণিজ্য, কৃষির অবনতি ও রাজকীয় বিদ্বৎসভা প্রভৃতি অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও অনেকাংশে সুখপাঠ্যতা গুণযুক্ত। 'রংমহালের প্রেম' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসটির অত্যল্পাংশ মাত্র প্রকাশিত; সুতরাং এখন ভাল-মন্দ বিশেষ কিছু বলিবার সুবিধা নাই; তবে ধরণটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বোধ হইল। কয়েকটি কবিতা কিছু কাঁচা লাগিল। দু-একটি কবিতা মন্দ নয়। বর্ণাশুদ্ধি, ব্যাকরণ-বিকার ও মুদ্রণ-প্রমাদ কতকগুলি দৃষ্ট হইল। আশা করি, ভবিষ্যতে তৎসম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বিত হইবে।

"জন্মভূমি" নামটি আজ কাল বড়ই সময়োপযোগী। "জন্মভূমি" যখন 'বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়' হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এ নামের এত উত্তপ্ত উপযোগিতা ছিল না। অধুনা এই স্বদেশী আন্দোলনের সন্দীপনী শক্তি-লীলার দিনে, যেরূপ দিনে দিনে দেশময় জননী জন্মভূমির সেবানুরাগ জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাতে "জন্মভূমি" নামটি এখন বেশ মানাইয়াছে। অতএব স্বদেশ-সেবা বিষয়ক পাকা হাতের প্রবন্ধাদি বেশী পরিমাণে "জন্মভূমি"তে থাকা বাঞ্ছনীয়। যাহাহউক "জন্মভূমি" পাঠে আমরা আশ্বাসিত হইয়াছি। আশা করি, আর একটু যত্ন ও আয়োজন সহকারে পরিচালিত হইলে, কালে ইহা একখানি [illegible] সাময়িক পত্রিকা-রূপে সাহিত্যসমাজে সমাদৃত হইবে।